দুটি বই একত্রে

NAEEM



মাসুদ রানা

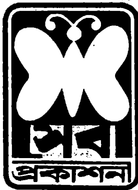
শ্বেত সন্ত্রাস

কাজী আনোয়ার হোসেন





Pathfinder



তিপ্পান্ন টাকা

ISBN 984-16-7151-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

প্রচ্ছদ: হাসান খুরশীদ রুমী

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M – M)
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
SHET SHONTRASH
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

শ্বেত সন্ত্রাস-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

এক

উত্তাল সমুদ্র ঘিরে রেখেছে সেইশেলস-কে। প্রজাতন্ত্রের একটা দ্বীপের নাম মাহে। এখানেই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে চড়ার জন্যে ভিক্টোরিয়া এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে পনেরো জন আরোহী।

অন্যান্য আরোহীদের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছে চারজনের দলটা, যে-কোন মুহূর্তে পাসপোর্ট আর কাস্টমস চেকিং শুরু হবে। চারজনই ওরা প্রাণবন্ত তরুণ-তরুণী, ফর্সা গায়ের রঙ রোদে পুড়ে উজ্জ্বল তামাটে হয়ে গেছে সবারই। এখনও ওরা আনন্দে মাতোয়ারা, স্বর্গীয় দ্বীপ মাহেতে ক'টা দিন ছুটি কাটিয়ে আরও যেন তাজা আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখে বাঁধ ভাঙা হাসি, চলনে বলনে যৌবনের মদমত্ততা। ওদের দিকে তাকালে একজনকে আলাদা এবং এককভাবে অবশ্যই চোখে পড়বে, শুধু তার শারীরিক উপস্থিতি আর ব্যক্তিত্বের প্রভা প্রায় নিষ্প্রভ করে রেখেছে বাকি তিনজনকে।

খুব লম্বা মেয়েটা, দীর্ঘ হাত-পা। সুগঠিত, গর্বিত ঘাড়ের ওপর বসানো রয়েছে ঝলমলে সোনালি মাথাটা। মাথা ভর্তি সোনা-রঙ মিহি আঁশগুলোকে মুচড়ে ওপর দিকে তোলা হয়েছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে তৈরি করা হয়েছে মস্ত একটা খোঁপা চাঁদির ঠিক মাঝখানে। রোদ তাকে হলুদ রঙ দিয়ে স্পর্শ করে সদ্য প্রস্ফুটিত সূর্যমুখী ফুলের মহিমা দান করেছে। সারা অঙ্গে বিকশিত স্বাস্থ্য আর যৌবন।

হাঁটার সময়ে মস্ত শিকারী বিড়ালের মত মনোহর ঢেউ ওঠে সারা শরীরে, খালি পা খোলা স্যান্ডেলে ঢোকানো, পাতলা সুতী কাপড়ের টি-শার্টের ভেতর দুর্বিনীত স্তন জোড়া কাঁপে, উরুসন্ধি আর নিতম্ব রেখার কাছে থেমে যাওয়া রঙ চটা ডেনিম শর্টস-এ এমন টান পড়ে যেন ছিঁড়ে যাবে, যেন নিজের চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে জ্যান্ত কোন প্রাণী। টি-শার্টের সামনের অংশে ইংরেজিতে একটা শ্লোগান লেখা–আই য়্যাম এ লাভ নাট। লেখাটার নিচে কোকো-ডি-মার নামে এই দ্বীপের একটা সুমিষ্ট ফলের স্কেচ, জোড়া নারকেলের মত দেখতে–ইঙ্গিতটা পরিষ্কার, ব্যাখ্যা করার দরকার হয় না।

কৃষ্ণবর্ণ ইমিগ্রেশন অফিসারকে মুক্তো ঝরা হাসি উপহার দিল সে, সোনালি ঈগল আঁকা মার্কিন পাসপোর্টটা ডেস্কের ওপর ফেলে আঙুলের টোকা দিয়ে ঠেলে দিল সামনের দিকে। অফিসার পাসপোর্ট পরীক্ষা করছে, ঘাড় ফিরিয়ে পুরুষ সঙ্গীর দিকে তাকাল মেয়েটা, বিশুদ্ধ জার্মান ভাষায় দ্রুত কথা বলে উঠল। এক মিনিট পর পাসপোর্ট ফেরত নিয়ে ধন্যবাদ জানাল অফিসারকে, নিজের দলটাকে পিছনে নিয়ে ঢুকে পড়ল সিকিউরিটি এরিয়ার ভেতর।

আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্যে দু'জন সেইশেলয় পুলিস রয়েছে, তাদেরকেও মুক্তো ঝরা হাসি উপহার দিল সে। কাঁধ থেকে নেটের ব্যাগটা নামিয়ে দুষ্টামি করার ভঙ্গিতে দোলাতে লাগল। মদির কটাক্ষ হেনে জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো আপনারা চেক করতে চান?' তার কথা শুনে হেসে ফেলল সবাই। ব্যাগে একজোড়া কোকো-ডি-মার রয়েছে। ফলগুলো অদ্ভুত আকৃতির, আকারে মানুষের মাথার দ্বিগুণ হবে একেকটা। মাহে দ্বীপের অত্যন্ত জনপ্রিয় স্যুভেনির এই কোকো-ডি-মার, ট্যুরিস্টরা প্রায় সবাই দু'একটা করে নিয়ে যায়। মেয়েটার সঙ্গী-সাথীরা সবাই যার যার নেট ব্যাগে একটা দুটো করে ভরে নিয়েছে। এ-ধরনের পরিচিত জিনিস পরীক্ষা করে লাভ নেই মনে করে ওদের ক্যানভাস ফ্লাইট ব্যাগের দিকে নজর দিল অফিসাররা। প্রত্যেকের হাতেই একটা করে ক্যানভাস ব্যাগ রয়েছে। মেটাল ডিটেকটর দিয়ে পরীক্ষা করার সময় হঠাৎ করে কর্কশ যান্ত্রিক আওয়াজ শোনা গেল। মেয়েটার এক পুরুষ সঙ্গী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করল, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ক্যানভাস ব্যাগ থেকে ছোট একটা নিকরম্যাট ক্যামেরা বের করল সে। আবার একবার হেসে উঠল সবাই,একজন পুলিস অফিসার হাত নেড়ে এগিয়ে যেতে বলল দলটাকে। ডিপারচার লাউঞ্জে পৌঁছে গেল ওরা।

ট্র্যানজিট প্যাসেঞ্জারে এরইমধ্যে ভরে গেছে ডিপারচার লাউঞ্জ, এরা সবাই মৌরিশাস থেকে বিমানের আরোহী হয়ে এসেছে। লাউঞ্জের খোলা জানালার বাইরে, টারমাকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড বোয়িং সেভেন-জিরো-সেভেন জাম্বো। চোখ ধাঁধানো ফ্লাডলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে বিমানটা, সেটাকে ঘিরে এয়ারপোর্ট কর্মীরা রিফুয়েলিঙের কাজে ব্যস্ত।

লাউঞ্জে বসার জন্যে কোন সীট খালি নেই, ঘুরতে থাকা একটা ফ্যানের তলায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল চারজন। রাতটা আজকের বেশ গরম, তার ওপর বদ্ধ ঘরের ভেতর এতগুলো মানুষের নিঃশ্বাস আর তামাকের ধোঁয়ায় দম আটকে আসার যোগাড়।

হাসি-খুশি খোশগল্পে স্বর্ণকেশী মেয়েটাই সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে, জলতরঙ্গের মত মিষ্টি হাসির আওয়াজ তুলে অনেকেরই দৃষ্টি কাড়ছে সে। পুরুষ সঙ্গীদের চেয়ে কয়েক ইঞ্চি, আর বান্ধবীর চেয়ে পুরো এক মাথা লম্বা, কাজেই তার দিকেই তাকাচ্ছে সবাই। মেয়েটাও নিজের রূপ-লাবণ্য সম্পর্কে সচেতন। তবে দারুণ সপ্রতিভ সে, হাবভাবে কোন রকম জড়তা নেই। কয়েকশো আরোহীর কৌতূহলী দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে হাসি তামাশায় মেতে আছে। লাউঞ্জে ঢোকার পর ওদের আচরণে সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে, চোখে-মুখে কি রকম যেন একটা স্বস্তির ভাব, যেন বড় ধরনের একটা বাধা পেরোনো গেছে। হাসির মধ্যেও কেমন একটা উল্লাসের বা উন্মাদনার চাপা সুর টের পাওয়া যায়। সবাই ওরা উত্তেজিত, মুহূর্তের জন্যেও স্থির থাকতে পারছে না। একবার এ পায়ে, আরেকবার ও পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, হাত দিয়ে কাপড় বা চুল ঠিক করছে ঘন ঘন।

বোঝাই যাচ্ছে পরস্পরের সাথে ওদের নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক, সেখানে আর কারও প্রবেশাধিকার নেই, তবু ট্র্যানজিট প্যাসেঞ্জারদের একজন কৌতূহল চেপে

রাখতে পারল না। সে তার স্ত্রীকে বসে থাকতে বলে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, লাউঞ্জের আরেক প্রান্ত থেকে এগিয়ে এল দলটার দিকে।

'এই যে, তোমরা ইংরেজি জানো নাকি?' কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করল সে। বেশি হলে আটচল্লিশ হবে বয়স, গম্বুজ আকৃতির মাথায় চকচকে টাক, মোটাসোটা নিরেট শরীর, চোখে বাইফোকাল চশমা। চেহারায় আত্মবিশ্বাস আর তৃপ্ত একটা ভাব, বোঝা যায় জীবনে সাফল্য আর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, বিপুল বিত্ত-বৈভবের অধিকারী।

অনিচ্ছার ভাব নিয়ে দলটা আকৃতি বদল করল, চারজনই তাকাল লোকটার দিকে, কিন্তু কথা বলল লম্বা মেয়েটা, একমাত্র যেন তারই অধিকার। 'অবশ্যই, আমিও একজন আমেরিকান।'

'কী আশ্চর্য, তাই না!' বিস্ময়ে আর আনন্দে চোখ বড় বড় করল লোকটা। খোলাখুলি, সপ্রশংস দৃষ্টিতে মেয়েটাকে লক্ষ করছে সে। 'আমি আসলে জানতে চাইছিলাম, ওগুলো কি জিনিস।' মেয়েটার পায়ের কাছে পড়ে থাকা নেট ব্যাগের দিকে আঙুল তুলল সে।

স্বর্ণকেশী জবাব দিল, 'ওগুলো কোকো-ডি-মার।'

'হ্যাঁ, নাম শুনেছি বটে…'

'এখানকার লোকেরা এগুলোকে লাভ নাটস্ বলে,' বলে চলেছে মেয়েটা, ঝুঁকে নেট ব্যাগটা খুলল সে। 'ভাল করে দেখলেই বুঝবেন, কারণটা কি।' দু'হাতে ফলটা ধরে লোকটাকে দেখাল সে।

ফলের দুটো অংশ এমন ভাবে জোড়া লেগে আছে, হুবহু মানুষের নিতম্বের মত দেখতে। 'এটা পেছন দিক,' বলে হাসল সে, মুখের ভেতর নড়ে উঠল জিভ, চীনামাটির মত ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। ফলটা ঘুরিয়ে ধরল সে। 'সামনের দিক।' লোকটা দেখল ফলের সামনের অংশটা কোমল রেশমের আঁশসহ অনেকটা যোনির মত দেখতে। 'কী আশ্চর্য, তাই না?' আবার হাসতে লাগল সে। দাঁড়াবার ভঙ্গি বদলে কোমরটা বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে, একটা ঢেউ উঠল তলপেটে। নিজের অজান্তেই মেয়েটার আঁটসাঁট ডেনিমের দিকে তাকাল লোকটা। দম বন্ধ হয়ে এল তার। বুঝতে পেরেছে, মেয়েটা তাকে নিয়ে কৌতুক করছে। একটা ঢোক গিলল বেচারা। হতভম্ব হয়ে পড়েছে–মেয়েটার শর্টসে দুটো বোতাম খোলা, ভেতরের বেশ কিছুদূর দেখা গেল।

'কী আশ্চর্য, তাই না?' আবার বলল মেয়েটা, সকৌতুকে লক্ষ করছে লোকটাকে।

লজ্জায়, অপমানে লোকটার কান গরম হয়ে উঠল। মুখ বন্ধ, ঘাম ছুটছে শরীরে।

'পুরুষ গাছটার যে কেশরে পরাগ থাকে, সেটা কত বড় হয় জানেন?' জিজ্ঞেস করল স্বর্ণকেশী। 'আপনার হাতের মত লম্বা আর মোটা, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন!' চোখ বড় বড় করল সে। লাউঞ্জের অপরপ্রান্তে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লোকটার স্ত্রী, মেয়েলি বুদ্ধি দিয়ে টের পেয়ে গেছে স্বামী বেচারা বিপদে পড়তে যাচ্ছে। স্বামীর চেয়ে তার বয়স অনেক কম, বাচ্চা কোলে সীট ছেড়ে

উঠতে হিমশিম খেয়ে গেল সে।

'এখানকার লোকদের মুখে শুনতে পাবেন, পূর্ণিমার রাতে পুরুষ গাছ তার শিকড়গুলো মাটির ওপর তুলে নিয়ে মেয়ে গাছের সাথে মিলিত হবার জন্যে সর সর করে হেঁটে যায়...'

'আপনার হাতের মত লম্বা...,' স্বর্ণকেশীর পাশ থেকে তার এলোচুল বান্ধবী খিলখিল করে হেসে উঠল, '...উই মা'' তামাশায় সে-ও যোগ দিল। তারপর, দু'জন একসাথে লোকটার তলপেটের নিচে তাকাল। পরিষ্কার দেখা গেল, কুঁকড়ে একটু ছোট হয়ে গেল লোকটা। তার এই দুর্দশা লক্ষ করে মেয়েগুলোর পুরুষ বন্ধুরা হাসতে লাগল, দু'জন লোকটার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াল স্ত্রী, কনুই ধরে টান দিল। মহিলার ঠোঁটের ওপর, নাকের নিচে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে, চোখে কঠোর দৃষ্টি। 'স্টিফেন, আমি অসুস্থ বোধ করছি,' হিস হিস করে বলল সে।

'আমাকে এখন যেতে হয়,' পালাবার ছুতো পেয়ে পরম স্বস্তি বোধ করল লোকটা, তার আত্মবিশ্বাস চুরমার হয়ে গেছে। স্ত্রীর হাত ধরে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল সে।

'ওকে তোমরা কেউ চিনতে পেরেছ কি?' এলোচুল মেয়েটা জার্মান ভাষায় জিজ্ঞেস করল, এখনও হাসছে সে।

'বেঞ্জামিন এফ. অ্যাডামস,' একই ভাষায় ফিসফিস করে উত্তর দিল স্বর্ণকেশী। 'ফোর্ট ও অর্থের নিউরো-সার্জেন। শনিবার সকালে টিভিতে দেখোনি, কনভেনশনের শেষ পেপারটা ও-ই তো পড়েছে। বড় মাছ-খুব বড় মাছ।' বিড়ালের মত করে সে তার গোলাপী জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁটের ওপরটা ভিজিয়ে নিল।

আজ এই সোমবার বিকেলে ডিপারচার লাউঞ্জের চারশো একজন আরোহীর মধ্যে তিনশো ষাট জনই হয় সার্জেন, না হয় তাঁদের স্ত্রী। সার্জেনদের মধ্যে কেউ কেউ ওষুধ বিজ্ঞানে অবদান রেখে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র আর যুক্তরাজ্য, জাপান আর দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন ওঁরা। চব্বিশ ঘণ্টা আগে মৌরিশাস দ্বীপে শেষ হয়েছে ওঁদের কনভেনশন, মাহে দ্বীপ থেকে পাঁচশো মাইল দক্ষিণে। কনভেনশন শেষ হবার পর এটাই দূরপাল্লার প্রথম ফ্লাইট, কাজেই বিমানের কোন আসনই খালি নেই। অনেক আগে টিকেট কাটা ছিল বলে মাহে থেকে বিমানে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে পনেরো জন জয়েনিং প্যাসেঞ্জার।

'ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ অ্যানাউন্সেস দ্য ডিপারচার অভ ফ্লাইট বি-এ জিরো-সেভেন-জিরো ফর নাইরোবি অ্যান্ড লন্ডন, উইল ট্র্যানজিট প্যাসেঞ্জারস প্লীজ বোর্ড নাউ থ্রু দ্য মেইন গেট।' ঘোষণা শেষ হবার সাথে সাথে ভিড় করে দরজার দিকে এগোল লোকজন।

'ভিক্টোরিয়া কন্ট্রোল, দিস ইজ স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরো, রিকোয়েস্ট পুশ ব্যাক অ্যান্ড স্টার্ট ক্লিয়ার্যান্স।'

'জিরো-সেভেন-জিরো, ইউ আর ক্লিয়ারড্ টু স্টার্ট অ্যান্ড ট্যাক্সি টু হোল্ডিং পয়েন্ট ফর রানওয়ে জিরো ওয়ান।'

'প্লীজ কপি অ্যামেন্ডমেন্ট টু আওয়ার ফ্লাইট প্ল্যান ফর নাইরোবি। নাম্বার অভ প্যাসেঞ্জারস অ্যাবোর্ড শুড বি ফোর-জিরো-ওয়ান। উই হ্যাভ এ ফুল হাউজ।'

'রজার, স্পীডবার্ড, ইওর ফ্লাইট প্ল্যান ইজ অ্যামেন্ডেড।'

নাক উঁচু করে এখনও আরও ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে প্রকাণ্ড জিরো-সেভেন-জিরো। নো-স্মোকিং আর সীট-বেল্ট লাইট ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। স্বর্ণকেশী মেয়েটা আর তার পুরুষ সঙ্গী পাশাপাশি বসে আছে প্রশস্ত ওয়ান-এ আর ওয়ান-বি সীটে। সীট দুটো ফরওয়ার্ড বাল্কহেডের ঠিক পিছনে, কমান্ড এরিয়া আর ফার্স্ট ক্লাস গ্যালির মাঝখানে একটা দেয়াল এই বাল্কহেড। তরুণ আর তরুণীর পাশাপাশি এই সীট জোড়া কয়েক মাস আগে রিজার্ভ করা হয়েছে।

কোন কথা হলো না, যুবকের মাথাটা দু'হাতে ধরে কাছে টানল যুবতী, দীর্ঘক্ষণ চুমো খেলো ঠোঁটে। তারপর মৃদু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সঙ্গীকে, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। যুবক সঙ্গী সামনের দিকে ঝুঁকল, প্যাসেজের ওপাশ থেকে কোন আরোহী যাতে সঙ্গিনীকে দেখতে না পায়। আড়াল পেয়ে দ্রুত নেট ব্যাগের ভেতর হাত গলিয়ে দিয়ে একটা কোকো-ডি-মার বের করে নিজের কোলের ওপর তুলল মেয়েটা।

ইলেকট্রিক করাত দিয়ে ফলটাকে দু'ভাগ করা হয়েছিল, পানি আর সাদা শাঁস বের করে নিয়ে আঠার সাহায্যে আবার জোড়া লাগানো হয়েছে, তবে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। জোড়া লাগা অংশে ছোট একটা সরু ধাতব ইন্সট্রুমেন্ট ঢুকিয়ে জোরে চাড় দিল মেয়েটা, দুটো ভাগ আলাদা হয়ে গেল সাথে সাথে। জোড়া খোলের ভেতর প্লাস্টিক ফোমের তোষক, তোষকের ওপর গ্রে রঙের মসৃণ গা একজোড়া গোল বস্তু—প্রতিটির আকার বেসবলের মত।

পূর্ব জার্মানীতে তৈরি গ্রেনেড। ওয়ারস প্যাক্ট কমান্ড নাম দিয়েছে, এম-কে, আই-ভি (সি)। প্রতিটি গ্রেনেডের বাইরের আবরণ প্রতিরোধক প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি, ল্যান্ডমাইনের আবরণে যে-ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়—ইলেকট্রনিক মেটাল ডিটেকটরকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে। প্রতিটি গ্রেনেডের চারদিকে হলুদ ডোরা কাটা রয়েছে, তারমানে হলো এগুলো ফ্র্যাগমেন্টেশন টাইপ গ্রেনেড নয়, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ক্ষমতা ভরে দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

বাঁ হাতে একটা গ্রেনেড নিল মেয়েটা, সীট-বেল্ট খুলল, তারপর নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল সীট ছেড়ে। কোন দিকে না তাকিয়ে পর্দা সরিয়ে গ্যালি এলাকার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে, অন্যান্য আরোহীরা তাকে ঢুকতে দেখলেও কেউ কিছু মনে করল না।

গ্যালির সার্ভিস সেকশনে তিনজন রয়েছে ওরা। একজন পার্সার, দু'জন স্টুয়ার্ডেস। এখনও ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে সবাই, চেয়ারের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো। স্বর্ণকেশী মেয়েটা ঢুকতেই ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল ওরা।

'দুঃখিত, ম্যাডাম–প্লীজ, নিজের সীটে ফিরে যান। ক্যাপটেন এখনও সীট-বেল্ট লাইট অফ করতে বলেননি!'

বাঁ হাত তুলে পার্সারকে ভয়ঙ্কর ডিমটা দেখাল স্বর্ণকেশী। 'এটা একটা স্পেশাল গ্রেনেড, ব্যাটল-ট্যাংকের ভেতর যারা থাকে তাদের মারার জন্যে তৈরি করা হয়েছে,' শান্তভাবে বলল সে। 'প্লেনের ফিউজিলাজ এমন ভাবে উড়িয়ে দেবে, মনে হবে ওটা কাগজের তৈরি–পঞ্চাশ গজের মধ্যে একজনও বাঁচবে না।'

ওদের মুখ লক্ষ করছে মেয়েটা, ভয় আর আতঙ্ক অশুভ ফুলের মত বিকশিত হচ্ছে।

'টেকনিক্যাল ব্যাপার তোমরা বুঝবে না, শুধু ফলাফলটা জেনে নাও। আমার হাত থেকে পড়ার তিন সেকেন্ড পর ফাটবে এটা।' একটু থেমে দম নিল মেয়েটা, চোখ দুটো উত্তেজনায় চকচক করছে। নিঃশ্বাস ফেলছে ছোট ছোট আর ঘন ঘন। 'তুমি–,' পার্সারকে বেছে নিল সে, '–ফ্লাইট ডেকে নিয়ে চলো আমাকে।' স্টুয়ার্ডেসদের দিকে তাকাল। 'তোমরা এখানেই থাকবে। কিছু করবে না, কিছু বলবে না।'

ককপিটটা ছোট; থরে থরে সাজানো ইন্সট্রুমেন্ট, ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট, আর ফ্লাইট ক্রুদের জায়গা হবার পর খালি মেঝে নেই বললেই চলে। স্বর্ণকেশী মেয়েটা ভেতরে ঢুকল, সামান্য অবাক হয়ে তিনজন লোকই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। বাঁ হাত তুলে গ্রে রঙের ডিমটা ওদের দেখাল সে।

সাথে সাথে বুঝল ওরা।

'প্লেনের নিয়ন্ত্রণ আমি নিলাম।' ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাল মেয়েটা। 'কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্টের সুইচ অফ করে দাও।'

ঝট করে ক্যাপটেনের দিকে তাকাল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপটেন। ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার এক এক করে তার রেডিওগুলো বন্ধ করে দিতে শুরু করল–প্রথমে ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি সেটগুলো, তারপর হাই ফ্রিকোয়েন্সি, আল্ট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি।

'এবং স্যাটেলাইট রিলে,' নির্দেশ দিল মেয়েটা। মুখ তুলে তার দিকে তাকাল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার, জ্ঞানের বহর দেখে বিস্মিত হয়েছে।

'সাবধান, স্পেশাল রিলেতে হাত দেবে না!' হিসিহিস করে উঠল মেয়েটা।

চোখ পিট পিট করল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার। কেউ জানে না, কোম্পানীর কিছু লোক ছাড়া কারও জানার কথা নয় যে এই প্লেনে স্পেশাল রিলে সিস্টেম আছে। খুদে বোতামটা রয়েছে তার ডান হাঁটুর পাশেই, একবার শুধু টিপে দিলেই হিথরো এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল জেনে যাবে হাইজ্যাকারদের পাল্লায় পড়েছে স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরো–ফ্লাইট ডেকের প্রতিটি শব্দ পরিষ্কার শুনতেও পাবে তারা। ধীরে ধীরে ডান হাঁটুর কাছ থেকে হাতটা সরিয়ে আনল সে।

'স্পেশাল রিলের সার্কিট থেকে ফিউজটা সরাও।' ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের মাথার ওপর অনেকগুলো বাক্স, সঠিক বাক্সটার দিকেই আঙুল তাক করল মেয়েটা। আবার একবার ক্যাপটেনের দিকে তাকাল এঞ্জিনিয়ার, চাবুকের মত শব্দ বেরুল মেয়েটার গলা থেকে। 'কারও দিকে তাকাতে হবে না, আমি যা বলছি করো!'

সাবধানে ফিউজটা সরাল এঞ্জিনিয়ার, সামান্য একটু শিথিল হলো মেয়েটার কাঁধের পেশী।

আবার নির্দেশ দিল সে, 'ডিপারচার ক্লিয়ার‍্যান্স পড়ে শোনাও।'

'রাডারের আওতা থেকে বেরিয়ে নাইরোবি যাবার অনুমতি পেয়েছি আমরা। উনচল্লিশ হাজার ফিট পর্যন্ত উঠতে পারব।'

'তোমার পরবর্তী "অপারেশনস নরম্যাল"-এর সময় বলো।' অপারেশনস নরম্যাল হলো রুটিন রিপোর্ট, নাইরোবি কন্ট্রোলকে জানাতে হবে প্ল্যান অনুসারেই এগোচ্ছে ফ্লাইট।

'এগারো মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড পর।' ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের বয়স বেশি হলে পঁয়ত্রিশ হবে, তার মাথাতেও সোনালি চুল। কপালটা চওড়া, এখন সেখানে ঘাম চিকচিক করছে। সপ্রতিভ চেহারা, বিপদের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ট্রেনিংও নেয়া আছে তার।

ক্যাপটেনের দিকে মুখ ফেরাল স্বর্ণকেশী, পরস্পরকে বোঝার চেষ্টায় দু'জনের দৃষ্টি অনেকক্ষণ এক হয়ে থাকল। ক্যাপটেনের মাথায় কালোর চেয়ে সাদা চুলই বেশি, বড়সড় গোল খুলি কামড়ে রয়েছে। ষাঁড়ের মত চওড়া ঘাড়, আর মাংসল মুখ দেখে তাকে কসাই বা চাষী বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক–কিন্তু তার চোখ জোড়া স্থির, আচরণ শান্ত এবং দৃঢ়। এই লোককে চোখে চোখে রাখতে হবে, সাথে সাথে উপলব্ধি করল মেয়েটা।

'আমি চাই কথাগুলো আপনি বিশ্বাস করুন। মৃত্যু আমার কাছ থেকে ক'ইঞ্চি দূরে, আমি জানি। আমার একটা আদর্শ আছে, আদর্শের জন্যে নিজের জীবন দিতে পারলে আমি ধন্য হব।' মেয়েটার গভীর নীল চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। ক্যাপটেনের বাদামী চোখ স্থির হয়ে আছে, সেখানেও ভয়ের কোন ছাপ নেই, আছে সমীহের ক্ষীণ একটু আভাস। মনে মনে খুশি হলো মেয়েটা, ক্যাপটেন তাকে হালকা ভাবে নিচ্ছে না। তার সতর্ক হিসেবে এই সমীহের ভাবটা আদায় করা গুরুত্বপূর্ণ, জরুরী ছিল। 'আমি আমার অস্তিত্ব এই অপারেশনে উৎসর্গ করেছি।'

'আমি বিশ্বাস করি,' বলে একবার মাথা ঝাঁকাল পাইলট।

'চারশো সতেরোটা প্রাণ, সবার দায়িত্ব আপনার কাঁধে,' বলে চলেছে মেয়েটা। 'শুধু যদি আপনি আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন, ওরা সবাই নিরাপদে থাকবে। এই একটা কথা আপনাকে আমি দিতে পারি।'

'বেশ।'

'এই নিন আমাদের নতুন ডেসটিনেশন।' ছোট একটা টাইপ করা কার্ড দিল মেয়েটা। 'নতুন একটা কোর্স চাই আমি, বাতাসের মতিগতি আর পৌঁছুবার সময় সহ। পরবর্তী অপারেশনস নরম্যাল রিপোর্ট পাঠাবার পরপরই নতুন কোর্স ধরবেন–' ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাল সে, সময় জানতে চায়।

'নয় মিনিট আটান্ন সেকেন্ড,' সাথে সাথে জানাল এঞ্জিনিয়ার।

'নতুন কোর্স ধরবেন খুব আস্তে-ধীরে, ব্যালেন্স থাকা চাই। আমরা চাইব না প্যাসেঞ্জারদের গ্লাস থেকে শ্যাম্পেন ছলকে পড়ুক, চাইব কি?'

বিষাক্ত কালনাগিনীর ভঙ্গি নিয়ে ফ্লাইট ডেকে দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটা।

ক্যাপটেনের সাথে কথা বলার সময় তার কণ্ঠস্বর ছিল দৃঢ়, ভাবাবেগশূন্য, ঠাণ্ডা। যৌনাবেদন নিয়ে তার দাঁড়াবার ভঙ্গি, পরনের ন্যূনতম পোশাক, সুন্দর অবয়ব, সোনালি খোঁপা,–সব কিছু মিলিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেমন যেন একটা ভয় মেশানো শ্রদ্ধা এসে গেছে ওদের মনে। উত্তেজনায় তার শরীর শক্ত হয়ে গেছে, শ্লোগান লেখা পাতলা সুতী শার্টের ভেতর থেকে নিরেট গোল আকৃতি প্রকট ভাবে চোখে লাগে। শরীরের মেয়ে-মেয়ে গন্ধ পাচ্ছে ওরা।

কয়েক মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। তারপর নিস্তব্ধতা ভাঙল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার, 'ত্রিশ সেকেন্ড পর অপারেশনস্ নরম্যাল।'

'ঠিক আছে, হাই ফ্রিকোয়েন্সি অন করে রিপোর্ট পাঠাও।'

'নাইরোবি অ্যাপ্রোচ দিস ইজ স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরো।'

'গো অ্যাহেড স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরো।'

'অপারেশনস্ নরম্যাল,' হেডসেটে বলল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার।

'রজার, জিরো-সেভেন-জিরো। রিপোর্ট এগেইন ইন ফরটি মিনিটস্।'

'জিরো-সেভেন-জিরো।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মেয়েটা। 'সেট অফ করো,' বলে ক্যাপটেনের দিকে ফিরল সে। 'ফ্লাইট ডাইরেক্টর ডিজএনগেজ করুন, বাঁক নিয়ে নতুন কোর্স ধরুন হাত দিয়ে–দেখা যাক কতটা নরমভাবে কাজটা আপনি করতে পারেন।'

প্লেন চালনা কৌশলের অপূর্ব প্রদর্শনী চাক্ষুষ করল মেয়েটা, মাত্র দু'মিনিটে ছিয়াত্তর ডিগ্রী দিক বদল সহজ কথা নয়। টার্ন অ্যান্ড-ব্যালেন্স ইন্ডিকেটরের কাঁটা এক চুল এদিক ওদিক নড়ল না। বাঁক নেয়া শেষ হতে এই প্রথমবারের মত হাসল স্বর্ণকেশী।

মুক্তোর এক ঝলক দ্যুতি ছড়ানো চোখ ধাঁধানো হাসি।

'গুড,' বলল সে, সরাসরি ক্যাপটেনের মুখের ওপর হাসছে। 'আপনার নাম কি?'

'জেংকিনস,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল ক্যাপটেন।

'আমাকে আপনি জেসিকা বলে ডাকতে পারেন,' অনুমতি দিল যেন মেয়েটা।

দুই

শার্ক কমান্ডের ট্রেনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে মাসুদ রানা। বাঁধা কোন রুটিন নেই, তবে পিস্তল আর অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে প্র্যাকটিস করা বাধ্যতামূলক। শার্ক কমান্ডের সবাইকে, এমন কি টেকনিশিয়ানদেরও, দৈনিক এক ঘণ্টা রেঞ্জে প্র্যাকটিস করতেই হবে।

দিনের বাকি সময় বিরতিহীন ব্যস্ততার মধ্যে কাটে রানার। ওর কমান্ড এয়ারক্রাফটে নতুন ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট বসানো হয়েছে, সেগুলোর নাড়ি-নক্ষত্র জানার জন্যে এক্সপার্টদের সাথে থাকতে হয় ওকে।

সকালের অর্ধেক এই দুই কাজে বেরিয়ে যায়, তারপর তাড়াহুড়ো করে ছুটতে হয় স্ট্রাইকার ফোর্সের সাথে যোগ দেয়ার জন্যে। দিনের অনুশীলন শুরু করার জন্যে ওর অপেক্ষায় হারকিউলিস ট্রান্সপোর্ট প্লেনের মেইন কেবিনে বসে থাকে সবাই।

প্রথম দশজনের সাথেই জাম্প করে রানা। পাঁচশো ফিট ওপর থেকে লাফ দেয়, হ্যাঁচকা টানের সাথে প্যারাস্যুট খোলে যেন মাটি স্পর্শ করার কয়েক সেকেন্ড আগে। তবে বিভিন্নমুখী জোরাল বাতাস থাকায় এত অল্প উঁচু থেকে লাফ দিলেও পরস্পরের কাছ থেকে বেশ একটু ছড়িয়ে পড়ে ওরা। আজকের প্রথম ল্যান্ডিংটা টার্গেট এরিয়ার যথেষ্ট কাছাকাছি না হওয়ায় অসন্তুষ্ট হলো রানা। জাম্প করার পর থেকে পরিত্যক্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙে পেনিট্রেট করতে সময় লাগল দু'মিনিট আটান্ন সেকেন্ড।

নির্জন স্যালিসবারি প্রান্তর, মিলিটারি জোন।

'এখানে যদি টেরোরিস্টরা একদল লোককে জিম্মি করে রাখত, যে-সময়ে পৌঁচেছি তাতে বড়জোর মেঝে থেকে রক্ত মোছার সময় পেতাম। আবার আমরা প্র্যাকটিস করব!'

দ্বিতীয়বার ওরা এক মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ডের মাথায় ঢুকল বিল্ডিঙে, ঝাঁকের প্রতিটি লোক আড়াল নিয়ে তৈরি হতে আরও দশ সেকেন্ড সময় নিল। কার্ল রবসনের দু'নম্বর স্ট্রাইকার টীমের চেয়ে পঁচিশ সেকেন্ড এগিয়ে থাকল ওরা।

এরপর পাঁচ মাইল দৌড়ে এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছল ওরা, প্রত্যেকে পুরোদস্তুর কমব্যাট কিট পরে আছে, ব্যবহার করা প্যারাস্যুট সিল্কের মস্ত বান্ডিলটাও বয়ে নিয়ে আসতে হলো।

বেসে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে হারকিউলিস অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে, কিন্তু মেইন রানওয়ের শেষ মাথায় শার্ক কমান্ডের সিকিউরিটি কমপাউন্ডে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

এবার শুরু হবে ডি-ব্রিফিং, শেষ হতে বেশ রাত হবে। ক্ষীণ একটু অপরাধবোধ নিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা, ভাবল সোহেল নিশ্চয়ই ইস্ট ক্রয়ডন স্টেশনে পৌঁছে গেছে এতক্ষণে। গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে রানা, দশ মিনিটের মধ্যে সোহেলকে নিয়ে নতুন ভাড়া করা কটেজে পৌঁছে যাবে ড্রাইভার। কটেজে একা একা অপেক্ষা করার সময় ওর ওপর রেগে ব্যোম্ হয়ে যাবে সোহেল। বেসের গেট থেকে কটেজটা সাড়ে চার মিনিটের পথ, ডি-ব্রিফিঙের দায়িত্ব কার্ল রবসনের ঘাড়ে চাপিয়ে এখুনি রওনা হয়ে যাওয়া দরকার রানার।

নতুন করে শার্ক কমান্ডের ট্রেনিং সেশন শুরু হবার পর, আজ ছয় হপ্তা, একদিনের জন্যেও ছুটি নেয়নি রানা। অনেকদিন হলো দেশে ফেরা হচ্ছে না। বি.সি.আই. এবং রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির সাথে সরাসরি কোন যোগাযোগও রাখতে পারছে না ও। বস্ বি.সি.আই. চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান স্কটল্যান্ডে ছিলেন, কিন্তু রানা মস্কো থেকে টোকিও হয়ে ইংল্যান্ডে আসার আগেই তিনি দেশে ফিরে গেছেন। শার্ক কমান্ডের ট্রেনিং শুরু হবার দু'হপ্তা পর ওর সাথে নতুন কটেজে দেখা করেছিল সোহেল, ছয় হপ্তা পর আবার সে দেখা করতে আসছে। দেশ, বি.সি.আই., এবং রানা এজেন্সির খবর পাবার একমাত্র

মাধ্যম হয়ে উঠেছে সোহেল। বিভিন্ন কাজে তাকেও বেশিরভাগ সময় ইউরোপে থাকতে হচ্ছে, তাই কিছুদিন পর পর রানার সাথে দেখা করা তার জন্যে সহজ।

আজ দু'জনের দেখা হওয়াটা জরুরী। দেখা করে রাতেই চলে যাবে সোহেল, গুরুত্বপূর্ণ কিছু রিপোর্ট, তথ্য, আর সিদ্ধান্ত রানাকে জানাতে চায় সে।

'কি ব্যাপার, বস্,' রানাকে দ্বিতীয়বার হাতঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠল কার্ল রবসন। 'কারও সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে নাকি?'

'আমার বন্ধু,' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল রানা। 'সোহেল আহমেদ। এতক্ষণে বোধহয় কটেজে পৌঁছে গেছে।'

ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিজম অর্গানাইজেশনের সি.সি. (সেন্ট্রাল কমিটি)-তে থাকার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল সোহেল আহমেদকে, সবিনয়ে ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছিল সে। তখন থেকেই তার পরিচয় জানে কার্ল রবসন, তারপর রানার কটেজে তাকে গতমাসে একবার দেখেওছে সে। জানে, মাসুদ রানার সাথে এই লোকের গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে। 'আমি ওদের ব্রিফিং করছি, বস্,' বলল সে। 'তোমার বন্ধুকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো।'

কম্পাউন্ড থেকে গাড়িতে মাত্র সাড়ে চার মিনিটের পথ হলেও নির্জন প্রান্তরে নিঃসঙ্গ একটা দ্বীপের মত কটেজটা। উঁচু একটা মাটির পাহাড়ের পিছনে অযত্নে বেড়ে ওঠা বাগানের মাঝখানে তিন কামরার সাজানো-গোছানো শান্তির নীড়। আশপাশে আর কোন ঘর-বাড়ি নেই, প্রতিবেশীরা সবাই ঝাঁক বেঁধে গাছপালায় বাস করে এবং সুমধুর কণ্ঠে গান শোনায় রানাকে। এত রকম আর এত বিচিত্র বর্ণের পাখি একসাথে আর কোথাও দেখেনি ও। সময় পেলেই ইচ্ছে আছে বাগানে হরেক রকম গোলাপ ফোটাবে। দূর গ্রাম থেকে একটা মেয়ে এসে ঘরদোর পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, হঠাৎ মাঝে মধ্যে তার সাথে দেখা হয় রানার। দুপুরে কম্পাউন্ডের ক্যান্টিনে লাঞ্চ সারে ও, রাতে গাড়ি নিয়ে চলে যায় ক্রয়ডনে। সকালের নাস্তা নিজের হাতে তৈরি করে ও। স্বাধীন, বন্ধনহীন জীবন। রাত কাটে বই পড়ে, ক্যাসেটে গান শুনে, আর ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত সব রোমাঞ্চকর স্বপ্ন দেখে। কোন কোন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে সহজে আর ঘুম আসতে চায় না, ফেলে আসা জীবনের কত কি কথা মনে পড়ে যায়, টুকরো টুকরো দৃশ্য ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। বার বার একটা মেয়ের মুখ দেখতে পায়, কিন্তু তাকে ঠিক যেন চিনতে পারে না। কখনও মনে হয় মেয়েটা তার জীবনে এসেছিল, কিন্তু কখন এসে কখন হারিয়ে গেছে আজ আর শত চেষ্টা করেও মনে করতে পারে না। আবার মনে হয়, না, একে কোন দিন দেখেনি সে–তবে এর অপেক্ষাতেই আছে, একদিন দেখা হবে। দেখা হলেই পরস্পরকে চিনতে পারবে ওরা। চোখে চোখ রেখে হাসবে দু'জনে, বলবে, 'এত দিনে এলে?'

কে মেয়েটা? কোথায় সে? কবে দেখা হবে? কেন সে বারবার উঁকি দেয় মনে?

কিংবা হয়তো ঘুমহীন আরেক রাতে দ্বিধা আর সন্দেহে ভুগতে থাকে রানা। জীবনটাকে কি সে হেলায় নষ্ট করল? মনীষীরা বলে গেছেন, কর্মই জীবন, কর্মেই মুক্তি। কাজ নিয়েই তো আছে সে, নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেছে দেশের সেবায়। তবু কেন মনে হয় আরও অনেক কিছু করার ছিল তার, আরও অনেক

কিছু করতে পারত। আরও কম বয়সে যে-সব স্বপ্ন ছিল সে-সব কবেই হারিয়ে গেছে। জ্ঞান হবার পর থেকে শুনে আসছে দুনিয়ার সবচেয়ে উর্বরা ভূমি রয়েছে বাংলাদেশে, স্বপ্ন দেখত আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে খেতে বিপুল ধান ফলাবে, খামারে গড়ে তুলবে হাঁস-মুরগীর বিশাল আবাস, চাষ করে পুকুর-ডোবাগুলো ভরে তুলবে রুপালি মাছে। বাংলাদেশের অজ্ঞ, অলস, আর সরল মানুষ বেশিরভাগই জেগে জেগে ঘুমাচ্ছে। বিপুল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করে এদের ডাকা হচ্ছে না বলেই আজ শুধু কাগজে মানচিত্র দিয়ে রুগ্ন বাংলাদেশের পরিচয় প্রকাশ করতে হয়। ঘুম ভাঙিয়ে এদেরকে যদি কাজে লাগিয়ে দেয়া যায়, এরাই গড়ে তুলবে সম্পদের পাহাড়, এরাই সৃষ্টি করবে মহৎ শিল্পকর্ম, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে অবদান রাখবে, মানবকল্যাণ আর সভ্যতার বিকাশে নেতৃত্ব দেবে। দেশ স্বাধীন হবার পর লাখ লাখ যুবকের মত রানাও এই স্বপ্ন দেখেছিল। রানা রাজনীতিবিদ নয়, কাজেই রাজনীতিতে কোন ভূমিকা নেয়ার চেষ্টা করেনি ও। নিজের কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়েছিল ও, সাধ্য অনুসারে যতটুকু পেরেছে করেছে—যেখানেই দেশের বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করেছে সেখানেই দুর্জয় সাহসের সাথে লড়েছে ও। প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়ে যখনই কোন ম্যানিয়াক সভ্যতাকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা কষেছে, তাকে বিনাশ করার জন্যে ছুটে গেছে রানা। কেউ বলতে পারবে না কাজে ফাঁকি দিয়েছে ও, কেউ বলতে পারবে না অন্যায় বা অবৈধভাবে নিজের জন্যে গড়ে তুলেছে সম্পদের পাহাড়। ওর সম্পর্কে যেটা বলা যায়, বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ ও সরকারী কর্মচারী সম্পর্কে সেটা বলা গেলে দেশের আজকের চেহারা সম্পূর্ণ অন্য রকম হত। কী দুর্ভাগ্য, বারবার শুধু বাটপারদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ল গোটা দেশ। কতকিছুই না ঘটে গেল চোখের সামনে। যাকেই নেতা বানাল জনসাধারণ, ক্ষমতায় গিয়েই জনতার দিকে বন্দুক তাক করে ধরল সে। সমাজের উঁচু মহলে আনুগত্য কেনাবেচা শুরু হয়ে গেল। চোর আর খুনীকে করা হলো পুরস্কৃত, সৎ আর জ্ঞানীকে হতে হলো লাঞ্ছনার শিকার। নানা কৌশলে বন্ধ করে দেয়া হলো জ্ঞানচর্চা, নির্বাসিত হলো চিরন্তন মূল্যবোধ, পরিবেশ পরিস্থিতি ওলট পালট করে দিয়ে যে যার আখের গোছাবার জন্যে লুটেপুটে খেতে লাগল।

দুঃখে, রাগে, ক্ষোভে ঘুম আসে না বটে, কিন্তু তবু পুরোপুরি হতাশ হতে সায় দেয় না মন। চারদিকে এত অব্যবস্থা, অনিয়ম, লোভ, আর স্বার্থপরতা দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, এখনও বোধহয় সময় আছে। চেষ্টা করলে এখনও হয়তো অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায় দেশটাকে।

দরকার যেটা সেটা হলো সৎ নেতৃত্ব। এমন একজন নেতা কি সত্যিই আমাদের নেই যিনি সব কিছুর ওপর দেশকে ভালবাসেন? যাঁর যোগ্যতা প্রশ্নাতীত? যিনি শতকরা আশি ভাগ গরীব মানুষকে খেয়ে-পরে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার এবং উত্তরোত্তর উন্নতি করবার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করবেন?

মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ, সময় মত কথাটা নিজেকে মনে করিয়ে দিতে পারে বলেই আজও রানা আশাবাদী। কিন্তু তাতেও আত্মসমালোচনার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মেলে না। একদল লোক দেশটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, বাকি সব লোক নিরুপায় নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নিয়ে বসে আছে। দর্শকদের মধ্যে সে-ও

একজন। সন্দেহ নেই, আর সবার মত তার ভূমিকাও নিন্দনীয়। কাউকে না কাউকে প্রতিবাদ তো করতেই হবে, সে লোক আমি নই কেন?

এই প্রশ্নটা মনে জাগলেই নিজেকে অসহায় আর অযোগ্য বলে চিনতে পারে রানা। সশস্ত্র একদল কমান্ডোকে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা তার আছে, কিন্তু জনসাধারণকে ডাক দিয়ে এক জায়গায় জড়ো করার, তাদের নিয়ে বিপুল, বিশাল কোন কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ার কৌশল তার জানা নেই। এমন একটা পেশার সাথে জড়িত সে, এমন একটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত, হঠাৎ করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসাও সম্ভব নয়। কাজেই নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া ছাড়া উপায় থাকে না যে জাতির এই দুর্দশা একদিন ঘুচবেই, জনতার কাতার থেকে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে এসে হাতে তুলে নেবে নেতৃত্ব। ধীরে ধীরে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

তারমানে সুদিনের অপেক্ষায় অসহায় দর্শকের ভূমিকায় থাকো। কি লজ্জা, কি গ্লানিময় জীবন।

আবার কোন কোন রাতে নিবিড় ঘুম হয় রানার। সকালে ঘুম ভাঙার পর মনে হয়, পাশে কেউ থাকলে ভাল হত। তখন আবার সেই মেয়েটার চেহারা ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। কোথায় যেন দেখেছে তাকে। নাকি কোথাও দেখবে? মনে হয় মেয়েটা যেন তাকে নিয়ে লুকোচুরি খেলছে। ধরা দেই দেই করেও দিচ্ছে না। অদ্ভুত একটা উপলব্ধি হয় রানার, তার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য মেয়েটা, বুদ্ধিমতী আর অভিজাত, প্রায় তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। শুধু দয়া করে সে যদি তার জীবনে আসে, তা না হলে তাকে পাবার আর কোন উপায় নেই। তাকে একদিন স্বপ্নেও দেখেছে ও, ফিসফিস করে ওর কানে কানে বলে গেছে, আপনাকে আমি শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস করি। সামনে পেলে তাকে রানা বলতে পারত, শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস আমি কি ধুয়ে খাব? পারো তো ভালবাসো। পারো তো উদ্ধার করো! এই দুঃসহ নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেতে চাই আমি। একাকীত্ব আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কিন্তু কোথায় সে, কাকে বলবে রানা? বললেও সে বুঝতে চাইবে কিনা কে জানে!

ভাগ্য ভাল যে শুধু কোন কোন রাতে এ-ধরনের বিপত্তি ঘটে। দিনের বেলা কমান্ডোদের ট্রেনিং দিতে এত ব্যস্ত থাকে যে আজেবাজে কোন চিন্তাই আসে না মাথায়।

গাড়ি-বারান্দায় থামল ল্যান্ড-রোভার। স্টার্ট বন্ধ করে পাঁচ সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল রানা। ঘর আর বারান্দায় আলো জ্বলছে, গ্যারেজ বন্ধ হলেও দরজার গায়ে সরু ফাটল দিয়ে ঝকঝকে মার্সিডিজটা দেখা গেল। ল্যান্ড-রোভার থেকে নেমে ধাপ তিনটে টপকে বারান্দায় উঠে দরজার দিকে এগোল ও।

চারদিক নিঝঝুম, ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাপিয়ে একেবারে পিঠের কাছে রাইফেল কক করার আওয়াজ বিস্ফোরণের মত শোনাল কানে। পরমুহূর্তে শোনা গেল একের পর এক কুকুর, বিড়াল, আর শিয়ালের ডাক। কোন প্রতিক্রিয়া হলো না, শান্তভাবে ঘরে ঢুকল রানা।

'হবে না, দেখে ফেলেছে! শালা বদমাশ টের পেয়ে গেছে!' থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে মহা চেঁচামেচি শুরু করে দিল সোহেল, রানার পিছু পিছু ঘরে ঢুকল

নিঃসঙ্গ হাতটাকে মুঠো পাকিয়ে।

'দেখিনি,' সোফায় বসে বলল রানা, পা দুটো লম্বা করে দিল কার্পেটে। হাত তুলে একটা আঙুল তাক করল নিজের কানে। 'এখানে ধরা পড়ে গেছিস তুই। রাইফেল কক করার আওয়াজটা প্রায় নিখুঁতই বলব, জিভ আর টাকরার সাহায্যে এরচেয়ে নিখুঁত করা সম্ভব নয়। তবে আমাকে বোকা বানাতে হলে আরও প্র্যাকটিস করতে হবে তোকে।'

'এই আওয়াজটাই যদি অন্য কেউ করত?' রেগেমেগে জিজ্ঞেস করল সোহেল। 'একবারও ভাবলি না, কেউ আমাকে কিডন্যাপ করেছে, বা হাত-পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে রেখেছে, তারপর অপেক্ষা করছে তোর জন্যে?'

'আমি জানি নিজেকে তুই রক্ষা করতে পারবি। আমার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য মনে করি তোকে।' রানা গম্ভীর। 'হাত মাত্র একটা মনে করে কারও যদি তোকে কিডন্যাপ করার দুর্মতি হয়, আচমকা সে দেখতে পাবে দশটা হাত গজিয়েছে তোর...।'

'তারমানে আমি দশভুজ রাক্ষস, আর তুই তিলে খচ্চর?' একটা সোফায় বসে সোহেলও সামনের দিকে লম্বা করে দিল পা দুটো।

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'তিলে খচ্চর মানে কি?' লক্ষ করল, ওর দামী কেডস জোড়া সোহেলের পায়ে শোভা পাচ্ছে।

'দাগী বদমাশ।' রানার গা জ্বালিয়ে দিয়ে হাসল সোহেল। 'যার কৌতুকে মানুষ বিরক্ত হয়। ঘেউ...ম্যাঁও...হুক্কাহুয়া–তুই নিজেও জানিস ডাকগুলো কি রকম বিরক্তিকর। যাকগে, চা খাওয়া।' টেবিল থেকে রানার সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল সে। 'কফি হলেও চলবে। নাকি অতিথি আপ্যায়নের কোন ব্যবস্থা রাখিসনি?' রানার দিকে একটা সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে নিজে একটা হাতে রাখল, তারপর প্যাকেটটা চালান করে দিল পকেটে।

'আমি ডানহিল খাব,' বলে টেবিলের দিকে তাকাল রানা। ওখানে রাখা ডানহিলের প্যাকেটটা সোহেলের।

টেবিল থেকে প্যাকেট নিয়ে রানার দিকে ছুঁড়ে দিল সোহেল। খুলে দেখল রানা, দশটা সিগারেট রয়েছে। ওর স্টেট এক্সপ্রেসের প্যাকেটে আঠারোটা ছিল। তবু জিত হয়েছে ওর, ডানহিলের প্যাকেট পকেটে ভরে রাখল।

'কফি খাবি?' বলে সোফা ছাড়ল রানা। কিচেনের দিকে এগোল ও।

'সাথে বিস্কিট চানাচুর কিছু থাকলে দিস,' হুকুম করল সোহেল। আয়েশ করে সিগারেট ধরাল। সে একটা টান দিতেই ভুরু কুঁচকে উঠল। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল সেটা। 'শালা ধড়িবাজ!' স্টেট এক্সপ্রেসের প্যাকেটে ফিল্টার টিপ স্টার ভরে রেখেছিল রানা, জানত সোহেল এসে ওর সামনেই ওর প্যাকেটটা দখল করবে। পকেট থেকে প্যাকেটটা বের করে রানার পিঠ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল সোহেল।

কিচেনে ঢোকার মুখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। 'আমি পাল্টা আঘাত হানায় বিশ্বাসী নই।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল সোহেল। রানার হাসি ম্লান হয়ে

যেতে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। রানার রুমালটা সযত্নে আবার পকেটে ভরে রাখল সে।

কফি খাবার পর কে কাকে ডিনার খাওয়াবে তাই নিয়ে তর্ক শুরু হলো। সোহেলের যুক্তি, সে অতিথি, রানা তাকে খাওয়াবে। রানার যুক্তি, অতিথির একমাত্র পরিচয় হাতে মিষ্টির বাক্স, সোহেলের হাতে তা যখন নেই কাজেই তাকে অতিথি বলা চলে না।

অবশেষে টস হলো। হেরে গেল রানা। যে যত ড্রিঙ্ক করতে পারে, সব বিল সোহেল দেবে। আর ডিনারের বিল দেবে রানা। সোহেল জানাল আজ রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে বিদায় হবে সে।

শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাবার সময় দেশের হালচাল জেনে নিল রানা। কাজের কথা শুরু করবে ওরা গাড়িতে, ক্রয়ডনে যাবার সময়, শেষ করবে ডিনার খেয়ে কটেজে ফিরে। দু'বন্ধু আজ সারারাত আড্ডা মারবে।

কথা বলতে বলতে স্টার সিগারেটগুলো একটা একটা করে ভেঙে অ্যাশট্রেতে গুঁজে রাখছিল সোহেল, হঠাৎ সেটা টেবিল থেকে পড়ে গড়িয়ে গেল মেঝের আরেক দিকে। পায়ের নাগালের মধ্যে থাকায় আটকাবার চেষ্টা করল সে, কিনারায় বেশি চাপ পড়ে চীনামাটির অ্যাশট্রে ভেঙে গেল।

'কি হলো রে?' বাথরুম থেকে জিজ্ঞেস করল রানা।

উত্তর না দিয়ে কার্পেটের ওপর উবু হয়ে বসেই থাকল সোহেল। ভাঙা অ্যাশট্রের ভেতর টেপ দিয়ে আটকানো ছোট্ট একটা জিনিস দেখতে পেয়েছে ও।

'সোহেল?' বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রানা, দাড়ি কামানো শেষ হয়ে গেছে। জিনিসটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সোহেল। তাকাল রানার দিকে।

দু'সেকেন্ড পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর হাত বাড়িয়ে সোহেলের কাছ থেকে জিনিসটা নিল রানা, উল্টেপাল্টে দেখল। খুদে একটা মাইক্রোফোন, আড়িপাতা যন্ত্র।

নিস্তব্ধতা ভাঙল সোহেল। 'কাকে সন্দেহ করিস?'

'কে আছে যে সন্দেহ করব! শার্ক কমান্ডের সবাই আমার সম্পর্কে সব কিছু জানে, ওদের কাউকে শত্রু ভাবার প্রশ্নই ওঠে না।'

'তাহলে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল রানা।

'আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল...'

'সকালে একবার চেক করে যাই, ফিরে এসে আবার একবার,' সোহেলকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'আজ তুই আসায় চেক করা হয়নি। ডিনার খেয়ে ফিরে এসে...'

'সেন্ট্রাল কমিটিকে জানাবি?'

'দেখি।'

গাড়িটা ওরা দু'জন মিলে চেক করল, পাওয়া গেল না কিছু। হাসি-খুশি পরিবেশটা নষ্ট হয়ে গেছে, ডিনার জমল না। একাই কয়েক আউন্স হুইস্কি খেলো

সোহেল, শার্ক কমান্ডের দায়িত্বে রয়েছে বলে রানা ওসব ছুঁলো না। ইটালিয়ান রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ক্রয়ডন শহরে খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল ওরা, এই ফাঁকে কাজের কথা যা ছিল সব সোহেলের কাছ থেকে শুনে নিল রানা।

কটেজে ফিরে এসে রানার জন্যে কফি তৈরি করল সোহেল। ড্রইং রুমে ফিরে দেখল দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে রানা। 'কি রে, কি ভাবছিস?'

'ভাবছি কার সাথে এখানে আমি কি এমন কথা বলি যে কারও তা শোনার আগ্রহ হবে? মাঝে মধ্যে তুই আসছিস, কনফিডেনশিয়াল কিছু কথা হয়। আর প্রায়ই আসে, রবসন, শার্ক কমান্ডের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড–কিন্তু তার সাথে গোপন কি আলোচনা করতে পারি!'

'কি ভাবছিস বুঝতে পারছি,' বলল সোহেল। 'তোর সম্পর্কে নয়, সম্ভবত আমার সম্পর্কে জানতে চাইছে কেউ।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু তোর সম্পর্কে জেনে কার কি লাভ?'

রানার সামনে টেবিলের ওপর কফির কাপটা নামিয়ে রাখল সোহেল। 'তা না-ও হতে পারে। শত্রু নয়, হয়তো তোর বন্ধুদেরই কেউ করেছে কাজটা–স্রেফ সাবধানতা অবলম্বনের জন্যে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমার ওপর কার এত অবিশ্বাস যে এ-ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়? উঁহু, ব্যাপারটা আরও সিরিয়াস, সোহেল।'

'একটা সিগারেট খাওয়া,' পরিবেশটাকে হালকা করার জন্যে বলল সোহেল। নিজের সিগারেট চেয়ে খেতে হচ্ছে ওকে।

পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সোহেলের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা, টেবিলের কাপের পাশে রাখা ব্লিপারটা কর্কশ স্বরে বেজে উঠল।

সাথে সাথে শক্ত হয়ে গেল সারা শরীর, সোহেলের দিকে না তাকিয়ে ম্যাচ বক্সের মত ছোট্ট ব্লিপারটা তুলে নিল রানা। মিনিয়েচার টু-ওয়ে রেডিওটা অন করল খুদে একটা বোতামে চাপ দিয়ে। 'শার্ক ওয়ান,' শান্ত গলায় বলল ও।

যান্ত্রিক, অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল, রেঞ্জের প্রায় শেষ সীমায় রয়েছে সেটটা। 'মেজর মাসুদ রানা, সি.সি. কন্ডিশন ব্লু ঘোষণা করেছে।'

আরেকটা ফল্স অ্যালার্ম, বিরক্ত হয়ে ভাবল রানা। গতমাসে বারো বার কন্ডিশন ব্লু ঘোষণা করা হয়, কিন্তু এত থাকতে আজ রাতে কেন! কন্ডিশন ব্লু হলো সতর্কতার প্রথম পর্যায়, তৈরি হয়ে কন্ডিশন গ্রীন-এর জন্যে অপেক্ষা করতে হবে কমান্ডোদের। কন্ডিশন গ্রীন ঘোষণা করার সাথে সাথে রওনা হতে হবে সবাইকে।

'সি.সি-কে জানাও সাত মিনিটের মধ্যে কন্ডিশন গ্রীনের জন্যে তৈরি হব আমরা।' সাড়ে চার মিনিট লাগবে কম্পাউন্ডে পৌঁছুতে। হঠাৎ করেই কটেজ ভাড়া করার সিদ্ধান্তটা ভুল হয়েছে বলে উপলব্ধি করল রানা। এই ক'মিনিটে অনেক নিরীহ মানুষ মারা যেতে পারে।

মুখ তুলে রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে সোহেল বলল, 'কি আর করা, আগের প্ল্যানই বহাল থাক–,' হাতঘড়ির ওপর চট করে চোখ বুলিয়ে নিল সে। '–শেষ ট্রেনটা এখনও ধরতে পারব।'

'মার্সিডিজটা নিয়ে যা,' পরামর্শ দিল রানা। 'স্টেশন থেকে ড্রাইভারকে দিয়ে আনিয়ে নেব। সাবধানে থাকিস।' উঠে দাঁড়াল ও।

'সাবধানে থাকতে হবে তোকে।' শেষ শব্দটা জোর দিয়ে উচ্চারণ করল সোহেল, চেহারা কঠোর হয়ে উঠল। 'তোর পেছনে লোক লেগেছে।'

'কিন্তু তার বা তাদের উদ্দেশ্য এখনও আমরা জানি না...'

'তোর কি মনে হয় এখানে তুই একা?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'না, আমার কোন সাহায্য দরকার নেই।'

কটেজ থেকে বেরুতে বেরুতে সোহেল বলল, 'বসকে আমি রিপোর্ট করব।' বেরিয়ে এসে রানা ল্যান্ড-রোভারে আর সোহেল মার্সিডিজে চড়ল। রাস্তার বাঁকে মোড় নেয়ার সময় হাত নাড়ল দু'জন, তারপর চলে গেল দু'দিকে।

নাইরোবি টাওয়ারে কন্ট্রোলার অপেক্ষা করছে, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের সেইশেলয ফ্লাইটের এখনই রিপোর্ট করার সময়। পনেরো সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর একবার, দু'বার, তিনবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করল সে। কোন সাড়া নেই। ইনফরমেশন, অ্যাপ্রোচ টাওয়ার, এবং ইমার্জেন্সীর জন্যে আলাদা আলাদা চ্যানেল আছে, বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সির সুইচ অন করে এক এক করে সবগুলো চ্যানেল জ্যান্ত করার চেষ্টা চলল। এগুলোর যেকোন একটা খোলা রেখে বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে হয় জিরো-সেভেন-জিরোকে। অথচ তবু কোন সাড়াশব্দ নেই।

পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেছে স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরো অপারেশনস নরমাল রিপোর্ট পাঠাচ্ছে না, অ্যাপ্রোচ র‍্যাক থেকে হলুদ স্লিপ নামিয়ে ইমার্জেন্সী 'লস্ট কন্ট্যাক্ট' স্লটে ঢোকাল কন্ট্রোলার, সাথে সাথে অনুসন্ধান ও উদ্ধার তৎপরতা শুরু হয়ে গেল।

দু'মিনিট তেরো সেকেন্ড পেরিয়ে গেছে। স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরো অপারেশনস নরমাল পাঠাচ্ছে না, হিথ্রো কন্ট্রোলের ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ডেস্কে টেলেক্স শীটটা পৌঁছুল। ষোলো সেকেন্ড পর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিজম অর্গানাইজেশনের সেন্ট্রাল কমিটিকে ব্যাপারটা জানানো হলো, সি.সি. থেকে খবর পেল শার্ক কমান্ড–কন্ডিশন ব্লু ঘোষণা করা হয়েছে।

পূর্ণিমা হতে আর তিন দিন বাকি, পৃথিবীর ছায়া পড়ায় চাঁদের ওপর দিকের কিনারায় সামান্য একটু চ্যাপটা। এত উঁচু আকাশ থেকে প্রায় সূর্যের মতই বড় দেখাচ্ছে।

গ্রীষ্মের রাতকে অপরূপ সাজে সাজিয়ে রেখেছে রূপালি মেঘমালা, কোথাও কোথাও ব্যাঙের ছাতার মত আকৃতি নিয়েছে, কিনারায় বজ্রবাহী বিশালকায় পাখনা, চাঁদের অঝোর আলোয় দীপ্তিময়।

মেঘমালার সার সার চূড়ার মাঝখান দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরো, যেন অশুভ একটা কালো বাদুড়। বিরতিহীন পশ্চিম দিকে তার এই যাত্রার যেন শেষ নেই।

'ওটা মাদাগাস্কার,' কথা বলল ক্যাপটেন, নিস্তব্ধ ককপিটে তার শান্ত

কণ্ঠস্বরও গমগম করে উঠল। 'ঠিক পথেই আছি আমরা।' তার পিছনে নড়েচড়ে উঠল মেয়েটা, সাবধানে হাত বদল করল গ্রেনেড, আধ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম মুখ খুলল সে।

'আরোহীরা কেউ কেউ জেগে আছে, ওরাও লক্ষ করছে ব্যাপারটা।' হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাল সে। 'সবাইকে জাগাবার সময় হয়েছে। সুখবরটা এবার জানানো দরকার।' ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকাল সে। 'কেবিন আর সীট বেল্ট লাইট জ্বালো, প্লীজ। তারপর মাইক্রোফোনটা দাও আমাকে।'

ক্যাপটেন স্টিফেন জেংকিনসকে আ'পর মনে করিয়ে দেয়া হলো, গোটা অপারেশনটাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্ল্যান করা। মেয়েটা এমন এক সময় আরোহীদের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করতে যাচ্ছে যখন তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা সবচেয়ে দুর্বল স্তরে পৌঁচেছে, ইন্টারকন্টিনেন্টাল ফ্লাইটের বাধাপ্রাপ্ত অগভীর ঘুম রাত দুটোর সময় ভাঙিয়ে দিলে বেশিরভাগই তারা অসহায় বোধ করবে।

'কেবিন আর সীট বেল্ট লাইট জ্বেলে দেয়া হয়েছে,' বলে মেয়েটার হাতে মাইক্রোফোন ধরিয়ে দিল এঞ্জিনিয়ার।

'গুড মর্নিং, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন,' সজীব, স্পষ্ট, আর মিষ্টি কণ্ঠস্বর মেয়েটার। 'এই অসময়ে আপনাদের ঘুম ভাঙানোর জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি যা ঘোষণা করতে যাচ্ছি সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমি চাই সবাই আপনারা মন দিয়ে শুনুন কথাগুলো।'

লোক ঠাসা বিশাল গুহার মত কেবিনে কাপড়চোপড়ের খসখস আওয়াজ শোনা গেল, দু'একটা করে উঁচু হতে শুরু করল মাথা, কেউ হাই তুলল, কেউ চোখ রগড়াতে শুরু করল।

'সীট বেল্ট লাইট জ্বলছে, আপনার পাশের আরোহীর ঘুম ভেঙেছে কিনা দয়া করে দেখে নিন। আরও দেখুন, তার সীট বেল্ট বাঁধা রয়েছে তো। কেবিন স্টাফরা ব্যাপারটা চেক করো।'

সব মানুষ সমান নয়, অনেকে বিপদের প্রথম ধাক্কা খেয়েই অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, সীট বেল্ট আটকানো থাকলে বাধা পাবে সে। কথা বলার মাঝখানে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বিরতি নিচ্ছে জেসিকা, কাঁটায় কাঁটায় ষাট সেকেন্ড পর আবার মুখ খুলল সে, 'প্রথমে আমার পরিচয়। অ্যাকশন কমান্ডো ফর হিউম্যান রাইটস-এর আমি একজন সিনিয়র অফিসার–' নিজেকে তুমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রানী ঘোষণা করলেও পারতে, সামান্য বাঁকা ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে ভাবল ক্যাপটেন, প্লেনের বাইরে, চন্দ্রালোকিত মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে আছে সে। '–এবং প্লেনটা এখন সম্পূর্ণ আমার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আমার অফিসারদের অনুমতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই কেউ নিজের সীট ছেড়ে উঠবেন না। কেউ যদি এই নির্দেশ অমান্য করেন, হাই এক্সপ্লোসিভ দিয়ে গোটা প্লেন উড়িয়ে দেয়া হবে।'

ঘোষণার পরপরই আবার সেটা সাবলীল জার্মান ভাষায় পুনরাবৃত্তি করা হলো। সবশেষে ফরাসী ভাষায়, তবে থেমে থেমে, বোঝা গেল মেয়েটা ভাল ফ্রেঞ্চ জানে না।

'অ্যাকশন কমান্ডোর অফিসাররা লাল শার্ট পরে থাকবে, সহজেই যাতে

আপনারা তাদের চিনতে পারেন।'

ওদিকে জেসিকা ঘোষণা শুরু করার পরপরই তার তিন সঙ্গী, ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের সামনের অংশে দাঁড়িয়ে যে যার ক্যানভাস ব্যাগের ফলস্ বটম্ খুলে ফেলেছে। ভেতরে জায়গা মাত্র দু'ইঞ্চি গভীর, চোদ্দ ইঞ্চি লম্বা, আর আট ইঞ্চি চওড়া, তবে ভাঁজ করা বারো বোর পিস্তল আর দশ রাউন্ড কার্ট্রিজের জন্যে যথেষ্ট। পিস্তলগুলোর ব্যারেল চোদ্দ ইঞ্চি লম্বা, বোরগুলো মসৃণ, আর আরমার্ড প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। নিরেট একটা বুলেটের প্যাসেজ হিসেবে এই প্লাস্টিক টেকার কথা নয়, তাই বিশেষ ধরনের বুলেট ব্যবহার করছে ওরা। এই বুলেটের ভেলোসিটি আর প্রেশার খুব কম। করডাইটের মাত্রাও অল্প, পরপর বেশ কয়েকটা গুলি করায় কোন অসুবিধে নেই। ব্রীচ আর ডাবল পিস্তল গ্রিপ-ও প্লাস্টিকের, সহজেই জায়গা মত জোড়া লেগে গেল। গোটা আগ্নেয়াস্ত্রে ধাতব পদার্থ বলতে শুধু কেস-স্টীল ফায়ারিং পিন আর স্প্রীং, ক্যানভাস ফ্লাইট ব্যাগের ধাতব পায়ার চেয়ে বড় নয় আকারে, কাজেই মাহে এয়ারপোর্টে সিকিউরিটি চেকিঙের সময় মেটাল ডিটেকটর-কে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি ব্যাগে দশটা করে কার্ট্রিজ রয়েছে, প্লাস্টিক কেসে মোড়া-এগুলোরও শুধু পরকাশন্ ক্যাপ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে তৈরি, কোন ইলেকট্রিক ফিল্ডকে উত্তেজিত করবে না। কার্ট্রিজগুলো লুপ করা বেল্টের ভেতর রয়েছে, বেল্টটা কোমরে জড়িয়ে দেয়া যাবে।

অস্ত্রগুলো ছোট, কালো, আর কুৎসিত।' সাধারণ শটগানের মত করে লোড করতে হয়। ব্যবহৃত শেল নিজে থেকে ছিটকে পড়ে না, আর রিকয়েলের ধাক্কা এত প্রচণ্ড যে সবটুকু শক্তি দিয়ে পিস্তল গ্রিপ চেপে না ধরলে ব্যবহারকারীর কব্জি নির্ঘাত ভেঙে যাবে। ত্রিশ ফিট দূর থেকে এর ধ্বংস ক্ষমতা হতবাক করে দেয়। বারো ফিট দূর থেকে পেটে গুলি করলে নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে আসবে। আর ছয় ফিট দূর থেকে নিখুঁতভাবে আলাদা করে দিতে পারে মাথা। অথচ একটা ইন্টারকন্টিনেন্টাল এয়ারলাইনারের প্রেশার হাল (খোল) ফুটো করার ক্ষমতা নেই।

ওদের হাতের এই কাজটার জন্যে আদর্শ একটা অস্ত্র। সংযোজনের পর লোড করা হলো, টি-শার্টের ওপর লাল শার্ট গায়ে চড়াল পুরুষ দু'জন, তারপর যে যার পজিশনে গিয়ে দাঁড়াল-একজন ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের পিছন দিকে, অপরজন ট্যুরিস্ট কেবিনের পিছন দিকে। চেহারায় মারমুখো ভাব নিয়ে হাতের অস্ত্র তুলল তারা, সবাইকে দেখাল।

সুন্দরী, এলোচুল, কালো চুল মেয়েটা আরও কিছুক্ষণ বসে থাকল নিজের সীটে। অবশিষ্ট কোকো-ডি-মার থেকে গ্রেনেড বের করে নেটিং ব্যাগে ভরল সে, জেসিকার হাতে যেটা রয়েছে সেটার সাথে এগুলোর এক জায়গাতেই পার্থক্য-মাঝখানে জোড়া লাল রেখা। তারমানে এগুলোর ফিউজ ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত।

কেবিন অ্যাড্রেস সিস্টেমে প্রাণবন্ত একটা কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে এই মুহূর্তে, আবার কথা বলছে জেসিকা। ইতিমধ্যে আরোহীরা সবাই সম্পূর্ণ জেগে গেছে, সার সার লম্বা সীটে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে প্রত্যেকে, চেহারায় হতচকিত বিপন্ন ভাব।

'ও কে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অ্যাকশন কমান্ডোর একজন অফিসার কেবিনের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত হেঁটে আসছে, তাই না? ওর হাতে ওগুলো হাই এক্সপ্লোসিভ গ্রেনেড–,' কালোকেশী জার্মান মেয়েটা প্যাসেজ ধরে হাঁটছে, পনেরোটা সীটের সারি পেরিয়ে একবার করে থামছে সে, ওভারহেড লকার খুলে ভেতরে একটা করে গ্রেনেড রাখছে, লকার বন্ধ করে আবার হাঁটছে। আরোহীদের মাথা একযোগে ঘুরতে শুরু করল, নিখাদ আতঙ্ক ভরা চোখে মেয়েটার কীর্তিকলাপ দেখছে তারা। 'গ্রেনেডগুলোর যে কোন মাত্র একটারই প্লেনটাকে উড়িয়ে দেয়ার এক্সপ্লোসিভ পাওয়ার রয়েছে। একটা ব্যাটল ট্যাংকের গা তৈরি করা হয় ছয় ইঞ্চি মোটা ইস্পাত দিয়ে, অনেকেই জানেন আপনারা। এই গ্রেনেডের রয়েছে সেই ছয় ইঞ্চি মোটা ইস্পাতকে ভেঙে ভেতরের লোকগুলোকে মেরে ফেলার বিস্ফোরণ ক্ষমতা। আমার অফিসার প্লেনের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত মোট চোদ্দটা গ্রেনেড রাখছে। আমার নিয়ন্ত্রণে ইলেকট্রনিক ট্র্যান্সমিটার রয়েছে, গ্রেনেডগুলো একসাথে ফাটিয়ে দেয়া যাবে।' এরপর তার কণ্ঠস্বরে কিছুটা দুষ্টামির সুর পাওয়া গেল, সেই সাথে মৃদু হাসির আওয়াজ। 'আর যদি ফাটে, নর্থ পোল থেকেও শোনা যাবে আওয়াজটা।'

মৃদুমন্দ বাতাসে গাছের পাতা যেমন কাঁপে তেমনি কাঁপতে লাগল আরোহীরা, কাছেপিঠে কোথাও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল একজন মহিলা। চাপা গলার কান্না, কেউ এমনকি তার দিকে তাকাল না পর্যন্ত।

'তবে দয়া করে কেউ উদ্বিগ্ন হবেন না। সে-ধরনের কিছু ঘটতে যাচ্ছে না। কারণ আমি জানি আপনারা সবাই আমার নির্দেশগুলো মেনে চলবেন। তারপর, সব যখন ভালয় ভালয় শেষ হবে, যে যার ঠিকানায় ফিরে যাবার সময় এই অপারেশনে ভূমিকা রাখার জন্যে সবাই আপনারা গর্ব অনুভব করবেন। আমরা সবাই মহান এবং গৌরবময় একটা মিশনে অংশগ্রহণ করছি। মানবকল্যাণ এবং স্বাধীনতার পক্ষে আমরা সবাই এক-একজন অকুতোভয় যোদ্ধা, বঞ্চিত মানুষের প্রাপ্য আদায়ে বদ্ধপরিকর। নতুন এক জগৎ সৃষ্টির কাজে আজ আমরা বড় একটা পদক্ষেপ নিয়েছি–সবাই মিলে ঝেঁটিয়ে দূর করব সব রকম অত্যাচার, বৈষম্য, দুর্নীতি, শোষণ, আর অবিচার। আসুন, আমরা শপথ নেই অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায় এবং তাদের কল্যাণের জন্যে নিজেদের আমরা উৎসর্গ করব।'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এখনও কাঁদছে মহিলা, তার সাথে পাল্লা দিতে শুরু করল ছোট একটা বাচ্চা।

কালোকেশী জার্মান মেয়েটা নিজের সীটে ফিরে এল, ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করল সে। এই ক্যামেরাটাই মাহে এয়ারপোর্টে ধরা পড়েছিল মেটাল ডিটেকটরে। নাইলনের স্ট্র্যাপটা মাথায় গলাল সে, গলায় ঝুলিয়ে নিল ক্যামেরা, তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে অবশিষ্ট পিস্তল দুটো জোড়া লাগাতে বসল।

দ্রুত হাতে কাজটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে, পিস্তল দুটো ছাড়াও হাতে কার্ট্রিজ বেল্ট রয়েছে। গ্যালি এলাকার ভেতর দিয়ে সোজা ফ্লাইট ডেকে চলে এল সে। নির্লজ্জের মত তার ঠোঁটে চুমো খেল জেসিকা।

'ক্লারা, আই লাভ ইউ!' ক্যামেরাটা নিয়ে নিজের গলায় ঝোলাল স্বর্ণকেশী।

'এটা,' ক্যাপটেনকে ব্যাখ্যা করল সে, 'যা দেখছেন তা নয়। এটা একটা রিমোট রেডিও ডিটোনেটর, কেবিনের গ্রেনেডগুলো ফাটিয়ে দেবে।'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপটেন। চেহারায় প্রকাশ্যে স্বস্তির ভাব নিয়ে পিনটা আবার জায়গামত ঢুকিয়ে দিয়ে গ্রেনেডটাকে ডিজআর্ম করল জেসিকা, অনেকক্ষণ ধরে মুঠোর ভেতর রাখায় তালুর ঘামে ভিজে গেছে। বান্ধবীর হাতে গুঁজে দিল সেটা।

'উপকূলে পৌঁছুতে আর কতক্ষণ লাগবে?' কোমরে কার্ট্রিজ বেল্ট জড়াতে জড়াতে জিজ্ঞেস করল সে।

'বত্রিশ মিনিট,' ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার সাথে সাথে জবাব দিল।

পিস্তলের ব্রীচ খুলল জেসিকা, লোড চেক করল, তারপর হাত-ঝাপটা দিয়ে বন্ধ করল আবার। 'তুমি আর এরিক এবার বিশ্রাম নিতে পারো,' ক্লারাকে বলল সে। 'বিশ্রাম মানে ঘুমাতে হবে।'

অপারেশনটা দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে চলতে পারে, তখন ক্লান্তি ওদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দেখা দেবে। সেজন্যেই ভেবেচিন্তে এত বড় করা হয়েছে দলটাকে। এখন থেকে, শুধু ইমার্জেন্সী ছাড়া, দু'জন করে বিশ্রাম নেবে।

'গোটা ব্যাপারটা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সামলাচ্ছেন আপনারা,' পাইলট স্টিফেন জেংকিনস প্রশংসার সুরে বলল, '–এখন পর্যন্ত।'

'ধন্যবাদ,' সুরেলা কণ্ঠে হেসে উঠল জেসিকা, তার একটা হাত সীটের পিঠ ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল, ক্যাপটেনের কাঁধে মৃদু চাপ দিল সে। 'আজকের এই দিনটার জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেছি আমরা।'

তিন

সরু গলির শেষ মাথায় কম্পাউন্ডের গেট দেখা গেল, ল্যান্ড-রোভারের গতি না কমিয়ে পরপর তিনবার হেডলাইট জ্বালল আর নেভাল রানা। তাড়াহুড়ো করে ঠেলে গেট খুলে দিল সেন্ট্রি, পরমুহূর্তে সগর্জনে তাকে পাশ কাটাল গাড়ি।

কোথাও ফ্লাডলাইট জ্বলছে না, নেই কোন ব্যস্ত ছুটোছুটি, প্রতিধ্বনিবহুল বিশাল গুহা আকৃতির হ্যাঙ্গারে শুধু পাশাপাশি এক জোড়া প্লেন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গোটা হ্যাঙ্গার একা লকহীড হারকিউলিসটাই যেন দখল করে রেখেছে। হ্যাঙ্গারটা আসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ছোট ছোট প্লেনের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল। হারকিউলিসের লম্বা, খাড়া ফিন ছাদের কাছাকাছি মাচা প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে। তার পাশে হকার সিডলি এইচ-এস ওয়ান-টু-ফাইভ একজিকিউটিভ জেট খেলনার মত লাগছে। শার্ক কমান্ড শুধু এই দু'দেশের বিমানই নয়, আরও কয়েকটা দেশের বিমান পেতে যাচ্ছে। সদস্য সব দেশই টাকা বা উপকরণ দিয়ে সাহায্য করছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিজম অর্গানাইজেশনকে। গরীব দেশগুলো, যারা টাকা বা উপকরণ দিয়ে সাহায্য করতে অপারগ, তারা মেধাবি

এক্সপার্ট পাঠাচ্ছে—যেমন বাংলাদেশ। এটা একটা বহুজাতিক সংগঠন, যে জন্যে জাতিসংঘের অনুমোদন এবং স্বীকৃতি আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

• 'বস্, মন বলছে আজকের এটা ফল্স অ্যালার্ম নাও হতে পারে,' ল্যান্ড-রোভারের এঞ্জিন বন্ধ হতেই পাশে এসে দাঁড়াল কার্ল রবসন, কথার সুরে মধ্য-পশ্চিম আমেরিকান টান। ইউ.এস.মেরিন্স-এর মেজর হলেও, চেহারা দেখে মনে হবে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির সেলসম্যান। পরিচয় হবার পর থেকে দু'জন ওরা খুব তাড়াতাড়ি পরস্পরের ওপর আস্থা রাখতে শিখে ফেলেছে। রবসনকে পছন্দ করে রানা, তার যোগ্যতার মূল্য দেয়; আর রানাকে শ্রদ্ধা করে রবসন, ওর ব্যক্তিত্ব আর অভিজ্ঞতাকে সমীহ করে।

নীল ওভারঅলস আর সুতী কাপড়ের ক্যাপ পরেছে রবসন, দুটোতেই লেখা রয়েছে—'শার্ক কমিউনিকেশনস'। সৈনিক নয়, বরং টেকনিশিয়ান বলে মনে হচ্ছে ওকে।

রানার সেকেন্ড ইন কমান্ড রবসন, শার্কের কমান্ডার হিসেবে রানা ছয় হপ্তা আগে যোগ দেয়ার পর প্রথম পরিচয়। খুব একটা লম্বা নয় রবসন, তবে শরীরটা বেশ ভারী। প্রথম দর্শনে তাকে মোটা বলে মনে হতে পারে, কারণ চওড়ায় একটু যেন বেশি সে। কিন্তু শরীরের কোথাও অতিরিক্ত মেদ নেই, সবটুকুই হাড় আর পেশী। সেনাবাহিনীতে হেভিওয়েট বক্সার হিসেবে খ্যাতি আছে তার, চওড়া হাসিখুশি মুখের ওপর নাকটা ব্রিজের ঠিক নিচে ভাঙা—সামান্য ফুলে গিয়ে দু'এক সুতো বেঁকে আছে। সবচেয়ে আগে দৃষ্টি কাড়ে পোড়া চকলেট রঙের চোখ জোড়া, বুদ্ধিদীপ্ত এবং সর্বভুক। রানার প্রশংসা অর্জন করা সহজ কথা নয়, মাত্র ছয় হপ্তার মধ্যে সফল হয়েছে রবসন।

এই মুহূর্তে জোড়া প্লেনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে, তার লোকেরা কন্ডিশন গ্রীন-এর জন্যে ব্যস্ত দক্ষতার সাথে তৈরি করছে নিজেদের। দুটো প্লেনই কমার্শিয়াল এয়ারলাইন স্টাইলে রঙ করা হয়েছে, পেটের কাছে গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা, শার্ক কমিউনিকেশন। কোন বাধা না পেয়ে পৃথিবীর যে-কোন এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে পারবে ওগুলো। শার্ক কমান্ডের কমান্ডোরা পাসপোর্ট ছাড়াই যে-কোন দেশে ভ্রমণ করতে পারবে, শুধু আইডেনটিটি কার্ডই যথেষ্ট। এ-ব্যাপারে সদস্য দেশগুলো গঠনতন্ত্রে সই করার সময়ই অনুমতি দিয়ে রেখেছে।

'কোথায় কি ঘটতে যাচ্ছে শুনি?' ল্যান্ড-রোভারের দরজা বন্ধ করে রবসনের পাশাপাশি হাঁটা ধরল রানা।

'নিখোঁজ প্লেন, বস্। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ। ধেত্তেরি, খাবলা মেরে জান খারাপ করে দিল!' প্রচণ্ড বাতাস রবসনের ওভারঅলের পায়া আর আস্তিন ধরে টান দিচ্ছে।

'কোথায়?'

'ভারত মহাসাগরে।'

'কন্ডিশন গ্রীনের জন্যে আমরা তৈরি?' নিজের কমান্ড প্লেনে ওঠার সময় জিজ্ঞেস করল রানা।

'অল সেট, বস্।'

হেডকোয়ার্টার আর কমিউনিকেশন সেন্টারের উপযুক্ত করে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে হকারের ভেতরটা। ফ্লাইট ডেকের ঠিক পিছনেই আরামদায়ক চারটে সীট চারজন অফিসারের জন্যে। পরের জায়গাটুকু দু'জন ইলেকট্রনিক এঞ্জিনিয়ার আর তাদের ইকুইপমেন্টের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সম্পূর্ণ আলাদা একটা কমপার্টমেন্ট। তারপর ছোট একটা টয়লেট, একেবারে পিছনে গ্যালি।

মাথা নিচু করে কেবিনে ঢুকতেই মাঝখানের দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল একজন টেকনিশিয়ান। 'গুড ইভনিং, মেজর-সি.সি-র সাথে ডাইরেক্ট লাইনে রয়েছি আমরা।'

'ভদ্রলোককে স্ক্রীনে আনো,' নির্দেশ দিল রানা, ছোট ওয়ার্কিং ডেস্কের পিছনে প্যাড লাগানো চেয়ারে বসল আরাম করে।

সরাসরি রানার দিকে মুখ করে রয়েছে চোদ্দ ইঞ্চি টিভিটা, তার ঠিক ওপরেই কনফারেন্স কমিউনিকেশনের জন্যে রয়েছে ছয় ইঞ্চি স্ক্রীন সহ চারটে সেট। চোদ্দ ইঞ্চিটা মেইন স্ক্রীন, সেটা সচল হয়ে উঠল, সাথে সাথে বড়সড় একটা মাথা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল স্ক্রীনে। প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধার ভাব জাগে মনে।

'গুড আফটারনুন, রানা।' হাসিটা আন্তরিক, চুম্বকের মত টানে।

'গুড ইভনিং, ড. ওয়ার্নার।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ড. ওয়ার্নার বোঝাতে চাইলেন রানার মত তিনিও যুক্তরাষ্ট্র আর যুক্তরাজ্যের সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে সচেতন। 'ঠিক এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছি আমরা, রানা। শুধু জানি, বি.এ. জিরো-সেভেন-জিরো চারশো একজন প্যাসেঞ্জার আর ষোলোজন ক্রু নিয়ে মাহে থেকে নাইরোবি আসছিল, বত্রিশ মিনিট হয়ে গেল ওটার কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না।'

জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন ড. ওয়ার্নার, সন্ত্রাসবাদ বিরোধী একটা আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার ধারণাটা প্রথম তাঁর মাথাতেই আসে। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে ব্যাপক আলোচনার পর সবার সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টিটেরোরিজম অর্গানাইজেশন। গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে, এটা একটা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলোর রাজনৈতিক মতাদর্শ বা তাদের উদ্দেশ্য যাই হোক, সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশে কমান্ডোরা তাদের কার্যকলাপ বানচাল করার জন্যে অপারেশন চালাবে। সংগঠনের সর্বমোট খরচের বেশিরভাগটাই বহন করবে রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানী, আর ফ্রান্স। অন্যান্য দেশ আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে নির্দিষ্ট চাঁদা দেবে। সংগঠনের কমান্ডো আর অফিসাররা দায়িত্ব পালনের সময় দুর্লভ কিছু অধিকার ভোগ করবে-যেমন, কোন অপারেশনে থাকার সময় কাউকে খুন করা হলে তার জন্যে কোন বিচারকের সামনে দাঁড়াতে হবে না, সীমান্ত পেরিয়ে কোন সদস্য দেশে ঢুকতে হলে পাসপোর্ট বা ভিসা লাগবে না, যে-কোন বহনযোগ্য অস্ত্র সাথে রাখা যাবে, ইত্যাদি। কাজের সুবিধের জন্যে সংগঠনের চেয়ারম্যান করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রধানকে। সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট, এবং অন্যান্য দায়িত্ব ছাড়াও ইন্টেলিজেন্স ওভারসাইট বোর্ড-এর উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছেন ড. ওয়ার্নার। তিনি শুধু আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে

সরাসরি রিপোর্ট করে থাকেন। প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন মনে করলে বা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অনুরোধে সেই রিপোর্ট প্রকাশ করবেন। ব্যক্তিগতভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ড. ওয়ার্নার। দু'জন তাঁরা এক স্কুল এবং একই কলেজ থেকে পড়াশোনা করেছেন।

ড. ওয়ার্নার একজন শিল্পী, প্রতিভাবান সঙ্গীতজ্ঞ। দর্শন আর রাজনীতির ওপর সাড়া জাগানো চারটে বই আছে তাঁর। দাবায় তিনি গ্র্যান্ড মাস্টার। নানা বিষয়ে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ভদ্রলোক, ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে ক্ষুরধার বুদ্ধির সাহায্যে সমস্যা সমাধানে অভ্যস্ত, মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। অথচ তবু তাঁকে একজন রহস্যময় ব্যক্তি না বলে উপায় নেই, কারণ উৎসুক প্রচার মাধ্যমগুলোকে সব সময় এড়িয়ে থাকেন তিনি, গোপন করে রাখেন নিজের উচ্চাশা। অবশ্য তাঁর কোন উচ্চাশা আছে কিনা বলা কঠিন। তাঁর মত একজন মানুষের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবার স্বপ্ন দেখা অসঙ্গত বা অসম্ভব নয়। প্রচার-বিমুখ এই জ্ঞানসাধক চুপচাপ শুধু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, কাঁধে যত বোঝাই চাপানো হোক প্রতিবাদ করতে জানেন না।

শার্ক কমান্ডের কমান্ডার হিসেবে রানার নাম প্রস্তাব করা হয় মাস কয়েক আগে, তারপর পাঁচ-ছয় বার ড. ওয়ার্নারের সাথে দেখা হয়েছে ওর। ড. ওয়ার্নারের নিউ ইয়র্কের বাড়িতে একবার পুরো একটা রোববার কাটিয়েছে রানা। ভদ্রলোককে যতই দেখেছে রানা, ততই শ্রদ্ধা জেগেছে মনে। কোন সন্দেহ নেই, সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট হবার উপযুক্ততা একমাত্র তাঁরই আছে। ট্রেনিং পাওয়া একদল সৈনিকের ওপর একজন দার্শনিকের প্রভাব খুব কাজ দেবে। তাঁর মত একজন সফল কূটনীতিকের পক্ষে সরকার প্রধানদের সাথে যোগাযোগ রাখা খুব সহজ হবে। এবং সংকটের সময় যখন শত শত নিরীহ মানুষের জীবন ধ্বংসের মুখোমুখি, রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার সৎসাহস এবং দৃঢ়তা শুধু তাঁর কাছ থেকেই আশা করা যায়।

অল্প কথায় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে রানাকে তিনি বললেন, 'মনে হচ্ছে এটা একটা পারফেক্ট টার্গেট। দুনিয়ার নাম করা প্রায় সব ক'জন সার্জেন রয়েছে প্লেনটায়, আঠারো মাস আগেই কনভেনশনের জায়গা আর দিন-তারিখ সবার জানা ছিল। ডাক্তারদের একটা চমৎকার ভাবমূর্তি আছে, পাবলিক সেন্টিমেন্টে ঘা দেয়ার জন্যে সেটা ভাল কাজ দেবে। আমেরিকান, ব্রিটিশ, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, জার্মান, ইটালিয়ান, জাপানী, থাই, ভারতীয়, বাংলাদেশী–সব দেশেরই লোক রয়েছে ওদের মধ্যে। চার-পাঁচটা দেশের আবার দুর্নাম রয়েছে, সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে তারা মোটেও কঠোর নয়। প্লেনটা ব্রিটিশ, কিন্তু হাইজ্যাকাররা সম্ভবত এমন এক জায়গায় নিয়ে যাবে সেটাকে, গোটা ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠবে–পলিটিক্যালি। দেখা যাবে, আমরা হয়তো পাল্টা আঘাত হানার কোন সুযোগই পাব না।' অনেক দেশই সন্ত্রাসবাদ বিরোধী এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য নয়, ড. ওয়ার্নার ইঙ্গিতে সেগুলোর কথা উল্লেখ করলেন।

তাঁর কপালে উদ্বেগের একটা রেখা ফুটে উঠল, খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, 'কোবরা কমান্ডের জন্যেও আমি কন্ডিশন ব্লু ঘোষণা করেছি।

ব্যাপারটা যদি হাইজ্যাক হয়, প্লেনটার শেষ অবস্থান জানার পর আমার মনে হচ্ছে হাইজ্যাকারদের গন্তব্য পূব দিকে হওয়াও বিচিত্র নয়।'

সি.সি-র তিনটে হাতিয়ার বা বাহু রয়েছে, প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। শার্ক কমান্ড শুধু ইউরোপ আর আফ্রিকায় কাজ করতে পারবে। কোবরা কমান্ডের হেডকোয়ার্টার ইন্দোনেশিয়ায়, এশিয়া আর অস্ট্রেলিয়া কাভার করছে। চিতা-র হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটনে, উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকায় তৎপর।

'আরেক রিলে-তে কোবরার স্টুয়ার্ট আমার সাথে কথা বলতে চাইছে। কয়েক সেকেন্ড পর আবার ফিরে আসবে, রানা।'

'ঠিক আছে, ড. ওয়ার্নার।'

স্ক্রীন কালো হয়ে গেল, রানার পাশের চেয়ারে দামী ডাচ চুরুট ধরাল কার্ল রবসন। নিজের ডেস্কের কিনারায় হাঁটু ঠেকিয়ে চেয়ারে হেলান দিল সে, হাতঘড়ি দেখল। 'এটাও যদি ফলস অ্যালার্ম হয়, সংখ্যাটা হবে তেরো।' মুখের সামনে হাত রেখে হাই তুলল একটা। শুধু অপেক্ষায় থাকা ছাড়া এই মুহূর্তে কারও কিছু করার নেই। এবং বারবার অপেক্ষা করতে করতে গোটা ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে উঠেছে ওদের কাছে। একঘেয়ে হলেও, প্রস্তুতি নিতে অবহেলা করেনি ওরা। বিশাল হারকিউলিস ট্রান্সপোর্টে প্রতিটি অস্ত্র এবং ইকুইপমেন্ট তাৎক্ষণিক ব্যবহারের জন্যে তৈরি রাখা হয়েছে। উঁচু মানের ট্রেনিং পাওয়া ত্রিশজন সৈনিককে তোলা হয়েছে প্লেনে। দুটো প্লেনেরই ফ্লাইট ক্রুরা যার যার স্টেশনে অপেক্ষা করছে। স্যাটেলাইটের সাথে যোগাযোগ রাখছে কমিউনিকেশন টেকনিশিয়ানরা, প্রয়োজনে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ওয়াশিংটন আর লন্ডনের ইন্টেলিজেন্স কমপিউটারের সাহায্য চাইবে ওরা। বাকি শুধু অপেক্ষার অবসান। একজন সৈনিক জানে তার জীবনের বেশিরভাগ সময় শুধু অপেক্ষাতেই কেটে যায়। কিন্তু অপেক্ষা করতে হলেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় রানার। কার্ল রবসনের সঙ্গ পেয়ে আজ তবু ব্যাপারটা সহনীয় লাগছে।

খানিক পর আবার স্ক্রীনে ফিরে এলেন ড. ওয়ার্নার, জানালেন জিরো-সেভেন-জিরোর সর্বশেষ পজিশনে একটা সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ প্লেন পাঠানো হয়েছিল, কিছুই জানতে পারেনি ক্রুরা। 'বিগ ব্রাদার' নামে একটা রিকনিস্যান্স স্যাটেলাইট ওই একই পজিশনের ফটো তুলেছে, কিন্তু পরীক্ষা করার জন্যে ফিল্ম পাওয়া যাবে চোদ্দ ঘণ্টা পর। এক ঘণ্টা ছয় মিনিট হলো জিরো-সেভেন-জিরো অপারেশনস নরমাল রিপোর্ট পাঠাচ্ছে না।

স্ক্রীন থেকে উধাও হলেন ড. ওয়ার্নার, একটা সিগারেট ধরাল রানা। সোহেল আর অ্যাশট্রের ভেতর আড়িপাতা যন্ত্রের কথা মনে পড়ে গেল ওর। ঠিক এই সময় প্রশ্নটা করল রবসন।

'তোমার বন্ধু কি কটেজে...?'

সংক্ষেপে জবাব দিল রানা, 'না। চলে গেছে।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল রবসন, খানিক ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু ঘটেছে, বস? ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে জানতে চাই না।'

মাথা নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, স্ক্রীনে ড. ওয়ার্নারের ছবি ফুটে উঠল।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা।

'দক্ষিণ আফ্রিকার রাডারে অজ্ঞাত পরিচয় একটা প্লেন দেখা গেছে, ওদের এয়ারস্পেসের দিকে এগোচ্ছে,' রানাকে বললেন ড. ওয়ার্নার। 'স্পীড আর পজিশন দেখে মনে হয় জিরো-সেভেন-জিরো হতে পারে। বাধা দেয়ার জন্যে এক ঝাঁক মিরেজ আকাশে তুলেছে ওরা। আমি ইতিমধ্যে ধরে নিচ্ছি প্লেন নিখোঁজ হওয়ার পিছনে সন্ত্রাসবাদীদের হাত আছে–কাজেই এই মুহূর্তে কন্ডিশন গ্রীন ঘোষণা করছি, ইফ ইউ প্লীজ, রানা।'

'রওনা হলাম আমরা, ড. ওয়ার্নার।'

ডেস্কের কিনারা থেকে হাঁটু নামিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল কার্ল রবসন, দু'সারি দাঁতের ফাঁকে এখনও আটকে রয়েছে চুরুটটা।

টার্গেট সচল এবং দৃশ্যমান–লিডিং মিরেজ এফ.আই. ইন্টারসেপটর-এর পাইলট বোতাম টিপে তার ফ্লাইট কমপিউটার চালু করল, সাথে সাথে জ্বলে উঠল লাল অক্ষরগুলো, অ্যাটাক। মিরেজের সবগুলো অস্ত্র-মিসাইল আর কামান–লোড করা অবস্থায় রয়েছে। কমপিউটার ইন্টারসেপট-এর সময় নির্ধারণ করে দিল–তেত্রিশ সেকেন্ড। দুশো দশ ডিগ্রী কোর্স ধরে এগোচ্ছে টার্গেট, গ্রাউন্ড স্পীড চারশো তিরাশি নট।

পাইলটের সামনে ভোরের প্রথম আলো নাটকীয় প্রদর্শনীর আদলে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। গোটা আকাশ জুড়ে ঝুলে আছে রূপালি আর গোলাপী মেঘ, দিগন্তরেখার নিচে অদৃশ্য সূর্য তার সোনালি আলোর বিশালকায় ফলা হিমবাহ আকৃতির মেঘমালার ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে দূর দূরান্তে। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ায় কাঁধের সাথে আটকানো স্ট্র্যাপে টান পড়ল, দস্তানা পরা হাত দিয়ে হেলমেটের পোলারয়েড ভাইজর তুলে নিল পাইলট। চোখ কুঁচকে তাকাল সে, আবার একবার দেখে নিল টার্গেটকে।

তার অভিজ্ঞ বন্দুকবাজ চোখে কালো একটা বিন্দুর মত ধরা পড়ল প্লেনটা। মেঘ আর রোদের মাঝখানে আবছা ধূসর পর্দার গায়ে খুদে একটা পোকা। নিজের অজান্তেই প্লেনের কন্ট্রোল প্যানেলে হাত চলে গেল তার–সরাসরি টার্গেটের দিকে এগোতে চায় না।

প্রতি ঘণ্টায় পনেরোশো মাইল ছুটছে মিরেজ, সামনের কালো বিন্দুটা আশঙ্কাজনক দ্রুতগতিতে বড় হচ্ছে আকারে। খানিক পর টার্গেটের পরিচয় সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকল না। ছড়ানো পাঁচ আঙুলের আকৃতি নিয়ে উড়ছিল ঝাঁকটা, লীডারের দেখাদেখি বাকি চারটে প্লেনও ঘুড়ির মত গোপ্তা দিয়ে নিচে নামতে শুরু করল। টার্গেট প্লেনের পাঁচ হাজার ফিট ওপরে সিধে হলো মিরেজগুলো।

'উলফ, দিস ইজ ব্ল্যাক কুইন–উই আর ভিজ্যুয়াল, অ্যান্ড টার্গেট ইজ এ বোয়িং সেভেন-ফোর-সেভেন বেয়ারিং ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ মার্কিংস।'

'ব্ল্যাক কুইন, দিস ইজ উলফ, কনফর্ম টু টার্গেট, মেইনটেইন ফাইভ থাউজেন্ড ফিট সেপারেশন অ্যান্ড অ্যাভয়েড এনি থ্রেটনিং অ্যাটিচ্যুডস। রিপোর্ট এগেইন ইন

সিক্সটি সেকেন্ডস।'

মেজর মাসুদ রানার একজিকিউটিভ জেট তীরবেগে ছুটে চলেছে দক্ষিণ দিকে, একই দিকে শ্লথগতিতে এগোচ্ছে পেটমোটা ট্র্যান্সপোর্টটা। প্রতি মুহূর্তে দুটো প্লেনের মাঝখানে দূরত্ব বাড়ছে—জেটটা যখন তার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছুবে, সম্ভবত এক হাজার মাইল পিছিয়ে থাকবে দ্বিতীয়টা। তবে স্পীড কম হলেও হারকিউলিসের বৈশিষ্ট্য অন্যখানে—পৃথিবীর যে-কোন দুর্গম প্রান্তে, এবড়োখেবড়ো ছোট্ট স্ট্রিপে লোকজন আর ভারী ইকুইপমেন্ট নিয়ে ল্যান্ড করতে পারে ওটা। হকারের কাজ হলো সন্ত্রাসবাদীরা যেখানে তৎপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রানাকে সেখানে পৌঁছে দেয়া। আর আগে ভাগে পৌঁছে রানার কাজ হলো কৌশলে সন্ত্রাসবাদীদের কাছ থেকে সময় আদায় করা, যতক্ষণ অ্যাসল্ট টীম নিয়ে কার্ল রবসন না পৌঁছায়।

তবে যোগাযোগ রয়েছে দু'জনের মধ্যে, রানার সামনে সেন্ট্রাল টেলিভিশনের ছোট স্ক্রীনটা সারাক্ষণ আলোকিত, হারকিউলিসের মেইন হোল্ডের ছবি দেখা যাচ্ছে তাতে। কাছ থেকে চোখ তুললেই নিজের লোকদের দেখতে পাবে রানা, সবার পরনে শার্ক ওভারঅল। হাত-পা ছেড়ে দিয়ে শিথিল ভঙ্গিতে বসে আছে সবাই, কারও মধ্যেই আড়ষ্ট কোন ভাব নেই। এরাও সবাই অপেক্ষার কঠিন পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে বহুবার। সামনের দিকে ছোট একটা ডেস্কের পেছনে বসে রয়েছে কার্ল রবসন, কন্ডিশন রেড ঘোষণা করা হলে কি কি কাজ তাৎক্ষণিকভাবে সারতে হবে তার একটা দীর্ঘ তালিকা পরীক্ষা করছে সে। কন্ডিশন গ্রীনের পর কন্ডিশন রেডের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেলে ঘোষণাটা আসবে।

ক্লিক ক্লিক একজোড়া আওয়াজের সাথে সামান্য যান্ত্রিক শব্দ-গুঞ্জন শোনা গেল, রানার কমিউনিকেশন কনসোলের সেন্ট্রাল স্ক্রীনটা জ্যান্ত হয়ে উঠল, ড. ওয়ার্নারের ছবি পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠার আগেই ভেসে এল তাঁর ভারী, গমগমে কণ্ঠস্বর।

'কন্ডিশন রেড, রানা,' বললেন তিনি। সম্পূর্ণ শান্ত দেখল তাঁকে রানা, শিরায় শিরায় দ্রুতগতি পেল রক্তস্রোত, রোমাঞ্চকর শিহরণ বয়ে গেল সারা শরীরে। একজন সৈনিকের জন্যে ব্যাপারটা আনন্দের, এই মুহূর্তটির আশায় বছরের পর বছর অপেক্ষা করে থাকে তারা।

'দক্ষিণ আফ্রিকানরা আইডেনটিফাই করেছে জিরো-সেভেন-জিরোকে,' বলে চলেছেন ড. ওয়ার্নার। 'প্লেনটা পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড হলো তাদের আকাশ-সীমায় ঢুকেছে।'

'রেডিও কন্ট্যাক্ট?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'না।' বড়সড় মাথাটা নাড়লেন ড. ওয়ার্নার। 'ডাকাডাকি করেও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ধরে নিতে হবে টেরোরিস্টদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে প্লেনটা—কাজেই এখন থেকে এই ডেস্কেই থাকছি আমি যতক্ষণ না একটা বিহিত করা যায়।'

'কি ধরনের সহযোগিতা আশা করতে পারি আমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইতিমধ্যে বেশ ক'টা আফ্রিকান রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ করেছি, সম্ভাব্য সব রকম সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছে তারা–ওভার-ফ্লাইট, ল্যান্ডিং, রিফুয়েলিং ফ্যাসিলিটি, কোন সমস্যা হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকাও সহযোগিতা করবে। ওদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সাথে কথা বলেছি আমি।'

'ওদের আপনি কোন নির্দেশ দেননি?'

'বলেছি জিরো-সেভেন-জিরোকে যেন ওদের কোন এয়ারপোর্টে নামতে দেয়া না হয়,' বললেন ড. ওয়ার্নার। 'দক্ষিণ আফ্রিকায় ল্যান্ডিং ক্লিয়ার্যান্স না পেলে উত্তর দিকে অন্য কোন দেশে সরে যাবে টেরোরিস্টরা, ওদের আসল প্ল্যানও হয়তো তাই। দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে আমার ধারণা কি তুমি জানো, সবকিছুতে গোয়ার্তুমি করা স্বভাব ওদের–তবে এই ব্যাপারটায় ওরা বেশ ভালই সহযোগিতা করছে।'

দেরাজ থেকে কালো একটা নায়ার পাইপ বের করলেন ড. ওয়ার্নার, টোবাকো দিয়ে ভরলেন সেটা। শরীরের অন্যান্য অংশের মত, তাঁর হাত দুটোও মোটাসোটা, তবে আঙুলগুলো অস্বাভাবিক লম্বা আর চঞ্চল। তামাকের গন্ধটা কি রকম মিষ্টি মনে পড়ে গেল রানার।

দু'জনেই চুপ করে আছে, গভীর চিন্তায় মগ্ন। ড. ওয়ার্নারের ভুরু জোড়া সামান্য একটু কুঁচকে আছে, একমনে পাইপ টানছেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার তিনি মুখ তুললেন। 'ঠিক আছে, রানা–এবার শোনা যাক, তুমি কি ভাবছ।'

সদ্য লেখা পয়েন্টগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। 'টেরোরিস্টদের কাছ থেকে সম্ভাব্য চার রকম আচরণ আশা করছি আমরা, ড. ওয়ার্নার। যে আচরণই করুক, কিভাবে ওদের আমরা কাবু করব তারও চারটে ছক তৈরি করেছি। আঘাতটা জার্মান নাকি ইটালিয়ান স্টাইলে করবে...'

আধবোজা চোখে শুনে যাচ্ছেন ড. ওয়ার্নার, রানার প্ল্যান-প্রোগ্রামের ওপর তাঁর আস্থা প্রবল। টেরোরিস্টরা যদি ইটালিয়ান স্টাইলে আঘাত হানে, সেটা মোকাবিলা করা অপেক্ষাকৃত সহজ–সরাসরি নগদ টাকা চাইবে ওরা। আর জার্মান পদ্ধতি হলো, বন্দীমুক্তির দাবি জানাবে ওরা, রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান চাইবে। নিজেদের মধ্যে প্রায় এক ঘন্টা আলোচনা করল ওরা, তারপর বাধা পেল।

'গুড গড!' শুধু অতিমাত্রায় বিস্মিত হলে এ-ধরনের ভাষা ব্যবহার করেন ড. ওয়ার্নার। 'এখানে দেখছি আরেক দিকে মোড় নিচ্ছে ঘটনা...'

পূব দিকের আকাশ পথ বেছে নিল জিরো-সেভেন-জিরো, স্পীড কমল, অনেক নিচেও নেমে এল আগের চেয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকান এয়ারফোর্স কমান্ড হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল কি ঘটতে চলেছে।

জরুরী নির্দেশে সমস্ত এভিয়েশন ফ্রিকোয়েন্সি নিস্তব্ধ করে দেয়া হলো, উপর্যুপরি হাতুড়ির বাড়ির মত বারবার একই আদেশ করা হলো জিরো-সেভেন-জিরোকে, জাতীয় আকাশ সীমা ছেড়ে বেরিয়ে যাও। কোন সাড়া তো পাওয়া গেলই না, বরং জান স্মুট ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে দেড়শো নটিক্যাল

মাইল দূরে বোয়িংটার স্পীড আরও কমল, আরও নিচে নেমে নিয়ন্ত্রিত আকাশ-সীমার ভেতর চলে এল।

'ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ জিরো-সেভেন-জিরো দিস ইজ জান স্মুট কন্ট্রোল, ইউ আর এক্সপ্রেসলি রিফিউজড্ ক্লিয়ার‍্যান্স টু জয়েন দি সার্কিট। ডু ইউ রিড মি, জিরো-সেভেন জিরো?'

'ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ জিরো-সেভেন-জিরো দিস ইজ এয়ারফোর্স কমান্ড। ইউ আর ওয়ার্নড্ দ্যাট ইউ আর ইন ভায়োলেশন অভ ন্যাশনাল এয়ারস্পেস। ইউ আর অর্ডারড্ টু ক্লাইম্ব ইমিডিয়েটলি টু থারটি থাউজেন্ড ফিট অ্যান্ড টার্ন অন কোর্স ফর নাইরোবি।'

বোয়িং ইতিমধ্যে একশো নাটিক্যাল মাইলের মধ্যে চলে এসেছে, পনেরো হাজার ফিট থেকে আরও নেমে আসছে নিচের দিকে।

'ব্ল্যাক কুইন, দিস ইজ উলফ্। টেক দি টার্গেট আন্ডার কমান্ড অ্যান্ড এনফোর্স ডিপারচার ক্লিয়ার‍্যান্স।'

দেখার বিষয়, জোর করে জিরো-সেভেন-জিরোকে বিদায় করা যায় কিনা।

সবুজ আর খয়েরি রঙের লম্বা চকচকে মিরেজের দ্রুতগতি পতন শুরু হলো। কয়েক হাজার ফিট নেমে এসে বোয়িঙের লাল, সাদা, আর নীল নাকের সামনে সিধে হলো পাইলট, মাঝখানে দূরত্ব মাত্র একশো ফিট। পাইলট তার মিরেজের ডানা কাত করল, নির্দেশ দিচ্ছে–'আমাকে অনুসরণ করো।'

সেই একই কোর্সে, একই গতিতে এগোচ্ছে বোয়িং, পাইলট যেন কিছু দেখেনি বা বোঝেনি। থ্রটল একটু পিছিয়ে আনল মিরেজের পাইলট, মাঝখানের ব্যবধান কমে গিয়ে পঞ্চাশ ফিটে দাঁড়াল। আবার কাত হলো মিরেজের ডানা, রেট-ওয়ান টার্ন নিয়ে উত্তর দিকে এগোল পাইলট।

নিজের পথেই থাকল বোয়িং, জোহানেসবার্গের দিকে এগোচ্ছে।

দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে মাঝখানের ব্যবধান আরও কমিয়ে আনল মিরেজের পাইলট। বোয়িঙের সরাসরি পিছনে না থেকে একপাশে সরে এল একটু, পিছিয়ে এসে জিরো-সেভেন-জিরোর ককপিটের পাশে চলে এল। ঘাড় ফিরিয়ে পঁয়তাল্লিশ ফিট দূরে তাকাল সে। 'উলফ্, দিস ইজ ব্ল্যাক কুইন ওয়ান। টার্গেটের ফ্লাইট ডেকের ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ককপিটে অতিরিক্ত একজন রয়েছে। একটা মেয়ে। মনে হচ্ছে তার হাতে একটা মেশিন পিস্তল।'

ইন্টারসেপটর প্লেনটাকে দেখার জন্যে ঘাড় ফেরাল দু'জন পাইলট, হাড়ের মত সাদা হয়ে গেছে চেহারা। বাঁ দিকের সীটটার পিছন থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল মেয়েটা, কুৎসিত দর্শন কালো অস্ত্রটা স্যালুটের ভঙ্গিতে কপালের কাছে তুলল। মিরেজ পাইলটের চোখে চোখ রেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল সে, এত কাছ থেকে যে, তার ঝকঝকে সাদা দাঁত পরিষ্কার দেখতে পেল পাইলট।

'–যুবতী একটা মেয়ে, সোনালি চুল–,' রিপোর্ট করল মিরেজ পাইলট। 'সুন্দরী–খুবই সুন্দরী।'

'ব্ল্যাক কুইন ওয়ান, দিস ইজ উলফ্। পজিশন ফর হেড-অন অ্যাটাক।'

সাথে সাথে সগর্জনে সামনের দিকে ছুটল মিরেজ, চোখের পলকে উঠে গেল

ওপর দিকে, বিশাল অর্ধবৃত্ত রচনা করে পাঁচ আঙুলের আকৃতি নিল গোটা ঝাঁক।

'উলফ, উই আর ইন পজিশন ফর এ হেড-অন অ্যাটাক।'

'ব্ল্যাক কুইন ফ্লাইট। সিমিউলেট। অ্যাটাক ইন দি অ্যাসটার্ন। ফাইভ সেকেন্ড ইন্টারভ্যালস। মিনিমাম সেপারেশন। ডু নট, আই সে এগেন, ডু নট ওপেন ফায়ার। দিস ইজ এ সিমিউলেটেড অ্যাটাক। আই সে এগেন, দিস ইজ এ সিমিউলেটেড অ্যাটাক।'

'ব্ল্যাক কুইন আন্ডারস্ট্যান্ডস সিমিউলেটেড অ্যাটাক।' মিরেজ এক্স.আই. নাক ঘুরিয়ে নিয়ে ডাইভ দিল, স্কেলের কাঁটা নড়ে ওঠার সাথে সাথে বিদ্যুৎগতিতে ছুটল, সোনিক ব্যারিয়ার ভেঙে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল তার মতিগতি।

সাত মাইল দূরে থাকতেই ওটাকে দেখতে পেল স্টিফেন জেংকিনস। 'জেসাস,' চেঁচিয়ে বলল সে। 'দিস ইজ রিয়েল!' ঝট করে সামনের দিকে ঝুঁকল সে, বোয়িঙের ম্যানুয়েল কন্ট্রোল নিজের হাতে নেবে। এতক্ষণ ইলেকট্রনিক ফ্লাইট ডিরেক্টর প্লেন চালাচ্ছিল।

'না, যেমন আছে তেমনি থাক!' এই প্রথম গলা চড়াল জেসিকা। 'হোল্ড ইট!' হাঁ করা জোড়া মাজল্ সহ শট পিস্তলটা ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের দিকে তাক করল সে। 'এখন আমাদের কোন নেভিগেটরের দরকার নেই।'

স্থির পাথর হয়ে গেল পাইলট, তীরবেগে সোজা ছুটে আসছে মিরেজ। প্রতি মুহূর্তে আকারে বড় হচ্ছে ওটা। এক সময় মনে হলো গোটা উইন্ডস্ক্রীন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। সম্ভাব্য শেষ মুহূর্তে নাকটা সামান্য একটু উঁচু হলো, মাথার ওপর দিয়ে সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল মিরেজ, মনে হলো দুটো প্লেনের মাঝখানে বড়জোর এক ফিট ব্যবধান ছিল। মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো না বটে, কিন্তু সুপারসোনিক আলোড়ন এত বড় বোয়িংটাকেও তীব্র একটা ঝাঁকি দিয়ে গেল।

'আরও একটা আসছে!' আর্তনাদ করে উঠল পাইলট।

'আমিও এখানে আছি,' হুমকির সুরে বলল জেসিকা, ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের ঘাড়ে এত জোরে মাজল্ চেপে ধরেছে সে যে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বেচারা, কপালটা ঠেকে রয়েছে কমপিউটার কনসোলের কিনারায়। কলারের ওপর নগ্ন ঘাড়ের ম্লান চামড়া ছিলে গেছে, সরু একটা রক্তের ধারা শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে পিঠের দিকে।

মিরেজগুলো একটার পর একটা আক্রমণ চালাল, সুপারসোনিক আলোড়ন বারবার ঝাঁকি দিয়ে গেল জিরো-সেভেন-জিরোকে। গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে খালি হাতে একটা র‍্যাকের কিনারা ধরে নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করছে জেসিকা, কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও এঞ্জিনিয়ারের ঘাড় থেকে জোড়া মাজল্ সরাল না। 'আমার কথার নড়চড় হবে না,' বারবার বলল সে। 'ওকে আমি খুন করব, সত্যি খুন করব।' সবাই ওরা আরোহীদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে, কেবিন আর ককপিটের মাঝখানে বাল্কহেড থাকায় ভোঁতা আর অস্পষ্ট শোনাল কান্নাগুলো।

এক সময় শেষ মিরেজটাও মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল।

'চেষ্টা করে দেখল আর কি,' ঠোঁট বাঁকা করে বিদ্রূপের হাসি হাসল জেসিকা, পিছিয়ে ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে এক পা সরে গেল সে। 'আর আসবে

না।' এঞ্জিনিয়ার বেচারা মাথাটা কাত করে শার্টের আস্তিন দিয়ে ঘাড়ের রক্ত মুছল। 'আসবে না, কারণ এখন আমরা ওদের নিয়ন্ত্রিত এয়ারস্পেসের অনেক ভেতরে ঢুকে পড়েছি।' হাত লম্বা করে দিয়ে সামনের দিকটা দেখাল সে। 'দেখো!'

মাটি থেকে মাত্র পাঁচ হাজার ফিট ওপরে রয়েছে জিরো-সেভেন-জিরো, কিন্তু হালকা কুয়াশা থাকায় দিগন্তরেখা তেমন স্পষ্ট নয়। ডানদিকে আবছাভাবে একটা টাওয়ার দেখা গেল–ওটা কেম্পটন পার্কে পাওয়ার স্টেশন, কুলিং টাওয়ার। আরও কাছাকাছি বিষাক্ত হলুদ প্রান্ত–সমতল আর নিষ্প্রাণ। খনির সমস্ত আবর্জনা এই প্রান্তরে নিয়ে এসে ফেলা হয়। এই বিশাল এলাকাটাকে বাদ দিয়ে, চারধারে ঘন লোকবসতি গড়ে উঠেছে। হাজার হাজার জানালার কাঁচ সকালের রোদ লেগে ঝলসে উঠল।

আরও কাছে লম্বা, সরল, নীলচে বিস্তৃতি দেখা গেল–জান স্মুট এয়াপোর্টের মেইন রানওয়ে।

'সোজা একুশ নম্বর রানওয়েতে চলুন,' নির্দেশ দিল জেসিকা।

'অসম্ভব...'

'কথা নয়,' ধমক দিল মেয়েটা। 'এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল নিশ্চয়ই পরিষ্কার করে রেখেছে সার্কিট। ওরা আমাদের থামাতে পারবে না জানে।'

'থামাতে পারবে, এবং থামাতে যাচ্ছে,' জবাব দিল জেংকিনস। 'রানওয়ে অ্যাপ্রনের দিকে তাকান একবার।'

এত কাছে চলে এসেছে ওরা, এক এক করে পাঁচটা ফুয়েল টেন্ডার গোণা গেল; প্রতিটি ট্যাংকে শেল কোম্পানীর প্রতীক চিহ্ন আঁকা রয়েছে।

'রানওয়েতে ব্যারিকেড তৈরি করছে ওরা!'

শুধু ট্যাংকার নয়, সাথে উজ্জ্বল লাল ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটা আর ধবধবে সাদা দুটো অ্যাম্বুলেন্সও রয়েছে। রানওয়ের কিনারা ধরে ছুটে আসছিল ওগুলো, তারপর মাঝখানের সাদা রেখায় কয়েকশো গজ পর পর দাঁড়িয়ে পড়ল একেকটা গাড়ি।

'ল্যান্ড করা সম্ভব নয়,' জানিয়ে দিল পাইলট।

'অটোমেটিক বাদ দিয়ে হাতে চালান প্লেন,' কঠিন আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠল জেসিকার কণ্ঠস্বর। 'আমার নির্দেশ বদলায়নি। ল্যান্ড করার প্রস্তুতি নিন।'

এক হাজার ফিটে নেমে এসেছে বোয়িং, আরও নামছে। একুশ নম্বর রানওয়ের দিকে ছুটছে ওরা। নাক বরাবর সোজা লাল আলোগুলো ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির মাথায় ঘুরছে।

'আমাকে মাফ করতে হবে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জেংকিনস। 'নামতে চেষ্টা করলে সবাই আমরা মারা পড়ব।' তার চেহারায় কোন ভয় বা দ্বিধা নেই। 'ওগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে এখান থেকে চলে যাব আমি।'

'ঘাসের ওপর নামুন!' মরিয়া হয়ে উঠল জেসিকা। 'রানওয়ের ডান দিকে খোলা মাঠ, ওখানে নামব আমরা।'

জেংকিনস যেন শুনতেই পায়নি, সামনের দিকে ঝুঁকে ঠেলে সামনে বাড়িয়ে দিল থ্রটল। আকস্মিক শক্তি পেয়ে গর্জে উঠল এঞ্জিনগুলো, নাক উঁচু করে

তীরবেগে ওপরে উঠতে শুরু করল জিরো-সেভেন-জিরো।

উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার, সারা শরীর উত্তেজনায় আড়ষ্ট। নগ্ন ঘাড়ের ওপর জোড়া মাজলের লালচে দাগ এখনও অম্লান। ডান হাত দিয়ে ডেস্কের কিনারা খামচে ধরল সে, আঙুলের ডগাগুলো সাদা হয়ে গেল।

আড়ষ্ট সেই হাতটার কব্জিতে পিস্তলের মাজল চেপে ধরল জেসিকা। কখন সে নড়ল টের পায়নি কেউ। বদ্ধ ককপিটের ভেতর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ হলো, মনে হলো কানের পর্দা ছিঁড়ে গেছে। লাফ দিয়ে জেসিকার মাথার প্রায় কাছাকাছি উঠে এল পিস্তলটা, পোড়া বারুদের গন্ধ ঢুকল নাকে।

চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে ডেস্কের ওপর তাকিয়ে থাকল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার।

ডেস্কের ধাতব মাথা ভেদ করে গর্ত তৈরি হয়েছে, চায়ের একটা কাপ গলে যাবে, গর্তের কিনারা এবড়োখেবড়ো আর সাদা জরির মত চকমকে।

বিস্ফোরণে এঞ্জিনিয়ারের কব্জি নিখুঁতভাবে দু'টুকরো হয়ে গেছে, বিচ্ছিন্ন অংশটা সামনের দিকে ছিটকে গিয়ে পাইলটদের জোড়া সীটের মাঝখানে পড়েছে, থ্যাতলানো মাংসের ভেতর থেকে বেরিয়ে রয়েছে ভাঙাচোরা হাড়। পদদলিত, জ্যান্ত, বোবা পোকার মত মোচড় খাচ্ছে সেটা।

'ল্যান্ড!' হিসহিস করে বলল মেয়েটা। 'তা না হলে পরের গুলিটা ওর মাথায় ঢুকবে।'

'ইউ ব্লাডি মনস্টার!' আর্তনাদ করে উঠল স্টিফেন জেংকিনস, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে এঞ্জিনিয়ারের বিচ্ছিন্ন হাতের দিকে তাকিয়ে আছে।

'লোকটা যদি মারা যায় সম্পূর্ণ আপনার দোষে মারা যাবে।'

আঙুল আর তালুহীন হাতটা যেন আপনা থেকে সেঁটে এল গায়ের সাথে, ক্ষতটা পেটে ঠেকিয়ে সামনের দিকে যতটা সম্ভব ঝুঁকল এঞ্জিনিয়ার, উরু আর পেটের মাঝখানে চাপা পড়ে গেল হাতটা। গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না, দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা দম ছাড়ার সময় কেঁপে কেঁপে উঠল সারা শরীর, কালচে আর বিকৃত হয়ে উঠেছে মুখ।

বিচ্ছিন্ন হাতটা থেকে দৃষ্টি যেন ছিঁড়ে সরিয়ে আনল ক্যাপটেন জেংকিনস, আবার সামনের দিকে তাকাল। সরু ট্যাক্সিওয়ে আর রানওয়ে মার্কার-এর মাঝখানে ঘাস মোড়া বিশাল খোলা মাঠ। হাঁটু সমান উঁচু হবে ঘাসগুলো, তবে আন্দাজ করা যায় ঘাসের নিচে মাটি কমবেশি সমতলই হবে।

শান্তভাবে থ্রটল পিছিয়ে আনল ক্যাপটেন, এঞ্জিনের গর্জন কমে এল, নিচু হলো প্লেনের নাক। মেইন রানওয়ের দিকে এগোচ্ছে বোয়িং, গাড়ির ড্রাইভারদের এখুনি বুঝতে দিতে চায় না তার উদ্দেশ্য। 'ডাইনী,' নিঃশ্বাসের সাথে বিড়বিড় করে বলছে সে। 'মড়াখাকী!'

একেবারে সম্ভাব্য শেষ মুহূর্তে সামান্য দিক বদল করল সে, খোলা মাঠের দিকে তাক করল প্লেনের নাক। একটু পর পিছিয়ে নিয়ে এসে লক করে দিল থ্রটল। ঝপ্ করে নেমে এল বোয়িং। গতি এরচেয়ে কমে গেলে শূন্যে থেমে যাবে। ঈশ্বরের নাম জপতে জপতে ঘাসের দিকে নামাতে শুরু করল জিরো-সেভেন-

জিরোকে।

প্রথম ঝাঁকিটা তেমন জোরাল হলো না, কিন্তু তারপরই বিরতিহীন লাফ দিতে দিতে নিয়ন্ত্রণহীন ধেয়ে চলল জিরো-সেভেন-জিরো। শেষ রক্ষা বোধহয় সম্ভব হলো না, কাত হয়ে পড়ল বোয়িং, উল্টে যায় যায় অবস্থা। শক্ত করে ধরে নোজ হুইলটা এমনভাবে ঘোরাচ্ছে ক্যাপটেন, মনে হচ্ছে প্যানেল থেকে ওটাকে ভেঙে বের করে আনতে চাইছে। ওদিকে তার কো-পাইলট বোয়িঙের সবগুলো দৈত্যাকার এঞ্জিন রিভার্স সুইচ টিপে চালিয়ে দিয়েছে, মেইন ল্যান্ডিং গিয়ার ব্রেকে পা চেপে ধরে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে সে।

স্টারবোর্ড ডানার ডগা থেকে অল্প দূরে দেখা গেল ফায়ার এঞ্জিন আর ট্যাংকারগুলোকে, স্যাৎ করে পিছিয়ে গেল। ড্রাইভার আর সহকারীদের একেবারে কাছ থেকে এক পলকের জন্যে দেখা গেল, স্তম্ভিত বিস্ময়ে সবার চেহারা সাদাটে হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে কমে এল গতি, নোজ হুইল মাটি স্পর্শ করল। আবার কয়েকটা ঝাঁকি খেলো বোয়িং। ইঁট দিয়ে তৈরি একটা বিল্ডিঙের কাছাকাছি চলে এল সেটা, ওই বিল্ডিঙে অ্যাপ্রোচ আর ল্যান্ডিং বীকন বসানো হয়েছে, মেইন রাডার স্থাপনা সহ।

সময় তখন সকাল সাতটা পঁচিশ মিনিট। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরো।

চার

'কোন বাধাই ওরা মানেনি,' শান্ত কণ্ঠে বললেন ড. ওয়ার্নার, 'নেমে পড়েছে। এ থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, দক্ষিণ আফ্রিকাই ওদের ফাইনাল ডেসটিনেশন ছিল।'

'জার্মান স্টাইল-,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে ওদের।'

'দুঃখও হয়, বুঝলে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন ড. ওয়ার্নার। কেন দুঃখ হয় তা ব্যাখ্যা করার আগে পাইপে দু'বার টান দিলেন তিনি। 'ওরা সবাই একটা নীতিতে বিশ্বাসী-ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে। কোন বিশেষ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে নিবেদিত প্রাণ।'

'ব্যাপারটা জটিল, ড. ওয়ার্নার,' বলল রানা, একটু যেন কঠোর হয়ে উঠল ওর চেহারা। 'নীতি বলুন, মহৎ উদ্দেশ্য বলুন, যারা নিরীহ মানুষকে জিম্মি রেখে কারও কাছ থেকে কিছু আদায় করতে চায়, তাদের সমর্থন করা যায় না। দাবি আদায়ের আরও তো অনেক উপায় আছে।'

'আমি তোমার সাথে সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু তার পরও কথা থেকে যায়।' ড. ওয়ার্নারের চোখে আগ্রহের ঝিলিক, বিষয়টা নিয়ে রানার সাথে তর্ক করতে ভাল লাগছে তাঁর। 'দাবি আদায়ের আরও অনেক পথ আছে বটে, কিন্তু সেগুলোয় কাজ কতটুকু হয় তা-ও ভেবে দেখতে হবে। কাজ হয় না বলেই তো টেরোরিস্টরা চরম

পন্থা বেছে নিতে বাধ্য হয়। কোনটা সন্ত্রাসবাদ কোনটা নয়, পার্থক্য করা সত্যি খুব কঠিন, তাই না? তোমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার আর আল বদরদের রাস্তায় পেয়ে পিটিয়ে মারোনি?'

'সেটা যুদ্ধ ছিল...'

'জিরো-সেভেন-জিরো যারা হাইজ্যাক করেছে তারাও সম্ভবত মনে করছে তারা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে-।'

'নিরীহ লোকদের সাথে?'

'যুদ্ধে জেতাটাই কি বড় কথা নয়? তাছাড়া, সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থ যদি লংঘিত হয়, ক্ষতি কি তাতে?' তারপরই হেসে ফেললেন ড. ওয়ার্নার। 'আমার কথা শুনে মনে হতে পারে টেরোরিস্টদের সমর্থন করছি আমি। তা করছি না, তুমিও জানো। কিন্তু ওরা সতেজপ্রাণ যুবসম্প্রদায়ের একটা অংশ, তাই না? দুঃখ এখানেই যে অনন্ত সম্ভাবনাময় জীবনের অধিকারী ওরা, অথচ মৃত্যু আর ধ্বংসের ঝুঁকি নিয়ে নিজেদেরকে শেষ করে দিতে দ্বিধা নেই।'

'ওদের বোঝা উচিত ভুল পথে রয়েছে ওরা, না বুঝলে তার খেসারত তো দিতেই হবে,' বলল রানা।

'কোনটা ভুল পথ, রানা?' হালকা সুরে জিজ্ঞেস করলেন ড. ওয়ার্নার। 'সর্বহারা মানুষের অধিকার আদায়ে যারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে চায়, তারা ভুল পথে রয়েছে? ধর্মের দোহাই পেড়ে যারা জেহাদ ঘোষণা করেছে অতীতে, তাহলে তাদের কি বলবে তুমি? কেনিয়ার মাও মাও আন্দোলনের কথা না হয় বাদ দাও, বাদ দাও ইদানীং আয়ারল্যান্ডে বা পাঞ্জাবে যা ঘটছে, কিন্তু ফ্রেঞ্চ বিপ্লবের সময় যা ঘটেছে তার কি ব্যাখ্যা? তুমি জানো ক্যাথলিক বিশ্বাস প্রচার করার সময় মানুষের ওপর কি নির্মম অত্যাচার চালানো হয়েছিল? নৈতিকতার বিচারে ওগুলোও কি সঠিক ছিল না?'

'আমি বলব ওগুলো হয়তো যুক্তিগ্রাহ্য ছিল, কিন্তু নিন্দনীয়ও বটে। সন্ত্রাসবাদ নৈতিকতার বিচারে ন্যায্য হতে পারে না, তার ধরন যাই হোক।'

'ঈশ্বর স্বয়ং টেরোরিস্ট, তাই না, রানা? তিনি আমাদের জন্যে নরক তৈরি করে রেখেছেন। তাঁর সৃষ্ট মাটির মানুষ আমরাও সবাই কমবেশি টেরোরিস্ট। আইনটা কি? ছেলের কাছে বাবা কি? আইন, শাসন, নিষেধ, ধর্ম যদি ন্যায্য হয়, অবিচারে ভরা সমাজে রাজনৈতিকভাবে যারা অত্যাচারিত, সম্পদের ন্যায্য অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল বলে মার খাচ্ছে, তাদের বিদ্রোহ কেন অন্যায় বা অন্যায্য হবে? যারা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে গলা ফাটাচ্ছে, তাদের গলা টিপে ধরা...'

অস্বস্তিবোধ করছে রানা, চেয়ারে নড়েচড়ে বসল। 'আপনি একটার সাথে আরেকটা মিলিয়ে ফেলছেন, ড. ওয়ার্নার। সুস্থ যে-কোন মানুষ ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলন অবশ্যই সমর্থন করবে, কিন্তু সেই সাথে দেখতে হবে নিরীহ মানুষকে যেন চরম মূল্য দিতে না হয়। বিবেকহীন, নিষ্ঠুর, নগ্ন সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে আজ পর্যন্ত কোন মহৎ উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়নি।'

'যায়নি, মানলাম। কিন্তু যাবে না, তারও তো কোন কথা নেই। টেরোরিস্টরা

ভুল না করলে তারাও সফল হতে পারে। আমি দুঃখিত, রানা,' চেয়ারে হেলান দিয়ে হাসলেন ড. ওয়ার্নার। 'মাঝে মধ্যে কনফিউজড হয়ে পড়ি। কিন্তু ভুলতে পারি না যে টেরোরিস্ট হবার চেয়ে দয়াময় উদার হওয়া তোমার আমার মত লোকের জন্যে অনেক বেশি নিরাপদ আর সুবিধেজনক। আমাদের মত নীতি নিয়ে আপোষ করে না ওরা, উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিধায় ভোগে না। থাক, এবার থামি।' পাইপে ঘন ঘন টান দিলেন তিনি। 'দু'এক ঘণ্টা তোমাকে আর বিরক্ত করব না, নতুন মাত্রা যেটা যোগ হয়েছে সেটা মনে রেখে প্ল্যান তৈরি করো। শেষে শুধু একটা কথা বলি–আমার মন বলছে, ব্যাপারটা মেটার আগে বিবেকের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে আমাদের।'

'ডানদিকে,' শান্তভাবে বলল জেসিকা, পরমুহূর্তে ঘাস মোড়া মাটি ছেড়ে ট্যাক্সিওয়ে-তে উঠে পড়ল বোয়িং। প্লেনটার ল্যান্ডিং গিয়ার অক্ষত রয়েছে, সাবলীল ভাবে ঘুরছে সবগুলো চাকা।

মাটিতে নামা কোন জাম্বো জেটের ফ্লাইট ডেকে আগে কখনও থাকেনি মেয়েটা, ককপিট মাটি থেকে এতটা উঁচু দেখে বিস্মিত হলো সে, সেই সাথে অসহায় আর বিচ্ছিন্ন একটা অনুভূতি জাগল মনে। 'আবার বাঁ দিকে,' নির্দেশ দিল সে। ঘুরে গিয়ে মেইন এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের দিকে পিছন ফিরল বোয়িং, দক্ষিণ প্রান্তে রানওয়ের শেষ মাথার দিকে এগোল। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের সমতল ছাদে অবজারভেশন ডেক, ইতিমধ্যে ডেকটা কৌতূহলী দর্শকে ভরে গেছে। তবে অ্যাপ্রনের সমস্ত তৎপরতা থামিয়ে দেয়া হয়েছে। টেন্ডার আর অ্যাম্বুলেন্স ছেড়ে চলে গেছে সবাই, গোটা রানওয়েতে একজন লোকও নেই।

'ওখানে পার্ক করুন।' হাত তুলে ফাঁকা একটা জায়গা দেখাল জেসিকা, কাছের বিল্ডিংটা থেকে চারশো গজ দূরে, টার্মিনাল আর সার্ভিস হ্যাঙ্গারের মাঝখানে। হ্যাঙ্গারের পাশে মেইন ফুয়েল ডিপো রয়েছে। 'ইন্টারসেকশনে থামাবেন।'

গম্ভীর এবং চুপচাপ, শুধু নির্দেশ মেনে যাচ্ছে ক্যাপটেন। হঠাৎ সীটের ওপর একটু ঘুরে বসল সে। 'ওকে এ অবস্থায় ফেলে রাখা যায় না, একটা অ্যাম্বুলেন্স ডেকে পাঠিয়ে দেয়া দরকার।'

কো-পাইলট আর একজন স্টুয়ার্ডেস ধরাধরি করে গ্যালির মেঝেতে শুইয়ে দিয়েছে ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারকে, ফ্লাইট ডেকের দরজার ঠিক সামনে। রক্ত বন্ধ করার জন্যে টেবিল ন্যাপকিন দিয়ে ক্ষতটা বেঁধেছে ওরা। তাজা রক্ত আর ঘামের সাথে বাতাসে এখনও মিশে রয়েছে বারুদের গন্ধ।

'এই প্লেন থেকে কেউ কোথাও যাচ্ছে না।' মাথা নাড়ল জেসিকা। 'এরই মধ্যে আমাদের সম্পর্কে অনেক বেশি জেনে ফেলেছে ও।'

'এ কি শোনালে, ঈশ্বর! কিন্তু ওর চিকিৎসা দরকার!'

'চিকিৎসার অভাব হবে না,' হেসে উঠে বলল জেসিকা। 'তিনশো ডাক্তার রয়েছে প্লেনে। দুনিয়ার সেরা ওরা, তাই না? দু'জন চলে আসতে পারে, দেখে যাক ওকে।' ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের রক্তাক্ত ডেস্কের কিনারায় বসে পা ঝুলিয়ে দিল সে,

হাত বাড়িয়ে এক ঝট্কায় অন করল ইন্টারনাল মাইক্রোফোন। রাগের মধ্যেও ব্যাপারটা লক্ষ করল স্টিফেন জেংকিনস, মেয়েটার দ্বিধাহীন আচরণ একটা জিনিসই প্রমাণ করে, জটিল কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা আছে তার। বুদ্ধি তো রাখেই, ভাল ট্রেনিংও পেয়েছে।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, আমরা জোহানেসবার্গ এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছি। এখানে আমরা অনেকক্ষণ থাকব-হতে পারে কয়েক দিন বা কয়েক হপ্তা। সময় যত গড়াবে ততই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ব এবং আমাদের ধৈর্য ফুরিয়ে আসবে, কাজেই আপনাদের আমি সতর্ক করে দিয়ে বলছি, যে-কোন রকম অবাধ্যতা কঠোরভাবে দমন করা হবে। এরই মধ্যে আমাদের কাজে একবার বাধা দেয়া হয়েছে, ফলে গুলি খেতে হয়েছে ক্রুদের একজনকে। আঘাত গুরুতর, মারা যেতে পারে। এ-ধরনের ঘটনা আরও ঘটুক, আমরা তা চাই না। কিন্তু সেই সাথে আপনাদের জানা দরকার যে আমি বা আমার অফিসাররা গুলি করতে ইতস্তত করব না, এমনকি আপনাদের মাথার ওপর গ্রেনেডগুলোও ফাটিয়ে দিতে পারি-যদি প্রয়োজন হয়।'

থামল জেসিকা, নির্বাচিত দু'জন ডাক্তারকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের দু'পাশে হাঁটু গেড়ে বসল তারা। থরথর করে কাঁপছে এঞ্জিনিয়ার, সাদা শার্ট তাজা রক্তে ভিজে জবজব করছে। জেসিকার চেহারায় কোন দয়া বা সহানুভূতি নেই, আবার যখন কথা বলল কণ্ঠস্বর আগের মতই শান্ত এবং হালকা শোনাল। 'আমার দু'জন অফিসার প্যাসেজ ধরে এগোবে, আপনাদের পাসপোর্টগুলো সংগ্রহ করবে তারা। যে যার পাসপোর্ট বের করে রাখুন, প্লীজ।'

ঝট্ করে আড়চোখে দূরে তাকাল সে, চোখের কোণে কি যেন নড়তে দেখেছে। সার্ভিস হ্যাঙ্গারগুলোর পিছন থেকে এক লাইনে চারটে আর্মারড় কার বেরিয়ে এল। ফ্রেঞ্চ প্যানহার্ড ওগুলো, এখানে সংযোজন করা হয়েছে। হিঁচড়ে টানার উপযোগী লম্বা টায়ার, গর্তের ভেতর সচল কামান বসানোর মঞ্চ, কামানের লম্বা ব্যারেল, সব পরিষ্কার দেখা গেল। ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল জেসিকার, ওদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। সাবধানে ঘুরল আর্মারড় ভেহিকেলগুলো, বোয়িং থেকে তিনশো গজ দূরে দাঁড়াল চারটে পয়েন্টে-প্লেনের ডানা বরাবর দুটো, একটা লেজের দিকে, অপরটা নাকের সামনে-ঘেরাও করে ফেলল জিরো-সেভেন-জিরোকে, লম্বা কামানের ব্যারেলগুলো প্লেনের দিকে তাক করা।

সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে জেসিকা, তার দিকে এগিয়ে এল একজন ডাক্তার। ছোটখাট মানুষটা, মাথায় উঁকি দিচ্ছে টাক, খুব সাহসী।

'ওকে এই মুহূর্তে হাসপাতালে পাঠাতে হবে।'

'সে প্রশ্নই ওঠে না।'

'এটা একটা মানবিক প্রশ্ন, উঠেই আছে। লোকটার জীবন বিপন্ন।'

'জীবন আমাদের সবার বিপন্ন, ডাক্তার।' এক মুহূর্ত থেমে কথাটা হজম করবার সময় দিল জেসিকা। 'কি কি দরকার আপনার তার একটা তালিকা দিন আমাকে। চেষ্টা করে দেখতে পারি পান কিনা।'

'ল্যান্ড করার পর ষোলো ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, অথচ মাত্র একবার যোগাযোগ করেছে ওরা।' জ্যাকেট খুলে ফেলেছেন ড. ওয়ার্নার, ঢিল করেছেন টাইয়ের নট, বাকি আর কিছু দেখে বোঝার উপায় নেই রাত জাগার ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করেছে। মাত্র একবার যোগাযোগ করে দুটো অনুরোধ করেছে সন্ত্রাসবাদীরা–ইলেকট্রিক মেইন্স-এর সাথে পাওয়ার লিঙ্ক-আপ আর মেডিকেল সাপ্লাই চেয়েছে।

টিভির পর্দায় ফুটে ওঠা ছবির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সাপ্লাইয়ের ধরন দেখে আপনার ডাক্তাররা কি ভাবছেন?'

'মনে হচ্ছে গুলি খেয়ে আহত হয়েছে কেউ। এ-বি পজিটিভ রক্ত চেয়েছে ওরা, দুর্লভ একটা গ্রুপ। ক্রুদের সার্ভিস রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে, অন্তত একজনের রক্তের গ্রুপ এ-বি পজিটিভ। দশ লিটার প্লাসমালাইট বি, রক্ত দেয়ার একটা সেট আর সিরিঞ্জ, মরফিন আর ইন্টারভেনাস পেনিসিলিন, টিটেনাস টক্সয়েড–স্ ওগুলোই গুরুতর আহত লোকের চিকিৎসায় লাগে।'

'মেইন পাওয়ারের সাথে বোয়িঙের সংযোগ দেয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ, এয়ার-কন্ডিশনিং ছাড়া চারশো লোক এতক্ষণে দম আটকে মারা যেত। এয়ারপোর্ট কর্মীরা একটা কেব্‌ল্ টেনে নিয়ে গিয়ে এক্সটারনাল সকেটে প্লাগ ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্লেনের সবগুলো সাপোর্ট সিস্টেম–গ্যারিল হিটিং সহ–পুরোপুরি চালু রয়েছে।'

'তারমানে যে-কোন সময় সুইচ অফ করে দিতে পারি আমরা।' ডেস্কে রাখা প্যাডের ওপর পয়েন্টটা লিখল রানা। 'কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন দাবি জানানো হয়নি? নেগোশিয়েটর হিসেবে কারও নামও প্রস্তাব করেনি?'

'না। মনে হচ্ছে এ-ধরনের পরিস্থিতিতে দর কষাকষির কৌশল ভালই জানা আছে ওদের। এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ভাবসাব ভাল ঠেকছে না।'

কি রকম?'

'কমান্ডো পাঠিয়ে বোয়িংটাকে দখল করতে চাইছে ওরা। আমেরিকান আর ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর চাপ সৃষ্টি করে কোনমতে ঠেকিয়ে রেখেছেন ওদের।'

রানার শিরদাঁড়া বেয়ে আতঙ্কের হিম একটা শিহরণ নেমে এল। 'সে-ধরনের কিছু ঘটতে দিলে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে, ড. ওয়ার্নার,' তাড়াতাড়ি বলল ও।

'ভেবেছ আমি বুঝি না? জান্ স্মুটে উড়ে আসতে আর কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

'সাত মিনিট আগে জাম্বেজি নদী পেরিয়ে এসেছি,' উইন্ডস্ক্রীনের দিকে ঝুঁকে নিচে তাকাল রানা, কিন্তু কুয়াশার জন্যে মাটি পর্যন্ত দৃষ্টি গেল না। 'দু'ঘণ্টা দশ মিনিট লাগবে, কিন্তু আমাদের সাপোর্ট সেকশন তিন ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পিছিয়ে আছে।'

'ঠিক আছে, রানা। দেখি ওদিকে ওরা কি করছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কেবিনেট মীটিং ডেকেছে, আমেরিকান এবং ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডরও উপস্থিত থাকছেন সেখানে, অবজারভার এবং অ্যাডভাইজার হিসেবে।'

রানা বলল, 'মীটিং শেষ হবার আগেই ওদের সাথে আপনার যোগাযোগ করা

দরকার। জিজ্ঞেস করুন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টিটেরোরিজম অর্গানাইজেশন নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তা কি ভুলে গেছে ওরা?'

'অবশ্যই জিজ্ঞেস করব,' মৃদু হাসলেন ড. ওয়ার্নার। 'তোমাকে জানানোর দরকার, কন্ডিশন ইয়েলো ঘোষণা করার অনুমতি পেয়ে গেছি আমি।' কন্ডিশন ইয়েলো মানে কাজে বাধা পেলে খুন করার সিদ্ধান্ত, ঘোষণাটা সংগঠনের চেয়ারম্যান মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে অনমোদন করিয়ে নিতে হয়। 'তবে,' বলে চলেছেন ড. ওয়ার্নার, 'কন্ডিশন ইয়েলো আমি সম্ভাব্য শেষ উপায় হিসেবে ব্যবহার করব। প্রথমে আমি ওদের দাবিগুলো শুনতে চাই, বিবেচনা করে দেখতে চাই–সেদিক থেকে ভাবলে, ওদের সাথে সহযোগিতা করার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি আমরা।'

অনেক কথাই বলছেন ড. ওয়ার্নার, মন দিয়ে শুনছেও রানা, কিন্তু প্রতিটি বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারছে না। অস্বস্তি গোপন করার জন্যে মুখ নিচু করে হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে থাকল ও। কথা বলল মৃদুকণ্ঠে, 'টেরোরিস্টদের বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেয়ার অর্থ হবে অন্যান্য গ্রুপগুলোকে আঘাত হানতে উৎসাহিত করা...'

'কন্ডিশন ইয়েলোর অনুমতি আমার হাতে তো থাকছেই,' একটু যেন তিক্ত শোনাল ড. ওয়ার্নারের কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু লাইসেন্স পেলেই মানুষ খুন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমরা খুনী নই, মেজর রানা।' স্ক্রীনের বাইরে দাঁড়ানো কার উদ্দেশে যেন মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'শার্ক কমান্ডের উপস্থিতি সম্পর্কে ওদের আমি এখুনি জানাব।' টিভির স্ক্রীন নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

লাফ দিয়ে উঠে প্যাসেজে পায়চারি শুরু করল রানা, কিন্তু দু'সারি সীটের মাঝখানে জায়গাটুকু খুব সরু, তাছাড়া সিলিং এত নিচু যে মাথা সোজা করা যায় না–রেগেমেগে আবার বসে পড়তে বাধ্য হলো ও।

পেন্টাগন থেকে খুব বেশি দূরে নয়, একটা ছাব্বিশতলা বিল্ডিঙের দুটো ফ্লোর নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি টেরোরিজম অর্গানাইজেশনের হেড অফিস। দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান ড. ওয়ার্নার হেড অফিসেই তাঁর একার সংসার পেতেছেন। চিরকুমার এই ভদ্রলোক বছরে যে অঙ্কের বেতন পান, যে-কোন ব্যবসায়ী জানলে ঈর্ষাবোধ না করে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের জন্যে প্লেন, হেলিকপ্টার, ইয়ট, একাধিক লেটেস্ট মডেলের গাড়ি, ইত্যাদি আরও অনেক কিছুই দেয়া হয়েছে তাঁকে, কিন্তু কালেভদ্রে জরুরী প্রয়োজন ছাড়া সেগুলো তিনি ব্যবহার করেন না। প্রতিষ্ঠানটাকে আরও শক্তিশালী করার জন্যে রাত নেই দিন নেই একনাগাড়ে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি, কাজের সুবিধে হবে ভেবে নিজের প্রাসাদতুল্য বাড়ি ছেড়ে বিছানা পেতেছেন অফিসে।

কমিউনিকেশন ডেস্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ড. ওয়ার্নার। তাঁর চলার পথ থেকে সমীহের সাথে সরে দাঁড়াল দু'জন টেকনিশিয়ান, দ্রুত হাতে ইনার অফিসের দরজা খুলে দিল পার্সোনাল সেক্রেটারি। এরকম একটা বিশাল ধড় নিয়ে চমৎকার সুষম সাবলীল হাঁটা-চলা সহজে চোখে পড়ে না, কাঠামোয় কোথাও বেশি মেদ

নেই, চওড়া হাড়গুলো মাংসের পাতলা ফালি দিয়ে মোড়া। তাঁর পরনের কাপড়চোপড় খুব দামী, ফিফথ এভিনিউ-এর দর্জিরা এরচেয়ে ভাল তৈরি করতে পারে না। কিন্তু কাপড়গুলো সবই পুরানো হয়ে গেছে, আগের মত আর ভাঁজ হয় না। জুতো জোড়া ইটালি থেকে আমদানী করা, কিন্তু অনেক দিন কালির মুখ দেখেনি। বেশভূষার ব্যাপারে অমনোযোগী, তা সত্ত্বেও আসল বয়সের চেয়ে দশ বছর কম, তেতাল্লিশ বলে মনে হয় তাঁকে। জুলফির কাছে অল্প দু'চারটে চুলে পাক ধরেছে।

ইনার অফিসে প্রচুর বই রেখেছেন ড. ওয়ার্নার, পঠন-পাঠনে তড়িঘড়ি একটা সময় বেরিয়ে যায়। ফার্নিচারগুলো হালকা এবং আরামদায়ক, বই আর পিয়ানোটা তাঁর নিজের। পাশ কাটাবার সময় পিয়ানোর কীবোর্ডে আঙুল ছোঁয়ালেন তিনি, লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন ডেস্কের দিকে।

সুইভেল চেয়ারে বসে ডেস্কে সাজিয়ে রাখা ইন্টেলিজেন্স ফোল্ডারগুলোয় হাত দিলেন ড. ওয়ার্নার। প্রতিটি ফোল্ডারে লেটেস্ট কমপিউটার প্রিন্ট-আউট রয়েছে, তাঁর অনুরোধে পাঠানো হয়েছে ওগুলো। স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরো উদ্ধার করার ব্যাপারে যারা জড়িত হবে তাদের মধ্যে থেকে বাছাই করা গুরুত্বপূর্ণ কিছু লোক সম্পর্কে তথ্য রয়েছে ফোল্ডারগুলোয়। এক একটা ফোল্ডার এক একজনের নামে।

প্রথম দুটো লাল রঙের ফোল্ডার দু'জন অ্যামব্যাসাডরের। হাইয়েস্ট সিকিউরিটি রেটিং-এর জন্যে ওদের ফোল্ডারের রঙ লাল। ফাইল দুটোর গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে– 'হেডস্ অভ দি ডিপার্টমেন্টস ওনলি'। পরের চারটে ফোল্ডার দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কেবিনেট মন্ত্রীদের, ইমার্জেন্সীর সময় চারজনই তাঁরা সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা এবং অধিকার ভোগ করেন। চারটের মধ্যে সবচেয়ে মোটাটা প্রাইম মিনিস্টারের। ড. ওয়ার্নার জানেন, এই ভদ্রলোক কালোদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল, তিনি তাদের অনেক ন্যায্য দাবিই মেনে নিতে চান, কিন্তু তাঁর শ্বেতাঙ্গ মন্ত্রীদের প্রবল বিরোধিতার মুখে বেশিরভাগ সময় সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হন। বাকি তিনটে ফোল্ডার বিচারমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, আর কমিশনার অভ পুলিসের।

একেবারে নিচের ফোল্ডারটার রঙও লাল। এত বেশি নাড়াচাড়া করা হয়েছে ওটা যে কার্ডবোর্ড কাভারের কোণগুলো নরম হয়ে গেছে। এই ফোল্ডারের অরিজিনাল প্রিন্ট-আউট চাওয়া হয়েছিল মাস কয়েক আগে, তার পর থেকে পনেরো দিন অন্তর অন্তর লেটেস্ট প্রিন্ট-আউট ভরা হয়েছে। ফোল্ডারের গায়ে লেখা রয়েছে–'মেজর মাসুদ রানা'। তার ঠিক নিচেই ব্র্যাকেটের ভেতর লেখা–'হেড অভ দি ডিপার্টমেন্টস ওনলি'।

ফোল্ডারের লেখাগুলো মুখস্থ বলতে পারবেন ড. ওয়ার্নার, তবু রিবন খুলে ফোল্ডারের পাতা ওল্টালেন। পড়তে পড়তেই পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন তিনি।

মাসুদ রানা সম্পর্কে যা কিছু জানা সম্ভব তার সবই এই ফোল্ডারে টোকা আছে। কোথায় জন্ম, কি নিয়ে পড়াশোনা, পারিবারিক বিবরণ, সেনাবাহিনীতে কবে ঢুকল, কোথায় ট্রেনিং পেয়েছে, কবে কমিশন পেল, যুদ্ধক্ষেত্রে কি কি কৃতিত্ব

ছিল, কিভাবে এবং কেন সেনাবাহিনী থেকে সরে এসে ইন্টেলিজেন্সে যোগ দিল, মুক্তিযুদ্ধে অবদান, সফল এবং ব্যর্থ অ্যাসাইনমেন্ট–প্রায় কিছুই বাদ পড়েনি। ফোল্ডারের এই অংশটুকু ইতিহাস। ব্যক্তিগত চরিত্র, আর্থিক অবস্থা, দুর্বলতা, অ্যামবিশন, ইত্যাদি বিষয়গুলো আলাদাভাবে রাখা হয়েছে ফোল্ডারে।

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করা হবে, এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পরপরই অস্থায়ী একটা কমিটিকে উপযুক্ত কর্মকর্তা নির্বাচনের দায়িত্ব দেয়া হয়–কর্মকর্তাদের তালিকায়, একেবারে শেষের দিকে, মাসুদ রানার নামটাও ছিল। অস্থায়ী কমিটিতে মার্কিন, ব্রিটিশ, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং জার্মান সরকারের প্রতিনিধি ছিল, যে যার উৎস থেকে রানা সম্পর্কে যা জানার সবই জানত তারা, নামটা প্রস্তাব করার ব্যাপারে যার যার সরকারের অনুমতিও পেয়েছিল। অনেক তর্ক-বিতর্ক এবং চালাচালির পর নতুন আরেকটা তালিকা তৈরি করা হয়, তাতে মাসুদ রানার নামটা উঠে আসে পয়লা নম্বরে।

প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল সি.সি. কমিটির প্রেসিডেন্ট হবার প্রস্তাব দেয়া হবে রানাকে, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক একটা মহল থেকে বিরোধিতা করে বলা হলো, একজন সৈনিককে এ-ধরনের উঁচু পর্যায়ের প্রশাসনিক পদ দেয়াটা উচিত হবে না।

অ্যাশট্রেতে পাইপের তামাক ঝেড়ে ফোল্ডার হাতে চেয়ার ছাড়লেন ড. ওয়ার্নার, পিয়ানোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে গোটা ঘটনাটা স্মরণ করলেন তিনি। পিয়ানোর মিউজিক র‍্যাকে ফোল্ডারটা রাখলেন, ধীরেসুস্থে বসলেন কীবোর্ডের সামনে। খোলা ফোল্ডারে চোখ রেখে বাজাতে শুরু করলেন তিনি।

ড. ওয়ার্নার ব্যক্তিগতভাবে শার্ক কমান্ডেও চাননি রানাকে, কারণ প্রথম থেকেই রানাকে তাঁর ভয়ানক বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছিল। রানা অতি মাত্রায় স্বাধীনচেতা, তাকে বশ করা বা বাধ্য করা কঠিন হবে। চোখ বুজে নির্দেশ পালন করা ওর স্বভাব নয়। তার বিবেচনায় শার্ক কমান্ডের জন্যে আদর্শ কমান্ডার হতে পারত স্টুয়ার্ট ডিলার, এখন যে কোবরা কমান্ডের কমান্ডার। কিংবা কার্ল রবসন হলেও ভাল হত। তবু বিভিন্ন মহলের সুপারিশ ফেলতে না পেরে শার্ক কমান্ডের দায়িত্ব নেয়ার জন্যে প্রস্তাব দেয়া হয় রানাকে, তবে সেই সাথে এমন একটা কৌশলও করা হয় যাতে প্রস্তাবটা সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করে রানা। বি.সি.আই-এ আরেকজন এজেন্ট, সোহেল আহমেদকে প্রস্তাব দেয়া হয় সি.সি. কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবার। শার্কের কমান্ডারের চেয়ে সেন্ট্রাল কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদটা বড়, ড. ওয়ার্নারের ধারণা হয়েছিল মাসুদ রানা অপমান বোধ করবে এবং ফিরিয়ে দেবে প্রস্তাবটা।

কিন্তু তা ঘটেনি। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল সোহেল আহমেদ, কিন্তু রানা শার্ক কমান্ডের দায়িত্ব নিতে রাজি হলো। অগত্যা বাধ্য হয়ে ওকে মেনে নিলেন ড. ওয়ার্নার। মেনে নিলেও, তাঁর মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব থেকেই গেল। রানার অ্যামবিশন সম্পর্কে সন্দেহ জাগল তাঁর মনে। ওর ওপর তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে শুরু করলেন। পাঁচ পাঁচবার রানাকে ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি, সঙ্গে রেখে বুঝতে চেষ্টা করেছেন ওকে। এমনকি তিনি তাঁর নিউ ইয়র্কের বাড়িতেও

রানাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, পুরো একটা রোববার কাটিয়েছেন ওর সাথে।

রানার ব্যক্তিত্ব লক্ষ করেছেন তিনি, লক্ষ করেছেন ওর জ্ঞানের পরিধি। মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছেন, ওর মেধা। একুশ বছর বয়সে ওজন যা ছিল, দশ বছর পর আরও এক পাউন্ড কমেছে, এখনও রানা ফ্রন্ট-লাইন সৈনিকের মত একহারা এবং অকুতোভয়।

ফোল্ডারটা পড়া শেষ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড. ওয়ার্নার। কিছু কিছু দুর্বলতা আছে বটে রানার, কিন্তু সেগুলো ভীতিকর নয় মোটেও। লম্বা মেয়ের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়, আবার দেখা গেছে তাদেরকে এড়িয়েও যেতে পারে। সিগারেট খায়, মাঝে মধ্যে আবার ছেড়েও দিতে পারে। মদের ব্যাপারেও সেই একই কথা, যখন খুশি খায় বা খায় না। অবৈধ কোন আয় নেই, সুইস ব্যাংকে নেই কোন গোপন অ্যাকাউন্ট। বেশিরভাগ সময় গম্ভীর, নির্লিপ্ত, কিন্তু বন্ধুদের সাথে প্রাণখোলা। সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, মন খুব নরম।

'মনটা খুব নরম, তাই কি?' বিড়বিড় করে বললেন ড. ওয়ার্নার। অস্বস্তির সাথে মাথা নাড়লেন তিনি।

'ড. ওয়ার্নার, স্যার–,' মৃদু নক করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। '–নতুন খবর এসেছে...'

দীর্ঘশ্বাস চেপে ড. ওয়ার্নার বললেন, 'আসছি।' ফোল্ডারটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

পাঁচ

বাতাস কেটে নিঃশব্দে নেমে এল হকার। মাটি থেকে পাঁচ হাজার ফিট ওপরে থাকতেই পাওয়ার বন্ধ করে দিয়েছে পাইলট, থ্রটল আবার স্পর্শ না করেই ফাইনাল অ্যাপ্রোচের জন্যে প্রস্তুতি নিল সে। প্লেন সচল রাখার জন্যে যে ন্যূনতম গতি দরকার তারচেয়ে মাত্র দশ নট বেশি গতিতে কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দিয়ে উড়ে এল সে, রানওয়ে ওয়ান ফাইভে নেমেই ম্যাক্সিমাম সেফ ব্রেকিং অ্যাপ্লাই করল। ওয়ান ফাইভ ছোট একটা বিকল্প রানওয়ে, হকারও অল্প একটু দূর ছুটে দাঁড়িয়ে পড়ল।

তিনশো ষাট ডিগ্রী বাঁক নিয়ে হকারকে ঘোরাল পাইলট, চলে এল পনেরো নম্বর রানওয়েতে, শুধু চাকা ঘোরাবার মত পাওয়ার ব্যবহার করছে।

'ওয়েল ডান,' ভারী গলায় বলল রানা, ঝুঁকে ওত পাতার ভঙ্গিতে পাইলটের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে জিরো-সেভেন-জিরো থেকে কেউ ওদের ল্যান্ড করতে দেখেনি।

সামনেই অ্যাপ্রন মার্শালকে হাত নাড়তে দেখা গেল, মার্শালের পিছনে চারজন লোক গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনের পরনে ক্যামোফ্লেজ ব্যাটলড্রেস, অপরজনের পরনে নীল ইউনিফর্ম, ক্যাপ আর গোল্ড ইনসিগনিয়া দেখে বোঝা

গেল সাউথ আফ্রিকান পুলিস অফিসার।

ভাঁজ খোলা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে ইউনিফর্ম পরা অফিসার প্রথম অভ্যর্থনা জানাল রানাকে। 'পীসমেকার,' রানার বাড়ানো হাতটা জোরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে নিজের পরিচয় দিল সে, 'লেফটেন্যান্ট-জেনারেল।' সেনাবাহিনীর নয়, পুলিসের পদ। মোটাসোটা, শক্ত-সমর্থ কাঠামো, চোখে স্টীল রিমের চশমা, বয়স হবে পঞ্চাশ। 'আসুন, মেজর মাসুদ রানা, আপনার সাথে কমান্ড্যান্ট লুইস বেলিংহামের পরিচয় করিয়ে দেই।' এটা মিলিটারি র‍্যাঙ্ক, কর্নেলের সমপর্যায়। কমান্ড্যান্টের বয়স পীসমেকারের চেয়ে কম, বেশ লম্বা। শ্বেতাঙ্গ এই দুই অফিসারই দ্বিধা আর সন্দেহে ভুগছে, চেহারায় ম্রিয়মাণ ভাব। কারণটাও সাথে সাথে জানা গেল।

'আমাকে বলা হয়েছে, আপনার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে, মেজর।' লোকগুলোর পজিশন অলগোছে বদলে গেল, অফিসার দু'জন আস্তে করে চলে এল রানার দু'পাশে, দু'জন মুখোমুখি দাঁড়াল। সাথে সাথে উপলব্ধি করল রানা, রাগ আর বিদ্বেষ একা শুধু ওর ওপর বর্ষিত হচ্ছে না। পুলিস আর মিলিটারির চিরন্তন রেষারেষি লেগে আছে এখানেও। সন্ত্রাসবাদ বিরোধী একটা আন্তর্জাতিক সামরিক সংগঠনের প্রয়োজন যে সত্যি ছিল, এই রেষারেষি লক্ষ করে নতুন করে আবার উপলব্ধি করল রানা। 'আপনিই অর্ডার করবেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করব।'

'ধন্যবাদ,' শান্তভাবে কম্যান্ড গ্রহণ করল রানা। 'ঠিক তিন ঘণ্টা পর আমার ব্যাক-আপ টীম ল্যান্ড করবে। একেবারে শেষ উপায় হিসেবে শক্তি ব্যবহার করব আমরা। যখন করব, শুধু শার্ক কমান্ডের কমান্ডোরা জড়িত হবে তাতে। ব্যাপারটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার।' রানা দেখল, সামরিক অফিসারের চোয়াল কঠিন হয়ে গেল।

'কিন্তু আমার লোকেরা অত্যন্ত…'

'সিদ্ধান্তটা পলিটিকাল, এবং আমার নয়,' বলল রানা। 'তবে অন্যান্য ব্যাপারে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ নিশ্চয়ই গ্রহণ করব আমি।' হাতঘড়ি দেখল ও। 'এবার বলুন দেখি, আমার সার্ভেইল্যান্স ইকুইপমেন্টগুলো কোথায় রাখা যায়। তারপর চারদিকটা একবার ঘুরেফিরে দেখব, কেমন?'

মজার রাখার জন্যে ভাল একটা জায়গা বাছাই করল রানা। সার্ভিস ম্যানেজারের কামরা টার্মিনাল ভবনের চারতলায়, আকারে বেশ বড়, ওখান থেকে ট্যাক্সিওয়ের দক্ষিণ প্রান্ত সহ গোটা সার্ভিস এলাকা পরিষ্কার দেখা যায়। পাঁচতলায় ঝুল-বারান্দা থাকায় চারতলার এই কামরার জানালায় ঘন ছায়া পড়ে, রানা যদি একেবারে জানালার কাছাকাছি না থাকে তাহলে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল রোদে দাঁড়িয়ে এদিকে তাকালে ওকে দেখতে পাবে না কেউ, এমনকি শক্তিশালী লেন্স ব্যবহার করেও কোন লাভ হবে না। তাছাড়া হাইজ্যাকাররা এদিকে তাকাবে বলেও মনে হয় না, আরও অনেক উঁচু কাঁচমোড়া কন্ট্রোল টাওয়ারে লোক থাকবে বলে ধারণা করবে ওরা।

সার্ভেইল্যান্স ইকুইপমেন্টের মধ্যে রয়েছে কয়েকটা ক্যামেরা, একটা অডিও ইন্টেনসিফায়ার। ক্যামেরাগুলোর কোনটাই বাড়িতে ব্যবহারযোগ্য সুপার এইট-এম.এম-এর চেয়ে বড় নয়, অ্যালুমিনিয়ামের ট্রাইপড সহ একহাতেই বহন করা যায়। ওগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, আটশো এম.এম. ফোকাল লেন্স পর্যন্ত জুম করা যায়, প্রয়োজনে রিপিট করা যাবে হুকারের কমান্ড কনসোলের স্ক্রীনে, একই সাথে ভিডিও টেপে ধরে রাখা সম্ভব। অডিও ইন্টেনসিফায়ার আকারে আরেকটু বড় হলেও ওজনে বেশি নয়। মাঝখানে সাউন্ড কালেক্টর সহ ওতে রয়েছে চার ফুটি ডিশ অ্যান্টেনা। একজন স্নাইপারের রাইফেল যতটুকু অব্যর্থ হতে পারে ততটুকু নিখুঁতভাবে ইন্টেনসিফায়ারকে লক্ষ্যস্থির করতে সাহায্য করে টেলিস্কোপিক সাইট–ফোকাস করতে পারে আটশো গজ দূরে দাঁড়ানো একজন লোকের ঠোঁটে, একই দূরত্বের যে-কোন সাধারণ কথাবার্তা পরিষ্কার রেকর্ড করতে পারে, শব্দগুলো সরাসরি পাঠিয়ে দেবে কমান্ড কনসোলে, সেই সাথে ম্যাগনেটিক টেপ স্পূলে জমা হয়ে যাবে সব।

রানার কমিউনিকেশন টীমের দু'জন টেকনিশিয়ানকে বসিয়ে দেয়া হলো কামরাটায়, প্রচুর স্যান্ডউইচ আর কফির ব্যবস্থা থাকল। আফ্রিকান কর্নেল আর তার লোকজনকে নিয়ে এলিভেটরে চড়ল রানা, উঠে এল কাঁচমোড়া কন্ট্রোল টাওয়ারে।

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে এয়ারফিল্ড, এয়ারফিল্ডের ওপাশে অ্যাপ্রন, এবং টার্মিনালকে ঘিরে থাকা সার্ভিস এলাকা অবাধে দেখা যায়। টাওয়ারের নিচে অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম খালি করা হয়েছে, শুধু সামরিক বাহিনীর লোকজন পাহারায় আছে ওখানে।

'এয়ারফিল্ডে ঢোকার সবগুলো পথ বন্ধ করে দিয়েছি। শুধু টিকেট সাথে থাকলে প্যাসেঞ্জারদের ঢুকতে দেয়া হবে। ট্রাফিকের জন্যে একটাই সেকশন খোলা রাখা হয়েছে, টার্মিনালের উত্তর প্রান্তে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সিনিয়র কন্ট্রোলারদের দিকে ফিরল রানা। 'আপনার ট্রাফিক প্যাটার্নটা কি রকম?'

'প্রাইভেট কোন ফ্লাইটকে ক্লিয়ার্যান্স দেয়া হচ্ছে না। ডোমেস্টিক নিয়মিত ফ্লাইটগুলোকে ল্যান্সেরিয়া আর জারমিস্টনে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। আসা-যাওয়া করছে শুধু ইন্টারন্যাশনাল নিয়মিত ফ্লাইটগুলো।'

'জিরো-সেভেন-জিরো থেকে দেখতে পাচ্ছে ওরা?'

'না। প্লেনটা থেকে সবচেয়ে দূরে ইন্টারন্যাশনাল ডিপারচার টার্মিনাল, তাছাড়া দক্ষিণ দিকের ট্যাক্সিওয়ে আর অ্যাপ্রন আমরা ব্যবহারই করছি না। দেখতেই পাচ্ছেন, গোটা এলাকা খালি করে ফেলেছি–শুধু ওভারহল আর সার্ভিসিঙের কাজ চলছে বলে তিনটে এস-এ এয়ারওয়েজের প্লেন রয়ে গেছে। ওগুলো ছাড়া জিরো-সেভেন-জিরোর এক হাজার গজের মধ্যে আর কোন প্লেন নেই।'

'বোয়িঙে যদি উঠতে হয়, সমস্ত ট্রাফিক বন্ধ করে দিতে হতে পারে...'

'আমাকে বললেই হবে, মেজর।'

চোখে বিনকিউলার তুলে আবার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বোয়িংটাকে দেখল রানা। নিঃসঙ্গ, চুপচাপ, যেন পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ওটা। উজ্জ্বল মার্কিংগুলো অলঙ্করণের মত লাগছে। লাল, নীল, আর সাদা, তিনটে রঙই রোদ লেগে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। টাওয়ারের দিকে পুরোপুরি আড়াআড়ি ভাবে পার্ক করা রয়েছে, প্রতিটি হ্যাচ আর দরজা বন্ধ। সার সার জানালার ওপর এক এক করে দৃষ্টি ফেলল রানা, ভেতর থেকে প্রতিটির সানশেড বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ফ্লাইট ডেকের উইন্ডশীল্ড আর সাইড প্যানেলের দিকে তাকাল রানা। ভেতর থেকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে ওগুলো, হাইজ্যাকার বা ক্রুদের দেখার কোন উপায় নেই, ফ্লাইট ডেকে গুলি করাও সম্ভব নয়। টার্মিনাল ভবনের সবচেয়ে কাছের কোণ থেকে প্লেনটার দূরত্ব চারশো গজের বেশি নয়, সুযোগ পেলে নতুন লেজার সাইটের সাহায্যে শার্কের ট্রেনিং পাওয়া স্নাইপার একজন লোকের যে-কোন একটা চোখে অব্যর্থ ভাবে গুলি করতে পারত।

ট্যাক্সিওয়ের খোলা টারমাকের ওপর দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে কালো ইলেকট্রিক কেবল, মেইন সাপ্লাই থেকে পাওয়ার পাচ্ছে প্লেনটা। চিন্তিত ভাবে কেবলটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর মনোযোগ দিল চারটে আর্মারড় কারের দিকে। অস্বস্তির ক্ষীণ একটা রেখা ফুটে উঠল কপালে। 'কর্নেল, ভেহিকেলগুলো ফিরিয়ে আনুন, প্লীজ। হ্যাচ বন্ধ অবস্থায় আপনার লোকজন অযথাই সেদ্ধ হচ্ছে ভেতরে।'

'মেজর, আমি উপলব্ধি করি এটা আমার কর্তব্য যে...,' শুরু করল কমান্ড্যান্ট লুইস বেলিংহাম, চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল রানা। সহিষ্ণু বন্ধুর মধুর হাসি, দেখে অবাক হয়ে গেল লোকটা।

'পরিবেশ থেকে যতটা সম্ভব উত্তেজনা কমিয়ে ফেলতে চাই আমরা,' সব ব্যাখ্যা করতে হওয়ায় বিরক্ত বোধ করছে রানা, তবু হাসিটা নিস্তেজ হতে দিল না। 'কারও দিকে চারটে কামান তাক করা থাকলে তার পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন, সে নিজেই ট্রিগার টেনে দিতে পারে। টার্মিনাল কার পার্কে রাখুন ওগুলো, প্লেন থেকে দেখা যাবে না। আর আপনার লোকদের বিশ্রাম নিতে বলুন।'

লাল চেহারা আরও লাল করে ওয়াকিটকিতে নির্দেশ দিল কর্নেল, খানিক পর আর্মারড় কারগুলো হ্যাঙ্গারের পিছনে অদৃশ্য হতেই আবার মুখ খুলল রানা। 'ওখানে ক'জন লোকের সময় নষ্ট করছেন আপনি?' প্রথমে অবজার্ভেশন ব্যালকনির নিচে পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকদের দিকে, তারপর সার্ভিস হ্যাঙ্গারের পাশে সার বেঁধে থাকা ছোট ছোট কালো মাথার দিকে আঙুল তুলল ও।

'দুশো তিরিশজন...'

'ডেকে নিন,' নির্দেশ দিল রানা। 'বোয়িঙের ওরা যেন লোকগুলোকে ফিরে আসতে দেখে।'

'সবাইকে?' কর্নেলের চোখে অবিশ্বাস।

'সবাইকে,' হাসল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, প্লীজ।'

দ্রুত শিখছে লোকটা, ইতস্তত না করে ওয়াকিটকিটা মুখের সামনে তুলল

আবার। প্রথমে দিশেহারা চঞ্চল একটা ভাব দেখা গেল সৈনিকদের মধ্যে, তারপর লাইনবন্দী হয়ে মার্চ শুরু করল সবাই। নিচু পাঁচিলের ওপর স্টীল হেলমেট আর অটোমেটিক রাইফেলের মাজল্ দেখা গেল।

'কিন্তু একটা কথা আপনাকে মানতেই হবে, মেজর। ওরা পশু, ওদের সাথে আপনি যদি নরম ব্যবহার করেন...'

আরও কি শুনতে হবে জানে রানা, তাড়াতাড়ি বলল, 'কিন্তু বন্দুক তাক করে রাখলে ওরা সতর্ক থাকবে। একটু বিশ্রাম নিতে দিন, আত্মবিশ্বাস বাড়ুক।' ইতিমধ্যে চোখে আবার বিনকিউলার তুলেছে ও, একজন সৈনিকের দূর-দৃষ্টি নিয়ে শার্কের চারজন স্নাইপারের জন্যে জায়গা খুঁজছে। ওদেরকে ব্যবহার করার সম্ভাবনা খুব কম—একই সময়ে শত্রুদের প্রত্যেককে খুন করতে পারতে হবে। তবে দুর্লভ একটা সুযোগ এসেও যেতে পারে, এলে প্রস্তুতির অভাবে বিফল হতে চায় না রানা। একটা রাইফেল রাখা যেতে পারে সার্ভিস হ্যাঙ্গারের ছাদে। বড় একটা ভেন্টিলেটর রয়েছে, ওটা ভেঙে ফেলা যেতে পারে, ওখান থেকে বোয়িঙের পোর্ট সাইডটা সম্পূর্ণ কাভার করা যাবে। দু'দিক থেকে ফ্লাইট ডেক কাভার করার জন্যে দুটো রাইফেল দরকার হবে। মেইন রানওয়ের কিনারা ধরে গভীর ড্রেন চলে গেছে, সেটার ভেতর দিয়ে ছোট কামরাটায় একজন লোককে পাঠানো সম্ভব—ওই কামরাতেই রয়েছে অ্যাপ্রোচ রাডার আর আই.এল.এস. বীকন। কামরাটা শত্রুপক্ষের পিছন দিকে, ওদিক থেকে তারা গোলা-গুলি আশা করবে বলে মনে হয় না।

এয়ারপোর্টের বড়সড় স্কেল ম্যাপের গায়ে ঘন ঘন চোখ বুলাচ্ছে রানা, সিদ্ধান্তগুলো লিখে রাখছে নোটবুকে। প্রতিটি সিদ্ধান্তের পাশে আলাদা আলাদা স্কেচ এঁকে প্ল্যান তৈরি করল, প্রতিটি প্ল্যানের পাশে লেখা থাকল দূরত্বের চুলচেরা হিসেব, বরাদ্দ করা থাকল টার্গেটে পৌঁছুবার নির্দিষ্ট সময়। অচেনা শত্রু, অবয়বহীন, তবু চিন্তা-ভাবনায় তাদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে চায় রানা।

একটানা একঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করার পর সন্তুষ্ট হলো রানা। হারকিউলিস এখনও না এসে পৌঁছুলেও, সিদ্ধান্ত আর প্ল্যানগুলো জানিয়ে দিতে পারে ও কার্ল রবসনকে—তাহলে প্রকাণ্ড ল্যান্ডিং হুইলগুলো টারমাক স্পর্শ করার চার মিনিটের মধ্যেই তার টীমের লোকজন পজিশন নিতে পারবে।

ম্যাপ থেকে চোখ তুলে সোজা হলো রানা, চামড়া মোড়া নোটবুকটা বোতাম খোলা বুক পকেটে ভরে রাখল। চোখে গ্লাস তুলে আরও একবার ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে দেখল বোয়িংটাকে, চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও অদ্ভুত একটা আক্রোশ অনুভব করল ও। সারা দুনিয়া জুড়ে সন্ত্রাসবাদীদের আলাদা কোন পরিচয় নেই—ওরা সবাই নিষ্ঠুর, নির্মম, আর বিবেকহীন। দাবি আদায়ের জন্যে নিরীহ মানুষ আর মাসুম বাচ্চাদের যারা খুন করে রানার অভিধানে তারা অমানুষ।

মাথা নিচু করে হকারের কেবিনে ঢোকার সময় রানা দেখল কমিউনিকেশন টেকনিশিয়ানরা টিভির বড় পর্দাটায় কার্ল রবসনকে এনে ফেলেছে। সীটে বসে ওপর সারির ডান দিকের স্ক্রীনে তাকাল ও, দক্ষিণ টার্মিনালের প্রায় সবটুকু দেখা

যাচ্ছে। স্ক্রীনের ঠিক মাঝখানে বিশাল ঈগলের মত বসে রয়েছে জিরো-সেভেন-জিরো। পাশের স্ক্রীনে আটশো এম.এম. জুম লেন্সের সাহায্যে বোয়িঙের ফ্লাইট ডেকের ব্লো আপ ধরে রাখা হয়েছে। খুঁটিনাটি সব কিছু এত পরিষ্কার যে উইন্ডশিল্ড ঢাকা কম্বলের গায়ে সেলাই করা ট্যাগটা পর্যন্ত দেখতে পেল। তৃতীয় ছোট স্ক্রীনে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ারের ভেতরটা ফুটে রয়েছে। আস্তিন গুটোনো কন্ট্রোলারকে দেখা গেল, সামনে রাডার রিপিটার নিয়ে বসে আছে। আরও সামনে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা জানালা, জানালার বাইরে বোয়িং। ছবিগুলো তোলা হচ্ছে এক ঘন্টা আগে টার্মিনাল বিল্ডিঙে বসানো ক্যামেরার সাহায্যে। অবশিষ্ট টিভির স্ক্রীনটা খালি। মেইন স্ক্রীনে হাসিখুশি কার্ল রবসন চুরুট ফুঁকছে।

'চলে এসো হে,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'এখানে তোমার অনেক কাজ।'

'এত তাড়া কিসের, বস? পার্টি তো এখনও শুরুই হয়নি।' বেসবল ক্যাপটা ঠেলে মাথার পিছন দিকে সরিয়ে দিল রবসন।

'তা ঠিক, এমনকি পার্টিটা কে দিচ্ছে তাও এখনও জানি না আমরা। শেষ হিসেবটা বলো, কখন পৌঁছাবে?'

'অনুকূল বাতাস পাওয়া গেছে–আর মাত্র এক ঘন্টা বিশ মিনিট উড়তে হবে।'

'গুড, এবার তাহলে কাজ শুরু করা যাক।' বুক পকেট থেকে নোটবুক বের করে ব্রিফিং শুরু করল রানা। বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে মনে করলে ক্যামেরাম্যানকে নির্দেশ দিল ও, স্ক্রীনে বদলে যেতে লাগল দৃশ্যগুলো–কখনও জুম করল ক্যামেরা, কখনও প্যান। ছবিগুলো শুধু কমান্ড কনসোলে নয়, বহু দূর হারকিউলিসের স্ক্রীনেও ফুটল। টীমের লোকজন সবাই যে যার পজিশন আগেভাগে দেখে নিতে পারছে। একই ফটো মহাশূন্যে ঘুরন্তে থাকা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে, একটু ঝাপসা হয়ে, পৌঁছে যাচ্ছে সি.সি. কমিটির স্ক্রীনে। বুড়ো সিংহের মত জড়োসড়ো হয়ে ব্রিফিঙের প্রতিটি শব্দ গভীর মনোযোগের সাথে শুনছেন ড. ওয়ার্নার, একবার শুধু তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট টেলেক্স মেসেজ নিয়ে এলে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ব্রিফিং শেষ হবার আগেই রানার ছবির দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন তিনি, নির্দেশ দিলেন তাঁর নিজের ছবি যেন রানার কমান্ড কনসোলে ফুটে ওঠে।

'বাধা দেয়ার জন্যে দুঃখিত, রানা–কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পৌঁচেছে।'

'ইয়েস, ড. ওয়ার্নার।'

'টেরোরিস্টরা মাহে এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে উঠেছে ধরে নিয়ে সেইশেলস পুলিসের কাছে জয়েনিং প্যাসেঞ্জারদের একটা তালিকা চেয়েছিলাম। পনেরো জন প্যাসেঞ্জার, দশজন স্থানীয়। একজন ব্যবসায়ী আর তার স্ত্রী, আটটা বাচ্চা, বয়স আট থেকে চোদ্দ, ওদের সাথে কোন অভিভাবক নেই ওদের মা-বাবা সেইশেলসে সরকারী চাকরি করে, ছেলে-মেয়েগুলো লন্ডন স্কুলে ফিরে যাচ্ছে।'

দুর্ভাবনা বাড়ল রানার। বাচ্চাদের জীবন যেমন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর মূল্যবান, তেমনি বড়বেশি অসহায় ওরা

টেলেক্স মেসেজে চোখ রেখে কথা বলে চলেছেন ড. ওয়ার্নার, পাইপের গোড়া দিয়ে ঘাড়ের পিছনটা চুলকাচ্ছেন। 'আরও রয়েছে একজন ব্রিটিশ ব্যবসায়ী, শেল অয়েল কোম্পানীর একজন শেয়ার হোল্ডার, বাকি চারজন ট্যুরিস্ট–একজন আমেরিকান, একজন ফ্রেঞ্চ, দু'জন জার্মান। এই চারজন একসাথে ট্রাভেল করছে বলে মনে হয়েছে, ইমিগ্রেশন আর সিকিউরিটি অফিসাররা মনে রেখেছে ওদের। দুটো মেয়ে, দুটো ছেলে, সবাই তরুণ। নাম–অ্যানি হাসলার, পঁচিশ বছর, আমেরিকান, সিঙ্গিয়া লিজবেথ, চব্বিশ, জার্মান, রলফ গ্রস, পঁচিশ, জার্মান; পিয়েরী বার্তোস, ছাব্বিশ, ফ্রেঞ্চ।'

'ওদের ব্যাকগ্রাউন্ড…'

'চেক করেছে পুলিস। ভিক্টোরিয়ার কাছাকাছি রীফ হোটেলে দু'হপ্তা ছিল ওরা, দুটো ডাবল রূমে মেয়েরা আর ছেলেরা আলাদাভাবে। ওদের সময় কাটে সাঁতার কেটে আর রোদ মেখে, প্যাটার্নটা বদলে যায় ভিক্টোরিয়ায় একটা সমুদ্রগামী ইয়ট ভেড়ার পর। পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা ইয়ট, স্কিপার একজন আমেরিকান। যে ক'দিন ওখানে ছিল, রোজই একবার করে ওটায় চড়েছে চারজনের দলটা। জিরো-সেভেন-জিরো আকাশে ওড়ার চব্বিশ ঘণ্টা আগে নোঙর তুলে চলে যায় ইয়ট।'

'ধরে নিচ্ছি ইয়ট থেকে অস্ত্র সাপ্লাই পেয়েছে,' বলল রানা। 'তারমানে অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে কাজে নেমেছে ওরা।' ধীরে ধীরে হলেও, শত্রুদের চেহারা প্রকাশ পাচ্ছে, ভাবল ও। জানে, নতুন সবগুলো তথ্যই ভীতিকর হবে, আস্তে আস্তে কুৎসিত হয়ে উঠবে চেহারাগুলো। 'নামগুলো কমপিউটারে চেক করিয়েছেন?'

'কোন রেজাল্ট পাইনি,' বললেন ড. ওয়ার্নার। 'হয় ওদের সম্পর্কে কোন ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট নেই, তা না হলে নাম আর পাসপোর্ট সব ভুয়া…'

একটা স্ক্রীনে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ারের ভেতরটা দেখা যাচ্ছিল, সেখানে অকস্মাৎ নতুন তৎপরতা শুরু হওয়ায় মাঝপথে থেমে গেলেন ড. ওয়ার্নার। দ্বিতীয় একটা স্পীকারে অন্য একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ভলিউম খুব উঁচুতে দেয়া ছিল, কন্ট্রোল বোর্ডের টেকনিশিয়ান তাড়াতাড়ি অ্যাডজাস্ট করল সেটা। কণ্ঠস্বর এক মেয়ের। প্রাণবন্ত, স্পষ্ট উচ্চারণ। ইংরেজিতে কথা বলছে। কথার সুরে আমেরিকান পশ্চিম উপকূলের টান।

'জান স্মুট টাওয়ার, দিস ইজ দি অফিসার কমান্ডিং দি টাস্ক ফোর্স অভ দি অ্যাকশন কমান্ডো ফর হিউম্যান রাইটস দ্যাট হ্যাজ কন্ট্রোল অভ স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরো। স্ট্যান্ড বাই টু কপি এ মেসেজ।'

'কন্ট্যাক্ট!' চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'কন্ট্যাক্ট অ্যাট লাস্ট!'

ছোট স্ক্রীনে নিঃশব্দে হাসছে কার্ল রবসন, কায়দা করে বারবার ঠোঁটের এক কোণ থেকে আরেক কোণে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে চুরুটটা। 'অনুষ্ঠান শুরু হলো,' ঘোষণা করল সে, কণ্ঠস্বর থেকে চাপা উত্তেজনা লুকিয়ে রাখতে পারল না।

ছয়

ক্রুদের তিনজনকে ফ্লাইট ডেক থেকে সরিয়ে হাইজ্যাকারদের খালি সীটে বসানো হয়েছে। বোয়িঙের ককপিটকে নিজের হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে জেসিকা, এই মুহূর্তে পাশে স্তূপ করা আরোহীদের পাসপোর্ট পরীক্ষা করছে সে, ভাঁজ খোলা সিটিং প্ল্যানটা কোলের ওপর, তাতে প্রতিটি আরোহীর নাম আর জাতীয়তা লেখা রয়েছে।

গ্যালির দিকে দরজাটা খোলা, এয়ার-কন্ডিশনিঙের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া প্রকাণ্ড প্লেনটা আশ্চর্য রকম নিস্তব্ধ। কেবিনে কথা বলা নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, নিষেধ মানা হচ্ছে কিনা দেখার জন্যে লাল শার্ট পরা কমান্ডোরা টহল দিচ্ছে প্যাসেজে টয়লেট ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হলেও, নিয়ম করে দেয়া হয়েছে একজন ফিরে এসে সীটে না বসা পর্যন্ত আরেকজন সীট ছেড়ে উঠতে পারবে না। ব্যবহার করার সময় খোলা রাখতে হবে টয়লেটের দরজা, কমান্ডোরা যাতে চট্ করে তাকিয়ে চেক করতে পারে।

নিস্তব্ধ হলেও, গোটা কেবিন টান টান হয়ে আছে উত্তেজনায়। কিছু আরোহী ঘুমাচ্ছে, বেশিরভাগই শিশু, বাকি সবাই যে যার সীটে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছে, চেহারায় ক্লান্তি আর উদ্বেগ; ভয় আর ঘৃণা মেশানো দৃষ্টিতে দেখছে কমান্ডোদের।

পিয়েরী বার্তোস, ফরাসী, ককপিটে ঢুকল। 'আর্মারড় কারগুলো ফিরিয়ে নিচ্ছে ওরা,' বলল সে। একহারা গড়ন তার, কবিসুলভ মায়াভরা চোখ, প্রায় চিবুক ছোঁয়া বাঁকানো গোঁফ জোড়া তাকে মানায়নি।

মুখ তুলে তার দিকে তাকাল জেসিকা। 'তুমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছ, ডিয়ার।' মাথা নাড়ল সে। 'সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখো।'

'বাজে কথা,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল পিয়েরী। 'নার্ভাস হব কেন?'

মৃদু, মিষ্টি হেসে ভালবাসার একটা হাত বাড়িয়ে পিয়েরীর মুখ স্পর্শ করল জেসিকা। 'ভেবো না তোমাকে আমি অপমান করছি।' এবার দু'হাত বাড়াল সে, পিয়েরীর মাথা ধরে নিজের দিকে টানল, চুমো খেলো তার ঠোঁটে; 'সাহসের পরিচয় আগেও দিয়েছ তুমি–বহুবার,' বিড়বিড় করে বলল সে।

পিস্তলটা ডেস্কের দিকে ছুঁড়ে দিল পিয়েরী, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল জেসিকাকে। জেসিকার লাল সুতী শার্টের ওপরের তিনটে বোতাম খোলা, পিয়েরীকে ভেতরটা হাতড়াবার সুযোগ করে দিল সে। একটু পরই তার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠল। কিন্তু পিয়েরী শর্টসের বোতামে হাত দিতেই তাকে নির্মমভাবে ঠেলে সরিয়ে দিল সে। 'পরে,' শুকনো গলায় বলল জেসিকা, 'আগে সব মিটে যাক।' সামনের দিকে একটু ঝুঁকে কম্বলের একটা কোণ একটু সরাল সে, ককপিটের সাইড উইন্ডোর বাইরে চোখ ধাঁধানো রোদ। উজ্জ্বল আলোটা চোখে সয়ে এল। অবজার্ভেশন ডেকের নিচে পাঁচিল ছাড়িয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে

হেলমেট পরা সৈনিকদের মাথা, মার্চ করে চলে যাচ্ছে লোকগুলো। মনে মনে খুশি হলো জেসিকা, ওরা তাহলে সৈনিকদেরও ফিরিয়ে নিচ্ছে। এবার কথা বলার সময় হয়েছে। না, আরও একটু ঘামুক ওরা। ইতিমধ্যে ধাতস্থ হয়ে গেছে পিয়েরী।

উঠে দাঁড়াল জেসিকা, শার্টের বোতাম লাগাল, গলায় স্ট্র্যাপের সাথে ঝুলতে থাকা ক্যামেরাটা অ্যাডজাস্ট করল, তারপর গ্যালিতে একবার থেমে ঠিকঠাক করে নিল সোনালি চুলগুলো। মাঝখানের প্যাসেজ ধরে কেবিনের পুরো দৈর্ঘ্য হেঁটে এল ধীর পায়ে, একবার থেমে ঘুমন্ত একটা শিশুর গায়ে ঠিকমত টেনে দিল কম্বলটা, আরেকবার থামল গর্ভবতী একজন আরোহিণীর অভিযোগ শোনার জন্যে। মহিলার স্বামী টেক্সাসের একজন নিউরোসার্জেন।

'বাচ্চারা আর আপনি সবার আগে প্লেন থেকে নামবেন–কথা দিলাম।'

নিঃসাড় ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে ঝুঁকল সে। জানতে চাইল, 'এখন কেমন আছে ও?'

'ঘুমোচ্ছে। মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়েছি।' মুখের ভেতর আরও কি যেন বিড়বিড় করে বলল মোটাসোটা ডাক্তার, জেসিকার দিকে একবারও তাকাল না। এঞ্জিনিয়ারের আহত হাতটা উঁচু করে স্লিঙের সাথে বাঁধা হয়েছে, রক্ত বন্ধ করার জন্যে, ক্ষতের ওপর ব্যান্ডেজ তো আছেই।

ডাক্তারের কাঁধে নরম একটা হাত রাখল জেসিকা। 'অনেক করেছেন আপনি। ধন্যবাদ।' অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল ডাক্তার। জেসিকা হাসছে, কিন্তু ডাক্তারের চোখে ঘৃণার ভাবটুকু তার চোখ এড়ায়নি। নিচু গলায়, যেন আর কেউ শুনতে না পায়, জিজ্ঞেস করল সে, 'উনি আপনার স্ত্রী?' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ডাক্তার, কাছাকাছি একটা সীটে বসা মোটাসোটা ইহুদি মহিলার দিকে একবার তাকাল। 'আমি দেখব উনি যাতে প্রথম দলটার সাথে নামতে পারেন,' ফিসফিস করে বলল জেসিকা। ডাক্তারের চেহারায় কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল। সিধে হয়ে আবার হাঁটা ধরল জেসিকা।

ট্যুরিস্ট কেবিনের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল লাল শার্ট পরা জার্মান যুবক, দ্বিতীয় গ্যালির পর্দা ঢাকা দরজার পাশে। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, ফ্যানাটিক। দু'টুকরো আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে চোখ, লম্বা চুলে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে কাঁধ, ওপরের ঠোঁটের এক কোণে সাদা একটা শুকনো ক্ষতচিহ্ন থাকায় মনে হয় সারাক্ষণ যেন ভেঙচাচ্ছে।

'বার্চ, সব ঠিক আছে তো?'

'খাই খাই করছে সবাই।'

'আরও দু'ঘণ্টা পর খেতে দেয়া হবে, তবে পেট ভরে নয়–,' ঘাড় ফিরিয়ে গোটা কেবিনটা ঘৃণাভরে একবার দেখে নিল জেসিকা, '–চর্বি,' হিসহিস করে বলল সে, '–চর্বিসর্বস্ব বুর্জোয়া শূকর এক একটা।' পর্দা সরিয়ে গ্যালিতে ঢুকল সে, ঘাড় ফিরিয়ে বার্চের দিকে আমন্ত্রণ ভরা চোখে তাকাল। চকচকে চোখ নিয়ে তার পিছু নিল বার্চ, গ্যালিতে ঢুকে পর্দাটা টেনে দিল ভাল করে।

'ক্লারা কোথায়?' বার্চ তার কোমরের বেল্ট খুলছে দেখে জিজ্ঞেস করল জেসিকা। এখুনি এক দফা সুখ দরকার তার, সাদা ব্যান্ডেজের গায়ে লাল রঙ আর

উত্তেজনা তার শরীরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে।

'বিশ্রাম নিচ্ছে, কেবিনের পিছনে। কেউ ডিসটার্ব করবে না আমাদের।'

শর্টসের চেইনটা নিচের দিকে টেনে দিল জেসিকা। 'ঠিক আছে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি, বার্চ, মনে থাকে যেন,' চাপা গলায় বলল সে। 'ঝটপট।'

ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের সীটে বসে আছে জেসিকা, তার কাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো চুল ক্লারা। ক্লারার পরনে উজ্জ্বল লাল স্কার্ট, কাঁধ থেকে ঝুলে আছে কার্ট্রিজ বেল্টটা। কোমরে জড়ানো হোলস্টারে কুৎসিত পিস্তল।

জেসিকার হাতে ধরা মাইক্রোফোনটা ঠোঁটের কাছে তোলা, অপর হাতের আঙুল দিয়ে সে তার সোনালি চুলে বিলি কাটছে। শান্ত গলায় কথা বলছে সে। '–একশো নব্বই জন ব্রিটিশ নাগরিক, দু'জন ভারতীয়, একজন চীনা, একজন থাই, দু'জন বাংলাদেশী, তিনজন পাকিস্তানী, একজন বার্মীজ, দু'জন জাপানী, একজন ফিলিপিনো, দু'জন আফগান, আর একশো একচল্লিশ জন আমেরিকান–' বন্দীদের তালিকা পড়ছে সে। 'একশো বাইশ জন মেয়ে, বাচ্চাকাচ্চা ছাব্বিশটা, ছয় থেকে দশ বছর বয়স।' প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে কথা বলছে সে, এতক্ষণে নড়েচড়ে বসল সীটে। মুখ ফিরিয়ে ক্লারার দিকে তাকিয়ে হাসল, উত্তরে তার সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে দিল ক্লারা।

'আমরা আপনার শেষ ট্রান্সমিশন কপি করেছি।'

'নাম ধরে ডাকো আমাকে। আমি জেসিকা, বলিনি?' যেন রসিকতা করছে, হাসিতে দুষ্টামির ভাব। অপরপ্রান্তে এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা, ধাক্কাটা সামলাতে সময় নিল কন্ট্রোলার।

'রজার, জেসিকা। আমাদের জন্যে আর কোন মেসেজ আছে আপনার?'

'একজন মুখপাত্র চাই আমি, দু'ঘন্টার মধ্যে। আরোহীদের মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে আমার কিছু শর্ত আছে, তার কাজ হবে কথাগুলো মন দিয়ে শোনা।'

'স্ট্যান্ড বাই, জেসিকা। অ্যামব্যাসাডরদের সাথে কথা বলার পরপরই আবার আমরা ফিরে আসব।'

'ন্যাকামি বাদ দাও, টাওয়ার,' ঝাঁঝের সাথে বলল জেসিকা। 'সবাই আমরা জানি, এই মুহূর্তে ব্রিটিশ আর মার্কিন অ্যামব্যাসাডর তোমাদের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন। ওঁদের বলো, দু'ঘন্টার মধ্যে একজন লোক চাই–তা না হলে প্রথম জিম্মির লাশ দেখবে তোমরা।'

সব কাপড়চোপড় খুলে শুধু একজোড়া বেদিং ট্রাঙ্ক পরেছে রানা, পায়ে ক্যানভাস চপ্পল। সামনাসামনি দেখা করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে জেসিকা, মেয়েটাকে কাছ থেকে মাপজোক করার সুযোগ পেয়ে খুশি হয়েছে ও।

'প্রতিটি মুহূর্ত তোমাকে আমরা কাভার দেব,' রানাকে বলল কার্ল রবসন, ঘন্টা বাজার আগে বক্সারকে ঘিরে কোচ যেমন ব্যস্ত থাকে তেমন আচরণ করছে সে। 'গানারদের সরাসরি নির্দেশ দেব আমি–পার্সোনালি।'

বিশেষভাবে হাতে তৈরি পয়েন্ট টু-টু-টু ম্যাগনাম দেয়া হয়েছে স্নাইপারদের,

প্রচণ্ড ভেলোসিটি আর স্ট্রাইকিং পাওয়ার নিয়ে ব্যারেল থেকে বেরিয়ে আসবে ছোট হালকা বুলেট। ম্যাচ-গ্রেড অ্যামুনিশন, প্রতিটি রাউন্ড হাতের সযত্ন পরশ দিয়ে পালিশ করা হয়েছে। ইনফ্রা-রেড টেলিস্কোপিক সাইট তো আছেই, এক পলকের ব্যবধানে লেজার সাইটও ব্যবহার করা যাবে, ফলে কি দিন কি রাতে অস্ত্রটা হয়ে উঠেছে লক্ষ্যভেদে ভীতিকর রকম অব্যর্থ। প্রায় একই সমতল সরলরেখা ধরে সাতশো গজ পর্যন্ত ছুটবে বুলেট। সন্দেহ নেই, মানুষ খুন করার জন্যেই তৈরি করা হয়েছে ওগুলো। যাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হবে তাকেই লাগবে শুধু, পাশে দাঁড়ানো কাউকে বা আরোহীদের গায়ে আঁচড়টিও কাটবে না। বুলেট হালকা হলেও, তেড়ে আসা গণ্ডারের মত ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে টার্গেট করা লোকটাকে। শরীরের ভেতর ঢুকে বিস্ফোরিত হবে বুলেট, ফলে টার্গেটের পিছনে কেউ থাকলেও তার কোন ক্ষতি হবে না।

'তুমিও যেমন!' হাসল রানা। 'কথা বলতে চায় ওরা, গুলি করবে না-অন্তত এখুনি করবে না।'

'তবু মেয়ে মানুষ তো,' সাবধান করে দিল রবসন। 'কি করতে কি করে বসে। আর এটাকে তো স্রেফ পয়জন বলে মনে হচ্ছে।'

'বন্দুকের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্যামেরা আর সাউন্ড ইকুইপমেন্ট।'

'কয়েকজনের কান মুচড়ে দিয়ে এসেছি, ছবি যা তুলবে অন্ধকার না পেয়ে যায়!' হাতঘড়ি দেখল রবসন। 'যাবার সময় হলো। মহারাণীকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা ঠিক হবে না।' হালকাভাবে রানার কাঁধ চাপড়ে দিল সে। 'দেরি কোরো না, বস্, একসাথে কফি খাব।' শান্ত ভাবে রোদে বেরিয়ে এল রানা, হাত দুটো কাঁধের ওপর তুলল-তালু খোলা, আঙুলগুলো ছড়ানো।

নিজের পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই-শান্ত, নিঃসংকোচ, দৃঢ় ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে রানা। তবু মনে হলো ওর জীবনের দীর্ঘতম পদযাত্রা এটা। বোয়িঙের যত কাছে চলে এল ততই সেটা টাওয়ারের মত উঁচু হতে থাকল, চোখের দৃষ্টি ক্রমশ উঠে গেল আরও ওপরে। জেসিকা ওকে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় আসতে বলেছে, কারণটা শুধু এই নয় যে সাথে অস্ত্র রাখতে পারবে না, মুখপাত্রকে আড়ষ্ট এবং অসহায় অবস্থায় পেতে চায় সে। গেস্টাপো কৌশল, জেরা করার সময় তারাও উলঙ্গ করে নিত বন্দীদের। কিন্তু রানার বেলায় জেসিকাকে নিরাশ হতে হবে। ওর মধ্যে কোন আড়ষ্ট ভাব নেই, বুকের ভেতরটা ধুক্‌ধুক করলেও চেহারায় তার কোন ছাপ নেই-বুক টান করে হাঁটছে ও, নিজের মেদহীন পেটা শরীর নিয়ে গর্বিত। চর্বিবহুল, ভুঁড়ি বিশিষ্ট একটা স্থূল শরীর এই চারশো গজ বয়ে নিয়ে আসতে হলে লজ্জায় মরে যেত রানা।

অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে, এই সময় সামনের দরজা, ককপিটের ঠিক পিছনে, খুলে গেল। চৌকো ফাঁকটায় একজন নয়, একটা দলকে দেখা গেল। চারপাশ কুঁচকে চোখ ছোট করল রানা, ইউনিফর্ম পরা তিনটে মূর্তি-না, চারটে-ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ইউনিফর্ম। দু'জন পাইলট, ওদের মাঝখানে একটা নারীমূর্তি। স্টুয়ার্ডেস।

কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, ওদের পিছনে আরও একটা মাথা,

মনে হলো সোনালি চুল। বাইরে প্রখর রোদ, আর প্লেনের ভেতর আলো কম, ভাল করে দেখা গেল না।

আরও কাছে এসে দেখল ডানদিকে দাঁড়ানো পাইলটের বয়স বেশি, ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা চুল মাথায়, মুখটা গোল। তারমানে কমান্ডার জেংকিনস হবে। যোগ্য লোক, তার সার্ভিস রেকর্ড পড়েছে রানা। কো-পাইলট আর স্টুয়ার্ডেসের দিকে না তাকিয়ে তাদের পিছন দিকে মনোযোগ দিল ও। কিন্তু খোলা হ্যাচের ঠিক নিচে না দাঁড়াবার আগে মেয়েটা ওকে তার চেহারা দেখার সুযোগ দিল না।

চুল নয় যেন সোনালি, কোমল আগুন। মুখ নয় যেন সূর্যমুখী ফুল। মুগ্ধ বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা। কমলা রঙের মুখে রোদের পালিশ, হালকা নীল চোখে কি গভীর সরলতা, রানার মনে হলো সে বুঝি স্বপ্ন দেখছে। বিশ্বাসই হতে চায় না মেয়েটা টেরোরিস্টদের একজন।

কথা বলল মেয়েটা, 'আমি জেসিকা।' রানা ভাবল, কিছু বিষাক্ত ফুল খুব সুন্দর হয়।

'আমি ব্রিটিশ আর মার্কিন সরকারের নির্বাচিত নেগোশিয়েটর,' বলল রানা, পাইলটের মাংসল মুখের দিকে তাকাল। 'তোমার কমান্ডোদের ক'জন রয়েছে প্লেনে?'

'কোন প্রশ্ন নয়!' কঠিন সুরে চিৎকার করল জেসিকা, আর উরুর সাথে সেঁটে থাকা ডান হাতের চারটে আঙুল সিধে করল স্টিফেন জেংকিনস, চেহারায় কোন ভাব ফুটল না।

সংখ্যাটা আগেই আন্দাজ করা হয়েছিল, তবে নিশ্চিতভাবে জানাটা জরুরী ছিল। পাইলটের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। 'শর্ত নিয়ে আলোচনা করার আগে,' বলল ও, 'এবং মানবিক কারণে, তোমার জিম্মিদের সুস্থতা আর আরামের জন্যে কিছু করার আছে কিনা ভাবতে পারি আমরা।'

'সবাইকে যত্নে রাখা হয়েছে।'

'খাবার বা পানির দরকার?'

মাথাটা পেছনদিকে একটু হেলিয়ে মনের আনন্দে প্রাণ খুলে হাসল জেসিকা। 'পানির সাথে ল্যাক্সাটিভ মিশিয়ে দেয়ার মতলব, তাই না? তরল ময়লায় যাতে আমাদের হাঁটু ডুবে যায়? গন্ধে পাগল হয়ে বেরিয়ে যাব?'

প্রসঙ্গটা নিয়ে আর আগে বাড়ল না রানা, অবশ্য ড্রাগ মেশানো খাবার অনেক আগেই তৈরি করে রেখেছে শার্ক কমান্ডের ডাক্তার। 'প্লেনে গুলিতে আহত লোক আছে কেউ?'

'কেউ আহত হয়নি,' হাসি থামিয়ে সরাসরি অস্বীকার করল জেসিকা, কিন্তু দুটো আঙুল দিয়ে গোল একটা আকৃতি তৈরি করল জেংকিনস, হ্যাঁ-সূচক ইঙ্গিত। তার সাদা শার্টের আস্তিনে রক্তের শুকনো দাগও দেখতে পেল রানা। 'যথেষ্ট হয়েছে,' রানাকে সাবধান করে দিল জেসিকা। 'আরেকটা প্রশ্ন করো, আলোচনা বাতিল করে দেয়া হবে...'

'ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি মেনে নিল রানা। 'আর কোন প্রশ্ন নয়।'

পরমুহূর্তে ঝড়ের বেগে কঠিন কঠিন শব্দের বৃষ্টি শুরু হলো, 'এই কমান্ডোর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো নিষ্ঠুর, চণ্ডাল, অমানবিক, নব্য-সাম্রাজ্যবাদী, বর্ণ-বৈষম্যবাদী, বিবেকহীন শোষক, অবৈধ স্বৈরাচারী সরকারকে সমূলে উৎখাত করা, যারা এই সম্পদশালী দেশের বৈধ সন্তানদের দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করে রেখেছে, সংখ্যাগুরু কালো শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করছে এবং সর্বহারা শ্রেণীর মৌলিক মানবাধিকার অস্বীকার করছে।'

জনপ্রিয় কথাবার্তা, সন্দেহ নেই, ভাবল রানা। কে বলবে ওদের উদ্দেশ্য মহৎ নয়? সবার সহানুভূতি আদায়ের জন্যে ভাল একটা ভূমিকা বাছাই করেছে টেরোরিস্টরা। দক্ষিণ আফ্রিকা টার্গেট হিসেবে আদর্শ।

রানা উপলব্ধি করল, দায়িত্ব পালন ওর জন্যে খুব কঠিন হবে।

বিরতিহীন একনাগাড়ে বলে চলেছে মেয়েটা। দীর্ঘ বাক্য, আবেগ ঢালা কাঁপা কাঁপা গলা, সযত্নে চয়ন করা শব্দমালা। তার বলার ভঙ্গিতে ধর্মীয় উন্মাদনার সব রকম লক্ষণ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠল। কোন সন্দেহ নেই মেয়েটা ফ্যানাটিক। ধীরে ধীরে গলা চড়ছে, কর্কশ আর তীক্ষ্ণ। সুন্দর মুখাবয়ব বিকৃত হয়ে উঠল, চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে ঘৃণা আর আক্রোশ। মেয়েটা থামার পর রানা বুঝল, এই মেয়ের পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই। উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে পারে, নিজের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে ঘটিয়ে বসতে পারে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড। শিউরে উঠল ও।

কেউ ওরা কথা বলছে না তবে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পরস্পরের দিকে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল মেয়েটার নিঃশ্বাস। তাকে শান্ত হবার জন্যে সময় দিয়ে অপেক্ষা করছে রানা।

'আমাদের প্রথম দাবি–,' আবার শান্ত গলায় বলল জেসিকা, কড়া চোখে লক্ষ করছে সে রানাকে, '–আমাদের প্রথম দাবি, এইমাত্র আমি যে বিবৃতিটা দিলাম সেটা ব্রিটিশ, মার্কিন, এবং দক্ষিণ আফ্রিকান টেলিভিশন নেটওঅর্কে পড়ে শোনাতে হবে। স্থানীয় সন্ধ্যা সাতটায় পড়তে হবে–লস অ্যাঞ্জেলস, নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, আর জোহানেসবার্গ টিভিতে।' রানা জানে, সাংবাদিকদের কল্যাণে রাতারাতি গোটা দুনিয়ায় প্রচার হয়ে যাবে বিবৃতিটা।

খোলা হ্যাচের সামনে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে জেসিকা, তার হাতে মোটা একটা এনভেলাপ দেখা গেল। 'এতে বিবৃতির একটা কপি আছে, আরও আছে নামের একটা তালিকা। একশো উনত্রিশটা নাম, সবাই এই দেশের অবৈধ সরকারের কারাগারে বন্দী। ওরা সবাই এই দেশের সুযোগ্য সন্তান, সংখ্যাগরিষ্ঠ কালোদের মহান নেতা।' এনভেলাপটা বাতাসে ছুঁড়ে দিল সে, রানার পায়ের কাছে পড়ল সেটা।

'আমাদের দ্বিতীয় দাবি,' আবার বলল জেসিকা। 'তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের সবাইকে একটা প্লেনে সুস্থ অবস্থায় তুলে দিতে হবে। প্লেনের ব্যবস্থা করবে স্বৈরাচারী সরকার। ওই একই প্লেনে থাকতে হবে এক মিলিয়ন গোল্ড ক্রুগার র‍্যান্ড কয়েন, তা-ও এই ডাকাত সরকারকে যোগাড় করতে হবে। মুক্ত রাজনৈতিক নেতারা যেখানে, যে-দেশে যেতে চাইবেন সেখানে, সে-দেশে তাদের

পৌঁছে দিতে হবে। সোনাগুলো তারা ব্যবহার করবে প্রবাসী সরকার গঠনের তহবিল হিসেবে...'

ঝুঁকে এনভেলাপটা তুলল রানা। দ্রুত হিসেব করছে ও। একটা ক্রুগার র‍্যান্ড মুদ্রার দাম হবে কম করেও একশো সত্তর মার্কিন ডলার। তারমানে টেরোরিস্টরা একশো সত্তর মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাবি করছে। আরও একটা হিসেব আছে। 'এক মিলিয়ন ক্রুগারের ওজন হবে চল্লিশ টনের বেশি,' জেসিকাকে বলল ও। 'একটা প্লেনে কিভাবে তোলা হবে সব?'

মেয়েটা ইতস্তত করতে লাগল। সব কিছু ওরা নিখুঁতভাবে প্ল্যান করেনি বুঝতে পেরে মনে মনে খুশি হলো রানা। ছোট হলেও, একটা ভুল যদি করে থাকে, আরও ভুল করে থাকতে পারে।

'ট্র্যান্সপোর্টের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবৈধ সরকারকেই করতে হবে,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল জেসিকা, মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে সে।

'আর কিছু?' জিজ্ঞেস করল রানা। ওর খোলা কাঁধে গরম ছ্যাঁকা দিচ্ছে রোদ, পাঁজর বেয়ে ঘামের ধারা নামছে।

'মুক্ত নেতাদের আর সোনা নিয়ে কাল দুপুরের আগে রওনা হবে প্লেন, তা না হলে আমরা জিম্মিদের খুন করতে শুরু করব।'

গলা শুকিয়ে গেল রানার। যে মেয়ে এত সহজে 'খুন করব' উচ্চারণ করতে পারে তার পক্ষে সবই সম্ভব।

'নেতাদের নির্বাচিত গন্তব্যে প্লেনটা পৌঁছুলে, আমাদের কাছে আগে থেকে ঠিক করা একটা কোড মেসেজ পাঠানো হবে–তারপর আমরা বোয়িঙের শিশু আর মেয়েদের মুক্ত করে দেব।'

'আর পুরুষদের?'

'সোমবার, ছয় তারিখে, আজ থেকে তিন দিন পর, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে একটা প্রস্তাব তুলতে হবে। প্রস্তাবটা তোলাতে হবে সিরিয়া বা ইরানকে দিয়ে। প্রস্তাবে দাবি করা হবে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে সব রকম আর্থিক সাহায্য দেয়া বন্ধ করা হোক। আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা কোন রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান অবৈধ সরকারকে কোন রকম আর্থিক সহায়তা দিতে পারবে না। ইতিমধ্যে যে-সব আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা-ও বাতিল করতে হবে। সমস্ত বিদেশী পুঁজি প্রত্যাহার করিয়ে নিতে হবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তেল রফতানী এবং সবরকম ব্যবসার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করতে হবে। ট্র্যান্সপোর্ট এবং কমিউনিকেশন লিঙ্ক কেটে দিতে হবে। জাতিসংঘের শান্তিবাহিনী মোতায়েন করে সবগুলো এয়ারপোর্ট আর বন্দরের তৎপরতা থামিয়ে দিতে হবে। এবং জাতিসংঘের ইন্সপেক্টরদের তত্ত্বাবধানে স্থগিত করা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।'

কি ঘটতে পারে কল্পনা করার চেষ্টা করল রানা। সিরিয়া বা ইরানকে দিয়ে সাধারণ পরিষদে তোলা যেতে পারে প্রস্তাবটা, বিপুল ভোটের ব্যবধানে পাসও হয়ে যেতে পারে, কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাবটা পাঠানো হলে ভেটো দেয়া হবে।

যেন রানার মনের কথা বুঝতে পেরেই আবার মুখ খুলল জেসিকা, 'নিরাপত্তা পরিষদের কোন সদস্য–আমেরিকা, ব্রিটেন, বা ফ্রান্স–যদি প্রস্তাবটার বিরুদ্ধে ভেটো দেয়, বোয়িং জিরো-সেভেন-জিরো হাই এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে।'

বোকা আর বোবা হয়ে গেল রানা। হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ফুলের মত সুন্দর কচি মেয়েটার দিকে। এত তাজা আর পবিত্র লাগছে দেখে, বাচ্চা একটা মেয়ে বলেই মনে হলো তাকে ওর। আবার যখন কথা বলার শক্তি ফিরে পেল, গলার কর্কশ আওয়াজ শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল ও, 'তোমাদের সাথে হাই এক্সপ্লোসিভ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না!'

'ধরো!' চিৎকার করে বলল জেসিকা, জিনিসটার ওজন অনুভব করে অবাক হয়ে গেল রানা। ধরার পরপরই চিনতে পারল ও। 'ইলেকট্রনিক্যালি ফিউজড।' হাসছে মেয়েটা। 'এত আছে যে তোমাকে একটা নমুনা হিসেবে দিতে পারলাম!'

নিজের বুকে হাত রেখে রানাকে কি যেন বলার চেষ্টা করছে স্টিফেন জেংকিনস, কিন্তু রানার মনোযোগ রয়েছে হাতের গ্রেনেডটার দিকে। ও জানে এ-ধরনের একটা গ্রেনেডই বোয়িং আর তার চারশো আরোহীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

পাইলট ওকে কি বলতে চাইছিল? আবার বুকে হাত দিয়েছে সে, কি বলতে চায়? মেয়েটার গলার দিকে তাকাল রানা। গলা জড়িয়ে থাকা স্ট্র্যাপে ছোট একটা ক্যামেরা ঝুলছে। গ্রেনেড আর ক্যামেরার সাথে কোন সম্পর্ক আছে? পাইলট কি সে কথাই বলার চেষ্টা করছে ওকে?

আবার কথা বলছে মেয়েটা, 'তোমার মনিবদের কাছে নিয়ে যাও ওটা, ঘেমে গোসল হোক তারা। সারা দুনিয়ার সর্বহারা মানুষের অভিশাপ রয়েছে তাদের ওপর। বিপ্লব আজ এবং এখানেই।' হ্যাচের দরজা সাঁৎ করে বন্ধ হয়ে গেল, ক্লিক করে তালা লাগার আওয়াজ পেল রানা।

দীর্ঘ পথ ধরে আবার ফিরে আসছে ও, এক হাতে গ্রেনেড আরেক হাতে এনভেলাপ। ভয় আর দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে গেছে মুখ।

হকারের হ্যাচওয়ে থেকে সরে গিয়ে রানাকে পথ করে দিল রবসন, চেহারা থেকে উধাও হয়েছে হাসি। ওভারঅলের বোতাম লাগাচ্ছে রানা, রবসন বলল, 'ড. ওয়ার্নার স্ক্রীনে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, বস্। তোমাদের প্রত্যেকটা কথা কপি করেছি আমরা, টেলিপ্রিন্টারে ওনাকেও কপি পাঠানো শুরু হয়েছে।'

'পরিস্থিতি খারাপ, কার্ল।'

'আরও খারাপ খবর তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে, বস্,' বলল রবসন। 'ড. ওয়ার্নারের সাথে আগে কথা বলে নাও।'

রবসনকে এক রকম ধাক্কা দিয়ে কমান্ড কেবিনে ঢুকল রানা, কমান্ড চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল। স্ক্রীনে দেখা গেল ডেস্কের ওপর ঝুঁকে বসে আছেন ড. ওয়ার্নার, টেলিপ্রিন্টার শীটের ওপর চোখ বুলাচ্ছেন, ঠাণ্ডা খালি পাইপটা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে।

স্ক্রীনের বাইরে দাঁড়ানো কমিউনিকেশন ডিরেক্টরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মেজর মাসুদ রানা, স্যার।'

মুখ তুলে তাকালেন ড. ওয়ার্নার। 'রানা। এই মুহূর্তে আমরা একা–তুমি আর আমি। সার্কিট বন্ধ করে দিয়েছি আমি, মাত্র একটা টেপ-রেকর্ড চালু আছে। আমি তোমার প্রথম প্রতিক্রিয়া জানতে চাই, তারপর আমি রিপোর্ট করব স্যার কীথ আর টিম ও'মেয়ারকে। স্যার কীথ মারটেল আর টিম ও'মেয়ার দক্ষিণ আফ্রিকায়-যথাক্রমে ব্রিটিশ আর আমেরিকান অ্যামব্যাসাডর।'

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল রানা।

একটু অধৈর্যের সাথে আবার বললেন ড. ওয়ার্নার, 'আমি তোমার প্রথম প্রতিক্রিয়া জানতে চাই।'

'উই আর ইন সিরিয়াস ট্রাবল, ড. ওয়ার্নার,' বলল রানা, মস্ত মাথাটা সায় দেয়ার ভঙ্গিতে ঝাঁকালেন ড. ওয়ার্নার।

'টেরোরিস্টদের সামর্থ্য, কতটুকু?'

'আমার এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্টরা গ্রেনেডটা পরীক্ষা করছে। তবে কোন সন্দেহ নেই যে জিরো-সেভেন-জিরোকে ধ্বংস করতে পারবে ওরা। আরোহীদের সহ।'

'তারমানে সাইকোলজিকাল কেপ্যাবিলিটিও আছে?'

'প্রচুর। ওরা বিশ্বাস করে ডেস্ট্রাকশনই একমাত্র ক্রিয়েটিভ অ্যাক্ট। বিশ্বাস করে ভায়োলেন্সই মানুষকে নবজন্ম দেয়। সার্ত্রে কি বলেছেন আপনি জানেন–বিপ্লবী যখন কাউকে খুন করে তখন একজন অত্যাচারী মারা যায় এবং একজন মুক্ত মানুষের আবির্ভাব ঘটে।'

'মেয়েটা কি সবটুকু পথ যাবে?'

'যাবে।' ইতস্তত না করে বলল রানা। 'তাকে বাধ্য করা হলে অবশ্যই যাবে।'

অ্যাশট্রেতে পাইপের ঠাণ্ডা ছাই ঝাড়লেন ড. ওয়ার্নার। 'হ্যাঁ, ওর সম্পর্কে এখানে যা জানা যাচ্ছে তার সাথে তোমার কথা মিলে যায়।'

'ওর সম্পর্কে জানতে পেরেছেন?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওর ভয়েস প্রিন্ট পাওয়া গেছে, আর ক্রস-ম্যাচের সাহায্যে ওর ফেশিয়াল স্ট্রাকচার প্রিন্ট তৈরি করে ফেলেছে কমপিউটার।'

'কে ও?'

'জন্মের পর ওর নাম রাখা হয় মিরান্ডা গ্যালেন, জার্মানি থেকে আসা থার্ড জেনারেশন আমেরিকান পরিবারের মেয়ে। বাবা সফল একজন ডেন্টিস্ট ছিল, মা মারা যায় উনিশশো পঁচাত্তরে। মেয়েটার বয়স সাতাশ–' আশ্চর্য হয়ে গেল রানা, এত বেশি! 'আই.কিউ. একশো আটত্রিশ, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে মডার্ন পলিটিক্যাল হিস্টরী নিয়ে পড়াশোনা করেছে। এস.ডি.এস-এর মেম্বার–এস.ডি.এস. মানে স্টুডেন্টস ফর ডেমোক্র্যাটিক সোসাইটি…'

'হ্যাঁ,' অধৈর্য হয়ে উঠল রানা।

'পারমাণবিক যুদ্ধ-বিরোধী বিক্ষোভে নিয়মিত অংশ নিয়ে, আর মারিজুয়ানা পাচার করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়, কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। তৃতীয়বার গ্রেফতার হয় বাটলার ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বোমাবাজি করার

অভিযোগে, কিন্তু আবারও প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যায়। আশি সালে আমেরিকা ছেড়ে চলে যায়, আরও পড়াশোনা করার জন্যে ভর্তি হয় জার্মানির ডুসেলডর্ফ ইউনিভার্সিটিতে। বিরাশি সালে পলিটিক্যাল ইকোনমিক্সে মাস্টার ডিগ্রী নেয়। এই সময় বাদের-মেইনহফের প্রথম সারির নেতাদের সংস্পর্শে আসে। পশ্চিম জার্মানির নামকরা ব্যবসায়ী ম্যানডেল বটারকে যারা খুন করে তাদের মধ্যে সে-ও ছিল বলে সন্দেহ করা হয়। তারপর অনেক দিন তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। শোনা যায়, সিরিয়া, তারপর লিবিয়ায় কমান্ডো ট্রেনিং নেয় সে...'

'হ্যাঁ,' ড. ওয়ার্নার থামার আগেই আবার বলল রানা, 'সবটুকু পথ যাবে সে।'

'আর কি মনে হয়েছে তোমার?'

'খুব উঁচু মহল থেকে প্ল্যানটা করা হয়েছে, কোন সরকার জড়িত থাকলেও আশ্চর্য হব না...'

'তোমার এরকম মনে হবার কারণ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ড. ওয়ার্নার।

'জাতিসংঘে কোন্ রাষ্ট্রকে দিয়ে প্রস্তাবটা তুলতে হবে তা-ও ওরা বলে দিচ্ছে...'

'ঠিক আছে, বলে যাও।'

'এমন একটা দেশ বেছে নিয়েছে ওরা যেখানে সত্যি সত্যি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে,' বলল রানা। 'ব্রিটেন আর আমেরিকার সচেতন মানুষ ওদের দাবি শুনে বলবে, অযৌক্তিক নয়। টেরোরিস্টরা জানে, তাদের দাবি আদায়ের শতকরা আশি ভাগ সম্ভাবনা রয়েছে। জিম্মিরা বেশির ভাগ আমেরিকান আর ব্রিটিশ, এই দু'দেশের লোক তাদের চারশো ভাই-বেরাদারকে হারাতে চাইবে না, ফলে টেরোরিস্টদের দাবি মেনে নেয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করবে সরকারের ওপর...'

'তোমার কি মনে হয় টেরোরিস্টরা কোন আপোষ রফায় আসবে?'

'আসতে পারে,' এক সেকেন্ড চিন্তা করে বলল রানা। 'কিন্তু আপনি জানেন, এ-ধরনের লোকদের সাথে আপোষ করার বিরোধী আমি।'

'এমনকি এই গুরুতর পরিস্থিতিতেও, রানা?'

'বিশেষ করে এই গুরুতর পরিস্থিতিতেই, ড. ওয়ার্নার। টেরোরিস্টদের দাবি সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমরা কে কতটুকু সহানুভূতিশীল সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। ওরা হয়তো ন্যায্য দাবিই করছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কাজ করছি। ওরা যদি জেতে, জিতটা হবে বন্দুকের। এবং ওদের জিততে দিলে মানবসভ্যতার ক্ষতি করা হবে।'

কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে পাইপে তামাক ভরলেন ড. ওয়ার্নার, অগ্নিসংযোগ করলেন, তারপর জানতে চাইলেন, 'পাল্টা আঘাত হানলে সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু?'

রানা জানত, প্রশ্নটা আসবে, তবু কিছুক্ষণ ইতস্তত করল ও। তারপর বলল, 'আধঘণ্টা আগে হলে আমি বলতাম, শতকরা নব্বই ভাগ সম্ভাবনা, হতাহত হবে শুধু টেরোরিস্টরা।'

'কিন্তু এখন?'

'এখন আমি জানি, ওরা আবেগতাড়িত অ্যামেচার নয়। আমাদের মতই ট্রেনিং পাওয়া লোক ওরা, ইকুইপমেন্টও আছে। কয়েক মাস প্রস্তুতি নেয়ার পর হাত দিয়েছে কাজে···'

'কিন্তু এখন?' আবার উত্তর চাইলেন ড. ওয়ার্নার।

'ইয়েলো কন্ডিশনে শতকরা ষাট ভাগ সম্ভাবনা আছে সফল হবার–দু'পক্ষের মিলে অন্তত দশজন হতাহত হবে।'

'বিকল্প উপায়?'

'নেই, ড. ওয়ার্নার। আমরা ব্যর্থ হলে কেউ বাঁচবে না– প্লেনটা ধ্বংস হবে, আরোহীরা সবাই মারা পড়বে, শার্ক কমান্ডের অপারেটররা খুন হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, রানা,' বলে চেয়ারে হেলান দিলেন ড. ওয়ার্নার। 'লাইনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা করছেন, ওঁদের সাথে কথা বলব এখন। অ্যামব্যাসাডরদের ব্রিফিং করার পর আবার ফিরে আসব তোমার কাছে এক ঘণ্টার মধ্যে।'

রানাও হেলান দিল চেয়ারে, উপলব্ধি করল কাজে নেমে পড়ার জন্যে মনটা ছটফট করছে ওর। কলিং বেল বাজাল ও, কমান্ড কেবিনের সাউন্ড-প্রুফ দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রবসন।

'গ্রেনেড খুলে পরীক্ষা করা হয়েছে,' বলল সে। 'এক্সপ্লোসিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সোভিয়েত সি.জে. কমপোজিশন, ফিউজিংটা কোন ফ্যাক্টরির তৈরি। প্রফেশনাল স্টাফ, কাজের জিনিস।'

রানার ধারণাই ঠিক, মেয়েটা মিথ্যে বলেনি–একটা দিয়েই উড়িয়ে দেয়া যাবে প্লেন।

'নামের তালিকা আর বিবৃতি ওয়াশিংটন পাঠানোর জন্যে টেলিপ্রিন্টারে দেয়া হয়েছে–,' সামনের দিকে ঝুঁকে কেবিন ইন্টারকমের সুইচ অন করল রবসন, মাউথপীসে বলল, 'লুপটা চালাও–প্রথমে সাউন্ড ছাড়া।' তারপর রানার দিকে ফিরল। 'খারাপ খবর আছে, বলেছিলাম না?'

ভিডিও করা ছবি মাঝখানের স্ক্রীনে ফুটে উঠল। অবজার্ভেশন পোস্ট থেকে পরিষ্কারভাবে তোলা হয়েছে। শুরু হলো রানাকে দিয়ে, নগ্ন পিঠ আর কাঁধে উজ্জ্বল রোদ নিয়ে বোয়িঙের দিকে দৃঢ় পায়ে হেঁটে যাচ্ছে ও। হঠাৎ করে বোয়িঙের দরজা খুলে গেল, কাছ থেকে ছবি নেয়ার জন্যে ক্যামেরাম্যান তার ক্যামেরা জুম করল।

দু'জন পাইলট আর এয়ার হোস্টেস দাঁড়িয়ে রয়েছে দোরগোড়ায়, এক মুহূর্ত স্থির থেকে আবার জুম করল ক্যামেরা। লেন্সের অ্যাপারচার দ্রুত অ্যাডজাস্ট করা হলো, এক পলকের জন্যে মেয়েটার সোনালি মাথা পরিষ্কার দেখা গেল, কিন্তু তারপরই একটু ঘুরে গেল মুখটা, তার কমলা কোষের মত সুন্দর ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠল। কাকে যেন কি বলল জেসিকা, মনে হলো তিনটে শব্দ উচ্চারণ করল সে। তারপর ঘাড় সোজা করে ক্যামেরার দিকে ফিরল।

'ওকে,' বলল রবসন। 'আবার চালাও, এবার সাউন্ডে নিউট্রাল ব্যালান্স দিয়ে।'

গোটা লুপটা আবার চালানো হলো। কেবিনের দরজা খুলল, তিনজন

জিম্মিকে দেখা গেল, সোনালি চুল নিয়ে মাথাটা ঘুরল, আর তারপরই জেসিকার গলা শোনা গেল, 'লেট'স রান।' কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে হিস-হাস আর শোঁ-সাঁ আওয়াজ হচ্ছে।

'লেট'স রান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আবার চালাও, এবার ডেনসিটি ফিল্টার ব্যবহার করো,' নির্দেশ দিল রবসন।

সেই একই দৃশ্য ফুটে উঠল স্ক্রীনে, লম্বা ঘাড়ের ওপর সোনালি মাথা ঘুরল।

'লেট'স রান।' কিন্তু রানার মনে হলো পরিষ্কার শুনতে পায়নি ও।

'ওকে,' টেকনিশিয়ানকে বলল রবসন, 'এবার ফুল ফিল্টার দাও, ফুল ভলিউমে প্রতিধ্বনি হোক।'

একই দৃশ্য, মেয়েটার মাথা, সরু ঠোঁট ফাঁক হলো, স্ক্রীনের বাইরে দাঁড়ানো কাউকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলল।

এবার শুনতে ভুল হলো না। পরিষ্কার গলায় জেসিকা বলল, 'ইট'স রানা।' শোনার সাথে সাথে অদৃশ্য হাতের প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেলো রানা তলপেটে।

'মেয়েটা তোমাকে চেনে,' বলল রবসন। 'উঁহুঁ, শুধু চেনে বলছি কেন–তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল!'

দু'জন ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল, রানার প্রশস্ত কপালে দুশ্চিন্তার রেখা। অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশনের কথা অনেকেই জানে, কিন্তু শার্ক কমান্ডের অস্তিত্ব হাতে গোণা মাত্র কয়েকজন লোক ছাড়া কেউ জানে না–একেবারেই টপ সিক্রেট। সেন্ট্রাল কমিটির তিন-চারজন বাদে বাইরের আরও হয়তো পাঁচ-ছয়জন জানতে পারে, তাদের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট একজন। অথচ জেসিকার কথাগুলো শুনতে ওরা ভুল করেনি।

শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় নির্দেশ দিল রানা, 'আবার চালাও।'

দুটো শব্দের জন্যে উত্তেজনার সাথে অপেক্ষা করে থাকল ওরা, জেসিকার প্রাণবন্ত কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। 'ইট'স রানা,' বলল জেসিকা, তারপর খালি হয়ে গেল স্ক্রীন।

পাতা বন্ধ করে একটা আঙুল দিয়ে চোখ রগড়াল রানা। মনে পড়তে একটু অবাক হলো গত প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা ঘুমায়নি ও। কিন্তু শারীরিক ক্লান্তি নয়, কেউ বেঈমানী করেছে উপলব্ধি করে বিধ্বস্ত লাগছে নিজেকে।

'কেউ শার্ক কমান্ডের অস্তিত্ব ফাঁস করে দিয়েছে,' নরম গলায় বলল রবসন। 'বোঝাই যাচ্ছে, শক্তিশালী কোন একটা মহল থেকে মদদ পাচ্ছে টেরোরিস্টরা।'

হাত নামিয়ে চোখ খুলল রানা। 'ড. ওয়ার্নারের সাথে এখুনি কথা বলতে হবে,' বলল ও। স্ক্রীনে ড. ওয়ার্নারের ছবি আসার পর দেখা গেল বেশ বিরক্ত হয়েছেন তিনি।

'আমি প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলছিলাম, রানা!'

'ড. ওয়ার্নার,' দ্রুত বলল রানা, 'পরিস্থিতি বদলে গেছে। কন্ডিশন ইয়েলোতে পাল্টা আঘাত হানলে আমাদের সফল হবার সম্ভাবনা কমে গেছে। ফিফটি ফিফটি চান্স, তার বেশি নয়।'

'আই সী,' গভীর সুরে বললেন ড. ওয়ার্নার। 'ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক আছে, প্রেসিডেন্টকে আমি জানাচ্ছি।'

ইতিমধ্যে ল্যাভেটরির ধারণ ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে, এয়ারকন্ডিশনিং চালু থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি কেবিনে ছড়িয়ে পড়েছে দুর্গন্ধ। খাবার আর পানির বরাদ্দ খুব কম, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাহিল হয়ে পড়েছে আরোহীরা। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বাচ্চাদের, কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে উঠেছে তাদের, বেশিরভাগই ঝিমাচ্ছে।

উত্তেজিত হাইজ্যাকারদের চেহারাতেও ক্লান্তির ছাপ ফুটতে শুরু করেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে তাদের, বিশ্রামের চার ঘণ্টা সময়ের সবটুকু ঘুমাতে পারে না। লাল সুতী শার্টের ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে, বগলের কাছে ঘামে ভেজা। চোখগুলো লালচে, অনিশ্চিত মেজাজ।

সন্ধ্যা লাগার পরপরই কালো-চুল ক্লারা বয়স্ক একজন আরোহীর ওপর খেপে গেল। টয়লেট থেকে বেরিয়ে নিজের সীটে ফিরতে দেরি করছিল লোকটা। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রুগিণীর মত তারস্বরে চেঁচাতে লাগল ক্লারা, শট পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে বুড়ো মানুষটার মুখে বারবার আঘাত করল, চোয়াল কেটে বেরিয়ে পড়ল সাদা হাড়। শুধু জেসিকা শান্ত করতে পারল ক্লারাকে, হাত ধরে পর্দা ঘেরা ট্যুরিস্ট গ্যালিতে নিয়ে চলে গেল তাকে। ওখানে তাকে জড়িয়ে ধরে আদর করল জেসিকা।

'সব ঠিক হয়ে যাবে, ডিয়ার,' ক্লারার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল সে। 'আর তো বেশি দেরি নেই। ঘণ্টা কয়েক পর পিল খাব আমরা, তাই না?'

থরথর করে কাঁপছিল ক্লারা, জেসিকার কথা শুনে কাঁপুনিটা বন্ধ হলো। একটু পর ম্লান চেহারা নিয়ে ট্যুরিস্ট কেবিনের পিছনে আবার সে তার পজিশনে ফিরে গেল।

একমাত্র জেসিকার শক্তিতে কোন ভাটা পড়েনি। রাতের বেলা একা একা প্যাসেজ ধরে হাঁটাহাঁটি করল সে, ঘুমাতে না পারা দু'একজন আরোহীর সাথে হালকা সুরে কথাবার্তা বলল, প্রত্যেককেই আশ্বাস-বাণী শোনাল, আর কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই আপনারা মুক্তি পেয়ে যাবেন।

মাঝরাতের খানিক পর মোটাসোটা, ছোটখাট ডাক্তার তার খোঁজে ককপিটে ঢুকল। 'নেভিগেটরের অবস্থা খুব খারাপ,' বলল সে। 'এখুনি যদি তাকে হাসপাতালে পাঠানো না হয়, লোকটা মারা যাবে।'

ডাক্তারের সাথে বেরিয়ে এসে ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের ওপর ঝুঁকে পড়ল জেসিকা। পায়ের চামড়া শুকিয়ে গেছে এঞ্জিনিয়ারের, পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তার।

'প্রস্রাব হচ্ছে না,' বলল ডাক্তার। 'ডিলেইড শক থেকে কিডনির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে ওর চিকিৎসা সম্ভব নয়। এখুনি ওকে হাসপাতালে পাঠানো দরকার।'

অচেতন ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের অক্ষত হাতটা ধরল জেসিকা। 'আমি দুঃখিত, কিন্তু তা সম্ভব নয়।' হাতটা অবশ্য ছাড়ল না।

'আপনি কি!' ডাক্তারের চাপা গলা কেঁপে গেল। 'একটু মায়াও লাগছে না?'

'লাগছে–কিন্তু আমার সে মায়া তো গোটা মানবজাতির জন্যেও,' শান্ত গলায় বলল জেসিকা। 'ও তো মাত্র একজন। কিন্তু বাইরে ওখানে কয়েকশো কোটি কষ্ট পাচ্ছে না?'

সাত

প্রায় সারা রাত ধরে কেবিনেট মীটিং চলল। বুল-ডগ আকৃতির মাথা আর দানব আকৃতির দেহ নিয়ে টেবিলের এক মাথায় বেশিরভাগ সময় নিঃশব্দে বসে থাকলেন প্রাইম মিনিস্টার, মাঝে মধ্যে শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অসম্মতি বা অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তাঁর দু'পাশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বসেছেন, কথা যা বলার তাঁরাই বললেন। টেবিলের আরেক প্রান্তে বসেছেন ব্রিটেন আর আমেরিকার অ্যামব্যাসাডর, তাঁদের সামনে রাখা টেলিফোন প্রায়ই বেজে উঠছে, দূতাবাস থেকে সর্বশেষ খবর বা স্ব স্ব সরকারের কাছ থেকে জরুরী নির্দেশ পাচ্ছেন তাঁরা।

'আপনার নিজের সরকার এতদিন টেরোরিস্টদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার কথা বলে এসেছে, অন্যান্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে ওদের সাথে আপোষ করা একদম উচিত হবে না, অথচ আজ আপনারা চাইছেন ওদের সাথে আমরা যেন নরম ব্যবহার করি...'

'আমরা জোর করছি না,' দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে মার্কিন অ্যামব্যাসাডর টিম ও'মেয়ার বললেন। 'আমরা শুধু পাবলিক সেন্টিমেন্টের কথা ভেবে একটা আপোষ রফার পরামর্শ দিচ্ছি।'

'স্পট থেকে সেন্ট্রাল কমিটি জানিয়েছে পাল্টা আঘাত হানলে সাফল্যের সম্ভাবনা আধাআধি,' বললেন ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর স্যার কীথ মারটেল। 'আমার সরকার মনে করে এই ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়।'

সুযোগ পেয়ে আবার মুখ খুললেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী, 'আমাদের সেনাবাহিনীর গেরিলা ইউনিট মনে করে তারা আরও সাফল্যের সাথে পাল্টা আঘাত করতে পারবে...'

'কিন্তু সেন্ট্রাল কমিটির আন্ডারে যে কমান্ডো টীম দায়িত্বে রয়েছে তারা সম্ভবত দুনিয়ার সেরা ট্রেনিং পাওয়া অ্যান্টি-টেরোরিস্ট গ্রুপ,' টিম ও'মেয়ার বললেন, তাঁকে বাধা দিলেন প্রাইম মিনিস্টার।

'এই পর্যায়ে, জেন্টলমেন, আসুন আমরা বরং শান্তিপূর্ণ একটা উপায় খুঁজে বের করি।'

'আমি একমত, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার।' স্যার কীথ মারটেল মাথা ঝাঁকালেন।

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার,' টিম ও'মেয়ার বললেন, 'টেরোরিস্টরা ব্রিটিশ এবং মার্কিন প্রতিনিধির কাছে তাদের দাবি জানিয়েছে...'

'স্যার, আপনি কি টেরোরিস্টদের দাবি সম্পর্কে সহানুভূতি প্রকাশ করছেন?' সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন প্রাইম মিনিস্টার।

'আমি পাবলিক সেন্টিমেন্টের দিকে লক্ষ করতে বলি, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার। ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। আপনারা যদি টেরোরিস্টদের কিছু কিছু দাবি মেনে নেন তাহলে জাতিসংঘের প্রস্তাবে ভেটো দেয়া আমাদের জন্য সহজ হবে।'

'এটা কি একটা হুমকি, স্যার?' আবারও সরাসরি জানতে চাইলেন প্রাইম মিনিস্টার।

'না, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, স্রেফ কমনসেন্স। প্রস্তাবটা যদি পাস হয়ে যায়, আপনার দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। সারা দেশে সন্ত্রাসবাদীরা তৎপর হয়ে উঠবে, শুরু হবে রাজনৈতিক হাঙ্গামা–দেশটা সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যে হয়ে উঠবে পাকা ফল। আমার সরকার সেটা হতে দিতে চায় না, চায় না চারশো নিরীহ মানুষকে টেরোরিস্টদের হাতে খুন হতে দিতে।' ক্ষীণ একটু হাসলেন টিম ও'মেয়ার। 'শান্তিপূর্ণ সমাধান ছাড়া আর বোধহয় কোন পথ খোলা নেই।'

'কিন্তু আমার প্রতিরক্ষামন্ত্রী একটা উপায়ের কথা এরমধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন!'

'মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, ব্রিটিশ আর আমেরিকান সরকারকে আগে থেকে না জানিয়ে টেরোরিস্টদের বিরুদ্ধে যদি কোন সামরিক ব্যবস্থা নেয়া হয়, তাহলে ভেটো দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না–আমরা বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের রায়কে শ্রদ্ধা জানাব।'

'এমনকি অ্যাটাক যদি সফল হয় তবুও?'

'এমনকি অ্যাটাক সফল হলেও। একটা ব্যাপারে আমরা অটল, পাল্টা আঘাত হানতে হলে একমাত্র সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশেই তা হানা যেতে পারে। কথা না বাড়িয়ে আসুন না ভেবেচিন্তে দেখি টেরোরিস্টদের কোন্ দাবিটা মেনে নেয়া যায়।'

ব্রেকফাস্ট পরিবেশনের সময় নিজে উপস্থিত থাকল জেসিকা। মাথাপিছু এক স্লাইস রুটি, একটা বিস্কিট, মধুর মত মিষ্টি এক কাপ কফি বরাদ্দ করা হলো। খিদের জ্বালায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছে আরোহীরা।

হাঁটতে হাঁটতে আরোহীদের মধ্যে সিগারেট বিলি করল জেসিকা–বাচ্চা ছেলেমেয়েদের গাল টিপে দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল, সান্ত্বনা আর অভয় দিল কোন মাকে–শান্ত এবং হাসিখুশি। এরই মধ্যে আরোহীরা তাকে 'সবার চেয়ে ভাল, লক্ষ্মী মেয়ে' বলে চিহ্নিত করেছে।

ফার্স্ট ক্লাস গ্যালিতে ফিরে এসে এক এক করে সহকর্মীদের ডেকে খেতে দিল জেসিকা। এক একজন তিন চারটে করে সেদ্ধ ডিম, মাখন দেয়া রুটি, যত খুশি বিস্কিট, পেস্ট্রি, আর স্যান্ডউইচ পেল। দুর্বল হওয়া চলবে না, বলল জেসিকা। পিল ওরা খাবে, কিন্তু দুপুরের আগে নয়। ড্রাগের প্রভাব থাকবে বেশি হলে বাহাত্তর ঘণ্টা, তারপর সাবজেক্টের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয়–হয়তো অলস হয়ে উঠবে, ইতস্তত করবে সিদ্ধান্ত নিতে। প্রস্তাবটা অনুমোদনের জন্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানো হবে নিউ ইয়র্ক সময়

আগামী সোমবার দুপুরে; তারমানে স্থানীয় সময় সোমবার সন্ধে সাতটায়। ওই সময় পর্যন্ত নিজের দলকে সম্পূর্ণ সতর্ক এবং তৎপর রাখতে চায় জেসিকা, কাজেই সময়ের আগে ড্রাগ ব্যবহার করে ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সে।

তবে ক্লান্তি তাকেও কাবু করে ফেলছে। ইতিমধ্যে চুপিচুপি বাথরূমের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে এসেছে সে বেশ কয়েকবার। চোখ এমন লাল হয়ে উঠেছে যে রীতিমত ভয় ধরে গেছে তার। হাঁটাচলার মধ্যেও একটা অনিচ্ছাকৃত ঝাঁকি এসে যাচ্ছে, সামান্য কারণে ঘেমে যাচ্ছে হাতের তালু, অকারণে চমকাচ্ছে—নার্ভাস হয়ে পড়ার লক্ষণ।

জার্মান যুবক, বার্চ, পাইলটের সীটে নেতিয়ে আছে। কোলের ওপর পিস্তল, মৃদু নাক ডাকছে, লাল শার্টের বোতাম নাভি পর্যন্ত খোলা। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে ঘন লোমে ভরা চওড়া ছাতিটা উঠছে আর নামছে। বার্চ দাড়ি কামায়নি, লম্বা মাথার চুলে ঢাকা পড়ে রয়েছে মুখের একটা অংশ। তার ঘামের গন্ধ নাকে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল জেসিকা, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। বার্চের চেহারায় অদ্ভুত একটা বুনো, নিষ্ঠুর ভাব আছে। হঠাৎ করে বার্চকে তার এই মুহূর্তে পেতে ইচ্ছে করল।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করে বার্চের ঘুম ভাঙিয়েও কোন লাভ হলো না। রক্তবর্ণ ঢুলু ঢুলু চোখে তাকাল সে, উত্তেজিত হবার কোন লক্ষণ নেই। শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করে ককপিট থেকে বেরিয়ে গেল জেসিকা।

পরমুহূর্তে কি মনে করে আবার ককপিটে ঢুকল সে, প্রায় ছোঁ দিয়ে হাতে নিল মাইক্রোফোনটা, প্যাসেঞ্জার কেবিনের লাউডস্পীকারের সুইচ অন করল। 'সবাইকে বলছি, গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘোষণা।' বিনা প্ররোচনায় সবার ওপর প্রবল আক্রোশ অনুভব করল সে। সুখে-শান্তিতে জীবনযাপনে অভ্যস্ত এই লোকগুলোই তো বুর্জোয়া, ভাবল সে, তার বাপের মত এরাও সবাই সুবিধাভোগী। গাল দিয়ে ভূত ছাড়াল জেসিকা। নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই সে চিনতে পারল না, লোকগুলোর প্রতি ঘৃণায় তার শরীর রী রী করতে লাগল।

একটানা দশ মিনিট অনলবর্ষী বক্তৃতা দেয়ার পর থামল সে। তারপর আবার যখন কথা বলল, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে গলা। 'এখন ন'টা বাজে,' বলল সে। 'তিন ঘণ্টার মধ্যে অত্যাচারী প্রতিপক্ষের তরফ থেকে সাড়া না পেলে আমরা জিম্মিদের খুন করতে শুরু করব–,' হুমকির সুরে পুনরাবৃত্তি করল সে, '–আর মাত্র তিন ঘণ্টা।'

শিকারী নেকড়ের মত প্যাসেজে পায়চারি শুরু করল জেসিকা।

'দু'ঘণ্টা,' আরোহীদের বলল সে। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে কুঁকড়ে সরে যাবার চেষ্টা করল লোকজন।

'এক ঘণ্টা,' উল্লাসে ফেটে পড়ল তার কণ্ঠস্বর। 'এখুনি জিম্মিদের মধ্যে থেকে লোক বাছাই করা হবে।'

'কিন্তু আপনি কথা দিয়েছিলেন,' করুণ মিনতিভরা গলায় আবেদন জানাল ছোটখাট ডাক্তার। জেসিকা তার স্ত্রীর হাত ধরে সীট থেকে তুলল। ফ্রেঞ্চ যুবক, পিয়েরী বার্তোসের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হলো মহিলাকে। মহিলাকে নিয়ে ফ্লাইট

ডেকের দিকে চলে গেল বার্তোস।

ডাক্তারের দিকে না তাকিয়ে ক্লারার দিকে ফিরল জেসিকা। 'বাচ্চাদের বাছাই করো–একটা ছেলে আর একটা মেয়ে,' নির্দেশ দিল সে। 'আর হ্যাঁ, গর্ভবতী মেয়েলোকটাকেও। ওর অত বড় পেটটা দেখুক ওরা।'

দুর্ভাগা জিম্মিদের খেদিয়ে ফরওয়ার্ড গ্যালিতে নিয়ে গেল ক্লারা, পিস্তলের মুখে বসিয়ে রাখল ভাঁজ করা এয়ার-ক্রুদের চেয়ারে। ফ্লাইট ডেকের দরজা খোলা, গ্যালি থেকে জেসিকার গলা পরিষ্কার শুনতে পাওয়া গেল, বার্তোসকে বলছে, 'ডেডলাইন পেরোবার সাথে সাথে আমাদের নিষ্ঠুরতার নমুনা দেখানোটা ভয়ানক জরুরী। দেখাতে যদি আমরা ব্যর্থ হই, ওরা আমাদের ঢোঁড়া সাপ ধরে নেবে, আমরা বিশ্বাসযোগ্যতা হারাব। অন্তত একবার ওদেরকে দেখাতে হবে আমরা কতদূর যেতে পারি।'

বাচ্চা মেয়েটা কাঁদতে শুরু করল। তেরো বছর বয়স, বিপদটা বুঝতে পারছে। স্থূলদেহী ডাক্তারের স্ত্রী মেয়েটার কাঁধে হাত রাখল, আদর করে কাছে টানল।

'স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরো···,' হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও, '–জেসিকার জন্যে আমাদের একটা মেসেজ আছে।'

'গো অ্যাহেড, টাওয়ার, দিস ইজ জেসিকা।' লাফ দিয়ে মাইক্রোফোন ধরেছে সে, পা লম্বা করে দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে ফ্লাইট ডেকের দরজা।

'নেগোশিয়েটর তোমার বিবেচনার জন্যে প্রস্তাব দিতে চায়। কপি করার জন্যে তৈরি হও।'

'নেগেটিভ,' ঠাণ্ডা, নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল জেসিকা। 'আবার বলছি, নেগেটিভ। নেগোশিয়েটরকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে। আর তাকে বলো চল্লিশ মিনিট পর ডেডলাইন। তাড়াতাড়ি এখানে চলে এলে ভাল করবে।' মাইক্রোফোনটা হুকে ঝুলিয়ে বার্তোসের দিকে ফিরল সে। 'শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা শুরু হয়েছে–এবার আমরা পিল নিতে পারি।'

আজও আকাশে কোন মেঘ নেই, খালি গায়ে চামড়া পোড়ানো রোদে টারমাকের ওপর দিয়ে হাঁটছে রানা। আগের মতই অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়েছে, বোয়িঙের ফরওয়ার্ড হ্যাচ খুলে গেল।

এবার জিম্মিদের কাউকে দেখা গেল না, প্রায় অন্ধকার খালি একটা চৌকো আকৃতির মত লাগল দোরগোড়াটাকে। দ্রুত হাঁটার একটা ঝোঁক অনুভব করলেও দৃঢ় ভঙ্গিতে শান্তভাবে এগোল রানা, মাথাটা উঁচু হয়ে আছে, চোয়াল শক্ত। প্লেন থেকে যখন পঞ্চাশ গজ দূরে ও, চৌকো জায়গাটায় এসে দাঁড়াল মেয়েটা। দাঁড়াবার ভঙ্গির মধ্যে রাজকীয় গরিমা। এক পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে, অপর পা সামান্য একটু বেঁকে আছে। তার নিতম্বের কাছে ঝুলে আছে বড়সড় শট পিস্তল, কার্ট্রিজ বেল্টটা সরু কোমরে জড়ানো। মুখে আধো হাসি নিয়ে রানার এগিয়ে আসা দেখছে।

হঠাৎ জেসিকার বুকে উজ্জ্বল একটা আলোক বিন্দু দেখা গেল। চোখে ঘৃণা

নিয়ে সেটার দিকে তাকাল সে। 'আমাকে উত্তেজিত করা হচ্ছে!' জানে, আলোক বিন্দুটার উৎস এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙে দাঁড়ানো একজন মার্কসম্যানের লেজার সাইট। ট্রিগারে আর কয়েক আউন্স চাপ বাড়লেই পয়েন্ট টু-টু-টু বুলেট ঠিক ওই আলোক বিন্দুর জায়গায় লাগবে, চোখের পলকে রক্তাক্ত কাদা বানিয়ে দেবে হৃৎপিণ্ডটাকে।

নির্দেশ ছাড়া লেজার সাইট চালু করায় স্নাইপারের ওপর রেগে গেল রানা, তবে রাগের চেয়েও বেশি অবাক হয়ে গেল মেয়েটার সাহস লক্ষ করে। বুকের ওপর সুনিশ্চিত মৃত্যুর ওই চিহ্ন দেখেও এক বিন্দু ঘাবড়ায়নি। ডান হাত দিয়ে দ্রুত বাতিল করার একটা ভঙ্গি করল রানা, প্রায় সাথে সাথে গানার তার লেজার সাইট অফ করে দেয়ায় আলোর বিন্দুটা জেসিকার বুক থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ধন্যবাদ,' বলল জেসিকা, হাসল সে, রানার শরীরের ওপর সপ্রশংস দৃষ্টি বুলাল। 'তোমার আকৃতিটা পয়সার মাল, বেইবী। খুব যত্ন করো, তাই না?'

রানা নিরুত্তর।

'সমতল পাথুরে পেট-,' বলে চলেছে জেসিকা, '-লম্বা, পেশীবহুল পা। ডেস্কে বসে কলম পিষে খাও না, বোঝা যায়।' ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করার ভান করল সে। 'আমার ধারণা তুমি পুলিস বা আর্মি অফিসার, বেইবী। আমার ধারণা, তুমি একটা শুয়োর।' কণ্ঠস্বর বদলে গিয়ে কেমন বেসুরো হয়ে উঠল তার।

আরও কাছে এসে রানার সন্দেহ হলো, মেয়েটা সুস্থ নয়। চোখ জোড়া অস্বাভাবিক চকচক করছে। হাত নাড়ছে এলোমেলোভাবে। নিশ্চয় উত্তেজক কোন ড্রাগস নিয়েছে।

হ্যাচের নিচে পৌঁছে থামল রানা, উত্তর দিল না। ওষুধের প্রভাবে স্থির থাকতে পারছে না জেসিকা, নিতম্বের কাছে অস্ত্রটা নাড়াচাড়া করছে, আরেক হাতের আঙুলগুলো কিলবিল করছে গলা থেকে ঝুলতে থাকা ক্যামেরার গায়ে। রানার মনে পড়ল, স্টিফেন জেংকিনস ক্যামেরার ব্যাপারে কি যেন বলতে চেয়েছিল ওকে-হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝে ফেলল ও। ফিউজের ট্রিগার, তা না হয়েই যায় না। সেজন্যেই সারাক্ষণ নিজের সাথে রাখছে ওটা জেসিকা। রানার চোখের দৃষ্টি কোথায় লক্ষ্য করে ক্যামেরা থেকে হাত সরিয়ে নিল জেসিকা, রানার আর কোন সন্দেহ থাকল না।

'বন্দীদের মুক্তি দেয়া হয়েছে?' জানতে চাইল জেসিকা। 'প্যাক করা হয়েছে সোনা? বিবৃতি ট্রান্সমিট করার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে?'

'ব্রিটেন আর আমেরিকার প্রতিনিধিদের পরামর্শ মত কাজ করতে রাজি হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার...'

'গুড,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল জেসিকা।

'মানবিক কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তোমার দেয়া তালিকার সব বন্দীদের মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে...'

'গুড।'

'বন্দীদের নির্বাচিত যে-কোন দেশে চলে যেতে দেয়া হবে...'

'কিন্তু সোনা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জেসিকা।

'দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার অসাংবিধানিক দাবির কাছে নতি স্বীকার করবে না,

অর্থাৎ সোনা দিতে রাজি নয়...'

'আর টেলিভিশন ট্র্যান্সমিশন?'

'দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার বিবৃতিটাকে সত্যের অপলাপ বলে বিবেচনা করছে...'

'তারমানে ওরা শুধু আমাদের একটা দাবি মেনে নিয়েছে!' চেহারায় অবিশ্বাস নিয়ে বলল জেসিকা। রানা লক্ষ করল, তার কাঁধ দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেল।

'বন্দী মুক্তির ব্যাপারে একটা শর্ত আছে,' নরম গলায় বলল রানা।

'কি সেটা?' জেসিকার গোলাপী মুখে রক্ত উঠে এল।

'বন্দীদের মুক্তির বিনিময়ে ওরা সব ক'জন জিম্মির মুক্তি চায়—শুধু বাচ্চা আর মেয়েদের নয়। এবং জিম্মিদের মুক্তি দেয়া হলে ওরা তোমাদের নিরাপদে এই দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে দেবে, মুক্ত বন্দীদের সাথে।'

হো হো করে হেসে উঠল জেসিকা, হাসির সাথে উন্মাদিনীর মত মাথা ঝাঁকাতে লাগল। তারপর হঠাৎ করেই থামল সে। ঠাণ্ডা, প্রায় শান্ত গলায় বলল, 'ওরা ভাবছে ওরাও শর্ত দিতে পারে, তাই না? জিম্মিদের ছেড়ে দিই আমরা, তাহলে ব্রিটেন আর আমেরিকার জন্যে আমাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো দেয়া খুব সহজ হয়ে যায়, তাই না?'

রানা কথা বলল না।

'জবাব দাও, সাম্রাজ্যবাদের পা চাটা কুকুর!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল জেসিকা। 'ওরা ভেবেছে আমরা সিরিয়াস নই, তাই না?'

'আমি শুধু একজন মেসেঞ্জার,' বলল রানা।

'তুমি একটা শুয়োর! তুমি একটা ট্রেনিং পাওয়া খুনী।' এক ঝটকায় হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে রানার দিকে তাক করল জেসিকা।

'ওদের আমি কি বলব?' জিজ্ঞেস করল রানা, যেন লক্ষই করেনি ওর দিকে পিস্তল তাক করা হয়েছে।

'কি বলবে, না?' আবার জেসিকার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হয়ে এল। 'হ্যাঁ, একটা উত্তর পাওনা হয়েছে ওদের।' পিস্তল নিচু করে কব্জিতে বাঁধা জাপানী হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। 'তিন মিনিট হলো ডেডলাইন পেরিয়ে গেছে, উত্তর তো একটা পেতেই হবে ওদের।' নিজের চারদিকে এমনভাবে তাকাল সে, যেন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

ওষুধটার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, ভাবল রানা। হয়তো বেশি হয়ে গেছে ডোজ। কিংবা যে প্রেসক্রাইব করেছে তার জানা ছিল না উত্তেজিত অবস্থায় আটচল্লিশ ঘণ্টা জেগে থাকার পর খাওয়া হবে ওষুধটা।

'আমি অপেক্ষা করছি,' শান্তভাবে বলল রানা।

'হ্যাঁ, দাঁড়াও।' প্লেনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল জেসিকা।

দুর্ভাগা চারজন জিম্মির দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লারা, ঘাড় ফিরিয়ে ঢুলু ঢুলু চোখে জেসিকার দিকে তাকাল সে। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল জেসিকা, আবার বন্দীদের দিকে ফিরল ক্লারা। 'এসো,' কোমল গলায় বলল সে। 'তোমাদের

মুক্তি দেয়া হচ্ছে।' প্রায় আদর করে গর্ভবতী মহিলাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল সে।

ক্লারাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত পিছনের কেবিনে চলে গেল জেসিকা। বার্চের সাথে চোখাচোখি হতে ছোট্ট করে আবার মাথা ঝাঁকাল সে। মাথা ঝাঁকি দিয়ে চুলগুলো মুখ থেকে সরাল বার্চ, পিস্তলটা বেল্টে গুঁজে নিল। মাথার ওপর লকার থেকে একজোড়া প্লাস্টিক গ্রেনেড বের করল সে, এক এক করে দুটোরই পিন খুলল, রিঙ দুটো জড়িয়ে নিল দু'হাতের কড়ে আঙুলে। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মত হাত দুটো ভাঁজ আর উঁচু করে প্যাসেজ ধরে হালকা পায়ে ছুটল সে। 'গ্রেনেডগুলো এখন জ্যান্ত, হাত থেকে পড়ে গেলেই বিস্ফোরিত হবে। কেউ নড়বে না, কেউ নিজের সীট ছেড়ে উঠবে না-যাই ঘটুক না কেন! যে যেখানে আছ সেখানেই থাকো!'

পিয়েরী বার্তোস একই ভঙ্গিতে ছুটল, তারও দু'হাতে দুটো জ্যান্ত গ্রেনেড, সে-ও একই কথা বলে সাবধান করে দিল সবাইকে। 'কেউ নড়বে না। কোন কথা নয়। সীট ছাড়বে না। সবাই চুপ!' জার্মানি এবং ফরাসী ভাষায় পুনরাবৃত্তি করল সে। রক্তের নেশায় তার চোখ জোড়াও অস্বাভাবিক চকচক করছে।

ফ্লাইট ডেকের দিকে পিছন ফিরল জেসিকা। 'এসো, লক্ষ্মীটি।' ছোট্ট মেয়েটার কাঁধে একটা কোমল হাত রাখল সে, তাকে দাঁড় করিয়ে খোলা হ্যাচওয়ের দিকে নিয়ে চলল। কিন্তু দু'পা এগিয়েই কুঁকড়ে পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল মেয়েটা। 'আমি তো কিছু করিনি, আমাকে ছেড়ে দাও,' ফিসফিস করে বলল সে, তার চোখ জোড়া আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। 'তোমার সব কথা শুনব আমি, প্লীজ!' ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে, পিছিয়ে গেল।

ছেলেটার বয়স আরও কম, বিপদের সত্যিকার চেহারা জানা নেই। বলতেই জেসিকার হাত ধরল সে। মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল তার, মুখে খয়েরি রঙের অনেক তিল, মধুরঙা চোখে একটু বিস্ময় এবং অনিশ্চিতভাব। জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কি বাবা আমাকে নিতে এসেছে?'

'তবে আর বলছি কি! তোমার বাবা এসেছেন বলেই তো তোমাকে যেতে দিচ্ছি, এসো, এসো। একটু পরই তার সাথে দেখা হবে তোমার।' খোলা হ্যাচওয়ের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিল জেসিকা। 'লক্ষ্মী ছেলের মত এখানে একটু দাঁড়িয়ে থাকো।'

ছেলেটাকে খোলা হ্যাচের সামনে দাঁড়াতে দেখল রানা, কি ঘটতে যাচ্ছে পরিষ্কার ধারণা নেই। ছেলেটার পাশে মোটাসোটা, মধ্য বয়স্কা এক মহিলা দাঁড়াল, পরনে খুব দামী সিল্ক ড্রেস, গলায় হীরে বসানো নেকলেস। মহিলার মাথায় চূড়া আকৃতির খোঁপা, খুচরো কিছু চুল কানের কাছে রিঙ তৈরি করেছে। চেহারায় কোমল, মাতৃসুলভ একটা ভাব, ছেলেটার কাঁধে আগলে রাখার ভঙ্গিতে একটা হাত রাখল সে।

তার পাশে এসে দাঁড়াল লম্বা, কম বয়েসী এক মহিলা। তার গায়ের সাদা রঙ কেমন যেন ফ্যাকাসে, কান্নাকাটি করায় নাকের ডগা আর চোখের পাতা ফুলে

আছে। কনুইয়ের ওপর হাত আর গলায় অসংখ্য লাল লাল দাগ, সম্ভবত অ্যালার্জি। ঢিলেঢালা সুতী কাপড় পরে আছে সে, কাপড়ের নিচ থেকে বেঢপভাবে ফুলে আছে পেট। দাঁড়াবার ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, রোদের দিকে তাকিয়ে চোখ পিট পিট করতে লাগল।

আরও একজনকে খোলা হ্যাচের সামনে আসতে দেখল রানা। কিশোরী একটা মেয়ে। আচমকা পাঁজরের ভেতরে চিনচিনে ব্যথা বোধ করল রানা, মনে হলো মেয়েটা লুবনা* । কিন্তু সে যে লুবনা নয় এটা উপলব্ধি করতে পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগল রানার। তবে চেহারা অনেকটা মেলে–চোখ ভরা সরলতা, মুখে দেবীসুলভ পবিত্রতা। এমন একটা বয়স যখন সবেমাত্র লকলকিয়ে বেড়ে উঠতে শুরু করেছে শরীর। সরু, লম্বা পা, ছেলেদের মত কোমর আর নিতম্ব।

তার বড়বড় চোখে নগ্ন ভীতি, এবং রানাকে দেখে এক পলকেই বুঝে নিল একমাত্র ও-ই তাকে উদ্ধার করতে পারে। সংশয় আর আতঙ্ক মেশানো দৃষ্টিতে করুণ আবেদন ফুটে উঠল, সাথে যোগ হলো আশার আলো। 'প্লীজ,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'ওদের বারণ করুন!' এত আস্তে, কোনরকমে শুনতে পেল রানা। 'প্লীজ, স্যার! প্লীজ হেল্প আস!'

কিন্তু ওখানে জেসিকা রয়েছে, শান্ত গলাতেই কথা বলছে সে, কিন্তু রানার কানে তার কথাগুলো দ্রিম দ্রিম ঢাক পেটাবার মত বাজল। 'আমরা যা বলি তা করি, এটা তোমাদের বুঝতে হবে। তোমার পুঁজিবাদী মনিবদের জানা দরকার যে একটা করে ডেডলাইন পেরোবে আর একটা করে হত্যাকাণ্ড ঘটবে! আমাদের প্রমাণ করতে হবে বিপ্লবের প্রশ্নে আমরা দয়ামায়াহীন। আমরা চাই তোমরা জানো দাবির ব্যাপারে কোন আপোষ নেই, দর কষাকষি চলবে না।' একটু থেমে দম নিল সে। 'পরবর্তী ডেডলাইন আজ মাঝরাত। ওই সময়ের মধ্যে আমাদের সব দাবি মেনে নেয়া না হলে, আবারও চরম মূল্য দিতে হবে।' থামল সে, তারপর বাঘের তাড়া খাওয়া মানুষের মত আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, 'এই হলো চরম মূল্যের নমুনা!' পরমুহূর্তে পিছিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ভয়-ভাবনায় অস্থির এবং অসহায় রানা কি করবে বুঝতে না পেরে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কি ঘটতে যাচ্ছে জানে, কিন্তু ঠেকাবার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না। এক পলকের জন্যে অতীতের একটা হৃদয় বিদারক দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে–কয়েকজন কিডন্যাপার টানা-হ্যাঁচড়া করছে লুবনাকে, পিস্তল হাতে তাদের দিকে ছুটে যাচ্ছে রানা।

'জাম্প!' জোরে চিৎকার করল রানা, মেয়েটার দিকে দু'হাত তুলে দিল। 'লাফ দাও, তাড়াতাড়ি! আমি তোমাকে ধরব।'

কিন্তু হ্যাচ থেকে টারমাক প্রায় ত্রিশ ফিট নিচে, মেয়েটা ইতস্তত করতে লাগল। একবার মনে হলো এই লাফ দিল, কিন্তু তাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল নিজের জায়গায়। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

---

* অগ্নিপুরুষ দেখুন।

মরে যেতে ইচ্ছে করল রানার। ওর এই অসহায় অবস্থার জন্যে নিয়তি নাকি স্রষ্টা কার ওপর জানে না, এমন প্রচণ্ড রাগ হলো, মনে হলো আত্মহত্যা করে।

মেয়েটার দশ কদম পিছনে, ক্লারা আর জেসিকা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে, একযোগে দু'জনেই পিস্তল তুলল তারা। দু'হাতে ধরে আছে পিস্তল, নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে টার্গেট।

'লাফ দাও, ফর গডস সেক লাফ দিয়ে পড়ো! তোমার কোন ভয় নেই!' রানার কণ্ঠস্বর কেবিনের ভেতর থেকে পরিষ্কার শোনা গেল, ক্ষীণ একটু বিদ্রূপের হাসি ফুটল জেসিকার ঠোঁটে।

'নাউ!' বলল সে, এবং দু'জন একসাথে গুলি করল। বিস্ফোরণের জোড়া শব্দ একটাই শোনাল, হাঁ করা মাজল্ থেকে বেরোল নীলচে ধোঁয়া, বারুদের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। কাঁচা মাংসের ভেতর বুলেট বিদ্ধ হবার আওয়াজগুলো অদ্ভুত কোমল শোনাল, কেউ যেন তরমুজের ফালি ছুঁড়েছে দেয়ালে।

ক্লারার চেয়ে একটু আগে দ্বিতীয় ব্যারেলটা ফায়ার করল জেসিকা, এবার তাই জোড়া বিস্ফোরণের আওয়াজ আলাদা আলাদা ভাবে চেনা গেল। তারপরই সব নিস্তব্ধ, পিন-পতন স্তব্ধতা নেমে এল। মাত্র এক মুহূর্ত, আচমকা ওদের পুরুষ সঙ্গীরা গর্জে উঠল।

'নো মুভমেন্ট! এভরিবডি ফ্রিজ!'

আট

সেকেন্ডের ওই ভগ্নাংশগুলো দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা বলে মনে হলো রানার। থেমে যাওয়া সময় যেন ওর মাথায় বিচিত্র এক খেলায় মেতে থাকল, যেন কোন ছায়াছবির কিম্ভূতকিমাকার একাধিক দৃশ্য স্থির হয়ে গেছে।

প্রথম বিস্ফোরণের পুরো ধাক্কাটা খেলো অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। বেশি পেকে যাওয়া ফলের মত ফেটে গেল সে, সীসাগুলো শিরদাঁড়া থেকে নাভি পর্যন্ত পথ করে নেয়ায় তার ফোলা শরীর আকৃতি বদল করল। সামনের দিকে ছিটকে পড়ল সে, শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে আলগা বস্তার মত পড়ল টারমাকের ওপর, প্রাণবায়ু আগেই বেরিয়ে গেছে।

মোটাসোটা মহিলা পাশে দাঁড়ানো ছেলেটাকে আঁকড়ে ধরেছিল, খোলা দোরগোড়ায় ঝাঁকি খেতে লাগল দু'জনেই, ঝাঁক ঝাঁক সীসা ওদের যেন নাচতে বাধ্য করছে, ম্লান নীলচে ধোঁয়া মোচড় খাচ্ছে ওদের ঘিরে। আঁটসাঁট সিল্ক ড্রেসে পনেরো-বিশটা ফুটো দেখা গেল, ধারাল কিছু দিয়ে কেউ যেন খোঁচা মেরেছে তাকে। ছেলেটার সাদা স্কুল-শার্ট ভেদ করেও ভেতরে ঢুকল অনেক গুলি, প্রতিটি ফুটোর কিনারা রঙিন হয়ে উঠল সাথে সাথে। কেউ ওরা কোন শব্দ করেনি। দু'জনের চেহারাতেই ঘোর বিস্ময় আর উদ্ভ্রান্ত ভাব। পরের বিস্ফোরণটা কঠিন ধাক্কা মারল ওদেরকে, ছিটকে শূন্যে পড়ার সময় মনে হলো ওদের যেন কোন হাড়

নেই। তখনও দু'জন জড়াজড়ি অবস্থায় রয়েছে। রানার মনে হলো ওরা যেন অনন্তকাল ধরে পড়ছে আর পড়ছে।

কিশোরী মেয়েটা পড়ে যাচ্ছে দেখে ধরার জন্যে সামনের দিকে ছুটল রানা, তার ভার সামলাতে না পেরে ভাঁজ হয়ে গিয়ে টারমাকে ঠেকে গেল রানার হাঁটু। দৌড়াতে শুরু করে সিধে হলো রানা, ঘুমন্ত শিশুর মত তাকে বয়ে নিয়ে চলেছে, একটা হাত তার হাঁটুর নিচে, আরেক হাত কাঁধ জড়িয়ে আছে। মেয়েটার ছোট্ট, সুন্দর মাথা ওর কাঁধে বাড়ি খেতে লাগল, মিহি চুলগুলো ওর চোখেমুখে সেঁটে গেল, প্রায় অন্ধ করে রাখল ওকে।

'মরো না।' নিঃশ্বাসের সাথে অস্ফুট শব্দগুলো বেরিয়ে এল, নিজের অজান্তেই মিনতি জানাচ্ছে রানা। 'প্লীজ, ডোন্ট ডাই!' তলপেটে গরম রক্তের স্রোত অনুভব করল ও, উরু বেয়ে নেমে যাচ্ছে পায়ের দিকে। অনেক রক্তপাত হচ্ছে। একসময় ভিজিয়ে দিল ওর পায়ের পাতা।

টার্মিনাল বিল্ডিঙের প্রবেশ পথ থেকে দশ কদম ছুটে এল কার্ল রবসন, চেষ্টা করল রানার হাত থেকে মেয়েটাকে তুলে নিতে। কিন্তু খ্যাপা পশুর মত তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল রানা। শার্ক কমান্ডের ডাক্তার অপেক্ষা করছিল, কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে কিছু বলার ব্যর্থ চেষ্টা করে তার হাতে মেয়েটাকে তুলে দিল ও।

দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছে রানা। সারা মুখে কঠিন রেখা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও।

একটু পরই মুখ তুলে তাকাল ডাক্তার। 'দুঃখিত, স্যার। শি ইজ ডেড।'

এ যেন রানার ব্যক্তিগত পরাজয়। স্তম্ভিত চেহারা নিয়ে ডাক্তারের দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ও, তারপর ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

প্রথমে লুবনা, তারপর আজ এখানে আরেকজন। ওদের কাউকে আমি বাঁচাতে পারি না!

নির্জন টার্মিনাল ভবনের মার্বেল পাথরে পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, একটু পিছনে ওকে অনুসরণ করছে রবসন। দু'জনের চেহারাই নির্লিপ্ত। কমান্ড এয়ারক্র্যাফটে চড়ার সময়ও কেউ ওরা কথা বলল না।

'স্যার কীথ, রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিনা বিচারে আটক রেখেছি বলে আপনি আমাদের অভিযুক্ত করছেন,' দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডরের দিকে তর্জনী তাক করলেন। 'কিন্তু আপনারা ব্রিটিশরা যখন প্রিভেনশন অভ টেরোরিস্ট অ্যাক্ট পার্লামেন্টে পাস করলেন তখন নাগরিকদের অধিকার হেবিয়াস কর্পাস প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তারও আগে ভারত, সাইপ্রাস, এবং প্যালেস্টাইনে এই আপনারাই তো বিনা বিচারে হাজার হাজার লোককে আটক রেখেছিলেন। আজই বা আপনারা কি করছেন– আয়ারল্যান্ডে? ওখানে আপনারা মুক্তিকামী মানুষের নেতাদের বিনা বিচারে আটক রাখেননি?'

চেহারা অম্লান রেখে চুপ করে থাকলেন স্যার কীথ মারটেল, ভাব দেখালেন জুৎসই একটা জবাবের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কৌশলে তাঁকে রক্ষা করলেন টিম ও'মেয়ার, মার্কিন অ্যামব্যাসাডর। 'আমরা ঐকমত্যে পৌঁছুবার চেষ্টা করছি,

জেন্টলমেন, বিতর্কে ইন্ধন জোগাতে চাইছি না। যেখানে কয়েকশো মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত...'

ঝনঝন শব্দে ফোন বেজে উঠল। শান্ত হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুললেন স্যার কীথ। অপরপ্রান্তের কথা শোনার সময় তাঁর মুখের রক্ত নেমে গেল। 'আই সী,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি, টেবিলের আরেক প্রান্তে সরাসরি প্রাইম মিনিস্টারের দিকে তাকালেন। 'আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে টেরোরিস্টরা, দশ মিনিট আগে চারজন জিম্মিকে খুন করেছে তারা–।'

অবিশ্বাস ভরা বিস্ময়সূচক আওয়াজ বেরিয়ে এল সবার গলা থেকে।

'জিম্মিরা ছিল দুই মহিলা আর দুই বাচ্চা–একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। ওদেরকে পিছন থেকে গুলি করা হয়, তারপর ফেলে দেয়া হয় প্লেন থেকে। নতুন একটা ডেডলাইন দিয়েছে টেরোরিস্টরা–আজ মাঝরাত। এই সময়ের মধ্যে ওদের সব দাবি মেনে নিতে হবে। তা না হলে আবার খুন করবে ওরা।'

নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল। তারপর ধীরে ধীরে সবাই বুল-ডগ আকৃতির মাথার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

'মানবতার নামে আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, স্যার,' টিম ও'মেয়ার নিস্তব্ধতা ভাঙলেন। 'আসুন, অন্তত মহিলা আর বাচ্চা-কাচ্চাদের বাঁচাই। ওরা খুন করবে আর আমরা বসে বসে দেখব সে অধিকার বা অনুমতি আমাদের নেই।'

'আর কোন উপায় নেই, কমান্ডো পাঠিয়ে জিম্মিদের উদ্ধার করব আমরা।'

মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাথা নাড়লেন। 'আমার সরকার অটল, স্যার–এবং আমার বিশ্বাস ব্রিটিশ সরকারও–,' স্যার কীথের দিকে তাকালেন তিনি, স্যার কীথ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন। 'আমরা একটা হত্যাযজ্ঞের ঝুঁকি নিতে পারি না, নেব না। আপনারা যদি প্লেনে হামলা চালান, প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কোন চেষ্টাই আমরা করব না, নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দেয়ার কথাও ভাবব না।'

'অথচ আপনারা খুব ভাল করেই জানেন যে এই পশুগুলোর দাবি মেনে নিলে আমরা আমাদের দেশটাকে নরকের দিকে ঠেলে দেব!'

'মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, মাত্র অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমাধান খুঁজে বের করতে হবে আমাদের–তা না হলে আরও কয়েকটা অমূল্য প্রাণ হারাব আমরা।'

'তুমি নিজেই বলেছ ইয়েলো অ্যাটাকে সাফল্যের সম্ভাবনা আধাআধি,' গম্ভীর সুরে বললেন ড. ওয়ার্নার, চৌকো পর্দা থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'আমার বা প্রেসিডেন্টের কাছে ঝুঁকিটা গ্রহণযোগ্য নয়।'

'ড. ওয়ার্নার, টারমাকে ওরা শিশু আর মেয়েদের খুন করছে,' গলার সুর স্বাভাবিক রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করল রানা।

'তোমাকে তো বললামই, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে টেরোরিস্টদের দাবি মেনে নিয়ে মহিলা আর বাচ্চাদের মুক্ত করার জন্যে...'

'ওতে সমাধান হবে না।' রেগে গেছে রানা, গলার সুরে খানিকটা প্রকাশও পেয়ে গেল। 'আজ রাতেও সেই একই পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।'

'বাচ্চা আর মহিলাদের ছাড়িয়ে আনতে পারলে, বিপদে থাকা মানুষের সংখ্যা কমে যাবে, তারপর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে–আমরা সময় কিনছি, রানা, দাম যদি বেশি দিতে হয় কি আর করা।'

'কিন্তু যদি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার না মানে? মাঝরাতের মধ্যে আমরা যদি হাইজ্যাকারদের সাথে কোন সমঝোতায় না আসতে পারি? তখন কি ঘটবে, ড. ওয়ার্নার?'

'যা ঘটবে কল্পনা করতে কষ্ট হয়, রানা, কিন্তু তা যদি ঘটে…,' অসহায় ভঙ্গিতে হাত দোলালেন ড. ওয়ার্নার। '…আমরা হয়তো আরও চারজনকে হারাব। কিন্তু পাইকারীভাবে চারশো লোককে খুন হতে দেয়ার চেয়ে সেটা তবু ভাল নয় কি? আরও চারজন লোক মারা গেলে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার জেদ ধরে বসে থাকতে পারবে না–বাচ্চা আর মহিলাদের ছাড়িয়ে আনতে রাজি হবে তারা–যে-কোন মূল্যে।'

রানার বিশ্বাসই হতে চায় না কথাগুলো ঠিক শুনেছে। জানে মেজাজের লাগাম টেনে না ধরলে বিচ্ছিরী একটা কাণ্ড ঘটে যাবে, নিজেকে শান্ত করার জন্যে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল ও। ডেস্কের ওপর হাতের আঙুলগুলো পরস্পরকে শক্তভাবে পেঁচিয়ে রেখেছে, মাথা নিচু করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। ওর ডান হাতের নখগুলোর ভেতর কালচে দাগ দেখা গেল, আধখানা চাঁদের মত। কিশোরী মেয়েটার রক্ত, শুকিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি শার্ক ওভার-অলের পকেটে হাতটা ভরে ফেলল ও। বড় করে শ্বাস টেনে ধীরে ধীরে বলল, 'কল্পনা করতে কষ্ট হলে এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারেন, ঘটনাটা যে দেখবে তার কষ্ট আরও বেশি হবে।'

'তুমি কি ফিল্ম করছ আমি বুঝি, রানা।'

'আমার তা মনে হয় না, ড. ওয়ার্নার,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়াল রানা।

'রানা, তুমি একজন সৈনিক…'

'–এবং শুধু একজন সৈনিকই ভায়োলেন্সকে ঘৃণা করতে জানে,' বলল রানা।

'আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি কাজে বাধা সৃষ্টি করবে এটা আমার অভিপ্রেত নয়,' এবার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল ড. ওয়ার্নারের গলা। 'তোমাকে আমি আবার একবার পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছি, ইয়েলো কন্ডিশন ঘোষণার অনুমতি শুধু আমাকে দেয়া হয়েছে। আমার নির্দেশ ছাড়া পাল্টা আঘাত হানা যাবে না। বুঝতে পারছ তো, মেজর রানা?'

'পারছি, ড. ওয়ার্নার,' সাথে সাথে ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল রানা। 'আমরা আশা করছি পরবর্তী হত্যাকাণ্ডের ভিডিও টেপ বেশ ভালই হবে। আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার জন্যে একটা কপি আমার কাছ থেকে অবশ্যই পাবেন আপনি।'

সঙ্কট শুরু হবার আগেই আরেকটা সেভেন-ফোর-সেভেন জাম্বো জেট সার্ভিসিঙের

জন্যে ল্যান্ড করেছিল, অ্যাসেম্বলি এলাকায় ওটা যেখানে পার্ক করা রয়েছে সেখান থেকে স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরো এক হাজার গজ দূরে, মেইন সার্ভিস হ্যাঙ্গার আর টার্মিনাল ভবনের একটা কোণ আড়াল তৈরি করায় হাইজ্যাকাররা ওটাকে দেখতে পাচ্ছে না। দুটো প্লেনের রঙ আলাদা, দ্বিতীয়টার গায়ে কমলা আর নীল রঙে লেখা রয়েছে সাউথ আফ্রিকান এয়ারওয়েজ, লেজে আঁকা ছুটন্ত হরিণের ছবি। তবে প্লেন দুটো একই মডেলের, এমন কি কেবিন প্ল্যানেও তেমন কোন পার্থক্য নেই। স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরোর ভেতরের প্ল্যান হিথ্রো-র ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ হেডকোয়ার্টার থেকে আগেই টেলিপ্রিন্টারের সাহায্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। দুটো প্লেন প্রায় একই রকমের হওয়ায় ওদের খুব সুবিধে হলো, সুযোগটা সাথে সাথে কাজে লাগাল কার্ল রবসন। এরই মধ্যে শূন্য খোলের ভেতর সাতবার ইয়েলো কন্ডিশনের মহড়া শেষ করেছে সে।

'ঠিক আছে, এসো এবার এমন ভাবে দৌড়াই যেন খোদ ডেভিল তাড়া করেছে আমাদের। "গো" থেকে পেনিট্রেশন পর্যন্ত চোদ্দ সেকেন্ড বড় বেশি সময়-,' রবসনের স্ট্রাইক টীম টারম্যাকে অর্ধবৃত্ত তৈরি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তারা, কেউ কেউ নাটকীয় ভঙ্গিতে আকাশের দিকে মুখ তুলে চোখ ঘোরাল। গ্রাহ্য করল না রবসন। '-এসো দেখি, নয় সেকেন্ডে পারা যায় কিনা।'

অ্যাসল্ট গ্রুপে ওরা ষোলোজন রয়েছে, রানা যোগ দিলে সতেরো জন হবে। শার্কের অন্যান্য সদস্যরা টেকনিকাল এক্সপার্ট-ইলেকট্রনিক্স আর কমিউনিকেশন্স, চারজন মার্কসম্যান স্নাইপার, একজন উইপনস্ কোয়ার্টারমাস্টার, একজন বম্ব ডিজপোজাল আর এক্সপ্লোসিভ সার্জেন্ট, ডাক্তার, কুক, একজন লেফটেন্যান্টের অধীনে তিনজন নন-কমিশনড এঞ্জিনিয়ার, পাইলট এবং অন্যান্য ক্রু, সব মিলিয়ে বড়সড় একটা দল, কিন্তু একজনকেও বাদ দেয়ার উপায় নেই।

এক প্রস্থ কালো নাইলনের তৈরি ইউনিফর্ম পরে আছে অ্যাসল্ট গ্রুপের লোকজন, রাতের বেলা সহজে কারও চোখে পড়বে না। প্রত্যেকের গলায় ঝুলছে গ্যাস মাস্ক। কালো বুটে নরম রাবার সোল। প্রত্যেকের সাথে রয়েছে যার যার অস্ত্র আর ইকুইপমেন্ট, হয় ব্যাক প্যাকে নয়তো কালো ওয়েবিং বেল্টে। কাউকে ভারী বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরতে দেয়া হয়নি, নড়তেচড়তে অসুবিধে হয়। নিরেট কোন হেলমেটও ব্যবহার করা হচ্ছে না, অস্ত্রের সাথে ঘষা লেগে আওয়াজ হতে পারে ভেবে।

গ্রুপের সবার বয়সই পঁচিশের মধ্যে, বিভিন্ন দেশের সেনাবাহিনী থেকে বাছাই করে আনা হয়েছে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে ট্রেনিং দিয়ে ওদেরকে ক্ষুরের মত ধারাল করে তুলেছে রানা।

টারমাকের দু'জায়গায় চক দিয়ে দুটো আঁক কেটেছে রবসন, একটা দাগ দিয়ে এয়ার টার্মিনালের প্রবেশমুখ বোঝানো হচ্ছে, আরেকটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে জিরো-সেভেন-জিরোর সবচেয়ে কাছের সার্ভিস হ্যাঙ্গারটাকে। অ্যাসল্ট গ্রুপ দাগের ওপর নিঃশব্দে দাঁড়াল, তীক্ষ্ণ চোখে ওদেরকে দেখছে রবসন। কোথাও কোন ঢিলেঢালা ভাব নেই। 'ঠিক আছে, দশ সেকেন্ড পর ফ্লেয়ার!' ইয়েলো

কন্ডিশনে আক্রমণ শুরু করা হবে টার্গেট প্লেনের নাকের সামনে ফসফরাস ফ্লেয়ার জ্বালিয়ে। ফ্লেয়ারগুলো খুদে প্যারাস্যুটের শেষ মাথায় থাকবে। ডাইভারশন তৈরির জন্যে ভাল কাজ দেয় কৌশলটা। আলোর উৎস জানার জন্যে ফ্লাইট ডেকে জড়ো হবে টেরোরিস্টরা। ফ্লেয়ারগুলো এত উজ্জ্বল যে তাকাবার সাথে সাথে ধাঁধিয়ে যাবে চোখ, পরে বেশ কয়েক মিনিট রাতের অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাবে না টেরোরিস্টরা।

'ফ্লেয়ারস!' গর্জে উঠল রবসন, সাথে সাথে তৎপর হয়ে উঠল অ্যাসল্ট গ্রুপ। দু'জন লোককে 'স্টিক' বলে ডাকা হয়, তারাই নেতৃত্ব দিচ্ছে ওদের। পরিত্যক্ত প্লেনের বিশাল লেজের দিকে সরাসরি ছুটল ওরা। লীডারদের প্রত্যেকের কাঁধে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে, ফ্লেক্সিবল আর্মারড্ কাপলিঙের সাথে সিলিন্ডারের সাথে আটকানো স্টেনলেস স্টীল প্রোব-সেজন্যেই এই নামকরণ ওদের। লীডারের পিঠের ট্যাংকে রয়েছে দুশো পঞ্চাশ অ্যাটমসফেয়ার কমপ্রেসড এয়ার, আর বিশ ফিট প্রোবের ডগায় রয়েছে হীরে বসানো এয়ার-ড্রিল। ল্যান্ডিং গিয়ারের দশ ফিট পিছনে, প্লেনের পেটের নিচে হাঁটু গেড়ে বসল সে, ঠিক জায়গাটায় এয়ার-ড্রিলের পয়েন্ট ছোঁয়াবার জন্যে দু'হাত উঁচু করে দিল। ম্যানুফ্যাকচারারের ড্রইং দেখে আগেই জেনে নিয়েছে স্পটটা কোথায়-প্লেনের এই অংশের প্রেশার হাল সবচেয়ে পাতলা, এখানে ফুটো করেই সরাসরি প্যাসেঞ্জার কেবিনে গ্যাস ঢোকানো হবে।

কাটিং ড্রিলের যান্ত্রিক গুঞ্জন চাপা দেয়া হবে দক্ষিণ টার্মিনাল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনের জেট এঞ্জিন চালু করে। বোয়িঙের খোল ফুটো করার জন্যে সময় বরাদ্দ করা হয়েছে তিন সেকেন্ড। দ্বিতীয় লীডার ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে তার প্রোবের ডগা সদ্য তৈরি ফুটোয় ঢোকাবার জন্যে।

'পাওয়ার অফ!' নির্দেশ দিল রবসন। এই নির্দেশ পাবার সাথে সাথে মেইন্স থেকে সংযুক্ত প্লেনের ইলেকট্রিক পাওয়ার লাইন কেটে দেয়া হবে, বন্ধ হয়ে যাবে এয়ার-কন্ডিশনিং।

দ্বিতীয় লীডার তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে-পিঠে বাঁধা বোতলের গ্যাস প্রোবের মাধ্যমে প্লেনের ভেতরকার বাতাসে ছড়িয়ে দেয়ার মহড়া দিচ্ছে সে। ভিক্টর ফাইভ নামে পরিচিত এই গ্যাসের প্রায় কোন গন্ধ নেই, নাকে ঢোকার পর দশ সেকেন্ডের মধ্যে একজন লোককে অসাড় করে দিতে পারে-পেশী অবশ হয়ে যাবে, নড়াচড়ায় নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, মুখে কথা আটকে যাবে, দৃষ্টি হয়ে উঠবে ঝাপসা।

বিশ সেকেন্ড শ্বাস নিলে সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়বে। ত্রিশ সেকেন্ড পর জ্ঞান থাকবে না। দু'মিনিটে মৃত্যু। রেহাই পাবার উপায়, তাজা বাতাস। আরও ভাল হয় খাঁটি অক্সিজেন পাওয়া গেলে। দ্রুতই ফিরে আসে সুস্থতা, দীর্ঘ মেয়াদী কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়াই।

অ্যাসল্ট গ্রুপের আর সবাই লীডারদের পিছু নিয়ে চারভাগে ভাগ হয়ে পড়েছিল, ডানার নিচে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল তারা-সবাই গ্যাস মাস্ক পরে আছে, হাতে বাগিয়ে ধরা অস্ত্র আর ইকুইপমেন্ট। স্টপওয়াচে চোখ রেখেছে রবসন,

আরোহীদের দশ সেকেন্ডের বেশি গ্যাস সরবরাহ করবে না সে। বয়স্ক লোকজন আর বাচ্চারা রয়েছে, হাঁপানির রোগী থাকতে পারে।

'পাওয়ার অন।' এয়ার-কন্ডিশনিং চালু হবার সাথে সাথে কেবিন থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করবে বিষাক্ত গ্যাস। তারপরই নির্দেশ এল, 'গো!'

অ্যালুমিনিয়ামের মই বেয়ে তরতর করে ডানার সংযোগ পর্যন্ত উঠে গেল অ্যাসল্ট টীম, বাড়ি দিয়ে ইমার্জেন্সী উইন্ডো প্যানেল ভেঙে ফেলল তারা। বাকি দু'দল উঠল প্রধান দুটো দরজার কাছে, কিন্তু ওরা শুধু স্ন্যাপ-হ্যামার দিয়ে ধাতব পাত ছিঁড়ে ভেতরের রকিং ডিভাইস বের করার ভান করল মাত্র। স্টান গ্রেনেড ডিটোনেট করারও সুযোগ নেই ওদের।

'পেনিট্রেশন।' লীডারদের একজন রানার ভূমিকায় অভিনয় করছে, কেবিনে ঢোকার সিগন্যাল দিল সে। সেই সাথে স্টপওয়াচ বন্ধ করল রবসন।

'সময়?' শান্ত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রবসন। কাজে এত মগ্ন ছিল যে জানেই না নিঃশব্দ পায়ে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে রানা।

'এগারো সেকেন্ড, বস্,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল রবসন। 'খারাপ নয়—তবে খুব একটা আহামরি কিছুও নয়। আবার মহড়া দেব আমরা।'

'একটু বিশ্রাম দাও,' নির্দেশ দিল রানা। 'কিছু কথাও হোক।'

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টাওয়ারের দেয়াল জুড়ে পাশাপাশি দাঁড়াল সবাই, শুধু রানা আর রবসন তাদের দিকে মুখ করে থাকল। বিকেলের তাপে টারমাকের দিকে তাকানো যায় না, তবে দূর আকাশের কোণে কালো আর ভারী মেঘ জমেছে।

'আর ছয় ঘণ্টা পর ডেডলাইন,' বলল রবসন। 'সরকারের তরফ থেকে কনসেশনের কোন খবর এল?'

'না। ওরা রাজি হবে বলে মনে হয় না।'

'হয়তো হবে, তবে আরেকটা ডেডলাইন পেরোবার পর।' দাঁত দিয়ে চুরুটের গোড়া ছিঁড়ল রবসন, ছেঁড়া অংশটুকু থোঃ করে ফেলে দিল, যেন কারও ওপর রেগে গেছে। 'এতগুলো দিন গাধার খাটনি খেটে নিজেকে তৈরি করলাম, অথচ যখন কাজ করার সুযোগ এল পিছমোড়া করে বেঁধে রাখল হাতজোড়া।'

'ইয়েলো কন্ডিশন ঘোষণা করা হলে কখন তুমি হামলা করবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সন্ধ্যার পরপরই,' সাথে সাথে জবাব দিল রবসন।

'না। ড্রাগের প্রভাব এখনও ওদের শরীরে বাড়ছে। প্রভাব কমতে শুরু করার খানিকক্ষণ পর আক্রমণ করব আমরা। আমার ধারণা দ্বিতীয় ডেডলাইনের একটু আগে আবার ওরা ড্রাগ নেবে, ঠিক তার আগে হামলা চালানো উচিত—,' হিসেব করার জন্যে থামল রানা, '—পৌনে এগারোটায়, ডেডলাইনের সোয়া একঘণ্টা আগে।'

রানাকে সমর্থন করে মাথা ঝাঁকাল রবসন। 'যদি ইয়েলো কন্ডিশন ঘোষণা করা হয়।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, তারপর কিছুক্ষণ ওরা কেউ কথা বলল না।

নিস্তব্ধতা রানাই ভাঙল, 'দেখো রবসন, ব্যাপারটা আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছে। ওরা আমার নাম জানে, তাহলে শার্ক সম্পর্কে আরও কিছু না জানতে পারার কি কারণ থাকতে পারে? প্লেন দখল করার জন্যে আমাদের নির্দিষ্ট প্ল্যান আছে, সেটাও কি জানে ওরা?'

'ঈশ্বর, আমি এত দূর ভাবিনি!'

'তাই ভাবছি, প্ল্যান কিছুটা বদলানো দরকার। মডেল ঠিক রেখেই করতে হবে সেটা, কারণ এখন আর সবটা বদলানো সম্ভব নয়।'

'কিন্তু গত দু'ঘণ্টা ধরে মহড়া দিচ্ছি আমরা—এখন আর কিছুই বদলানো সম্ভব নয়,' রবসনকে সন্দিহান দেখাল।

'ফ্লেয়ার,' বলল রানা। 'হামলা যদি করি, আমরা ফ্লেয়ার জ্বালব না।'

'কিন্তু তাহলে তো টেরোরিস্টরা প্যাসেঞ্জার কেবিনে ছড়িয়ে থাকবে…!'

'লক্ষ করেছ জেসিকা লাল শার্ট পরে আছে?'

'তারমানে কি ওরা সবাই…হ্যাঁ, হতে পারে।'

'ভেতরে ঢুকে লাল কিছু দেখলেই ঝাঁঝরা করে দেব,' বলল রানা। 'কিন্তু ঢুকে যদি দেখি লাল শার্ট নেই, তাহলে ইসরায়েলি স্টাইল ফলো করতে হবে।' ইসরায়েলি স্টাইল হলো, সবাইকে শুয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়া, নির্দেশ অমান্য করলে সরাসরি খুন করার জন্যে গুলি করা। 'বিচ্ছু হচ্ছে ওই মেয়েটা। ক্যামেরাটা ওর কাছে রয়েছে। ওর ভিডিও টেপ দেখিয়েছ সবাইকে?'

'দেখিয়েছি, চিনতে পারবে। শালী কিন্তু ভারি সুন্দর। শুধু জেসিকার নয়, লাশের ভিডিও দেখিয়েছি। আহত বাঘের মত হয়ে আছে সবাই। কিন্তু লাভ কি,' চেহারায় হতাশ ভাব এনে বলল রবসন, 'সেন্ট্রাল কমিটি ইয়েলো কন্ডিশন ঘোষণা করবে না। আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি।'

'ধরে নাও ইয়েলো কন্ডিশন ঘোষণা করা হয়েছে, অসুবিধে আছে কোন?' জিজ্ঞেস করল রানা, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বলে চলল, 'আমি তোমাকে বললাম আজ রাত স্থানীয় সময় দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হামলা করা হবে। কাজটা এমনভাবে করবে যেন মহড়া দিচ্ছ না, সত্যি হামলা করছ—খুঁটিনাটি কোন কাজেই ভান করবে না…'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে কমান্ডারের চোখে তাকাল রবসন, দু'জনের দৃষ্টি এক হলো। রানার চোখের পাতা, ভুরু, নাকের ফুটো, ঠোঁট, কিছুই নড়ছে না।

'ধরে নেব, বস্?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবসন।

'অবশ্যই,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা, একটু যেন অসহিষ্ণু।

কাঁধ ঝাঁকাল রবসন। 'ধেত্তেরি, আমি তো এখানে শুধু কাজ করি,' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে।

চোখে বিনকিউলার তুলে বোয়িং জিরো-সেভেন-জিরোর লেজ থেকে নাক পর্যন্ত দেখল রানা, কোথাও প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। প্রতিটি পোর্ট আর জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। তারপর, অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিনকিউলার একটু নিচু করে প্লেনের পাশে টারমাকে তাকাল ও। লাশগুলো স্তূপ হয়ে এখনও পড়ে রয়েছে ওখানে।

বিনকিউলার নামাল রানা, একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে উঠে এল এয়ার ট্রাফিক টাওয়ারে। সিনিয়র এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের পাশে দাঁড়াল ও। 'আমি আবার একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই।' সাথে সাথে ওর হাতে মাইক্রোফোন ধরিয়ে দেয়া হলো।

'স্পীডবার্ড জিরো-সেভেন-জিরো, দিস ইজ টাওয়ার। জেসিকা, ডু ইউ রিড মি? কাম ইন, জেসিকা।'

গত কয়েক ঘণ্টায় দশ-এগারোবার যোগাযোগ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে রানা, হাইজ্যাকাররা কোন সাড়া দেয়নি।

'জেসিকা, কাম ইন, প্লীজ।' হাল না ছেড়ে আবার ডাকল রানা।

হঠাৎ করেই প্রাণবন্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'দিস ইজ জেসিকা। কি চাই তোমার?'

'জেসিকা, অনুরোধ করছি অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে লাশগুলো সরিয়ে আনার অনুমতি দাও।'

'নেগেটিভ, টাওয়ার। আই সে এগেন, নেগেটিভ। প্লেনের ধারেকাছে কেউ আসতে পারবে না।' এক সেকেন্ড থামল সে। 'এত তাড়া কিসের, আরও বারোটা লাশ ওখানে জমুক না, তখন সব একসাথে সরিয়ে নিতে পারবে।' খিলখিল করে হাসল সে। 'মাঝরাত পর্যন্ত সবুর করো, কথা দিচ্ছি মেওয়া ফলবে।' ক্লিক শব্দ করে স্তব্ধ হয়ে গেল রেডিও।

'এখন আপনাদের ডিনার পরিবেশন করা হবে,' সহাস্যে ঘোষণা করল জেসিকা, এবং আশ্চর্য, এত আতঙ্ক আর দুর্ভাবনার মধ্যেও উৎসাহের সাথে নড়েচড়ে বসল আরোহীরা। 'আপনারা জেনে খুশি হবেন আজ আমার জন্মদিন। কাজেই ডিনারের পর সবাইকে শ্যাম্পেনও দেয়া হবে। কি মজা, তাই না?'

কিন্তু ছোটখাট, মোটাসোটা ইহুদি ডাক্তার হঠাৎ করে উঠে দাঁড়াল, তার মাথার ক'গাছি সাদা চুল খাড়া হয়ে থাকায় কৌতুককর লাগছে দেখতে। তারপর মুখ যেন ভেতর দিকে দেবে গেছে, মনে হলো গলতে শুরু করা মোমের তৈরি। বিধ্বস্ত একজন মানুষ, শোকে কাতর–কি বলা হচ্ছে বা কি ঘটছে সে-ব্যাপারে তার যেন কোন হুঁশ নেই। 'কেন, কেন? কোন অধিকারে? কি করেছিল সে তোমার?' বুড়ো মানুষের মত কেঁপে গেল তার গলা। 'ওর মত মেয়ে হয় না, তাকে তুমি বিনা কারণে মেরে ফেললে! জীবনে কখনও কারও মনে দুঃখ দেয়নি…'

'আপনার স্ত্রীর কথা বলছেন?' তাকে থামিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল জেসিকা। 'ভাল ছিল?' বিদ্রূপের হাসি হাসল সে। 'কেউ ভাল নয়, কেউ নিরীহ নয়, আপনারা সবাই আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের নোংরা উপকরণ। জানেন, আপনারা সম্পদের পাহাড় গড়েছেন বলেই দুনিয়ার শতকরা আশি ভাগ লোক মানবেতর জীবনযাপন করছে? জানেন, প্রতিদিন আপনারা যে খাবার খেতে না পেরে ড্রেনে ফেলে দেন সেগুলো পেলে তৃতীয় বিশ্বের অর্ধেক লোককে দু'বেলা উপোস করতে হত না?' হঠাৎই থেমে গেল জেসিকা, নিজেকে সামলে নিয়ে ডাক্তারের কাঁধে হাত রাখল একটা, জোর করে হাসল একটু। 'বসুন,' বলল সে,

প্রায় কোমল সুরে। 'আপনার কেমন লাগছে আমি জানি, প্লীজ বিশ্বাস করুন। অন্য কোন উপায় থাকলে সত্যি ভাল হত।'

ধপ্ করে বসে পড়ল ডাক্তার, চোখে শূন্য দৃষ্টি, একহাতের আঙুল দিয়ে আরেক হাতের আঙুল অকারণেই নাড়া চাড়া করছে।

'শান্ত হোন, শান্ত হয়ে বসে থাকুন,' নরম সুরে বলল জেসিকা। 'আমি নিজে আপনাকে এক গ্লাস শ্যাম্পেন নিয়ে এসে দিচ্ছি।'

নয়

'মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার-,' প্রায় দুটো দিন আর দুটো রাত বিরতিহীন উদ্বেগের মধ্যে থেকে টিম ও'মেয়ারের কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে গেছে, '-দশটার বেশি বেজে গেছে। হাতে আর দু'ঘণ্টা সময়ও নেই, সিদ্ধান্ত যা নেয়ার এখুনি নিতে হবে। তা না হলে কি ঘটবে সবাই আমরা জানি।'

গুঞ্জন থামাবার জন্যে লোমশ একটা হাত তুললেন প্রাইম মিনিস্টার।

হাজার মাইল দূরবর্তী জোহানেসবার্গ থেকে ভিডিও টেপের একটা কপি আনানো হয়েছে প্লেনে করে, উপস্থিত সবাই চাক্ষুষ করেছেন জিম্মিদের হৃদয় বিদারক হত্যাকাণ্ড। টেবিলে এমন একজন লোক নেই যে নিঃসন্তান। ওঁদের মধ্যে যারা ডানপন্থী রাজনীতি করেন, চেহারায় অনিশ্চিত ভাব নিয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছেন তাঁরা। এমনকি লৌহমানব বলে খ্যাত মিনিস্টার অভ পুলিস পর্যন্ত চোখ তুলে অ্যামব্যাসাডরদের দিকে তাকাতে পারেননি।

'এবং এ-ও আমরা জানি টেরোরিস্টদের সবগুলো দাবি পুরোপুরি মেনে না নিলে আপোষের কোন সম্ভাবনা নেই...'

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটল সময়, তারপর প্রাইম মিনিস্টার মুখ খুললেন, 'মি. অ্যামব্যাসাডর, আমরা যদি দাবিগুলো মেনে নিইও, মেনে নেব শুধু মানবিক কারণে। আরোহীরা আপনাদের নাগরিক, তাদের নিরাপত্তার জন্যে বড় বেশি চড়া মূল্য দিতে হবে আমাদের-কিন্তু যদি এই মূল্য দিই আমরা, কাল বাদে পরশু কি নিরাপত্তা পরিষদে ব্রিটেন আর আমেরিকার পূর্ণ সমর্থন পাব আমরা?'

টিম ও'মেয়ার বললেন, 'আমার প্রেসিডেন্ট আমাকে ক্ষমতা দিয়েছেন, আমি যেন আপনার সহযোগিতার বিনিময়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্যের প্রস্তাব দিই।'

'ওই একই ক্ষমতা হার ম্যাজেস্টি'জ গভর্নমেন্ট আমাকেও দিয়েছে,' তাল মেলালেন স্যার কীথ মারটেল। 'এবং আমার সরকার একশো সত্তর মিলিয়ন ডলারের মোটা একটা অংশ যোগান দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।'

'তবু আমি একা সিদ্ধান্ত নেয়ার কেউ নই। একজনের পক্ষে ব্যাপারটা বড় বেশি ভারী।' প্রাইম মিনিস্টার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'আমি আমার মন্ত্রীদের কাছে ভোট চাইব, কাজেই আপনারা ক'মিনিটের জন্যে, প্লীজ...'

অ্যামব্যাসাডররা একযোগে চেয়ার ছেড়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

'মেজর রবসন কোথায়?' প্রশ্ন করলেন ড. ওয়ার্নার।

'ওখানে অপেক্ষা করছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে কমান্ড কেবিনের সাউন্ডপ্রুফ দরজার দিকে ইঙ্গিত করল রানা।

'এই আলোচনায় ওকেও আমাদের দরকার, প্লীজ,' স্ক্রীন থেকে বললেন ড. ওয়ার্নার, কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল রানা।

মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকল রবসন, ছাদ নিচু বলে একটু ঝুঁকে থাকল, শার্ক ক্যাপটা ভুরুর কাছে নেমে আছে। 'গুড ইভনিং, স্যার।' স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে বলল সে, রানাকে পাশ কাটিয়ে পাশের সীটে বসল।

'রবসম এখানে থাকায় আমি খুশি,' বলল রানা। 'আশা করি আমার প্ল্যানটা সমর্থন করবে ও। ইয়েলো কন্ডিশনে পাল্টা আঘাত যদি পৌনে এগারোটায় করা হয় তাহলে সাফল্যের সম্ভাবনা আগের চেয়ে অনেক বাড়বে বলে আমার ধারণা।' আস্তিন সরিয়ে হাতঘড়ি দেখল ও। 'তারমানে আমরা আক্রমণ করব আর চল্লিশ মিনিট পর, ড্রাগসের প্রভাব তখন সবচেয়ে কম থাকবে। আমার ধারণা...'

'ধন্যবাদ, মেজর রানা–,' শান্তভাবে রানাকে বাধা দিলেন ড. ওয়ার্নার। 'কিন্তু আমি আসলে মেজর রবসনকে এখানে ডেকেছি যাতে আমার নির্দেশ নিয়ে কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে। মেজর রবসন, শার্ক কমান্ডের কমান্ডার মেজর মাসুদ রানা এখুনি হাইজ্যাকারদের কাবু করে বোয়িং জিরো-সেভেন-জিরো দখল করতে চায়। আমি, তোমার উপস্থিতিতে, তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। কোন অবস্থাতেই, প্রকাশ্যে বা গোপনে টেরোরিস্টদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কোন ব্যবস্থা আমার হুকুম ছাড়া নেয়া যাবে না। আমি কি আমার বক্তব্য পরিষ্কার ব্যাখ্যা করতে পেরেছি?'

'ইয়েস, স্যার।' রবসনের চেহারায় পাথুরে একটা ভাব।

'মেজর রানা?'

'ইয়েস, ড. ওয়ার্নার।'

'ভেরি গুড। আমি চাই তোমরা আমার জন্যে তৈরি থাকো, প্লীজ। অ্যামব্যাসাডরের সাথে কথা বলে আবার আমি ফিরে আসছি।'

স্ক্রীন খালি হয়ে যেতে ধীরে ধীরে রানার দিকে ফিরল রবসন, যা দেখল তাতে তার চেহারা সামান্য বদলে গেল। তাড়াতাড়ি কমান্ড কনসোলের সেনসর বোতামে চাপ দিল সে, সাথে সাথে সমস্ত রেকর্ডিং টেপ অচল হয়ে গেল, বন্ধ হয়ে গেল সব ক'টা ভিডিও ক্যামেরা। যাই বলুক ওরা, তার কোন রেকর্ড থাকবে না।

'কিছু বলবে, বস্?' জিজ্ঞেস করল রবসন।

নিঃশব্দে আরেকবার হাতঘড়ি দেখল রানা। থমথম করছে চেহারা। দশটা বেজে সতেরো মিনিট।

'চিন্তা করো, বস্, ভাল করে ভেবে দেখো,' আবার মুখ খুলল রবসন, জানে রানা কি ভাবছে। 'ফর গডস সেক, ম্যান, কেন তুমি নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে যাবে? এ-ধরনের একটা কাজ করলে কি মূল্য দিতে হতে পারে, ভেবে দেখেছ?

তোমার বিশ্বাসযোগ্যতা বলে কিছু আর থাকবে? কোরো না, বস্। কোরো না। মাথা ঠাণ্ডা করে আরেকটু ভেবে দেখো···'

'ভাবছি, রবসন,' শান্ত গলায় বলল রানা, '–ঘটনাটা ঘটার পর থেকে ভাবনা ছাড়া একটা মুহূর্ত কাটাইনি–প্রতিবার একই সিদ্ধান্তে এসেছি। ওদের যদি মরতে দিই, ওই মেয়েটার চেয়ে আমার অপরাধ কোন অংশে কম হবে না।'

'কেন তুমি অপরাধী হতে যাবে? সিদ্ধান্তটা আরেকজনের···'

'এভাবে এড়িয়ে যাওয়া সহজ,' বলল রানা। 'কিন্তু এড়িয়ে গেলে কি চারশো লোক বাঁচবে?'

রানার কাঁধে একটা হাত রেখে মৃদু চাপ দিল রবসন। 'কিন্তু তোমার ক্যারিয়ার, বস্? ভবিষ্যৎ? কেউ আর তোমার ওপর ভরসা রাখতে পারবে?'

'ইচ্ছে করলে তুমি সরে দাঁড়াতে পারো, রবসন। আমি চাই না তোমার ক্যারিয়ার নষ্ট হোক।'

'সরে দাঁড়াতে তেমন পটু নই, বস্।' রানার কাঁধ থেকে হাতটা নামিয়ে নিল রবসন। 'তুমি থাকলে আমিও আছি, আমাকে থাকতে হবে।'

'কিন্তু কেন? কেন তুমি যেচে পড়ে নিজের সর্বনাশ···?'

'ব্যাখ্যা চেয়ো না, বস্, দিতে পারব না। হয়তো আমার ভেতর বীরপূজোর প্রবণতা আছে। হয়তো কারও কাছ থেকে কিছু শিখলে প্রতিদান না দিয়ে পারি না। হয়তো কারও মধ্যে মানবিক গুণ দেখলে আমারও ইচ্ছে হয় ভাল কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়ি।'

'আমি চাই তুমি একটা প্রতিবাদ রেকর্ড করো–সবাই একসাথে ডোবার কোন মানে হয় না,' বলল রানা, রেকর্ডিং ইকুইপমেন্টের সুইচ অন করল ও–অডিও আর ভিডিও, দুটোই। 'মেজর রবসন,' স্পষ্ট উচ্চারণে বলল রানা, 'আমি মেজর মাসুদ রানা ইয়েলো কন্ডিশনে জিরো-সেভেন-জিরো এখুনি দখল করতে যাচ্ছি। সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করো, প্লীজ।'

ক্যামেরার দিকে মুখ ফেরাল রবসন। 'মেজর মাসুদ রানা, সেন্ট্রাল কমিটির অনুমতি ছাড়া ইয়েলো কন্ডিশন ঘোষণা করছেন আপনি, আমি এর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

'মেজর রবসন, তোমার প্রতিবাদ নোট করা হলো,' গম্ভীরভাবে বলল রানা, হাত ঝাপটা দিয়ে সেনসর বোতাম টিপল রবসন।

'যথেষ্ট পাগলামি হয়েছে,' সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'চলো বস্, শালাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে আসি।'

হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের সীটে বসে রয়েছে জেসিকা, আরোহীদের পিলে চমকানো আরও একটা দুঃসংবাদ দেয়ার জন্যে মনে মনে তৈরি হচ্ছে সে। চোখের পিছনে বোধহয় কোন শিরা লাফাচ্ছে, তা না হলে ব্যথা হবে কেন! মাইক্রোফোন ধরা হাতটাও কাঁপছে একটু একটু। জানে, এ-সবই ড্রাগের প্রতিক্রিয়া। মনে মনে স্বীকার করল সে, লিটারেচারে যা লেখা ছিল তার চেয়ে বেশি ডোজ বরাদ্দ করাটা বোকামি হয়ে গেছে। সেজন্যে মূল্য দিতে হচ্ছে

চারজনকেই। তবে আর বিশ মিনিট পর আবার এক ডোজ ড্রাগ নেয়ার সময় হবে, তখন মাত্রা ঠিক রাখবে সে, কারও জন্যেই দুটোর বেশি ট্যাবলেট বরাদ্দ করবে না।

'বন্ধুরা আমার,' মাইক্রোফোনে কথা বলতে শুরু করল সে। 'অত্যাচারীরা আমাদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করেনি। ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদীর এই হলো আসল চেহারা, আপনাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে মোটেও উদ্বিগ্ন নয় সে। অথচ আপনারা জানেন, এই অত্যাচারী লোকটার নেতৃত্বে একদল হায়েনা এ-দেশের বৈধ সন্তানদের কিভাবে শোষণ করছে, কিভাবে তাদের স্বাধীনতার দাবি অস্বীকার করে আসছে।'

হাঁপিয়ে গেছে জেসিকা, দম নিয়ে আবার শুরু করল, 'আমি দুঃখিত, কিন্তু নষ্ট করার মত আর সময় নেই—আরও চারজন জিম্মিকে বেছে নিতে হবে আমাদের। কথা দিচ্ছি, বাছাইয়ের কাজে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখা হবে। সেই সাথে আপনাদের আমি এই বলে কাতর হতে নিষেধ করি যে এখানে এই মুহূর্তে যে বিপ্লব ঘটছে আপনারা আমরা সবাই তাতে সামিল হতে পেরে গর্বিত। সবাই আমরা এই ভেবে অহঙ্কার করতে পারি যে...'

অকস্মাৎ বার কয়েক বিদ্যুৎ চমকাল, সেই সাথে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। গুরু-গম্ভীর মেঘ ডাকছে। অর্থহীন পাগলের প্রলাপ বকে চলেছে জেসিকা, দম ফুরিয়ে গেলে থামছে, তারপর আবার কঠিন কঠিন শব্দ সাজিয়ে যা মনে আসছে তাই বলে যাচ্ছে।

'সীট নম্বর ধরে আপনাদের ডাকব আমি,' আবার কাজের কথায় ফিরে এল সে। 'আমার অফিসাররা আপনাদের নিয়ে আসবে। দয়া করে তাড়াতাড়ি আপনারা চারজন ফার্স্ট ক্লাস গ্যালিতে চলে আসবেন। বিপ্লবী ভাই এবং বোনেরা, আপনাদের কাছ থেকে আমি পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি।' তিন সেকেন্ডের বিরতি, তারপর আবার তার গলা শোনা গেল, 'সীট নম্বর নাইনটি/বি। দাঁড়ান, প্লীজ।'

কড় কড়-কড়াৎ করে বাজ পড়ল কোথাও। লাফ দিয়ে জেসিকার পাশে চলে এল ক্লারা, থরথর করে কাঁপছে সে। তার চোখ জবা ফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে, চোখের পাতা ভারী। চেহারায় উদ্‌ভ্রান্ত একটা ভাব নিয়ে কান পেতে থাকল সে, বজ্রপাতের আওয়াজকে তার ভারী ভয়। অন্যমনস্কভাবে পিঠে হাত বুলিয়ে অভয় দিল তাকে জেসিকা।

লম্বা চুলে মুখ ঢাকা জার্মান যুবক বার্চ এগিয়ে গেল, নাইনটি-বি সীটের মধ্য বয়স্ক আরোহীকে টেনে-হিঁচড়ে দাঁড় করাল সে। লোকটার একটা হাত ধরে মুচড়ে শিরদাঁড়ার কাছে নিয়ে এল।

'কিছু একটা করুন আপনারা!' সহ-আরোহীদের দিকে তাকিয়ে করুণ আবেদন জানাল লোকটা। তার সাদা শার্ট ঘামে ভিজে আছে। ঢিলেঢালা ট্রাউজারের ভেতর বারবার ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাঁটু, প্যাসেজ ধরে তাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বার্চ। 'ওরা আমাকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে দেখেও কেউ আপনারা কিছু করবেন না?' বিস্ময়ে বিপন্ন চোখে লোকজনদের দিকে তাকাল লোকটা।

'প্লীজ, আমাকে বাঁচতে দিন! আমি বাঁচতে চাই!' কিন্তু সবাই ওরা যে যার কোলের দিকে তাকিয়ে থাকল। কেউ নড়ল না, কেউ মুখ খুলল না।

'সীট নম্বর ফরটি-থ্রী/এফ।'

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের সুন্দরী এক মহিলা, নিজের সীটের ওপর নম্বরটা দেখার সাথে সাথে তার চেহারা ধীরে ধীরে আঁচ লাগা মোমের মত গলে যেতে শুরু করল। কান্নার আওয়াজ চাপা দেয়ার জন্যে মুখে একটা হাত তুলল সে। তার ঠিক উল্টোদিকের সীট থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন একজন, চটপটে এক বৃদ্ধ। মাথা ভর্তি প্রচুর চুল, সব সাদা হয়ে গেছে, ক্লিনশেভড়। সপ্রতিভভাবে তিনি তাঁর টাইটা ঠিক করলেন।

প্রায় চার যুগ আগে সাহসের অভাবে একটা ভুল করেছিলেন ভদ্রলোক, সমাজ আর লোকলজ্জার ভয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মেয়েটাকে। সেই রু'মণির সাথে মেয়েটার চেহারা একটু যেন মেলে, কাজেই আজ তিনি সাহসের অভাবে কোন ভুল করতে পারেন না। ঠোঁট কাঁপল না, চোখের হাসি হাসি ভাবটুকু এতটুকু ম্লান হলো না, ফিসফিস করে তিনি বললেন, 'আমার সাথে সীট বদল করবে, ম্যাডাম, প্লীজ?' বড় বেশি স্পষ্ট উচ্চারণ, কণ্ঠস্বরে বিদেশী টান। কথা শেষ করে উত্তরের অপেক্ষায় থাকলেন না, প্যাসেজে বেরিয়ে সহজ ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগলেন। হনহন করে এগিয়ে আসছিল ফরাসী যুবক পিয়েরী বার্তোস, বৃদ্ধ ডা. আজমল হুদার কনুই চেপে ধরল সে। ঝাঁকি দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন তিনি, দৃঢ় পায়ে একাই ফরওয়ার্ড গ্যালিতে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বোয়িং জিরো-সেভেন-জিরোর সবচেয়ে দুর্বল জায়গা চিহ্নিত করা হলো। ফ্লাইট ডেকের পাশের জানালাগুলো থেকে বিশ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে পিছনের লেজ পর্যন্ত যে জায়গাটুকু রয়েছে সেখানে প্লেন থেকে কারও চোখ পড়বে না। হাইজ্যাকারদের সাথে অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট রয়েছে, এবং তাদের আত্মবিশ্বাস আকাশচুম্বি, কাজেই দুর্বল জায়গাটার ওপর কড়া নজর রাখছে বলে মনে হয় না।

মেইন সার্ভিস হ্যাঙ্গারের কোণে দাঁড়িয়ে কৌশল আর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছে ওরা। দাঁতের ফাঁকে চুরুট রয়েছে রবসনের, মন দিয়ে রানার কথা শুনছে সে। সরাসরি বোয়িঙের পিছনে রয়েছে ওরা, মাঝখানে চারশো গজের কিছু বেশি দূরত্ব, তার অর্ধেকটাই হাঁটু সমান উঁচু ঘাসে ঢাকা, বাকিটা টারমাক। টারমাক শুধু ট্যাক্সিওয়ের নীল আলোয় আর এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের সাদা আভায় আলোকিত হয়ে আছে। এয়ারপোর্টের সব আলো নিভিয়ে দেয়ার কথা ভেবেছিল রানা, পরে বাতিল করে দিয়েছে চিন্তাটা। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলে হাইজ্যাকাররা বিপদ টের পেয়ে যাবে, বোয়িঙের কাছে পৌঁছুতে অ্যাসল্ট টীমেরও অসুবিধে হবে।

'কই, কিছুই তো দেখছি না,' চোখ থেকে নাইট গ্লাস নামিয়ে বলল রবসন। অনেক আগেই নিভে গেছে তার চুরুট, তবু ফেলছে না সেটা। 'ব্লাইন্ড স্পটে ওরা নজর রাখছে না।'

দু'জনেই ওরা একজন এন.সি.ও-র হাতে নিজেদের নাইট গ্লাস ধরিয়ে দিল, ওগুলো আর দরকার হবে না। একান্ত প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট ছাড়া বাকি সব কিছু

ফেলে রেখে যাচ্ছে অ্যাসল্ট টীম।

টার্মিনাল ভবনে নিজের লোকদের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্যে হালকা, এগারো আউন্সের একটা ভি.এইচ.এফ. ট্রানসিভার সেট নিয়েছে রানা, আর শুধু একটা ওয়ালথার পি.কে.থারটি এইট অটোমেটিক পিস্তল। নিতম্বের কাছে কুইক-রিলিজ হোলস্টারে রয়েছে ওটা। অ্যাসল্ট টীমের অন্যান্য সদস্যরা যে যার পছন্দ মত অস্ত্র বেছে নিয়েছে। রবসন নিয়েছে ব্রাউনিং হাই-পাওয়ার পয়েন্ট ফরটিফাইভ, ম্যাগাজিনে চোদ্দ রাউন্ড গুলি। সবাই ওরা সুপার ভেলেক্স এক্সপ্লোসিভ বুলেট ভরেছে যে যার অস্ত্রে–ধাক্কা লাগার সাথে সাথে ধরাশায়ী হবে টার্গেট, শরীরের ভেতর বিস্ফোরণ ঘটায় ভেদ করে বেরিয়ে আর কাউকে আহত করার আশঙ্কা নেই।

রোলেক্সের আলোকিত ডায়ালে চোখ রাখল রানা। এগারোটা বাজতে ষোলো মিনিট বাকি। ঠিক এই মুহূর্তে জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে এমন একটা কাজে হাত দিতে যাচ্ছে ও। এর পরিণতি কি হতে পারে ওর জানা নেই। কিন্তু সে-ব্যাপারে চিন্তিত নয় ও। যা-ই ঘটুক, পরে দেখা যাবে।

মুঠো পাকানো ডান হাতটা মাথার ওপর তুলল রানা, দু'সেকেন্ড ওভাবে রাখল, তারপর নামিয়ে আনল ঝট্ করে। সিগন্যাল পেয়ে 'স্টিক' দু'জন দ্রুত সামনে বাড়ল, বুটে রাবার সোল থাকায় কোন শব্দ হলো না, পিঠের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা গ্যাস সিলিন্ডার আর প্রোব।

ধীরে ধীরে পাঁচ পর্যন্ত গুনল রানা, উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে শরীর। ড. ওয়ার্নারের নির্দেশ এখনও পরিষ্কার বাজছে ওর কানে। সব ভুলে গিয়ে আবার সিগন্যাল দিল রানা, ছায়া থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে রওনা হয়ে গেল অ্যাসল্ট টীম, ওদের তিন জন অ্যালুমিনিয়ামের একটা মই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, চারজনের কাঁধ থেকে স্ট্র্যাপের সাথে ঝুলছে স্টান গ্রেনেড ভরা ব্যাগ, অন্যান্যদের হাতে স্ন্যাপ-হ্যামার–প্লেনের দরজায় লাগানো তালা ভাঙার কাজে দরকার হবে ওগুলো।

প্রায় কোন আওয়াজ না করে ছুটল ওরা, প্রত্যেকে শুধু তার নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে।

টার্মিনাল বিল্ডিঙের আলোর আভায় স্টিক দু'জনকে দেখতে পেল রানা, নাক বরাবর সামনে, প্লেনের ফুলে থাকা রূপালি পেটের নিচে পজিশন নিয়েছে। ভিজে টারমাক চকচক করছে। বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক, সেই সাথে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ভেসে গেল চারদিক। তারপরই অন্ধকার, কিন্তু আবার যে-কোন মুহূর্তে চমকাতে পারে বিদ্যুৎ। বিস্ফোরণের মত শব্দ করে ডেকে ওঠার পর থামেনি মেঘ, গর গর করে গজরাচ্ছে। কালো আকাশটাকে চিরে আবার ছুটে গেল বিদ্যুৎ রেখা। ঘাসের ওপর মাথা উঁচু করে ছুটছে অ্যাসল্ট টীম, সবাইকে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। হাইজ্যাকাররাও কি দেখতে পেয়েছে?

মাটি ছেড়ে শক্ত টারমাকে উঠে এল ওরা। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে রানা যে-কোন মুহূর্তে এক সাথে দশ-বারোটা গ্রেনেড ছুটে আসবে। কিন্তু এল না। তারপর অনেকটা যেন হঠাৎ করেই বোয়িঙের ফিউজিলাজের নিচে পৌঁছে গেল

সব.ক'জন, যেন বাচ্চারা মুরগীর পেটের তলায় নিরাপদ আশ্রয়ে গা ঢাকা দিল।
• দুটো দল চার ভাগ হয়ে গেল, প্রত্যেকে তার বাঁ হাঁটু ভাঁজ করে টারমাকে ঠেকাল, একসাথে ঢেকে ফেলল যে যার মুখ গ্যাস মাস্ক দিয়ে। সবাইকে চট করে একবার দেখে নিয়ে ট্র্যানসিভারের বোতামে চাপ দিল রানা, গোটা ব্যাপারটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলবে না ও-বলা যায় না, হয়তো একই ফ্রিকুয়েন্সি মনিটর করছে হাইজ্যাকাররা। বোতাম চাপ দেয়ার ফলে টার্মিনাল ভবনে অপেক্ষারত শার্ক কম্যান্ডের লোকজন শব্দটা শুনতে পেল-ক্লিক। এই সিগনালের জন্যেই অপেক্ষা করছিল ওরা। প্রায় সাথে সাথে দূরে গর্জে উঠল একটা জেটের এক জোড়া ইঞ্জিন। উত্তর প্রান্ত ঘেঁষে ইন্টারন্যাশনাল ডিপারচার এরিয়ায় রয়েছে জেটটা, তবে জেটের এগজস্ট সার্ভিস এলাকার দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে। এক এক করে আরও তিনটে জেটের তিন জোড়া ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। সবগুলোর একত্রিত আওয়াজে এত দূর থেকেও কানে তালা লাগার অবস্থা হলো। হাত তুলে সিগনাল দিল রানা।

তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল একজন স্টিক, সিগনাল পেয়েই ড্রিলের ডগা ফিউজিলাজের গায়ে ছোঁয়াল সে। ড্রিলের আওয়াজ ওরাই কেউ শুনতে পেল না, হাইজ্যাকারদের তো আরও শুনতে না পাবার কথা। প্রেশার হাল ভেদ করে লম্বা প্রোব বোয়িঙের ভেতর সেঁধিয়ে গেল। সাথে সাথে দ্বিতীয় স্টিক তার প্রোব ঢোকাল খুদে ফুটোর ভেতর, চট করে রানার দিকে একবার তাকাল সে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছে রানা। সিগনাল দিল ও, প্লেনের ভেতর গ্যাস ঢুকতে শুরু করল।

ট্র্যানসিভারের বোতামে পরপর দু'বার চাপ দিল রানা, দু'সেকেন্ড পর বোয়িঙের পর্দা ঢাকা আলোকিত পোর্টহোলগুলো অন্ধকার হয়ে গেল একযোগে-মেইন্স থেকে পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

জেট ইঞ্জিনগুলোর আওয়াজ আরও কয়েক সেকেন্ড শোনা গেল। মইবাহী লোকদের সামনের দিকে এগোবার সিগনাল দিল রানা। রাবার প্যাড লাগানো মইয়ের মাথা মসৃণ ডানার কিনারায় ঠেকাল, তরতর করে ওপর দিকে উঠে গেল কমান্ডোরা। গ্যাস মাস্ক পরা কালো মূর্তিগুলো দ্রুত হাতে কাজ শুরু করল।

বোয়িঙের কেবিনে গ্যাস ঢোকার পর দশ সেকেন্ড সময় নিল রানা, তারপর তিনবার চাপ দিল বোতামে। সাথে সাথে মেইন্স থেকে আবার পাওয়ার সাপ্লাই শুরু হলো, প্লেনের ভেতর জ্বলে উঠল আলোগুলো। সেই সাথে এয়ার-কন্ডিশনিংও চালু হলো আবার। কেবিন আর ফ্লাইট ডেক থেকে বিষাক্ত গ্যাস এবার বেরিয়ে যাবে।

রবসনের কাঁধে মৃদু টোকা দিল রানা, বুক ভরে বাতাস টেনে ছুটল দু'জন। দুই ডানার ওপর অপেক্ষা করছে দুটো দল, তাদের নেতৃত্ব দেবে ওরা।

'এগারোটা বাজতে নয় মিনিট,' ক্লারাকে বলল জেসিকা, বাইরে কোথাও জেট এঞ্জিন চালু হওয়ায় গলা একটু চড়াতে হলো তাকে। ড্রাগের প্রভাব কমে আসায় জিভ আর গলা শুকিয়ে গেছে তার, চোখের কোণে একটা শিরা ঘন ঘন লাফাচ্ছে। মনে হলো পাকানো একটা রশি জড়ানো রয়েছে তার কপালে, কেউ সেটা ধীরে ধীরে চাপ দিয়ে আরও আঁটসাঁট করছে। মনে হচ্ছে হিসেবে ভুল করেছে খলিফা।

দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার হার মানতে রাজি নয়।' ঠোঁট একটু বাঁকা করে ফ্লাইট ডেকের খোলা দরজা দিয়ে ভাঁজ খোলা চেয়ারে বসা ক্রুদের দিকে তাকাল সে। পাকা চুল পাইলট ভার্জিনিয়া সিগারেট খাচ্ছে, নিস্তেজ চোখে জেসিকার দিকে তাকাল সে। কোন কারণ ছাড়াই পিত্তি জ্বলে গেল জেসিকার, গলা চড়িয়ে বলল, 'এই দলটাকেও গুলি করতে হতে পারে।'

প্রবল বেগে মাথা নাড়ল ক্লারা। 'খলিফার কখনও ভুল হয় না। এখনও এক ঘণ্টা বাকি রয়েছে ডেডলাইনের।' এই সময় একবার কেঁপে উঠে নিভে গেল আলো। পোর্ট হোলে শেড থাকায় বোয়িঙের ভেতরটা গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল, এয়ার-কন্ডিশনিঙের হিসহিস থেমে যাওয়ায় নেমে এল জমাট নিস্তব্ধতা।

অন্ধকারে বিস্ময়সূচক কিছু আওয়াজ হলো।'

কন্ট্রোল প্যানেল হাতড়াল জেসিকা। বোতামটা পেয়ে চাপ দিল সে, প্লেনের নিজস্ব ব্যাটারিচালিত আলো জ্বলে উঠল–ম্লান আর নিস্তেজ। নরম আলোর আভায় জেসিকাকে উত্তেজিত দেখল ক্লারা।

'পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছে ওরা,' হিস হিস করে বলল জেসিকা। 'এয়ার-কন্ডিশনিং···হয়তো ইয়েলো কন্ডিশন ঘোষণা করা হয়েছে–।'

'না,' প্রায় চিৎকার করে বলল ক্লারা। 'ফ্রেযার কোথায়?'

'কিন্তু···,' মুখের ভেতর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে জেসিকার, জিভটাকে অনেক বড় লাগছে। ক্লারার চেহারা তার চোখে ঝাপসা লাগল, মুখের কিনারাগুলো পরিষ্কার নয়। 'ক্লারা–,' শুরু করল আবার, কিন্তু নাকে কি যেন একটা গন্ধ পেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। হঠাৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ জোড়া। 'গড, ওহ্ গড!' আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, ম্যানুয়েল অক্সিজেন রিলিজ করার জন্যে উন্মাদিনীর মত লাফ দিল সামনের দিকে। প্রতিটি সীটের ওপরের প্যানেলে কোরাগেটেড হোস সহ অক্সিজেন মাস্ক রয়েছে।

'বার্চ! পিয়েরী!' কেবিন ইন্টারকমের মাউথপীসে মুখ ঠেকিয়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল জেসিকা। 'অক্সিজেন! অক্সিজেন নাও! ইয়েলো কন্ডিশন, ফর গডস সেক! ওরা ইয়েলো কন্ডিশন ঘোষণা করেছে!'

ঝুলন্ত একটা অক্সিজেন মাস্ক খপ্ করে ধরে কাঁপা হাতে মুখে পরল সে, ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করে শ্বাস টানতে লাগল। ফার্স্ট ক্লাস গ্যালিতে ক্রুদের একজন নিঃশব্দে ঢলে পড়ল সামনের দিকে। আরেকজন ঘুমিয়ে পড়ল কাত হয়ে।

ঘনঘন অক্সিজেন টানতে টানতে গলা থেকে ক্যামেরাটা নামাল জেসিকা, আতঙ্ক ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ক্লারা।

'তু-তুমি কি স-ব উড়িয়ে দিতে চা-চাও, জেসিকা?' অক্সিজেন মাস্ক খুলে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ক্লারা, মনে হলো কেঁদে ফেলবে, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে। 'না, প্লীজ, না!'

তাকে গ্রাহ্য না করে মাইক্রোফোনে চিৎকার করছে জেসিকা, 'বার্চ! পিয়েরী! পাওয়ার সাপ্লাই আবার শুরু হবার সাথে সাথে চলে আসবে শত্রুরা। চোখ আর কান ঢাকো, স্টান গ্রেনেড ব্যবহার করবে ওরা। ডানার দিকে জানালা আর দরজায় নজর রাখো।' আবার অক্সিজেন মাস্ক পরে হাপরের মত হাঁপাতে লাগল সে।

'মে-মেরো না, জেসিকা!' আবার মাস্ক খুলে ফেলেছে ক্লারা। 'সারেন্ডার করলে খ-খলিফা আমাদের এ-এক মাসের মধ্যে ছা-ছাড়িয়ে আনবে! আমাদের ম-মরার কোন দ-দরকার নেই!' সে ঠিক তোতলাচ্ছে না, কথা আটকে যাচ্ছে মুখে। হঠাৎই আবার চোখ ধাঁধিয়ে ফিরে এল আলো, মৃদু হিস-হিস আওয়াজের সাথে চালু হয়ে গেল এয়ার-কন্ডিশনিং।

বুক ভরে অক্সিজেন নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের দিকে ছুটল জেসিকা, কয়েকজন জিম্মি আর দু'জন এয়ার হোস্টেসের অজ্ঞান দেহ লাফ দিয়ে টপকাল, ঝুলন্ত আরেকটা অক্সিজেন মাস্ক খপ্ করে ধরে মুখে পরে গোটা কেবিনের ওপর চোখ বুলাল। বার্চ আর পিয়েরী ছাদের কাছাকাছি প্যানেল থেকে নেমে আসা অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার করছে। পোর্ট উইং প্যানেলের কাছে অস্ত্র হাতে তৈরি হয়ে আছে বার্চ, আর পিয়েরী দাঁড়িয়েছে পিছনের হ্যাচের পাশে, তার হাতেও পিস্তল। কিন্তু মাস্কে ঢাকা বলে তাদের মুখ দেখতে পেল না জেসিকা।

অল্প কয়েকজন আরোহী বুদ্ধি করে তাড়াতাড়ি অক্সিজেন মাস্ক টেনে নিয়ে মুখে লাগিয়েছিল, শুধু তারাই জ্ঞান হারায়নি। বাকি সবাই হয় সীটের ওপর ঢলে পড়েছে নয়তো কাত হয়ে পড়ে গেছে সীট থেকে।

খালি হাতে ক্যামেরা ধরে আছে জেসিকা। এখনও অক্সিজেন নিচ্ছে সে। জানে এয়ার-কন্ডিশনিং চালু হলেও গ্যাস বেরিয়ে যেতে আরও অনেক সময় লাগবে। যা ঘটার দু'এক সেকেন্ডের মধ্যে ঘটবে, তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে সে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ক্লারা, মাস্কের ভেতর ঠোঁট নড়ছে তার, আপন মনে বিড় বিড় করে কি বলছে শোনা যাচ্ছে না।

'সঙের মত দাঁড়িয়ে থেকো না,' ধমকের সুরে বলল জেসিকা। 'ফ্রন্ট হ্যাচটা কাভার করো, যাও।'

'জেসিকা, আ-আমাদের মরার কোন দরকার নেই...' আবেদন জানাল ক্লারা, এবং সাথে সাথে ভেঙে পড়ার শব্দ নিয়ে ভেতর দিকে বিস্ফোরিত হলো পোর্ট উইঙের ইমার্জেন্সী এগজিট প্যানেল। সদ্য তৈরি কালো গহ্বর থেকে আরও কালো একজোড়া গোল বস্তু উড়ে এল কেবিনের ভেতর।

'স্টান গ্রেনেড!' আর্তনাদ করে উঠল জেসিকা। 'গেট ডাউন!'

দশ

নীলিমায় ডানা মেলে দেয়া বাজপাখির মত হালকা আর স্বচ্ছন্দ বোধ করল রানা। শরীরে এমন একটা সর্বগ্রাসী ক্ষিপ্র ভাব এসে গেছে যে মনে হলো বেয়ে নয়, উড়ে এল ও-হাত আর পা যেন মইয়ের ধাপগুলো স্পর্শই করেনি। ছুঁড়ে দেয়া ঢিলের মত লাগছে নিজেকে, মনে এখন আর কোন রকম দ্বিধা নেই, জাতশত্রু টেরোরিস্টদের বিরুদ্ধে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছে বলে পরম স্বস্তি বোধ করছে। সারা জীবনের ট্রেনিং আর নীতিবোধ আজকের এই বিশেষ

মুহূর্তটিতে আগুন ধরা বারুদের মত করে তুলেছে ওকে।

মইয়ের শেষ ধাপ থেকে লাফ দিল রানা, মসৃণ আর বাঁকানো ডানার কিনারা টপকে সারফেসের ওপর কাঁধ আর নিতম্ব দিয়ে পড়ল, উঠে দাঁড়াল এক পলকে, চওড়া আর চকচকে ধাতব মেঝে পেরোল নিঃশব্দ পায়ে। ওর পায়ের চারপাশে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো মুক্তো দানার মত ফেটে পড়ছে, ছোটার সময় ভেজা বাতাসে চুল উড়ছে ওর। মেইন খোলের সামনে পৌঁছুল ও, প্যানেলের একপাশে হাঁটু গেড়ে পজিশন নিল, কিলবিল করতে করতে আঙুলগুলো খুঁজে নিল জয়েন্টের সূক্ষ্ম রেখাটা। উল্টো দিকে ঝট করে নিচু হলো ওর টীমের দু'নম্বর লোকটা।

মনে মনে একটা হিসেব করল রানা, 'গো' থেকে এখানে আসতে ছয় সেকেন্ড লেগেছে, মহড়ায় এরচেয়ে বেশি লেগেছিল। বিপদ আর ঝুঁকির মধ্যে মানুষের ক্ষিপ্রতা অনেক বেড়ে যায়।

রানা আর ওর দু'নম্বর সমস্ত শক্তি এক করে ইমার্জেন্সী এস্কেপ হ্যাচের রিলিজে চাপ দিল, স্থানচ্যুত হয়ে ভেতর দিকে ছিটকে পড়ল সেটা। গ্রেনেড হাতে অপেক্ষা করছিল অন্য দু'জন কমান্ডো, বিদ্যুৎ খেলে গেল তাদের শরীরে। তারপর চারজনই ওরা সেজদার ভঙ্গিতে বসে পড়ে যে যার চোখ আর কান ঢাকল।

কেবিনের বাইরে রয়েছে ওরা, তবু মনে হলো গজব পড়েছে মাথায়। বিস্ফোরণের শব্দের সাথে তীব্র আলোর ঝলকানি, বন্ধ চোখ হাত দিয়ে ঢাকা থাকা সত্ত্বেও এক্স-রে ছবির মত লাগছে আঙুলগুলো দেখতে পেল রানা। পরমুহূর্তে গ্রেনেড টীমের লোকেরা কেবিনের দিকে মুখ করে গর্জে উঠল, 'শুয়ে পড়ুন! সবাই শুয়ে পড়ুন।' এখন থেকে ওরা বিরতিহীন চিৎকার করতে থাকবে, যতক্ষণ প্রয়োজন মনে করে।

বিস্ফোরণের ধাক্কা খেয়ে গতি কমে গেল রানার, ওয়ালথারের বাঁটে একবার পিছলে গেল হাত, ঝটকা মেরে হ্যামার টেনে ভেতরে ঢুকল ও। খোলা হ্যাচ দিয়ে প্রথমে ভেতরে ঢুকল জোড়া পা, যেন একজন দৌড়বিদ সর্বশেষ রেখা স্পর্শ করার জন্যে শরীরটাকে পিছলে দিয়েছে। শূন্যে থাকতেই ক্যামেরা হাতে লাল শার্ট পরা মেয়েটাকে ছুটে আসতে দেখল ও, কি যেন চিৎকার করে বলছে। ডেকে পা ঠেকতেই গুলি করেছে ও, গুলিটা তার মুখে লাগল। সাদা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে লাল একটা গর্ত তৈরি করল বুলেট, মাথাটা পিছন দিকে এত জোরে ঝাঁকি খেলো যে ঘাড়ের ভঙ্গুর হাড়টা ভেঙে গেল, আওয়াজটা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা।

দু'হাত দিয়ে কান আর চোখ ঢেকে রেখেছে জেসিকা, ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। লোক ঠাসা কেবিনের ভেতর আগুন আর আলোর তাণ্ডব বয়ে গেছে। তারপরও ধাক্কাটা সামলাবার জন্যে একটা সীটের পিঠ ধরে টলতে লাগল সে, হিসেব করার চেষ্টা করছে শার্ক কমান্ডের লোকেরা খোলের ভেতর কখন ঢুকবে।

খোলের বাইরে যারা থাকবে বিস্ফোরণে তাদের খুব একটা ক্ষতি হবে না, প্রাণে বেঁচে যাবে। জেসিকা চাইছে গোটা অ্যাসল্ট টীম ভেতরে ঢুকলে গ্রেনেডগুলো ফাটাবে সে। যত বেশি সম্ভব লোককে নিজের সাথে নিয়ে যেতে

চায়। ক্যামেরাটা দু'হাতে ধরে হাত দুটো মাথার ওপর তুলল, অপেক্ষা করছে। 'এসো, চলে এসো!'

গোটা কেবিন ধোঁয়ায় ভরে গেছে, বারুদের গন্ধে বন্ধ হয়ে আসছে দম। প্যানেল থেকে ঝুলে থাকা হোসগুলো দুলছে আর মোচড় খাচ্ছে। একটা শট পিস্তলের গুলি হলো, কেউ চিৎকার করে বলল, 'শুয়ে পড়ুন! সবাই শুয়ে পড়ুন!' খোলা ইমার্জেন্সী হ্যাচওয়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে জেসিকা, ডিটোনেটর বোতামে আঙুল। কোথা থেকে আচমকা কালো একটা মূর্তি ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর।

'না, তুমি খুন করতে পারো না! এভাবে আমরা মরব না!' জেসিকার উঁচু করা হাত থেকে ক্যামেরাটা ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে লাফ দিল সে। এক পাশে সরে গিয়ে ক্লারাকে ফাঁকি দিল জেসিকা, কিন্তু মুঠোর মধ্যে ক্যামেরার স্ট্র্যাপটা পেয়ে হ্যাঁচকা টান দিল ক্লারা। 'মেরো না, আমাদের মেরো না! খলিফা আমাদের ছাড়াবে, খলিফা বলেছে আমরা কেউ খুন হব না!' ক্যামেরা নিয়ে সামনের দিকে ছুটল সে, হিতাহিত জ্ঞান নেই। 'খলিফা…'

খোলা হ্যাচ দিয়ে উড়ে এল রানা, প্যাসেজের মাঝখানে পা দিয়েই গুলি করল। পরের গুলি দুটো এত দ্রুত বেরুল শব্দ শুনে মনে হলো একটাই গুলি হয়েছে, পেটে আর বুকের ভেতর বিস্ফোরিত হলেও শিরদাঁড়া আর শোল্ডার ব্লেড চুরমার করে দিল ক্লারার। ঝাঁকি লেগে তার হাত থেকে ছুটে গেল ক্যামেরাটা, ডিগবাজি খেতে খেতে অচেতন একজন আরোহীর কোলে পড়ল।

বুনো বিড়ালের মত সাথে সাথে লাফ দিল জেসিকা, প্যাসেজে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল। ধোঁয়ায় কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু এভাবে এগোলে দেরি হয়ে যাবে। আরও বিশ ফিট দূরে রয়েছে ওটা। দাঁড়াতে হবে তাকে, চারটে অচেতন দেহ টপকে ক্যামেরার কাছে পৌঁছুতে হবে।

তিনটে গুলি করে নাচের ভঙ্গিতে জায়গা বদল করল রানা, দু'নম্বরের জন্যে ঠাঁই করে দিল। ঠিক রানার ফেলে আসা জায়গাতেই জোড়া পা দিয়ে নামল দু'নম্বর, পিছনের গ্যালির আড়াল থেকে বেরিয়েই তাকে গুলি করল লাল শার্ট পরা বার্চ। ভারী বুলেটের ধাক্কায় রানার পায়ের কাছে আছাড় খেলো দু'নম্বর, ভাঁজ করা ছুরির মত বাঁকা হয়ে গেছে শরীর, শরীরে প্রাণ নেই।

গুলির আওয়াজের দিকে পাঁই করে ঘুরল রানা, ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে আসা জেসিকার দিকে পিছন ফিরল। গুলি করার পর পিস্তলের ব্যারেল সিলিঙের দিকে উঠে গেছে, প্রাণপণ চেষ্টায় সেটাকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে বার্চ। তার লাল শার্ট নাভি পর্যন্ত খোলা, শক্ত আর চকচকে পেশী কালো লোমে ঢাকা, ঝাঁকড়া চুল ভর্তি মাথার নিচে চোখ দুটো একজন উন্মত্ত খুনীর। রানার গুলি তার লোমশ বুকে আঘাত করল, দ্বিতীয়টা চুরমার করে দিল কপালের হাড়। শক্তি মদমত্ত লোকটা এক নিমেষে রক্তাক্ত কাদার মত হয়ে গেল, প্যাসেজে মুখ থুবড়ে পড়ে আর নড়ল না।

'দু'জন,' বিড়বিড় করে বলল রানা। সম্পূর্ণ শান্ত রয়েছে ও, দক্ষতার সাথে হাতের কাজ করে যাচ্ছে। হিসেবেও ভুল নেই, ওয়ালথারে এখনও চারটে বুলেট

রয়েছে। 'আরও দু'জন আছে।' কিন্তু ধোঁয়ার জন্যে পনেরো ফিটের ওদিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া দুলতে থাকা অক্সিজেন হোসগুলোও চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে।

দোমড়ানো মোচড়ানো দু'নম্বরের ল্যাম্পটা লাফ দিয়ে টপকাল রানা, ওর বুট থেকে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল তাজা রক্ত। হঠাৎ করেই কার্ল রবসনকে কেবিনের আরেক দিকে দেখতে পেল রানা, স্টারবোর্ড উইং দিয়ে ঢুকেছে সে। পাক খাওয়া ধোঁয়ার ভেতর গ্যাস মাস্ক পরা রবসনকে পাতাল থেকে উঠে আসা দৈত্যের মত লাগল, মার্কসম্যানের প্রিয় ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসল সে, দু'হাতে শক্ত করে ধরল ব্রাউনিংটা।

লাল শার্ট পরা আরেক লোককে গুলি করল রবসন। ধোঁয়া আর হোসের মাঝখানে অস্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পেয়েছে সে। বাচ্চা ছেলের মত মুখ লোকটার, চিবুক ছোঁয়া গোঁফ। গুলিটা যেন সেন্টার বাল্কহেডের সাথে গেঁথে ফেলল তাকে। কপালের ফুটো থেকে হলুদ মগজ আর বুক থেকে ফিনকি দিয়ে লাল রক্ত বেরিয়ে এল।

তিনজন, ভাবল রানা। এবার ক্যামেরাটা খোঁজা দরকার। কিন্তু আরেকজন গেল কোথায়?

গুলি করার পর মেয়েটার হাত থেকে ক্যামেরাটা পড়ে যায়, দেখেছে রানা। ডিটোনেটরটা উদ্ধার করা জরুরী- কারণ ওটা জেসিকার হাতে পড়ে গেলে সবাইকে মরতে হবে। কেবিনে ঢোকার পর মাত্র চার সেকেন্ড পেরিয়েছে অথচ মনে হচ্ছে চোখের পলক ফেলতে অনন্তকাল লাগছে। স্ন্যাপ-হ্যামার দিয়ে দরজার তালা ভাঙা হচ্ছে, সামনে পিছনে দু'দিকে, আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হুড়মুড় করে বোয়িঙের ভেতর ঢুকে পড়বে শার্ক অ্যাসল্ট টীম, অথচ এখনও পালের গোদাটাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না ও।

'শুয়ে পড়ুন! সবাই শুয়ে পড়ুন!' ইমার্জেন্সী এগজিটের বাইরে থেকে এখনও একজন লোক নির্দেশ দিচ্ছে।

ফ্লাইট ডেকের দিকে ছুটল রানা, ওর ধারণা এখানে ওত্ পেতে আছে জেসিকা। সামনে পড়ল কালো চুল মেয়েটা, নিজের গাঢ় রক্তে ভাসছে। তালা ভেঙে পড়ার সাথে সাথে ফরওয়ার্ড হ্যাচ দড়াম করে খুলে গেল, কিন্তু ধোঁয়ার ভেতর সেদিকে কিছুই দেখতে পেল না রানা। লাশটা টপকাবার জন্যে লাফ দিতে যাবে, এই সময় ধোঁয়ার ভেতর থেকে ডেকের ওপর সিধে হতে শুরু করল জেসিকা। সিধে হতে হতেই লাফ দিল সে।

ক্যামেরা থেকে দু'হাত দূরে ডাইভ দিয়ে পড়ল জেসিকা, হাত বাড়িয়ে অন্ধের মত হাতড়াচ্ছে। একটু বেসামাল হয়ে পড়েছে রানা, লাফ দিতে যাচ্ছিল, শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়েছে নিজেকে, হাতটা ঘুরিয়ে এনে পিস্তলটা জেসিকার দিকে তোলার চেষ্টা করল।

ক্যামেরার স্ট্র্যাপ ধরে ফেলল জেসিকা। এতক্ষণে দেখতে পেল রানা ওটা। শিরশির করে উঠল শরীর। কিন্তু স্ট্র্যাপ ধরে টানলেও ক্যামেরাটা দুই সীটের মাঝখানে আটকে যাওয়ায় হাতে আনতে পারছে না জেসিকা। রানার কাছ থেকে

মাত্র বারো ফিট দূরে সে, কাজেই সরাসরি মাথায় গুলি করতে হবে। মাঝখানে ধোঁয়া থাকলেও ব্যর্থ হবার আশঙ্কা নেই।

আরোহীদের মধ্যে যারা জ্ঞান হারায়নি তাদের একজন ছিটকে এসে পড়ল রানার সামনে। লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টানার মুহূর্তে হতভম্ব হয়ে গেল রানা, জানে এখন আর সম্ভব নয়, তবু ব্যারেল উঁচু করার চেষ্টা করল ও। লোকটার কালো, ফোলা-ফাঁপা চুল দু'ফাঁক করে বেরিয়ে গেল বুলেট। দু'হাত মাথার ওপর তুলে নাচছে লোকটা। 'গুলি করবেন না। প্লীজ, প্লীজ! আমাকে এখান থেকে বেরুতে দিন।' চুল পোড়ার গন্ধ বাতাসে। এই মুহূর্তে জেসিকা কি করছে দেখতেই পাচ্ছে না রানা।

খালি হাতে লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রানা। পলকের জন্যে দেখতে পেল টানতে টানতে স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে ফেলেছে জেসিকা, কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে গিয়ে ক্যামেরাটা ধরে ফেলল।

রানার পিস্তল ধরা হাতটা ধরে ঝুলে পড়ল উদ্ভ্রান্ত লোকটা।

মাঝখানের কয়েক প্রস্থ সীটের ওদিক থেকে গুলি করল রবসন, একবার। এখনও সে স্টারবোর্ড প্যাসেজে রয়েছে, টার্গেট মিস করার সম্ভাবনা ষোলো আনা। রানার কাঁধের নয় ইঞ্চি দূর দিয়ে ছুটে যেতে হবে বুলেটটাকে, তা না হলে জেসিকার দেহ-কাঠামোর কিনারায়ও লাগবে না। ঝুলন্ত হোসগুলো আরেক বাধা।

রবসনের প্রথম গুলিটা লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলো। তবে কানের ওপর চুল আর খুলি ছুঁয়ে গেছে বুলেট; একটা ঝাঁকি মত খেল জেসিকার মাথা, ভারসাম্য হারিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল প্যাসেজে।

বসে বসে ক্যামেরার গায়ে ডিটোনেটর খুঁজছে।

উন্মাদ লোকটার গলায় ডান হাতের শক্ত আঙুল দিয়ে জোরে একটা খোঁচা মারল রানা, ছিটকে নিজের সীটের ওপর গিয়ে পড়ল সে। প্রাণপণ চেষ্টা করে পিস্তল ধরা বাঁ হাতটা জেসিকার দিকে তুলে লক্ষ্যস্থির করল রানা, জানে সরাসরি মাথায় লাগাতে হবে, যাতে আঘাতের সাথে সাথে অচল হয়ে যায় আঙুলগুলো।

রবসন দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়ল, প্রায় রানার সাথে একই সময়ে। রবসনের বুলেটের ধাক্কায় স্যাৎ করে দূরে সরে গেল জেসিকা, তার খালি করা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে গেল রানার বুলেট।

জেসিকার ডান কাঁধে লেগেছে গুলি, ঝাঁকি খেয়ে তার একটা হাত স্যালুটের ভঙ্গিতে কপালের কাছে উঠে গেল। দাঁড়াবার চেষ্টা করছে জেসিকা, তার মাথায় লক্ষ্যস্থির করল রানা। কিন্তু আবারও ট্রিগার টানার আগে ধোঁয়ার ভেতর থেকে ছুটে এল কয়েকটা মূর্তি। জেসিকাকে তারা ঘিরে দাঁড়াল, লাথি মারছে, চুল ধরে টানাটানি করছে। ফরওয়ার্ড হ্যাচ দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল শার্ক অ্যাসল্ট টীমের লোকজন, খ্যাপা আরোহীদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে জেসিকার প্রাণ বাঁচাল। হোলস্টারে ওয়ালথার রেখে ক্যামেরাটা তোলার জন্যে ঝুঁকল রানা। তুলে নিল ওটা, হাসল।

তারপর আরেক হাতে গ্যাস মাস্কটা মুখ থেকে নামাল ও। 'আর কেউ নেই। অপারেশন কমপ্লিট!' চেঁচিয়ে বলল রানা। মাইক্রোফোনের সুইচ অন করল ও।

'টাচ ডাউন! টাচ ডাউন!' পরিপূর্ণ সাফল্যের কোড সিগনাল। শার্ক কমান্ডের তিনজন কমান্ডো ধরে রেখেছে জেসিকাকে, আহত হয়েও কার্পেটের ওপর নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টায় ধস্তাধস্তি করছে সে খাঁচায় বন্দী হিংস্র নেকড়ের মত।

'ইমার্জেন্সী প্লাস্টিক স্লাইড নামাও,' নির্দেশ দিল রানা, প্রতিটি খোলা প্রবেশপথ থেকে বাতাস ভরা লম্বা প্লাস্টিক স্লাইড নেমে গেল টারমাকে। শার্ক কমান্ডোর লোকেরা সাথে সাথে আরোহীদের পথ দেখিয়ে নামাতে নিয়ে চলল।

ওঁয়া ওঁয়া করতে করতে বারোটা অ্যাম্বুলেন্স ছুটে এল টার্মিনাল ভবন থেকে। শার্ক কমান্ডের ব্যাক-আপ টীম সদ্য জ্বলে ওঠা ফ্লাডলাইটের আলোয় ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে বোয়িঙের দিকে, উল্লাসে ফেটে পড়ছে তাদের গলা, 'টাচ ডাউন! টাচ ডাউন!'

প্রাগৈতিহাসিক দানবের মত উত্তরপ্রান্তের অ্যাপ্রন থেকে ছুটে এল প্রকাণ্ড যান্ত্রিক সিঁড়ি।

এক হাতে ক্যামেরা নিয়ে মেয়েটার দিকে ঝুঁকল রানা। হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ করে রানার দিকে তাকাল জেসিকা। তার চোখ দুটো অঙ্গারের মত জ্বলছে। কপালে ঘাম, হাঁপাচ্ছে সে। হঠাৎ মাথাটা একটু পিছিয়ে নিল, ছোবল মারার আগে সাপ যেমন পিছিয়ে নেয়। একদলা থুথু ছুঁড়ে দিল সে। রানার পায়ের ওপর ছড়িয়ে পড়ল সাদা ফেনা। রানার পাশে এসে দাঁড়াল রবসন। 'দুঃখিত, বস্। চেয়েছিলাম, কিন্তু হার্টে লাগেনি।'

'আমাকে তোমরা আটকে রাখতে পারবে না,' আচমকা চিৎকার জুড়ে দিল জেসিকা। 'তোমাদের মত চুনোপুঁটির কাজ নয় আমাকে আটকে রাখে। বড়জোর দু'মাস, হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাব আমি!'

প্রায় একটা ধাক্কার সাথে উপলব্ধি করল রানা, কথাটা সত্যি। প্লেন হাইজ্যাকারদের শাস্তি আইনের বইগুলোয় যাই লেখা থাক, নানা অজুহাত দেখিয়ে এবং অন্যায় চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত মাস কয়েকের জেল খাটিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় তাদের, কখনও কখনও জেল না খেটেই ছাড়া পেয়ে যায়। দু'হাত দিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরা কিশোরী মেয়েটার কথা মনে পড়ল রানার, ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল ওর পেট, উরু, আর পায়ের পাতায়।

'আমার লোকেরা আমাকে ছিনিয়ে নিতে আসবে!' আবার থুথু ছুঁড়ল মেয়েটা, এবার তাকে যারা ধরে রেখেছে তাদের একজনের মুখে। 'হয় ছিনিয়ে নেবে নাহয় বাধ্য করবে আমাকে ছেড়ে দিতে...'

এ-ও সত্যি। দুনিয়া জুড়ে অদ্ভুত এক অরাজকতা চলছে। বন্দী হাইজ্যাকার বা সন্ত্রাসবাদীদের মুক্ত করার জন্যে তাদের দলের সশস্ত্র লোকেরা জঙ্গী মিছিল করবে, রাস্তা-ঘাটে ভিড়ের মধ্যে বোমা ফাটাবে,নিরীহ শিশু আর মহিলাদের অপহরণ করে আটকে রাখবে। রানার মনে হলো, আজকের ওর এই সাফল্য আসলে সাময়িক একটা ব্যাপার মাত্র। অশুভ শক্তির গতি মন্থর করতে পেরেছে হয়তো, কিন্তু তাদের পরাজিত করতে পারেনি। আরও শক্তি সঞ্চয় করে, আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আবার ওরা ছোবল মারবে। কে জানে,এই মেয়েটাই হয়তো নেতৃত্ব দেবে তখনও।

'আমরাই বিপ্লব!' অক্ষত হাতটা কপালের কাছে তুলে স্যালুট করার ভঙ্গি করল জেসিকা। 'আমরাই শক্তি। কেউ, দুনিয়ার কোন শক্তি আমাদের রুখতে পারবে না।'

রানার চোখের সামনে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার বিকৃত লাশটা ভেসে উঠল। পাকা ফলের মত ফেটে গিয়েছিল তার ফোলা পেট।

ওর মুখের সামনে শক্ত মুঠো করা হাতটা নাড়ল জেসিকা। 'এই তো সবে শুরু—শুভ সূচনা ঘটেছে নতুন যুগের...'

সিধে হলো রানা। অস্থির বোধ করছে ও।

'পুঁজিবাদী শোষকদের পরাজয় অনিবার্য! সাম্রাজ্যবাদীদের পা চাটা কুকুর, শেষ যুদ্ধে তোমরা জিততে পারবে না! বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী...'

'সুধীবৃন্দ,' দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাইম মিনিস্টার বিষণ্ণচিত্তে ধীরে ধীরে কথা বলছেন, তাঁর চেহারায় গাম্ভীর্য মেশানো অভিমান, কণ্ঠস্বরে পরাজয়ের সুর, 'আমি এবং আমার কেবিনেট দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে টেরোরিস্টদের দাবি মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে হিংস্র একটা বাঘের পিঠে আশ্রয় নেয়া, যার পিঠ থেকে আর কখনোই আমরা নামতে পারব না।' থেমে টেবিলের অপরপ্রান্তে পাশাপাশি বসা অ্যামব্যাসাডরদের দিকে তাকালেন, তাঁর কাঁধ ঝুলে পড়ল। 'কিন্তু মানবতার স্বার্থে অনেক সময় চরম ত্যাগ স্বীকার না করে উপায় থাকে না। তাছাড়া, বৃহৎ একাধিক দেশের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা ছোট একটা দেশের না থাকারই কথা। এই সব বাস্তবতা উপলব্ধি করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে টেরোরিস্টদের দাবিগুলো মেনে নিয়ে অন্তত শিশু আর মহিলাদের উদ্ধার করা যেতে পারে...'

মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের সামনে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

ভুরু কুঁচকে উঠল প্রাইম মিনিস্টারের, কিন্তু আবার তিনি শুরু করলেন, 'তবে দুনিয়ার অন্যতম মাতবর হিসেবে আপনাদের সরকারদ্বয় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমি আশা করি...,' ফোনের বেল আবার বাজতে শুরু করায় তিনি অসহায় একটা ভাব করে থেমে গেলেন, তারপর বললেন, 'আপনি বরং কথা বলে নিন, স্যার...'

'এক্সকিউজ মি, মি. প্রাইম মিনিস্টার,' টিম ও'মেয়ার ফোনের রিসিভার তুললেন। ধীরে ধীরে তাঁর চেহারায় বিস্ময় আর অবিশ্বাস ফুটে উঠল। 'এক মিনিট ধরুন,' বলে প্রাইম মিনিস্টারের দিকে তাকালেন তিনি, হাত দিয়ে মাউথপীসটা চাপা দিলেন। 'মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি অতীব আনন্দের সাথে আপনাকে জানাচ্ছি যে তিন মিনিট আগে শার্ক কমান্ডের অ্যাসল্ট টীম কমান্ডো হামলা চালিয়ে বোয়িং জিরো-সেভেন-জিরো দখল করে নিয়েছে। তিনজন টেরোরিস্ট মারা গেছে, গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় ধরা পড়েছে আরেকজন, কিন্তু আরোহীদের একজনও হতাহত হয়নি। ইতিমধ্যে তাদের সবাইকে প্লেন থেকে বের করা হয়েছে। সবাই সুস্থ এবং অক্ষত।'

প্রকাণ্ডদেহী প্রাইম মিনিস্টার সীটের ওপর নেতিয়ে পড়লেন পরম স্বস্তিতে, কেবিনেট মন্ত্রীরা সবাই একযোগে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগল, এ যেন তাঁর ব্যক্তিগত বিজয়। প্রশ্রয় দেয়া পিতৃসুলভ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর

'টাচ ডাউন! টাচ ডাউন!' পরিপূর্ণ সাফল্যের কোড সিগনাল। শার্ক কমান্ডের তিনজন কমান্ডো ধরে রেখেছে জেসিকাকে, আহত হয়েও কার্পেটের ওপর নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টায় ধস্তাধস্তি করছে সে খাঁচায় বন্দী হিংস্র নেকড়ের মত।

'ইমার্জেন্সী প্লাস্টিক স্লাইড নামাও,' নির্দেশ দিল রানা, প্রতিটি খোলা প্রবেশপথ থেকে বাতাস ভরা লম্বা প্লাস্টিক স্লাইড নেমে গেল টারমাকে। শার্ক কমান্ডোর লোকেরা সাথে সাথে আরোহীদের পথ দেখিয়ে নামাতে নিয়ে চলল।

ওঁয়া ওঁয়া করতে করতে বারোটা অ্যাম্বুলেন্স ছুটে এল টার্মিনাল ভবন থেকে। শার্ক কমান্ডের ব্যাক-আপ টীম সদ্য জ্বলে ওঠা ফ্লাডলাইটের আলোয় ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে বোয়িঙের দিকে, উল্লাসে ফেটে পড়ছে তাদের গলা, 'টাচ ডাউন! টাচ ডাউন!'

প্রাগৈতিহাসিক দানবের মত উত্তরপ্রান্তের অ্যাপ্রন থেকে ছুটে এল প্রকাণ্ড যান্ত্রিক সিঁড়ি।

এক হাতে ক্যামেরা নিয়ে মেয়েটার দিকে ঝুঁকল রানা। হাত-পা ছোঁড়া বন্ধ করে রানার দিকে তাকাল জেসিকা। তার চোখ দুটো অঙ্গারের মত জ্বলছে। কপালে ঘাম, হাঁপাচ্ছে সে। হঠাৎ মাথাটা একটু পিছিয়ে নিল, ছোবল মারার আগে সাপ যেমন পিছিয়ে নেয়। একদলা থুথু ছুঁড়ে দিল সে। রানার পায়ের ওপর ছড়িয়ে পড়ল সাদা ফেনা। রানার পাশে এসে দাঁড়াল রবসন। 'দুঃখিত, বস্। চেয়েছিলাম, কিন্তু হার্টে লাগেনি।'

'আমাকে তোমরা আটকে রাখতে পারবে না,' আচমকা চিৎকার জুড়ে দিল জেসিকা। 'তোমাদের মত চুনোপুঁটির কাজ নয় আমাকে আটকে রাখে। বড়জোর দু'মাস, হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাব আমি!'

প্রায় একটা ধাক্কার সাথে উপলব্ধি করল রানা, কথাটা সত্যি। প্লেন হাইজ্যাকারদের শাস্তি আইনের বইগুলোয় যাই লেখা থাক, নানা অজুহাত দেখিয়ে এবং অন্যায় চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত মাস কয়েকের জেল খাটিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় তাদের, কখনও কখনও জেল না খেটেই ছাড়া পেয়ে যায়। দু'হাত দিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরা কিশোরী মেয়েটার কথা মনে পড়ল রানার, ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল ওর পেট, উরু, আর পায়ের পাতায়।

'আমার লোকেরা আমাকে ছিনিয়ে নিতে আসবে!' আবার থুথু ছুঁড়ল মেয়েটা, এবার তাকে যারা ধরে রেখেছে তাদের একজনের মুখে। 'হয় ছিনিয়ে নেবে নাহয় বাধ্য করবে আমাকে ছেড়ে দিতে...'

এ-ও সত্যি। দুনিয়া জুড়ে অদ্ভুত এক অরাজকতা চলছে। বন্দী হাইজ্যাকার বা সন্ত্রাসবাদীদের মুক্ত করার জন্যে তাদের দলের সশস্ত্র লোকেরা জঙ্গী মিছিল করবে, রাস্তা-ঘাটে ভিড়ের মধ্যে বোমা ফাটাবে,নিরীহ শিশু আর মহিলাদের অপহরণ করে আটকে রাখবে। রানার মনে হলো, আজকের ওর এই সাফল্য আসলে সাময়িক একটা ব্যাপার মাত্র। অশুভ শক্তির গতি মন্থর করতে পেরেছে হয়তো, কিন্তু তাদের পরাজিত করতে পারেনি। আরও শক্তি সঞ্চয় করে, আরও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আবার ওরা ছোবল মারবে। কে জানে,এই মেয়েটাই হয়তো নেতৃত্ব দেবে তখনও।

'আমরাই বিপ্লব!' অক্ষত হাতটা কপালের কাছে তুলে স্যালুট করার ভঙ্গি করল জেসিকা। 'আমরাই শক্তি। কেউ, দুনিয়ার কোন শক্তি আমাদের রুখতে পারবে না।'

রানার চোখের সামনে অন্তঃসত্ত্বা মহিলার বিকৃত লাশটা ভেসে উঠল। পাকা ফলের মত ফেটে গিয়েছিল তার ফোলা পেট।

ওর মুখের সামনে শক্ত মুঠো করা হাতটা নাড়ল জেসিকা। 'এই তো সবে শুরু—শুভ সূচনা ঘটেছে নতুন যুগের...'

সিধে হলো রানা। অস্থির বোধ করছে ও।

'পুঁজিবাদী শোষকদের পরাজয় অনিবার্য। সাম্রাজ্যবাদীদের পা চাটা কুকুর, শেষ যুদ্ধে তোমরা জিততে পারবে না! বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী...'

'সুধীবৃন্দ,' দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাইম মিনিস্টার বিষণ্নচিত্তে ধীরে ধীরে কথা বলছেন, তাঁর চেহারায় গাম্ভীর্য মেশানো অভিমান, কণ্ঠস্বরে পরাজয়ের সুর, 'আমি এবং আমার কেবিনেট দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে টেরোরিস্টদের দাবি মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে হিংস্র একটা বাঘের পিঠে আশ্রয় নেয়া, যার পিঠ থেকে আর কখনোই আমরা নামতে পারব না।' থেমে টেবিলের অপরপ্রান্তে পাশাপাশি বসা অ্যামব্যাসাডরদের দিকে তাকালেন, তাঁর কাঁধ ঝুলে পড়ল। 'কিন্তু মানবতার স্বার্থে অনেক সময় চরম ত্যাগ স্বীকার না করে উপায় থাকে না। তাছাড়া, বৃহৎ একাধিক দেশের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা ছোট একটা দেশের না থাকারই কথা। এই সব বাস্তবতা উপলব্ধি করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে টেরোরিস্টদের দাবিগুলো মেনে নিয়ে অন্তত শিশু আর মহিলাদের উদ্ধার করা যেতে পারে...'

মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের সামনে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

ভুরু কুঁচকে উঠল প্রাইম মিনিস্টারের, কিন্তু আবার তিনি শুরু করলেন, 'তবে দুনিয়ার অন্যতম মাতবর হিসেবে আপনাদের সরকারদ্বয় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমি আশা করি...,' ফোনের বেল আবার বাজতে শুরু করায় তিনি অসহায় একটা ভাব করে থেমে গেলেন, তারপর বললেন, 'আপনি বরং কথা বলে নিন, স্যার...'

'এক্সকিউজ মি, মি. প্রাইম মিনিস্টার,' টিম ও'মেয়ার ফোনের রিসিভার তুললেন। ধীরে ধীরে তাঁর চেহারায় বিস্ময় আর অবিশ্বাস ফুটে উঠল। 'এক মিনিট ধরুন,' বলে প্রাইম মিনিস্টারের দিকে তাকালেন তিনি, হাত দিয়ে মাউথপীসটা চাপা দিলেন। 'মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি অতীব আনন্দের সাথে আপনাকে জানাচ্ছি যে তিন মিনিট আগে শার্ক কমান্ডের অ্যাসল্ট টীম কমান্ডো হামলা চালিয়ে বোয়িং জিরো-সেভেন-জিরো দখল করে নিয়েছে। তিনজন টেরোরিস্ট মারা গেছে, গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় ধরা পড়েছে আরেকজন, কিন্তু আরোহীদের একজনও হতাহত হয়নি। ইতিমধ্যে তাদের সবাইকে প্লেন থেকে বের করা হয়েছে। সবাই সুস্থ এবং অক্ষত।'

প্রকাণ্ডদেহী প্রাইম মিনিস্টার সীটের ওপর নেতিয়ে পড়লেন পরম স্বস্তিতে, কেবিনেট মন্ত্রীরা সবাই একযোগে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগল, এ যেন তাঁর ব্যক্তিগত বিজয়। প্রশ্রয় দেয়া পিতৃসুলভ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর

'চেহারা। মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের দিকে আবার তাকালেন তিনি। খুশিতে গদগদ হয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ, স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'তোমাকে আমি কর্তব্যে অবহেলার জন্যে অভিযুক্ত করছি, মেজর মাসুদ রানা,' গমগম করে উঠল ড. ওয়ার্নারের কণ্ঠস্বর।

'চারশো লোকের জীবন রক্ষার জন্যে এছাড়া আর কোন পথ ছিল না,' সম্পূর্ণ শান্ত রানা। চোখে প্রায়-নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা দৃষ্টি। 'নৈতিক আইন বলে একটা কথা আছে, সেটা আমাকে ব্যবহার করতে হয়েছে।' হাইজ্যাকারদের কাবু করার পর পনেরো মিনিটও পেরোয়নি, চেহারা দেখে মনে না হলেও বমি বমি ভাব আর মানসিক অস্থিরতায় এখনও ভুগছে রানা।

'তুমি ইচ্ছে করে আমার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ অমান্য করেছ।' উন্মত্ত সিংহের মত ক্রোধে গরগর করছেন ড. ওয়ার্নার, স্ক্রীনে তাঁর চেহারা লাল টকটকে দেখাচ্ছে, সাদা চুল এলোমেলো আর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাথায়। তাঁর সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্ব হুকারের কমান্ড কেবিন ভরাট করে রেখেছে। 'তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল, তুমি সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছ...'

'আপনার এ-সব কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে শার্ক কমান্ড থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে আমাকে,' বাধা দিয়ে বলল রানা, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। এতক্ষণে ওর চেহারায় রাগের ভাব দেখা গেল, একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন ড. ওয়ার্নার। রানা জানে, সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে ড. ওয়ার্নার সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু তাঁর পক্ষেও সদ্য অর্জিত বিজয়ের নায়ককে এত তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। রানাকে বিদায় করতে সময় লাগবে, তবে ওর ভাগ্যলিপি নির্ধারিত হয়ে গেছে।

'সরাসরি আমার নিয়ন্ত্রণে থাকছ তুমি। ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে জিজ্ঞেস না করে কোন সিদ্ধান্ত তুমি নিতে পারবে না। আমি কি বোঝাতে চাইছি জানো, মেজর মাসুদ রানা?'

উত্তর দেবে না বলে মনস্থির করল রানা।

মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে বলে চললেন ড. ওয়ার্নার, 'এখন তোমার প্রথম কর্তব্য, সব কটা শার্ক ইউনিটকে প্রত্যাহার করে নেয়া–যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। টেরোরিস্ট যে মেয়েটা ধরা পড়েছে তাকে লন্ডনে পাঠাতে হবে। ওখানেই তাকে জেরা করা হবে, ওখানেই তার বিচার করা হবে...'

'মেয়েটা অপরাধ করেছে এখানে। খুনের অভিযোগে তার বিচার হওয়া উচিত এখানেই...'

'দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সাথে কথা বলে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে।' রানা তর্ক করছে দেখে রাগ হলেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখলেন ড. ওয়ার্নার। 'এবং এই সিদ্ধান্তের নড়চড় হবে না। তোমার কমান্ড প্লেনে করে লন্ডনে যাবে সে। শার্ক ডাক্তার তার দেখাশোনা করবে।'

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল রানা।

'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটাকে লন্ডনে চাই আমি,' আবার বললেন ড.

ওয়ার্নার। 'প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে কেউ যেন তার গায়ে হাত দিতে না পারে, সেক্ষেত্রে তোমাকে আমি সরাসরি দায়ী করব। এরইমধ্যে যথেষ্ট রক্তপাত ঘটিয়েছি আমরা, তোমার বোকামির জন্যে। আমি আর কোন রক্তপাত চাই না।'

আশ্চর্য ঋজু ভঙ্গিতে, দৃঢ় পায়ে হাঁটছে রানা। উঁচু হয়ে আছে শির, চোখ জোড়া ধকধক করে জ্বলছে। এয়ারপোর্টের প্রতিধ্বনিবহুল ডোমেস্টিক ডিপারচার হলে বহু লোকের ভিড়, শার্ক কমান্ডের সদস্যরা ওকে দেখে হাতের কাজ ফেলে সিধে হয়ে দাঁড়াল।

'ওয়েল ডান, স্যার।'

'গ্রেট স্টাফ, মেজর।'

'অ্যাই, পথ ছাড়ো, আমাদের কমান্ডার আসছেন...'

মুক্ত আরোহীদের সেবা করছে ওরা সবাই, তাদের জিনিস-পত্র গোছগাছ করে দিচ্ছে, সেই সাথে নিজেদের সিকিউরিটি আর কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট খুলে বাক্সে ভরছে। এই মুহূর্তে যে-যার কাজ ফেলে রানাকে ঘিরে ধরল, কে কার আগে হ্যান্ডশেক করতে পারে তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। শুধু শার্ক কমান্ডের সদস্যরাই নয়, আরোহীদের অনেকেই চিনতে পারল রানাকে। রানা তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় অভিনন্দন জানাল সবাই। বৃদ্ধা এক মহিলা ওর পথরোধ করে দাঁড়াল, হাত দুটো দু'পাশে মেলে দিয়েছে। রানা তার কুশল জিজ্ঞেস করল। দু'হাত দিয়ে ওকে আলিঙ্গন করল বৃদ্ধা : 'বেঁচে থাকো বাবা, শত বর্ষ আয়ু হোক তোমার। গড ব্লেস ইউ!'

'ঠিক যেন আমাদের দেশের একজন ছেলে,' বিড়বিড় করে বললেন চটপটে সেই বৃদ্ধ, আজমল হুদা। কিন্তু রানা তার কথা শুনতে পেল না। ভিড় ঠেলে রানার দিকে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করলেন তিনি, হাতটাও বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেন না। তাঁর বাড়ানো হাতটা এক সেকেন্ডের জন্যে শুধু রানার মাথা স্পর্শ করল। 'দোয়া করি...'

বৃদ্ধাকে আস্তে করে ছাড়িয়ে নিজের পথে এগোল রানা, হাসছে বটে, কিন্তু বুকের ভেতর ইস্পাত হয়ে আছে হৃদয়।

এখনও কালো অ্যাসল্ট স্যুট পরে রয়েছে কার্ল রবসন, কোমরে ঝুলছে পয়েন্ট ফরটিফাইভ। 'এটা একবার দেখো, বস্,' রানাকে ডেকে বলল সে। তার সামনে একটা ডেস্ক, তাতে বিস্ফোরক আর আগ্নেয়াস্ত্র। 'বেশিরভাগই রাশিয়ান, কিন্তু ওদের হাতে এল কিভাবে একমাত্র ঈশ্বরই জানে।' জোড়া ব্যারেল সহ শর্ট পিস্তলের দিকে আঙুল তাক করল সে। 'এগুলো হাতে তৈরি, সাংঘাতিক দামী। এত টাকা ওরা পেল কোথায়?'

'প্রচুর টাকা ওদের,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'এই তো মাত্র কয়েক মাস আগের কথা, মনে নেই? দেড় মিলিয়ন ডলার দিয়ে ওপেক মন্ত্রীদের ওদের হাত থেকে ছাড়ানো হলো? তারপর সিরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ছেলেকে কিডন্যাপ করেও তো বিশ লাখ ডলার পেয়েছে। পঁচিশ মিলিয়ন পেয়েছে সৌদী রাজপরিবারের দুই তরুণীকে আটক রেখে...' ডেস্ক থেকে একটা শর্ট পিস্তল তুলে নিল রানা, ব্রিচ

খুলল। ভেতরে গুলি নেই। 'মেয়েটা কি এটা দিয়েই জিম্মিদের খুন করেছিল?'

ঠোঁটের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে চুরুটটা চালান করে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল রবসন। 'সম্ভবত। দুটো ব্যারেল থেকেই গুলি করা হয়েছে।'

শট পিস্তলটা লোড করল রানা, লম্বা পা ফেলে অফিসের ভেতর দিয়ে আবার এগোল। আশপাশের সমস্ত ডেস্ক খালি, শুধু ফাইল আর টাইপরাইটার রয়েছে। এক দিকের দেয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি পড়ে রয়েছে তিন হাইজ্যাকারের মৃতদেহ, প্রতিটি লাশ স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মোড়কে ঢাকা। আরেক দেয়াল ঘেঁষে পড়ে রয়েছে রানার সহকারীর লাশ, একবার থেমে লাশটার দিকে ঝুঁকল রানা। মিশরীয় সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপটেন ছিল লোকটা। এখনও তার চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে আছে, মুখ হাঁ করা। মৃত্যু মানুষের মর্যাদা কেড়ে নেয়, ভাবল রানা। ধীরে ধীরে সিধে হলো ও।

শট পিস্তল হাতে ইনার অফিসে ঢুকল রানা, পিছু পিছু রবসন আসছে।

মেয়েটাকে ওরা একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে রেখেছে, একজন ডাক্তার আর দু'জন পুরুষ নার্স নিঃশব্দে সেবা করছে তার। স্যালাইন আর রক্ত, দুটো একসাথে দেয়া হচ্ছে জেসিকাকে। দরজা খোলার আওয়াজে বিরক্ত হলো ডাক্তার, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখে মুখের ভাব বদলে গেল। 'মেজর, ওর হাতটা যদি রাখতে চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে। শোল্ডারের জয়েন্ট চুরমার হয়ে গেছে...'

অপরূপ সোনালি মাথাটা ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। তার চুলে আর মুখে রক্ত লেগে রয়েছে। চেহারা ম্লান হয়ে গেছে, কিন্তু চোখ দুটো আগের মতই জ্বলজ্বলে।

'এখানকার কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি আমি,' বলে চলেছে ডাক্তার। 'দু'জন অর্থোপেডিক সার্জেন এখুনি চলে আসছেন, সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে একটা হেলিকপ্টারও পাওয়া যাবে...'

'বেরিয়ে যান,' ডাক্তারকে বলল রানা।

'জ্বী?' হতভম্ব হয়ে গেল তরুণ ডাক্তার।

'গেট আউট,' আবার বলল রানা। 'আপনারা সবাই।' দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল রানা। তারপর শান্ত, স্পষ্ট উচ্চারণে মেয়েটাকে বলল, 'মানুষ হিসেবে আমার একটা নীতি আছে, তুমি আমাকে বাধ্য করেছ সেই নীতি বিসর্জন দিতে। তারমানে আমার অধঃপতন ঘটেছে, তোমার লেভেলে নেমে এসেছি আমি।'

চোখে অনিশ্চিত দৃষ্টি নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল জেসিকা। আড়চোখে একবার দেখে নিল রানার হাতের শট পিস্তলটা। রানার ডান হাতে ঝুলছে ওটা।

'অবোধ শিশু আর নিরীহ মেয়েদের খুন করে তুমি আমাকে এমন একটা পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিলে, আমি আমার ঊর্ধ্বতন অফিসারের নির্দেশ অমান্য করে তার বিশ্বাস আর আস্থা হারালাম।' এক সেকেন্ড থামল রানা, তারপর আবার বলল, 'আমি একজন গর্বিত মানুষ, কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর না পেলে এখন যে কাজটা করব তা করার পর গর্ব করার মত আর কিছুই আমার থাকবে না।'

'মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের সাথে আমাকে দেখা করতে দেয়া হোক,' দাবির সুরে বলল জেসিকা, আরেকবার রানার হাতে ধরা শট পিস্তলের দিকে তাকাল। 'আমি আমেরিকান সিটিজেন। আই ডিমান্ড প্রোটেকশন...'

রানা তাকে থামিয়ে দিল, আগের মত স্পষ্ট, শান্ত সুরে কথা বলছে, 'ভেবো না এটা প্রতিশোধ। অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, মানুষের যত খারাপ গুণ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো প্রতিশোধ...'

'অসম্ভব, এ কাজ তুমি করতে পারো না!' জেসিকার গলা চড়ল, ভয় পেয়ে গেছে সে। রানা চাইছেও তাই, প্রথম মেয়েটাকে ভয় পাইয়ে দেবে, তারপর প্রশ্ন করবে। প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতেই হবে ওকে। 'আমার গায়ে হাত দিলে নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারবে তুমি। ওরা তোমাকে ছিঁড়ে খাবে...'

কিন্তু রানা এমনভাবে বলে গেল যেন তার কথা শুনতেই পায়নি, 'সত্যি এটা প্রতিশোধ নয়। কারণটা তুমি নিজে তৈরি করেছ। তুমি বেঁচে থাকলে ওরা তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে আসবে, আমি জানি। তোমার বেঁচে থাকার অর্থই হবে অন্য আরও নিরীহ মানুষের অকাল মৃত্যু।'

'আমি একজন মেয়েমানুষ। আমি আহত। আমি একজন যুদ্ধবন্দী।' আর্তনাদ করে উঠল জেসিকা, হাত-পা ছুঁড়ে স্ট্র্যাপ ঢিলে করার চেষ্টা করছে।

'উত্তর দেবে কিনা বলো। মেয়েমানুষ, আহত, যুদ্ধবন্দী–এসব পুরানো সেন্টিমেন্ট। ওসব বাতিল হয়ে গেছে। বইটা ছিঁড়ে ফেলেছ তুমি, লিখেছ নতুন একটা–আমি এখন তোমার নিয়মে খেলছি। মর্যাদা আর গর্ব হারিয়ে তোমার লেভেলে নেমে আসতে যাচ্ছি আমি...'

রবসনের দিকে তাকাল জেসিকা। 'ও পাগল হয়ে গেছে! ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও! আমি প্রোটেকশন চাই! আমি মার্কিন অ্যামব্যাসাডরের সাথে দেখা করতে চাই...'

'খলিফা কে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা।

স্থির হয়ে গেল জেসিকা। বোঝা গেল, সাংঘাতিক বিস্মিত হয়েছে সে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তা না হলে কি ঘটবে বলেছি। খলিফা কে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জেসিকা। উত্তর দেবে না।

'আমি আবার জিজ্ঞেস করছি, খলিফা কে?'

'তোমার যম!' হিস হিস করে বলল জেসিকা। 'তোমাকে তিনি ধ্বংস করবেন! আমার গায়ে হাত দিলে তোমার চোদ্দপুরুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে...'

'আমি জানতে চেয়েছি, কে সে?' রানা কঠিন আর ঠাণ্ডা।

ঘামে ভিজে গিয়ে চকচক করছে জেসিকার মুখ। হাঁপাচ্ছে। হঠাৎ রানার মুখের ওপর হাসল সে, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে বলল, 'তার সন্ধান পাওয়া তোমার মত চুনোপুঁটির কাজ নয়। স্রেফ পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলবে তোমাকে।'

'খলিফাই কি তোমাদের নেতা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তোমরা তার নির্দেশেই...'

রবসনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল জেসিকা, 'পাগলটাকে বোঝাও!

ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও এখান থেকে! ওকে আমার অসহ্য লাগছে!'

'রবসন,' ডাকল রানা, কিন্তু তাকাল না তার দিকে। 'এবার তুমিও বেরিয়ে যেতে পারো।'

আতঙ্ক আবার গ্রাস করল জেসিকাকে। 'না! অসম্ভব, না! ওকে থামাও! ওকে বাধা দাও! কে কোথায় আছ, আমাকে বাঁচাও! পাগলটা আমাকে খুন করতে চাইছে...'

'বস্-,' বলল রবসন।

'হ্যাঁ, কাজটা আমাকে করতে হবে,' বলল রানা। 'যদি উত্তর না পাই।'

জেসিকার দিকে তাকাল রবসন। 'খলিফা কে বলছ না কেন?'

ঘনঘন মাথা নাড়ল জেসিকা। 'মেরে ফেললেও বলব না।' এক সেকেন্ড পর আবার বলল, 'জানলে তো বলব!'

'আমার পরিচয় তুমি জানতে-কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমার পরিচয় তো তুমি একটা কুকুর-সাম্রাজ্যবাদীদের পা চাটা কুত্তা।'

'নামটা কার কাছ থেকে শুনেছ? শার্ক কমান্ডের কথা কে তোমাকে বলেছে? খলিফা কে?'

রানার দিকে থুথু ছুঁড়ল জেসিকা। 'দূর হও! আমার সামনে থেকে দূর হও!'

পিস্তল তুলল রানা, এক পা পিছিয়ে এল।

এখনও পিস্তলে হাত দিয়ে রয়েছে রবসন, রানাকে পাশ কাটিয়ে এগোল সে। তারপর জেসিকাকে আড়াল করে রানার দিকে ফিরল।

'এর মানে কি, রবসন?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে ফেলে দিল রবসন। 'আমি নিরস্ত্র, বস্। এরপরও কি বলে দিতে হবে অর্থটা? আমি চাই না এমন কিছু তুমি করো যাতে তোমার মর্যাদা নষ্ট হয়। এভাবে তুমি নিজেকে ধ্বংস করবে তা আমি দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে পারব না।'

রবসনের চোখে চোখ রেখে তিন সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল রানা, তারপর নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল।

ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল রবসনের ঠোঁটে, বস্ তাকে অপমান করেনি।

দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল রানা, কিন্তু বলতে গিয়ে দেখল সামনেই হাঁ করে আছে মৃত্যু। সাথে সাথে গুলি করল ও, কিন্তু একই সাথে গর্জে উঠল আরেকটা পিস্তল।

বোকামিটা রবসনের, পিস্তলটা কোথায় ফেলেছে লক্ষ করেনি। রানা পিছন ফিরতেই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে জেসিকা, রবসনের পিস্তল তুলে নিয়েছে হাতে। রবসন তখনও নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল বলে রানার পিঠে লক্ষ্য স্থির করতে পারছিল না সে। রানা দরজার কাছে পৌঁছুল, এই সময় রবসনও একপাশে সরে গিয়ে নিচের দিকে তাকাল নিজের পিস্তলের খোঁজে-আর ঠিক তখনই রানার দিকে পিস্তল তুলল জেসিকা। অক্ষত কাঁধের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করে আছে সে।

তার কপাল ফুটো করে ভেতরে ঢুকল বুলেট, হলুদ মগজ সহ বেরিয়ে গেল পিছন দিয়ে। রানার মাথার ওপর দেয়ালে লাগল জেসিকার গুলিটা, প্লাস্টার খসে পড়ল।

হাঁ করে প্রথমে রানা, তারপর জেসিকার দিকে তাকাল রবসন। মৃত জেসিকার হাতে নিজের পিস্তল দেখে ছানাবড়া হয়ে গেল চোখজোড়া। তারপর আবার রানার দিকে তাকাল সে।

পরস্পরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর ফিসফিস করে রবসন বলল, 'আমার দোষে, বস্, সম্পূর্ণ আমার দোষে খুন হয়ে যাচ্ছিলে তুমি!'

এগারো

নির্জন খাঁ-খাঁ দুপুর, কোথাও প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। দুই পাহাড়ের মাঝখানে চওড়া উপত্যকা, তার ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সরু রাস্তাটা, সভ্যতার আর কোন নিদর্শন চোখে পড়ে না। মিটারে যা বিল উঠবে তারচেয়ে পঞ্চাশ পাউন্ড বেশি দেয়া হবে বলে ড্রাইভারকে আসতে রাজি করিয়েছে রানা, কিন্তু লোকালয় ছাড়ার পর থেকে রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছে লোকটা। হয়তো ভাবছে, আরোহীর কোন বদ মতলব নেই তো?

আরও তিন মাইল এগোবার পর শুরু হলো গভীর বনভূমি, বনভূমির কিনারা থেকে শুরু হয়েছে ফিলবি'স ইয়ার্ড। জঙ্গলের ভেতর দিয়েও চলে গেছে পিচঢালা পথ, কাঁটাতারের বেড়া দেখা যাবে আরও মাইল দেড়েক এগোবার পর।

শেষ বাঁকটা নেয়ার পর কাঁটাতারের বেড়া আর ঘোড়সওয়ার, দুটো একসাথে দেখা গেল।

ঘোড়াটা চকচকে কালো, টগবগিয়ে ছুটে আসছে। দূর থেকে সওয়ারকে ভাল করে চেনা গেল না। তবে বোঝা গেল একটা মেয়ে। ঋজু ভঙ্গিতে, শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে পিঠের ওপর। পিছনে ঘন সবুজ গাছপালা থাকায় তার সাদা শর্টস আর লাল টি-শার্ট বড় বেশি উজ্জ্বল লাগল রানার চোখে। ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে একবার তাকাল ড্রাইভার, চোখে প্রশ্ন।

একবার মনে হলো খুব পরিচিত কেউ হবে—সোহানা নয় তো? সম্ভাবনাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিল রানা। গগলের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই সোহানার, রানার সাথে দেখা করার জন্যে এখানে আসবে না সে। তবে এখানে অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটবে, তা না হলে জরুরী খবর দিয়ে ওকে এখানে ডাকত না গগল।

এক মিনিট পর মেয়েটাকে চিনতে পারল রানা। ডোরা, গগলের বান্ধবী। বান্ধবী না বলে সঙ্গিনী বললে ওদের দু'জনের সম্পর্কটা একটু বেশি খোলসা হয়। স্বামী-স্ত্রীর মতই একসাথে বসবাস করছে ওরা, তা প্রায় দু'বছর তো হলোই। বিয়ের জন্যে দু'জনের কেউই তাগাদা অনুভব করছে না, তবে সবাই জানে বিয়েটা হবে, শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। গগলের জীবনে ডোরা আসার পর আশ্চর্য সব

পরিবর্তন এসেছে তার মধ্যে। রহস্যময় আর্মস স্মাগলার থেকে শিল্পপতি বনে গেছে গগল–স্পেন, আমেরিকা, স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড, আর ফ্রান্সে স্টীল মিল চালাচ্ছে সে। ইলেকট্রনিক্স, রেডিমেড গার্মেন্টস, খেলনা, তৈজসপত্র, স্যানিটারী ফিটিংস–এই রকম আরও অনেক ব্যবসার সাথে জড়িত সে। ডোরা তার পার্সোনাল সেক্রেটারিও বটে, প্রজেক্ট প্রোফাইল তৈরি করায় তার নাকি জুড়ি নেই। ইউরোপের প্রায় সব দেশে বাড়ি করেছে গগল, আগের মত এখন আর সে ভবঘুরে নয়। ফিলবি'স ইয়ার্ডটা এক ইংরেজ ব্যারনের কাছ থেকে নিলামে কিনে নিয়েছে সে, এটা তার বাগানবাড়ি বা অবসর বিনোদন কেন্দ্র, ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মাঝে মধ্যে চুটিয়ে আড্ডা মারে এখানে।

ডোরাকে চিনতে পেরে অকারণ আনন্দে রানার সারা শরীরে ভাল লাগার একটা শিহরণ বয়ে গেল। ডোরা যে শুধু সুন্দরী তাই নয়, তার মত হাসিখুশি, বুদ্ধিমতী, সপ্রতিভ, আর মার্জিত রুচির মেয়ে খুব বেশি দেখেনি রানা। গগলের বন্ধু ও, তাই ওকেও বিশ্বস্ত আর নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নিয়েছে ডোরা। ওকে যথেষ্ট আপন মনে করে মেয়েটা, কিন্তু সেটা শুধু মাঝে মধ্যে আচরণে প্রকাশ পায়; শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু তাই বলে দূরত্ব বজায় রেখে চলে না।

ড্রাইভারের কাঁধে টোকা দিয়ে ট্যাক্সি থামাতে বলল রানা। বিল আর অতিরিক্ত পঞ্চাশ পাউন্ড দিয়ে নেমে পড়ল ও। ডোরা এখনও দুশো গজ দূরে, এক হাতে লাগাম, আরেক হাত তুলে রানার উদ্দেশে নাড়ছে। এত দূর থেকেও তার সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখতে পেল রানা।

ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথে চলে গেল ড্রাইভার।

'সুপার-স্টার!' রাস্তার পাশে একটা গাছের নিচে ঘোড়া থেকে নামল ডোরা। নিচু একটা ডালে লাগামটা দু'প্যাঁচ জড়িয়ে ছুটে এসে হাত ধরল রানার। 'হিরো বনে গেছ, ভাই! সবগুলো দৈনিক আর সাপ্তাহিক পড়ে শেষ করতে আরও এক মাস লাগবে আমার!'

গম্ভীর একটু হাসল রানা। 'তোমরা আছ কেমন?' প্রায় এক মাস হয়ে এল শার্ক কমান্ড থেকে পদত্যাগ করেছে রানা, কিন্তু কাগজগুলো এখনও ওর কাহিনী প্রায় নিয়মিত ছেপে যাচ্ছে। দু'দলে ভাগ হয়ে গেছে রিপোর্টাররা, এক দল নিন্দা করছে, আরেক দল প্রশংসা। তবে দুটোর কোনটাই এখন আর স্পর্শ করছে না রানাকে, গোটা ব্যাপারটা ভুলে থাকতে চায় ও।

সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে ড. ওয়ার্নারই আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উত্থাপন করেন ওর বিরুদ্ধে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা কোন সিদ্ধান্তে আসার আগেই পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেয় রানা। সেন্ট্রাল কমিটির অফিস থেকে ওকে জানিয়ে দেয়া হয়, পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যস, ওখানেই চুকে গেছে ব্যাপারটা।

রিজাইন করে সুইটজারল্যান্ডে চলে গিয়েছিল রানা, অপেক্ষা করছিল বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে কি নির্দেশ আসে দেখার জন্যে। বস্, মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খান ওকে টেলিফোনে জানান, 'আগামী কয়েক মাস তোমার কোন কাজ নেই, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াও–সময় হলে তোমাকে

ডাকা হবে।' কিছু উপদেশও দেন তিনি–শরীরের ওপর অত্যাচার কোরো না, চোখ-কান খোলা রাখবে, ইউরোপ আর আমেরিকায় থাকো কিছুদিন, ইত্যাদি। সবগুলো নির্দেশের অর্থ পরিষ্কার বোঝেনি রানা। সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অমান্য করেছে ও, সেজন্যে কি বি.সি.আই-ও ওকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না? কয়েক মাস কোন কাজ দেয়া হবে না, এটা কি এক ধরনের শাস্তি?

রানা ঠিক করেছে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করবে ও, তারপর সরাসরি যোগাযোগ করে বসকে জিজ্ঞেস করবে, আসলে ব্যাপারটা কি।

লাগাম ধরে হাঁটছে ডোরা, তার আরেক পাশে রানা। অনর্গল কথা বলে চলেছে ডোরা, কোন্ পত্রিকায় রানার কি গুণকীর্তন করা হয়েছে তারই বিশদ বর্ণনা।

তাকে হঠাৎ বাধা দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার বলো তো? গগল এভাবে জরুরী খবর দিয়ে আমাকে আনাল কেন?'

ক্ষীণ একটু বিস্মিত হলো ডোরা। 'কই, আমাকে কিছু বলেনি তো! শুধু জানতাম তুমি আজ আসছ, ও আমাকে বলল একটু এগিয়ে এসে তোমাকে যেন সঙ্গে করে নিয়ে যাই।' থেমে রানার দিকে ফিরল সে। 'এভাবে হাঁটলে বাড়ি পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে যাবে।' লাফ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল সে। 'ওঠো।'

রানা ইতস্তত করতে লাগল।

ঠোঁট টিপে একটু হেসে ডোরা বলল, 'তাহলে তুমি লাগাম ধরো, আমি তোমার পেছনে বসি?'

একটু যেন লজ্জাই পেল রানা, তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলল, 'না, ঠিক আছে।' ডোরার পিছনে ঘোড়ার পিঠে বসল ও। জিজ্ঞেস করল, 'আমি ছাড়া আর কে তোমাদের মেহমান?'

'আরও পাঁচ-সাত জন,' বলল ডোরা। 'সবাইকে চিনি না।'

রানার মনে হলো একটু যেন রহস্য করে উত্তর দিল ডোরা। তবে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না ও। মিনিট দশেক ছুটল ঘোড়া, কথা যা বলার একা ডোরাই বলে গেল, নীরব শ্রোতা রানা। একটু পরই লাল ইঁটের বাড়িটা দেখা গেল, তিন একর জায়গা নিয়ে বিশাল ছাদ। বাড়ির সামনে পাথুরে উঠান, পশ্চিম প্রান্তে আস্তাবল। ঘোড়া থেকে নেমে ঘাড় ফেরাতেই খোলা গ্যারেজগুলোর দিকে চোখ পড়ল রানার। ওর জানা আছে, গগলের ইদানীংকার বন্ধু-বান্ধব প্রায় সবাই সফল ব্যবসায়ী। নতুন মডেলের অনেকগুলো গাড়ি রয়েছে গ্যারেজে, তার মধ্যে একটা মার্সিডিজ সিক্স হানড্রেড, আরেকটা রোলসরয়েস। রোলসরয়েসের পাশে দু'জন লোক টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কঠিন চেহারা। দেহরক্ষী।

রানাকে নিয়ে গোলাপ বাগানের ভেতর দিয়ে এগোল ডোরা। রানার একটা রসিকতায় খিলখিল করে হেসে উঠল সে, কনুই দিয়ে মৃদু খোঁচা দিল ওর পাঁজরে। হাসতে হাসতেই প্রশস্ত ড্রইংরুমে ঢুকল ওরা।

'মাসুদ রানা দি গ্রেট!' অতিথিদের ফেলে লম্বা পায়ে এগিয়ে এল ভিনসেন্ট গগল। প্রায় রানার সমান লম্বা সে, মেহদি রাঙানো ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, হাতে কারুকাজ করা একটা ছড়ি। গগল কখন কি পোশাক পরবে, আগে থেকে কারও

জানার উপায় নেই–এই যেমন আজ, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কালো সিল্কের তার এই ড্রেসটাকে শেরওয়ানি বললে ভুল হবে না, বুক আর পাঁজরের কাছে বহু রঙা জরির নকশা। তার মাথায় তুর্কী টুপি। সব মিলিয়ে বেখাপ্পা নয় মোটেও, মানিয়ে গেছে। 'এসো, তোমার সাথে এক বিশিষ্ট ভদ্রমহিলার পরিচয় করিয়ে দিই।'

মুখ তুলে পিকাসোর একটা ছবি দেখছিল সে, যেই মাত্র ঘুরল অমনি পিছনের জানালা দিয়ে শীতের রোদ কোমল প্রভায় আলোকিত করে তুলল তাকে। রানার মনে হলো পায়ের তলায় ধরণী কাত হয়ে পড়ছে, দু'পাশের পাঁজরে কিসের একটা তীব্র চাপ অনুভব করে দম আটকে এল ওর।

দেখামাত্র তাকে চিনতে পারল রানা। কিডন্যাপাররা অনেক দিন ধরে আটকে রেখেছিল ওর স্বামীকে, তারপর খুন করে। অফিশিয়াল ফাইলে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই অনেক ফটো ছিল। একটা পর্যায়ে বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছিল কিডন্যাপাররা ব্যারন ভদ্রলোককে নিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে, প্রায় এক হপ্তা কন্ডিশন ব্লু-তে ছিল শার্ক কমান্ড। ছবিগুলোর মধ্যে কয়েকটা ছিল ভোগ পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা, দক্ষ পেশাদার ক্যামেরাম্যানের নিপুণ শিল্পকর্ম, বহু রঙা ঝলমলে ছবি। কিন্তু সে-সব ছবিতেও রূপবতীর প্রতি অবিচার করা হয়েছে, রূপের মহিমা বা ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীয় দিকগুলো সিকিভাগও ফোটেনি।

সামান্য অবাক এবং অকারণ পুলকের সাথে রানা লক্ষ করল, ওকেও চিনতে পেরেছে সে মেয়েটার মুখের ভাব বদলাল না, শুধু গাঢ়-সবুজ পান্নার মত পলকের জন্যে দীপ্তি ছড়াল চোখ জোড়া। এখনও তার দিকে হাঁটছে রানা, কাছাকাছি হয়ে বুঝতে পারল মেয়েটা বেশ লম্বা, কিন্তু দেহ-সৌষ্ঠবে কোন খুঁত না থাকায় সাথে সাথে তা বোঝা যায় না। সূক্ষ্ম উলের তৈরি একটা স্কার্ট পরে আছে সে, নর্তকীর মত লম্বা পা দুটো বেশিরভাগই অনাবৃত।

'ব্যারনেস, মে আই প্রেজেন্ট মাই ফ্রেন্ড, মেজর মাসুদ রানা।'

'হাউ ডু ইউ ডু, মেজর।' প্রায় নিখুঁত ইংরেজি বলতে পারে সে, শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর, ইংরেজি তার জন্যে বিদেশী ভাষা বলেই সম্ভবত সুর একটু প্রলম্বিত, রানার পদটা সে উচ্চারণ করল তিন ভাগে– মে-এ জ-অ অ-র।

'রানা, দিস ইজ ব্যারনেস অটারম্যান।'

চকচকে কালো চুল এমনভাবে ব্যাকব্রাশ করা, টান টান হয়ে আছে কপালের চামড়া। পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে লম্বা চুলগুলো বিনুনি করা হয়েছে, তারপর কান জোড়ার ওপর মাথার দু'পাশে উঁচু করে বাঁধা হয়েছে দুটো খোঁপা। উঁচু চোয়ালের স্লাভিক গড়ন সহজেই টের পাওয়া যায়, চেহারায় দৃঢ় মানসিকতার একটা ভাব এনে দিয়েছে। চোখ জুড়িয়ে যায় গায়ের রঙ দেখলে, নির্মল হালকা গোলাপী। কিন্তু তার থুতনি সামান্য চৌকো, এবং একটু যেন শক্ত, সৌন্দর্য নিখুঁত হবার পথে ছোটখাট হলেও একটা বাধা বটে। কমনীয় চেহারা, কিন্তু কোমলতার চেয়ে কাঠিন্যই যেন বেশি। মেয়েটা বিশ্বসুন্দরী হতে পারবে না, কিন্তু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে কেউ তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়েও থাকতে পারবে না। যা সাধারণত হয় না, প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করল রানা। কয়েক মুহূর্ত নিজের অস্তিত্ব

ভুলে গিয়ে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকল ও। একটা মেয়ের মধ্যে যা কিছু থাকা সম্ভব, থাকলে সন্তুষ্ট আর পুলকিত হয় হৃদয়, তার মধ্যে যেন সব কিছুই অঢেল রয়েছে। কি শুভক্ষণে আজ দেখা হলো, এ তো ওর স্বপ্নে দেখা সেই রাজকন্যে, স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে আসা রহস্যময়ী দেবী। নারীর সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে যেন অন্য কোন গ্রহের বাসিন্দা।

মুগ্ধ বিস্ময়ে রানার অভিভূত হবার আরও অনেক কারণ আছে। ও জানে, ব্যারনেস মিডো অটারম্যান তার এই অল্প বয়েসেই অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। বিশাল এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী সে। আধুনিক দুনিয়ার যারা ভাগ্য নিয়ন্তা, যাঁরা পৃথিবীখ্যাত ব্যক্তিত্ব, তাঁরাও তার সঙ্গ পেলে কৃতার্থ বোধ করেন। সরাসরি রানার ওপর চোখ বুলিয়ে সে যেন ওর পৌরুষদীপ্ত অস্তিত্বকে ক্ষীণ একটু বিদ্রূপ করছে কিংবা কৌতুক বোধ করছে। চেহারায় রানী বা দেবীসুলভ নির্লিপ্ত ভাব, অথচ মনে হলো রানাকে মুগ্ধ হতে দেখে খানিকটা যেন সন্তুষ্ট, রানার এই অভিভূত ভাব যেন তার ন্যায্য পাওনা।

তার সম্পর্কে যা যা জানে এক মুহূর্তে সব মনে পড়ে গেল রানার।

প্রথমে ব্যারনের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিল লিনা, পাঁচ বছর কাজ করার পর ব্যারনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে সে। তার নিপুণ কর্মকুশলতা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, আর আন্তরিকতা লক্ষ করে ব্যারন তাকে ধাপে ধাপে তুলে আনেন, ডিরেক্টরদের একজন বানানো হয় তাকে। প্রথমে তিন-চারটে ছোটখাট গ্রুপ অভ ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনার দায়িত্ব, তারপর সেন্ট্রাল্ হোল্ডিং কোম্পানীর অসীম ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া হয় তার হাতে। দুরারোগ্য ক্যানসারে দীর্ঘদিন ভুগেছেন ব্যারন, সে-সময় তিনি আরও বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন লিনার ওপর। দেখা গেল, তিনি তাঁর বিশ্বাস অপাত্রে ঢালেননি। একাধিক হেভি ইন্ডাস্ট্রি, ইলেকট্রনিক্স আর আর্মামেন্টস করপোরেশন, ব্যাঙ্কিং, শিপিং, প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট–সবগুলো জটিল ব্যবসা নিপুণ দক্ষতার সাথে চালিয়ে গেল সে। আটান্ন বছর বয়সে বিয়ে করলেন তিনি, লিনার নতুন পরিচয় হলো ব্যারনেস মিডো অটারম্যান। তার বয়স তখন মাত্র তেইশ। দেখা গেল শুধু ব্যবসায়ী হিসেবে নয়, স্ত্রী হিসেবেও লিনার জুড়ি পাওয়া ভার।

মুক্তিপণের বিশাল অঙ্কের টাকা কিডন্যাপারদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে একাই গিয়েছিল ব্যারনেস মিডো অটারম্যান, ফ্রেঞ্চ পুলিসের বারণ কানে তোলেনি। কিডন্যাপাররা ছিল নির্মম খুনী–কিন্তু স্বামীকে ফিরে পাবার জন্যে নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করেনি সে। মুক্তিপণের বিনিময়ে স্বামীকে নয়, তাঁর ক্ষতবিক্ষত লাশ নিয়ে ফিরে আসে সে। শোকে অস্থির হলেও, কর্তব্য-কর্ম থেকে সরে দাঁড়ায়নি সে, স্বামীকে সমাধিস্থ করার সমস্ত আয়োজন নিজে দেখাশোনা করেছে। তারপর নিহত স্বামীর শিল্প-সাম্রাজ্যের হাল ধরেছে আগের চেয়ে আরও দক্ষ এবং শক্ত হাতে।

লিনা অটারম্যানের হাতের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা, পলকের জন্যে তার মসৃণ, ঠাণ্ডা আঙুলে ঠোঁট ছোঁয়াল। অনামিকায় হীরে বসানো একটা আঙটি পরেছে সে, সাদা পাথরটা থেকে রঙহীন আগুনের মত দ্যুতি ছড়াচ্ছে। শুধু বিত্ত-বৈভব

নয়, এই নারীর মধ্যে উন্নত রুচি আর সৌন্দর্যবোধেরও বিকাশ ঘটেছে। সিধে হবার সময় উপলব্ধি করল রানা, লিনা অটারম্যানও সতর্কতার সাথে ওর সব কিছু খুঁটিয়ে লক্ষ করছে। পান্নার আলো ছড়ানো বড় বড় চোখ, কিছুই যেন তার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

'ইদানীং খুব নাম শোনা যাচ্ছে আপনার,' বলল লিনা, যেন কৌতূহলী দৃষ্টির ব্যাখ্যা দিল।

ডোরার দুই বান্ধবী আর বোন, গগলের পেটমোটা পাঁচ জন ব্যবসায়ী বন্ধু, লিনা অটারম্যান, আর রানা, মোট এগারোজন অতিথির জন্যে লাঞ্চ টেবিল সাজানো হয়েছে। হাসিখুশি পরিবেশ, সবার সামনে সুস্বাদু খাবারের ছোটখাট পাহাড় কিন্তু ব্যারনেস এমন একটা সীটে বসেছে যে সরাসরি তার সাথে কথা বলার সুযোগ হলো না রানার। তার কথা শোনার জন্যে সারাক্ষণ কান খাড়া করে রাখলেও, অত্যন্ত নিচু গলায় গগল আর একটা জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকের সাথে দু'চারটে কথা বলল সে, ওরা দু'জন তাকে মাঝখানে নিয়ে বসেছে। রানার বাঁ দিকে বসেছে ডোরার এক বোন, চোখ ধাঁধানো রূপ দিয়ে রানাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে বেচারি।

চোরা চোখে ব্যারনেসকে বারবার লক্ষ করছে রানা। বেশ কয়েকবার ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিল লিনা, কিন্তু ওয়াইনের লেভেল যেমন ছিল তেমনি থাকল, নিচে নামল না। প্লেটের খাবারও খুঁটে খুঁটে অতি সামান্যই খেলো সে। রানা চুপিচুপি তাকালেও, ব্যারনেস ভুলেও একবার রানার দিকে তাকাল না। একেবারে শেষ সময়, যখন ওরা কফি খাচ্ছে, হঠাৎ ওর পাশে চলে এসে বলল সে, 'মশিয়ে গগল আমাকে বলছিলেন, ফিলবি'স ইয়ার্ডে নাকি রোমান ধ্বংসাবশেষ আছে?'

'বনের ভেতর দিয়ে হেঁটে অনেকটা দূর যেতে হয়,' বলল রানা। 'আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু তার আগে মশিয়ে গগলের সাথে কিছু ব্যবসার কথা আছে আমার। আমরা কি তিনটের সময় রওনা হতে পারি?'

কাপড় পাল্টে টুইডের ঢোলা স্কার্ট আর জ্যাকেট পরে এল ব্যারনেস, খাটো কেউ পরলে তাকে মোটা দেখাত। কাপড়ের মত হাই বুট জোড়াও ব্রাউন। জ্যাকেটের নিচে পরেছে গোল গলা কাশ্মীরী জার্সি, একই সূক্ষ্ম উলের তৈরি স্কার্ফটা পিঠে ঝুলে আছে। চওড়া কার্নিসসহ হ্যাটের ব্যান্ডে উজ্জ্বল পালক, চোখ প্রায় ঢেকে রেখেছে।

নিঃশব্দে হাঁটছে সে, হাত দুটো জ্যাকেট-পকেটের গভীরে ঢোকানো, কাদা বা ভেজা পাতা থেকে বুট জোড়া বাঁচানোর কোন চেষ্টা নেই। লম্বা পা ফেলে হাঁটার মধ্যে বাতাস কেটে ভেসে চলার একটা ভাব আছে, নিতম্বের কাছ থেকে ওপরের অংশটুকু অদ্ভুত এক ছন্দে দোল খায়, এবং তার ফলে রানার মনে হতে লাগল ওর পাশে ব্যারনেসের মাথাটা যেন ভাসছে। ফাইন্যান্স আর ইন্ডাস্ট্রির জগতে মেয়েটা যদি সম্রাজ্ঞী না-ও হত, কোন সন্দহ নেই, সাড়া জাগানো মডেল হতে পারত অনায়াসে। কাপড় দিয়ে সাজিয়ে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা এবং চেহারায়

দুর্লভ আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলায় ভারি দক্ষ, সেই সাথে পরিচ্ছদের প্রতি নির্লিপ্ত অবহেলা অকৃত্রিম একটা সারল্য ফুটিয়ে তুলেছে।

সমীহের একটা ভাব নিয়ে নৈঃশব্দ্য উপভোগ করছে রানা, ব্যারনেসের সাথে সমান তালে পা ফেলে পাশাপাশি হাঁটতে পারায় খুশি। কাল রাতে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছে এদিকে, সবুজ পাতার ছুঁচালো ডগায় চিকচিক করছে পানি; ছাল ওঠা নগ্ন ওক গাছের কাণ্ডগুলোকে নির্লজ্জ পুরুষ-মূর্তির মত লাগছে। এখান থেকে ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করেছে মাটি। কোথাও না থেমে খোলা একটা ঢালের মাথায় বেরিয়ে এল ওরা। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে একটু হাঁপাচ্ছে ব্যারনেস, আরও গোলাপী হয়ে গেছে মুখের চেহারা। কিন্তু ক্লান্ত নয় মোটেও। প্রায় হন হন করে সোয়া ঘণ্টা হাঁটার পর এই প্রথম থামল ওরা। কোন সন্দেহ নেই, ভাবল রানা, শরীরটাকে ফিট রেখেছে।

'ওই দেখুন।' পাহাড়ের মাথা ঘিরে থাকা ঘাস মোড়া বৃত্ত আকারের গর্তের দিকে হাত তুলল রানা। 'তেমন আহামরি কিছু নয়, হতাশ হতে পারেন ভেবে ইচ্ছে করেই আগে আপনাকে সাবধান করিনি।'

এই প্রথম হাসল ব্যারনেস। 'এখানে আমি আগেও এসেছি,' সেই প্রলম্বিত, শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর।

'তারমানে প্রথম সাক্ষাতেই পরস্পরকে আমরা ধোঁকা দিলাম।' মৃদু শব্দে হেসে উঠল রানা।

'প্যারিস থেকে এত দূর এলাম, অকারণে নয়,' অনেকটা যেন ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলল ব্যারনেস। 'মশিয়ে গগলের সাথে ব্যবসা নিয়ে টেলিফোনেও কথা বলতে পারতাম। কিন্তু বুঝলাম, আপনার সাথে আমাকে মুখোমুখি কথা বলতে হবে। মশিয়ে গগলকে অনুরোধ করলাম, বললেন সম্ভব–তাঁর কথা আপনি নাকি ফেলতে পারবেন না।'

'আপনার মত সুন্দরী ভদ্রমহিলা আমার ব্যাপারে আগ্রহী...'

ভুরু কুঁচকে উঠল সামান্য, সাথে সাথে রানাকে থামিয়ে দিল ব্যারনেস। এমন খোলামেলা প্রশংসা শুনতে অভ্যস্ত নয় সে। 'ইকো-র শাখা মিডো স্টীল কোম্পানীর একটা প্রস্তাব আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, মিডো স্টীলের সেলস ডিভিশনের হেড।' মাথা ঝাঁকাল রানা। শার্ক কমান্ড থেকে পদত্যাগ এবং বি.সি.আই. তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ছুটি মঞ্জুর করার পর এ-ধরনের অনেক প্রস্তাবই দেয়া হয়েছে ওকে। 'প্রস্তাবগুলোয় আপনাকে সন্তুষ্ট করার সব রকম সুযোগ-সুবিধে ছিল বলেই আমার ধারণা। নাকি আপনার মার্কেট ভ্যালু কম করে ধরা হয়েছে?'

'একান্তই যদি পণ্য হিসেবে বিবেচনা করেন আমাকে, এই মুহূর্তে আমার কোন মার্কেট ভ্যালু নেই।' একটু গম্ভীর হলো রানা।

'লোকে হয়তো তা ভাবতে পারে, কিন্তু আমি ভাবি না।' ব্যারনেস এখন আর হাসছে না। 'মার্কেট ভ্যালু নেই কেন? ওই অ্যাকশনটার জন্যে? কিন্তু আপনার জায়গায় আমি হলে আপনি যা করেছেন আমিও ঠিক তাই করতাম। মেয়েটাকে খুন করে আপনি...'

'আমি তাকে খুন করিনি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'আমি আত্মরক্ষার জন্যে

গুলি করেছিলাম।'

'অনেক কাগজে অবশ্য উল্টোটা লিখেছে, বোয়িঙের আরোহীরাও কেউ কেউ বলেছে বন্ধ দরজার ভেতর থেকে মেয়েটার বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শুনেছিল তারা। তবে আপনার কথাই বিশ্বাস করব আমি। কিন্তু মেয়েটাকে যদি আপনি খুন করার জন্যেও গুলি করতেন, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা তাতে কমত না।' একটু থেমে আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল ব্যারনেস, 'মিডো-র প্রস্তাব আপনি ফিরিয়ে দিলেন কেন?'

'প্রস্তাবের লোভনীয় দিকগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, ভাবটা যেন লুফে না নিয়ে উপায় থাকবে না আমার,' বলল রানা। 'আরও একটা কারণ আছে। এই মুহূর্তে কাজ করার মুড নেই আমার।'

'মুড না থাকলে অবশ্য আলাদা কথা,' শান্ত সুরে বলল ব্যারনেস। 'কিন্তু আপনি কি জানতেন, মিডো-র অফারটা গ্রহণ করলে কি কি কাজ করতে হত আপনাকে?'

'ন্যাটো কমান্ডে আমার বন্ধু-বান্ধব আছে, আমার অনেক দায়িত্বের একটা হয়তো এই হত-ওদের কাছে ঘুষের টাকা ভর্তি অ্যাটাচি কেস পৌঁছে দেয়া, ওরা যাতে মিডো-র কাছ থেকে অস্ত্রপাতি কেনে।'

'আপনি কি জানেন, অটারম্যান ইন্ডাস্ট্রি, এবং অন্যান্য গ্রুপ অভ ইন্ডাস্ট্রি সহ ইকো আর মিডো-র মেজর শেয়ারহোল্ডার আমি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি না।'

'জানেন কি, মিডো-র অফারটা ব্যক্তিগতভাবে আমি পাঠিয়েছিলাম?'

এবার রানা কোন কথা বলল না।

'একটা কথা ঠিক, ন্যাটো এবং ব্রিটিশ হাই কমান্ডে আপনার বন্ধু-বান্ধব আছে বলেই আপনাকে অবিশ্বাস্য রকম মোটা বেতন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।' হঠাৎ ঠোঁট টিপে হাসল ব্যারনেস, সাথে সাথে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার গোলাপী চেহারা। 'আমরা একটা ক্যাপিটালিস্টিক সোসাইটিতে বাস করছি, মেজর মাসুদ রানা। এমনকি বেতনভুক কর্মচারীকেও আমরা কমিশন আর ইনট্রডিউসার ফিস দিয়ে থাকি।'

ওগুলোর জন্যে নয়, হাসিটা সংক্রামক বলে রানারও হাসি পেল।

'তবে লকহীড কেলেঙ্কারির পর আমরা আর কাউকে টাকা বহন করতে দেই না, কমিশন দেয়ার সিস্টেমও তুলে দিয়েছি। তার বদলে চালু হয়েছে নতুন সিস্টেমে বোনাস। আপনার যা কানেকশন, অনায়াসে বছরে প্রায় চার মিলিয়ন মার্কিন ডলার বোনাস আদায় করতে পারতেন।'

'এ-সব এখন কথার কথা,' বলল রানা। 'আমি প্রস্তাবগুলো ফিরিয়ে দিয়েছি।'

'জানি। সেজন্যেই তো আসল কথাটা বলার জন্যে আমার নিজেকে আসতে হলো।'

'আসল কথা?'

মাথা নিচু করে নিয়ে এমনভাবে চুপ করে থাকল ব্যারনেস, যেন কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। হ্যাটের কার্নিসে ঢাকা পড়ে আছে মুখ। আবার যখন চোখ তুলল,

সাথে সাথে হাতটাও উঠে এল রানার গায়ে। রানার কনুই ধরে স্মিত হাসল সে। 'আমার স্বামী ছিলেন অসাধারণ একজন মানুষ। তাঁর মত হিতাকাঙ্ক্ষী, শক্তিশালী, আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ আমি আর দেখিনি। সেজন্যেই ওঁকে তারা খুন করে-,' ফিসফিস করে কথা বলছে সে, '-খুন করার আগে তারা ওঁর ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়।' থামল সে, কিন্তু মুখ ঘোরাল না। কেঁদে ফেলেছে, কিন্তু সেজন্যে লজ্জিত নয়। চোখ দুটো ভরে উঠেছে পানিতে, তবু নিচের পাতার কিনারা উপচে ঝরে পড়ল না, এমনকি পাতা দুটো একবার একটু কাঁপল না পর্যন্ত। অন্য দিকে তাকাতে হলো রানাকেই। এবার ওর কনুই ছেড়ে দিল ব্যারনেস, ওর পাঁজর আর কনুইয়ের মাঝখানে হাত গলিয়ে দিয়ে আরও কাছে সরে এল, কেন কে যেন শিউরে উঠল একবার, দুটো মুখ একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে। 'বৃষ্টি হবে এখুনি,' বলল সে, শান্ত গলা। 'আমাদের বোধহয় ফেরা উচিত।'

ফেরার পথে মৃদু কণ্ঠে কথা বলে গেল ব্যারনেস। 'অটারম্যান খুন হয়ে গেল, কিন্তু খুনীদের কোন সাজা হলো না, নপুংসক সমাজ তাদের শাস্তি দেয়ার কোন ব্যবস্থা করতে পারল না। ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজশনের ধারণাটা প্রথম থেকেই আমার ভাল লেগেছিল। কিন্তু সেন্ট্রাল কমিটি বা শার্ক কমান্ড আমাকে হতাশ করল।' একটু থেমে রানার হাতে মৃদু চাপ দিল সে। 'হ্যাঁ, মেজর রানা-শার্ক, কোবরা, আর চিতা-র কথা আমার জানা ছিল। কিভাবে জেনেছি জিজ্ঞেস করবেন না, প্লীজ।'

খোলা ঢালের মাথা থেকে নেমে আবার বনভূমিতে ঢুকল ওরা। শুনে যাচ্ছে রানা, কিছুই বলছে না।

'বুঝলাম, শক্তি নিয়ে কেউ বাধা না দিলে কিছুদিনের মধ্যে সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে টেরোরিস্টদের হাতে। রাত দিন চিন্তা করতে লাগলাম আইনের ভেতরে থেকে কিভাবে ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করা যায়। অটারম্যান ইন্ডাস্ট্রির উত্তরাধিকারী হিসেবে আন্তর্জাতিক তথ্য সংগ্রহের একটা চ্যানেল বা সিস্টেমেরও মালিক আমি...,' ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল ব্যারনেস, বিভিন্ন সীমান্তের ওপার থেকে কিভাবে সে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার খবরাখবর পেতে শুরু করে। 'প্রথমে আগাম খবরগুলো ইন্টারপোলকে দিলাম, কিন্তু ওরা আমাকে জানাল অপরাধ সংঘটিত হবার আগে ওদের কিছুই করার নেই। সি.আই.এ. বলল, তারা কে.জি.বি-কে নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, সময় দিতে পারবে না। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস জানাল, ফান্ড এবং লোকবলের অভাব।' হঠাৎ একটু লজ্জিত হাসল ব্যারনেস। 'মায়ের কাছে মামাবাড়ির গল্প হয়ে যাচ্ছে, এ-সবই তো জানেন আপনি।'

'আমি অপেক্ষা করছি আসল কথাটা কখন বলবেন।'

'তারপর আমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্মগুলো সম্পর্কে খবর নিতে শুরু করি,' বলল ব্যারনেস। 'কিন্তু, মেজর রানা, আমরা বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি-সবার সামনে তো...'

'আসুন,' বলে পথ দেখিয়ে এগোল রানা, আস্তাবলকে পাশ কাটিয়ে চলে এল পিছনের সুইমিং পুল প্যাভিলিয়নে। পুলের গরম পানি থেকে মিহি বাষ্প উঠছে। ওদের পাশে কাঁচমোড়া ঘরে ফুলে ফুলে ভরে আছে গাছ। একটা দোলনায় বসল

ওরা, পাশাপাশি, এত কাছে যে নিচু গলায় কথা বললেও শোনা যাবে। হ্যাট, স্কার্ফ, আর জ্যাকেট খুলে পাশের একটা বেতের চেয়ারে ছুঁড়ে দিল ব্যারনেস। তারপর সকৌতুকে বলল, 'কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনি গোঁফ রাখলে দারুণ মানাবে। কখনও রেখেছেন নাকি?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সরাসরি আরেকটা প্রশ্ন করল সে। মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি কিচিরমিচির করতে করতে উড়ে গেল। রানার মনে হলো শব্দটা ভুল শুনেছে।

'কি বললেন?' সাবধানে জিজ্ঞেস করল ও। নির্লিপ্ত চেহারা, কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না।

'খলিফা। নামটার তাৎপর্য আপনার জানা আছে?'

ভুরু কোঁচকাল রানা, স্মরণ করার ভান করছে। বোয়িঙের ভেতর যা যা ঘটেছে সব এক পলকে ভেসে উঠল চোখের সামনে। বিস্ফোরণ, শিখা, ধোঁয়া, পিস্তলের আওয়াজ, লাল শার্ট পরা কালো চুল মেয়েটা উন্মাদিনীর মত ছুটে আসতে আসতে চিৎকার করছে, 'মেরো না, আমাদের মেরো না! খলিফা বলেছে আমাদের মরতে হবে না! খলিফা...'

'খলিফা?' জিজ্ঞেস করল রানা, নিজেও জানে না কেন অস্বীকার করছে ও। 'শব্দটা মুসলমানদের একটা টাইটেল। আক্ষরিক অর্থ সম্ভবত পয়গম্বরের উত্তরাধিকার।'

'হ্যাঁ,' একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ব্যারনেস। 'সিভিল আর রিলিজিয়াস লীডারের টাইটেল-কিন্তু কোডনেম হিসেবে নামটা কখনও কোথাও ব্যবহার হতে শুনেছেন?'

'না, দুঃখিত। তাৎপর্যটা কি?'

'নামটা আমি কয়েক মাস আগে প্রথম শুনি, জীবনে ভোলার নয় এমন একটা পরিস্থিতিতে,' কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল ব্যারনেস। 'আমার স্বামী কিডন্যাপ হলেন, তারপর কিভাবে তাঁকে খুন করা হলো, সমস্ত ঘটনা জানেন আপনি? দরকার না হলে সব আবার নতুন করে মনে করতে চাই না।'

'আমি জানি।'

'জানেন, মুক্তিপণের টাকা আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসি?'

'হ্যাঁ।'

'রঁদেভো ছিল ইস্ট জার্মান বর্ডারের কাছে পরিত্যক্ত একটা এয়ারফিল্ড। হালকা দুই ইঞ্জিনের একটা রাশিয়ান প্লেন নিয়ে অপেক্ষা করছিল ওরা, রঙ স্প্রে করে মার্কিংগুলো মুছে ফেলা ছিল।' বুক ভরে বাতাস নিল ব্যারনেস। রানার মনে পড়ল, বোয়িং জিরো-সেভেন-জিরো হাইজ্যাক করার প্ল্যানেও কোন খুঁত ছিল না, এবং হাইজ্যাকাররা স্পেশাল টাইপের ইকুপমেন্ট ব্যবহার করেছে। অটারম্যানকে যারা কিডন্যাপ করেছিল তাদের সাথে হাইজ্যাকারদের অনেক মিল আছে। 'চারজন ছিল ওরা,' আবার শুরু করল ব্যারনেস। 'সবাই মুখোশ পরা। রুশ ভাষায় কথা বলছিল-অন্তত দু'জন বলছিল। বাকি দু'জন কোন কথাই বলেনি।' রানার মনে পড়ল, রুশ ছাড়াও আরও পাঁচটা ভাষায় ভাল দখল আছে ব্যারনেসের। তার জন্ম পোল্যান্ডে, খুব ছোট থাকতে বাবা তাকে নিয়ে পালিয়ে আসেন। ব্যারনেস

সম্পর্কে ইন্টেলিজেন্স ফাইল ছিল হাতের কাছে, তবে ভাল করে সেটা পড়া হয়নি রানার। 'রাশিয়ান প্লেন, ভাষা, এ-সব নিজেদের আসল পরিচয় গোপন করার জন্যে ব্যবহার করছিল ওরা। অল্প কিছুক্ষণ ছিলাম ওদের সাথে, পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্ক নিয়ে গিয়েছিলাম। কয়েক মিনিট পর ওরা যখন বুঝতে পারল আমার সাথে বা পিছনে পুলিস নেই, ওরা হাসাহাসি আর ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগল। রুশ ভাষায় কথা বললেও ইংরেজি টোনে খলিফা শব্দটা শুনলাম ওদের মুখে। বাক্যটা মনে আছে আমার-"খলিফা কখনও ভুল করেন না"।'

'পুলিসকে জানিয়েছিলেন?'

'কেন জানাইনি বলতে পারব না। তখন ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। মনের অবস্থাও ভাল ছিল না যে খতিয়ে সব কিছু দেখব। তাছাড়া, প্রথম থেকেই আমার জেদ ছিল ওদের আমি নিজের চেষ্টায় খুঁজে বের করব।'

'ওই একবারই নামটা শোনেন?'

অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ব্যারনেস, যেন রানার প্রশ্ন শুনতেই পায়নি। 'সারা দুনিয়া জুড়ে টেরোরিজম একটা লাভজনক ব্যবসা হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রমাণিত হিসেব-সফল হবার সম্ভাবনা শতকরা সত্তর ভাগ। পুঁজি খুব কম লাগে। নগদ প্রাপ্তির সাথে উপরি পাওনা পাবলিসিটি। প্রভাব বা ত্রাস সৃষ্টি হয়, অসামান্য রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে চলে আসে। এমনকি ব্যর্থ হলেও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা থাকে প্রাণে বাঁচার।' হাসল সে, কিন্তু এখন আর মাধুরী বা উষ্ণতা নেই হাসিতে। 'একজন ব্যবসায়ী হিসেবে বলতে পারি, এর চেয়ে ভাল ব্যবসা আর হতে পারে না।'

'কিন্তু ব্যবসাটা অ্যামেচাররা করছে,' বলল রানা। 'কিংবা এভাবে বলা যায়, প্রফেশনাল যারা জড়িত তাদের উদ্দেশ্য সীমিত, সমাজের অব্যবস্থা আর অন্যায় অবিচার সহ্য করতে না পেরে ঘৃণায় আর আক্রোশে অন্ধ হয়ে এ-পথে নেমেছে। এদের দ্বারা মহৎ কোন উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।'

'দুঃখিত, আমি শুধু একা একা বকবক করে যাচ্ছি। আসলে কি জানেন, আপনাকে আমার পুরানো বন্ধুর মত লাগছে। ভাল কথা, আমি লিনা।'

'ধন্যবাদ, লিনা।'

'হ্যাঁ, আপনার কথা ঠিক,' আগের সূত্র ধরে আবার শুরু করল ব্যারনেস লিনা। 'এতদিন অ্যামেচাররাই জড়িত ছিল। কিন্তু কথাটা এখন আর সত্যি নয়।'

'আপনি বলতে চাইছেন মাঠে খলিফা নেমেছে।'

'ফিসফাস গুঞ্জন যা শুনছি আর কি। কোন নাম নয়, শুধু ওই একটা রহস্যময় শব্দ। এথেন্সে হয়তো একটা মীটিং হয়ে গেছে, কিংবা আমস্টারডামে, ইস্ট বার্লিনে, বা এডেনে। খলিফা কে জানি না, নামটা একজনের নাকি কয়েকজনের তাও বলতে পারব না। তবে সত্যি যদি তার অস্তিত্ব থাকে, নিশ্চয়ই সে ধনকুবেরদের একজন হবে। এবং খুব তাড়াতাড়ি প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে।'

'একজন বা একদল মানুষ? কোন সংগঠন নয়?'

'হতে পারে, জানি না। হয়তো কোন সরকার। রাশিয়া, কিউবা, লিবিয়া, কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের অন্য কোন দেশ।'

'কিন্তু উদ্দেশ্য?'

'টাকা। রাজনৈতিক মতলব হাসিলের জন্যে ফান্ড। তারপর, ক্ষমতা।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ব্যারনেস লিনা। 'এ-ও স্রেফ কল্পনা। তবে টাকা ওরা যথেষ্ট কামিয়েছে—ওপেক আর আমার কাছ থেকে তো বটেই, অন্যান্য আরও অনেকের কাছ থেকে।'

'এখন সে তাহলে রাজনৈতিক ক্ষমতা চাইছে?'

'ক্ষমতা তার দরকার, কিন্তু এই মুহূর্তে এক্সপেরিমেন্ট করছে সে। ভেবে দেখুন না, বর্ণ-বৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে টার্গেট করল কেন? ওটা একটা সফট্ টার্গেট নয়? এমন সব কুকীর্তি করে যাচ্ছে ওরা, চরম বিপদের সময় সুপার পাওয়ারগুলো ওদেরকে সাহায্য করবে না। হাইজ্যাকাররা প্রায় সফল হতে যাচ্ছিল, তাই না? ওরা সফল হলে কি ঘটত কল্পনা করুন।'

'ব্যাপারটা কালোদের পক্ষে যেত...'

হাত তুলে রানাকে বাধা দিল ব্যারনেস। 'না। বর্তমান সরকারের পতন ঘটত, তা ঠিক কিন্তু ক্ষমতায় বসত আরেক শ্বেতাঙ্গ সরকার। কে জানে, নতুন সরকার-প্রধান হয়তো খলিফার প্রতিনিধিত্ব করত, সে হয়তো খলিফার নির্বাচিত নিজের লোক হত। ভেবে দেখুন, খনিজ সম্পদে ভরপুর একটা দেশ, খলিফার নিজের লোকরা সেটার মালিক বনে যেত...'

'একটু কষ্ট কল্পনা নয় কি?'

'হয়তো, কিন্তু বিপদের আসল চেহারা বুঝতে হলে অনেক সময় লাগামহীন চিন্তা-ভাবনার দরকার হয়...'

'বেশ, তারপর?'

'তারপর আর কি, তার সম্পর্কে এর বেশি কিছু জানলে তো। যে-ই হোক সে, তার উদ্দেশ্য হয়তো মহৎ, হয়তো মানবসভ্যতার ভালই চাইছে সে। আধুনিক রবিনহুড? ধনীদের সম্পদ লুঠ করে গরীবদের মঙ্গল করতে চায়? শোষণ-মুক্ত একটা দুনিয়া গড়ে তুলতে চায়? নাকি গোটা মানবসমাজকে কেনা গোলামে পরিণত করতে চায়?'

হাসি পেলেও, কথাগুলো এমন একজন ব্যক্তিত্বের মুখ থেকে বেরুচ্ছে, হাসতে পারল না রানা।

আবার রানার হাত ধরল ব্যারনেস লিনা, এবার তার আঙুলের শক্তি অনুভব করে অবাক হয়ে গেল রানা। 'আমি আপনার সাহায্য চাই, মেজর রানা। তার সন্ধানে আমি আমার সর্বস্ব বাজি রাখব, কোন বাধাই আমি মানব না। আমি একজন মানুষকে শ্রদ্ধা করতাম, সে তাকে খুন করেছে। আমি প্রতিশোধ নেব।' একটু থেমে দম নিল সে। 'আমার যত সম্পদ, আমার যত ক্ষমতা আর প্রভাব, সব তোমার হাতে তুলে দেব।'

'কিন্তু আমাকে বেছে নেয়ার পিছনে কারণটা কি?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আহত একজন বন্দীকে খুন করেছি, সেটাই কি আমার সার্টিফিকেট?'

'কেন, বলিনি, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্মগুলো সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেছি আমি? রানা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি আমাকে প্রভাবিত করেছে। তোমার যোগ্যতার

বিশদ বর্ণনা আমি দেব না, কিন্তু আমি যে তোমাকে যোগ্য জেনেছি বলেই সাহায্য চাইছি-এটুকু তো পরিষ্কার বুঝতে পারছ। কারও সম্পর্কে যতটুকু জানা সম্ভব ততটুকু না জেনে তার সাথে আমি কথা বলি না।'

দোলনা থেকে উঠে ব্যারনেসের সামনে পায়চারি শুরু করল রানা।

'খলিফা একটা অশুভ শক্তি, রানা।' রানার সাথে হাঁটতে শুরু করল ব্যারনেস লিনা। বিশ্বস্ত বন্ধুর মত রানার বাহুতে হাত রাখল সে। 'তাকে যদি বাড়তে দেয়া হয়, দুনিয়াটা ছারখার করে ফেলবে। সময় থাকতে তাকে ধ্বংস করা উচিত নয়? আমি আর তুমি, আমাদের মিলিত শক্তি দিয়েও কি তাকে খতম করতে পারব না?'

রানা চিন্তা করছে। খলিফা-অন্ধকারে একজন শত্রু। জেসিকা তার পরিচয় প্রকাশ করার চেয়ে মরতেও রাজি ছিল। এ থেকে তার ক্ষমতার সীমা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু তার আকৃতি জানা নেই ওর। হাজার মাথা নিয়ে কদাকার একটা দানব?

'করবে, রানা? তুমি আমাকে সাহায্য করবে?' ব্যাকুল চোখে রানার দিকে তাকাল ব্যারনেস।

'তুমি জানো, করব।'

বারো

ধু-ধু প্রান্তর ঢাকা পড়ে আছে উজ্জ্বল সাদা বরফে, ঠিকরে উঠে এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে রোদের আলো। ছুটে নয়, মাইলের পর মাইল যেন ভেসে যাচ্ছে মেয়েটা-একে তো ঢালু হয়ে নেমে গেছে প্রান্তর, তার ওপর হাতের স্টিক দুটো বিদ্যুৎবেগে ঘন ঘন স্পর্শ করছে বরফ। বরফের কুচি আর মিহি গুঁড়ো ঝর্ণার পানির মত ওপরে উঠে আবার নেমে আসছে নিচে।

প্রায় আঁটসাঁট স্বচ্ছ ধূসর রঙের স্কিন-স্যুট পরেছে সে-কাঁধ, আস্তিনের শেষ মাথা, আর কলার কালো। স্কি-গুলোও কালো আর লম্বা।

তাকে অনুসরণ করছে রানা, প্রাণপণ চেষ্টায় মাঝখানের ব্যবধানটা বাড়তে দিচ্ছে না। পথের মাঝে কোথাও কোথাও পাইনের ছায়া, বিপজ্জনক বাঁক নেয়ার সময় স্কির নিচে আর্তনাদ করছে বরফ। হঠাৎ এরকম একটা বাঁক নিয়েই ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। সামনে কোথাও নেই মেয়েটা।

এক ঢাল থেকে আরেক ঢালে নেমে গেছে সে। রানা যখন নামল, আরও আধ মাইল এগিয়ে গেছে সে। স্কি-তে তত ভাল নয় রানা, তাছাড়া প্র্যাকটিসও নেই বেশ কিছুদিন, কিন্তু একটা মেয়ের কাছে হেরে যাবার মত কাঁচাও ছিল না কোন দিন। তবে আজ ওকে পরাজয় স্বীকার করতে হলো, দু'ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করেও মাঝখানের ব্যবধান কমাতে পারেনি ও। অথচ রওনা হয়েছিল একসাথে।

আরেক ঢালের কিনারায় ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল মেয়েটা, গগলস জোড়া ঠেলে মাথায় তুলে দিয়েছে, খুলে ফেলেছে দস্তানা, দুটো স্টিকই পাশের বরফে

গাঁথা। 'এই এক্সারসাইজটুকু কি যে দরকার ছিল তুমি বুঝবে না।' নিজের প্রাইভেট লিয়ার জেটে করে আজ সকালেই জুরিখে এসেছে ব্যারনেস লিনা। রানা এসেছে ব্রাসেলস থেকে সুইসএয়ার ফ্লাইটে চড়ে। তারপর গাড়ি নিয়ে দু'জন একসাথে এখানে। 'জানো, রানা, আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্নটা কি?'

'বলো।'

'পুরো একটা মাস সাধারণ মানুষ হয়ে থাকি। ত্রিশ দিনের মুক্তি, যা খুশি তাই করার স্বাধীনতা, মুহূর্তের জন্যেও কোন অপরাধবোধ ভুগব না।'

ফিলবি'স ইয়ার্ডে প্রথমবার ওদের দেখা হবার পর ছ'হপ্তা কেটে গেছে, তারপর আর মাত্র তিনবার একসাথে হয়েছে ওরা। তিনবারই অল্পসময়ের জন্যে পরস্পরের সঙ্গ পেয়েছে, মন ভরেনি কারও।

তিনবারের মধ্যে একবার ইকো-র হেডকোয়ার্টার ব্রাসেলসে, রানার অফিস স্যাইটে। তারপর লা পিয়েরে বেনিত-এ–প্যারিসের বাইরে ব্যারনেসের গ্রামের বাড়িতে। কিন্তু ওখানে ডিনারে উপস্থিত ছিল আরও বিশ-বাইশ জন অতিথি। তৃতীয়বার প্যানেল ঘেরা সাজানো লিয়ার জেটের কেবিনে, ব্রাসেলস টু লন্ডন ফ্লাইটে।

খলিফাকে খুঁজে বের করার কাজে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি, রানা শুধু এখানে সেখানে টোকা মেরে দেখছে আর টোপ সহ বড়শি ফেলছে এন্তার।

তৃতীয় বারের সাক্ষাতে লিনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেছে রানা। পুরানো দেহরক্ষীদের বদলে ফেলা হয়েছে। নতুন যারা এসেছে তারা দক্ষ এবং বিশ্বস্ত। সুইটজারল্যান্ডের একটা এজেন্সি থেকে আনা হয়েছে ওদেরকে, খুব কম লোকই এজেন্সিটার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে, নিজেরা ট্রেনিং দিয়ে দেহরক্ষী বানায় ওরা। এজেন্সির ডিরেক্টর রানার পুরানো এবং বিশ্বস্ত বন্ধু।

রানা এজেন্সি বা বি.সি.আই-এর সাহায্য নিতে পারত রানা, কিন্তু মন সায় দেয়নি। খলিফার সাথে তার দ্বন্দ্বযুদ্ধ একান্তই ব্যক্তিগত বলে মনে করছে ও।

আজ ওরা দেখা করছে রানা লিনাকে রিপোর্ট করবে বলে।

'আরও দু'ঘণ্টা থাকবে আলো।' উপত্যকার শেষ মাথায় গ্রাম্য চার্চের দিকে তাকাল রানা। হাতঘড়ির সোনালি কাঁটা দুই-এর ঘরে। 'রাইন হর্ন ঘুরে তারপর ফিরবে নাকি?'

মাত্র এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ব্যারনেস লিনা। 'তুমি যখন বলছ–একটু দেরি হলেও দুনিয়াটা ঘুরতে থাকবে।'

ইতিমধ্যে লিনার সময়জ্ঞান জানা হয়ে গেছে রানার। দিনের কাজ শুরু করে সবাই যখন ঘুমায়, এবং বুলেভার্ড ক্যাপুসিন-এ অটারম্যান ইন্ডাস্ট্রির কর্মচারীরা অফিস শেষে বাড়ি ফিরে যাবার পরও টপ ফ্লোরে তার অফিস স্যুইটে আলো জ্বলে। জুরিখ থেকে গাড়িতে আসার সময়ও চিঠিপত্র দেখেছে লিনা, ডিকটেশন দিয়েছে একজন সেক্রেটারিকে। রানা জানে, উপত্যকার আরেক প্রান্তের শ্যালে-তে গাদা গাদা টেলেক্স নিয়ে এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে তার দু'জন সেক্রেটারি, উত্তর দেয়ার আগে ব্যারনেসের কাছ থেকে পরামর্শ নেবে তারা।

'কাজ নিঃশ্বাসের মত, ফেলতেই হবে,' বলল রানা। 'কিন্তু কাজ যদি

তোমাকে মেরে ফেলে, তখন?'

'ঠিক। কথাটা আমাকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে পাশে সব সময় একজনের থাকা দরকার।'

প্রথমে নিরাপত্তার ব্যবস্থা বদল করতে রাজি হয়নি লিনা, শেষ পর্যন্ত রানার যুক্তির কাছে হার মানতে হয় তাকে। তারপর রানা চাপ দেয়, তাকে তার নিয়মিত আচরণের প্যাটার্ন বদলাতে হবে।

'কিন্তু সমস্যা কি জানো,' হাসছে বটে, কিন্তু হাসির নিচে লুকিয়ে রয়েছে বিষণ্ণ একটা ভাব, 'আমার স্বামী আমাকে একটা ট্রাস্টের দায়িত্ব দিয়ে গেছে। দায়িত্ব আমাকে পালন করতে হবে। আমি ভাবছি, একদিন সব তোমাকে আমি ব্যাখ্যা করে শোনাব।'

মৃদু তুষার পড়ছে। তুষার, মেঘ, আর পাথুরে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে সূর্য। গ্রামের ভেতর দিয়ে ফিরে আসছে ওরা। সুইটজারল্যান্ডের প্রত্যন্ত অঞ্চল, এখানকার গ্রামেও সার-সার ডিপার্টমেন্টাল স্টোর উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। ইউরোপে সম্পদের অভাব নেই, আর শীতপ্রধান আবহাওয়া বলে পরিশ্রমও করতে পারে এরা, ফলে সম্পদ বৃদ্ধি ঠেকানো মুশকিল হয়ে পড়েছে। জীবনের মান এত উন্নত, ঈর্ষা হয় রানার। রাগও হয়–সবুজ শ্যামল স্বদেশের মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করছে। ভাগ্য সত্যি বিরূপ, নাকি আসলেই গোটা জাতি কুঁড়েমি রোগে ভুগছে? জাপানের সেই প্রিন্টিং প্রেসের মালিক আর ম্যানেজারের কথা মনে পড়ে গেল রানার। শোনা গল্প নয়, নিজের চোখে দেখা বাস্তব ঘটনা। অফিসে সবার আগে পৌঁছে গোটা অফিস আর প্রেস নিজের হাতে ঝাড়ু দেন মালিক। তাঁর প্রেসে কাজ করে তিনশো বাষট্টি জন লোক, প্রতি হপ্তায় নিজের খরচে তাদের নিয়ে পিকনিকে যান তিনি, মোট বওয়া থেকে শুরু করে রান্না পর্যন্ত অনেক খাটনির কাজ নিজে করেন। রানার সামনে এক মেয়ে কর্মচারী হাত থেকে একটা গ্লাস ফেলে দেয়, হতভম্ব মেয়েটা নড়ার শক্তি পাচ্ছিল না। পকেট থেকে রুমাল বের করে কাঁচের টুকরোগুলো তাতে তুললেন মালিক, ন্যাকড়া দিয়ে মেঝেটা মুছে ফেললেন, এই কাজের জন্যে আলাদা লোক থাকলেও তাকে খবর দিয়ে আনতে দেরি হত। ম্যানেজার বাংলাদেশী টাকায় বেতন পান তেরো লাখ। রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি তাঁর, ছুটি নেই। অফিসই তাঁর ঘর-বাড়ি। প্রেসের প্রতিটি সেকশনের প্রতিটি কাজ তিনি জানেন। কোন কর্মচারী অনুপস্থিত থাকলে তার চেয়ারে নিজে বসে পড়েন, কোন দিকে না তাকিয়ে আটঘণ্টা কাজ করেন, তারপর নিজের ভাগের কাজ সারেন রাত জেগে যতক্ষণ লাগে। দুপুরবেলা দু'ঘণ্টা ছুটি পায় কর্মচারীরা, প্রেসেই বিছানা আছে, শুয়ে বসে সময় কাটাবার জন্যে। দেখা গেছে, আধ ঘণ্টার বেশি কেউ বিশ্রাম নেয় না, বাকি দেড় ঘণ্টা দায়িত্ব বহির্ভূত এটা সেটা অনেক কাজ করে সময়টা কাটিয়ে দেয়। এই পরিশ্রমের জন্যে তারা কোন পারিশ্রমিক পেত না, তিন বছর পর কোম্পানীর তরফ থেকে হঠাৎ একদিন ঘোষণা করা হলো, অতিরিক্ত সময় কাজ করার জন্যে কর্মচারীদের তিন বছরের বকেয়া পরিশোধ করা হবে। শুধু এই একটা কোম্পানীতে নয়, জাপানের প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এই একই পরিস্থিতি দেখতে

পাওয়া যায়।

আর বাংলাদেশে?

নিজেদের ওপর করুণায় মাথা হেঁট হয়ে এল রানার।

'নেকড়েগুলো কাছে পিঠে নেই, নিজেকে তাই স্বাধীন স্বাধীন লাগছে,' বলল লিনা। বরফ থেকে স্টিক তুলে রানার বাহু খামচে ধরল সে, ব্যালেন্স ফিরে পেয়ে ছেড়ে দিল আবার। নেকড়ে মানে দেহরক্ষী, পায়ে হেঁটে বা গাড়িতে করে সারাক্ষণ পাহারা দিচ্ছে তাকে। লিনা যখন কাজ করে, অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে দু'জন। আর যখন ঘুমায়, অন্য দু'জন বাড়ির ভেতর টহল দিয়ে বেড়ায়।

আজ সকালে অবশ্য রানাকে লিনা বলেছিল, 'সাথে থাকছে অলিম্পিক পিস্তল চ্যাম্পিয়ান, কাজেই আজ আর সাথে নেকড়ে রাখার দরকার হবে না।'

মিডো সদ্য তৈরি নাইন-এমএম প্যারাবেলাম পিস্তল বাজারে ছেড়েছে, নাম কোবরা। আন্ডারগ্রাউন্ড রেঞ্জে মাত্র এক সকাল প্র্যাকটিস করেই অস্ত্রটা পছন্দ হয়ে গেছে রানার। কোবরা ওয়ালথারের চেয়ে হালকা আর ছোট, গোপনে বহন করা সহজ। সিঙ্গেল অ্যাকশন মেকানিজম। ট্রেড স্যাম্পল হিসেবে সাথে রাখার জন্যে লাইসেন্স পেতে কোন অসুবিধে হয়নি ওর, তবে কমার্শিয়াল ফ্লাইটে চড়ার সময় প্রতিবার চেক করিয়ে নিতে হয়।

'তৃষ্ণায় মারা যাচ্ছি আমি,' বলে রানাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল ব্যারনেস লিনা, র‍্যাকে স্কি রেখে আনন্দঘন, উষ্ণ, আর বাষ্পের মেঘে ঢাকা একটা কফি শপে ঢুকে পড়ল। তরুণ-তরুণীর ভিড়ে এরই মধ্যে ভরে গেছে ভেতরটা, ভাগ্যক্রমে শেষ মাথায় একটা টেবিল পেল ওরা। কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে এই সময় ফোর পীস ব্যান্ডে বেজে উঠল জনপ্রিয় একটা গানের সুর, টেবিল খালি করে ছেলেমেয়েরা ছুটল খুদে ড্যান্স ফ্লোরের দিকে। চ্যালেঞ্জের ভাব নিয়ে নিঃশব্দে একটা ভুরু উঁচু করল রানা, সকৌতুকে ওকে জিজ্ঞেস করল লিনা, 'স্কি বুট পরে নেচেছ কখনও?'

'সব কিছুতেই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে।'

যখন যা করে মগ্ন হয়ে করে ব্যারনেস, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করার বিস্ময়কর একটা প্রবণতা রয়েছে তার মধ্যে। কে জানে, এটাই হয়তো তার সাফল্যের চাবিকাঠি। মেয়েটাকে যতই দেখছে রানা ততই শিখছে ও, মনে হচ্ছে আরও অনেক কিছু শেখার আছে ওর কাছ থেকে। নাচের মধ্যে দুটো শরীর বার কয়েক এক হলো, গোলাপী আভার ভেতর ব্যারনেসের হাসি পাপড়ি মেলে দেয়া ফুল হয়ে উঠল প্রতিবার। লজ্জা পাচ্ছে, শিহরণ অনুভব করছে, উপভোগ করছে। রানা অনুভব করল তার শরীর কোথাও কোমল, কোথাও কঠিন–লম্বা আর বাহুল্যবর্জিত।

গ্রামের ওপর সরু পাহাড়ী পথ ধরে ওরা যখন ফিরছে তখন সন্ধে হয়ে গেছে। শ্যালের-বিশাল গেট ইলেকট্রনিক্যালি নিয়ন্ত্রণ করা হয়, ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল সেটা। দু'মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা গোটা বাড়ি, পাঁচিলের ওপর কাঁটাতার।

ব্যারনেসকে ফিরে আসতে দেখে কর্মচারী আর চাকরবাকরদের মধ্যে স্বস্তির একটা আলোড়ন উঠল, কিন্তু সবাই চুপচাপ। তার চেহারায় একটু যেন অহঙ্কার

লক্ষ করল রানা, এই মাত্র কি যেন একটা প্রমাণ করে দেখিয়েছে সবাইকে। দু'জন পুরুষ সেক্রেটারিকে নিয়ে দোতলার অফিস কামরায় চলে গেল সে, কাপড়চোপড় না পাল্টেই।

গরম পানিতে শাওয়ার সেরে স্ল্যাকস, ব্লেজার, আর সিল্ক রোলনেক পরল রানা, এখনও নিচের তলার অফিস কামরা থেকে টেলেক্স মেশিনের আওয়াজ পাচ্ছে ও। আরও এক ঘণ্টা পর হাউজ ফোনে ওকে ডাকল ব্যারনেস।

গোটা টপ ফ্লোর একা ব্যবহার করে সে। জানালার বাইরে বেশ গাঢ় হয়ে নেমেছে অন্ধকার, তবে তুষারের সাদায় গোটা উপত্যকা আবছাভাবে আলোকিত। স্কি বুটের ভেতর গোঁজা সবুজ স্ল্যাকস পরেছে সে, একই রঙের ব্লাউজ, চোখের সাথে ম্যাচ করা। পিছনে রানার পায়ের আওয়াজ পেয়েই পর্দার আড়ালে হাত ঢুকিয়ে একটা বোতামে চাপ দিল সে, কোন শব্দ না করে জানালায় পর্দা পড়ল। তারপর রানার দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'ড্রিঙ্ক, রানা?'

'আগে কাজের কথা শেষ হোক?'

'হোক।' হাত তুলে ফায়ারপ্লেসের কাছাকাছি চৌকো, নরম লেদার আর্মচেয়ার দেখাল ব্যারনেস লিনা, তারপর হঠাৎ হাসল সে। 'মিডো-র সেলস্ ডিরেক্টর হিসেবে এমন একটা জাদুকরকে পেয়ে যাব ভাবতেও পারিনি। এই অল্প ক'দিন তুমি যা করেছ আমি অবাক হয়ে গেছি।'

'ইকোর সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার না হয়ে কেন মিডো-র সেলস্ ডিরেক্টর হয়েছি, তুমি জানো–কাভার। কাভারটা জেনুইন প্রমাণ করতে হবে না? তাছাড়া, আমি এখনও নিজেকে একজন সৈনিক বলে মনে করি–কাজটা ইন্টারেস্টিং লাগছে।'

'বঙ্গ সন্তানরা কি সবাই তোমার মত বিনয়ী?' কৃত্রিম অসহায় একটা ভঙ্গি করে হাসল ব্যারনেস লিনা। রানার সামনে হাঁটাহাঁটি করছে, ঠিক অস্থির নয়, তবে কি এক পুলক যেন তাকে চঞ্চল করে তুলেছে। 'আমাকে জানানো হয়েছে, ন্যাটো নাকি কেসট্রেল টেস্ট করতে যাচ্ছে, একটানা প্রায় দু'বছর টালবাহানা করার পর।'

কেসট্রেল হলো মিডো-র তৈরি মাটি-থেকে-মাটিতে নিক্ষেপযোগ্য পোর্টেবল মিসাইল।

'আরও খবর পেলাম, পুরানো ক'জন বন্ধুর সাথে তুমি কথা বলার পর সিদ্ধান্তটা নিয়েছে ওরা।'

'দুনিয়াটাই তো চলছে বন্ধুত্বের খাতিরে,' মৃদু হাসল রানা।

'মিশর আর সৌদি আরবেও তাহলে তোমার বন্ধু আছে?' মাথা একটু কাত করে উত্তরের অপেক্ষায় রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ব্যারনেস লিনা।

'শুধু বন্ধুত্ব নয়, ভাগ্যও সহায়তা করছে,' বলল রানা। 'মিশরের নতুন সামরিক উপদেষ্টার কাছে আমি এক সময় ট্রেনিং পেয়েছিলাম, উনি আমাকে ভীষণ স্নেহ করেন। আর সৌদি রাজ পরিবারের কিছু সমস্যা রানা এজেন্সি সমাধান করে দিয়েছিল। কিন্তু তুমি শুধু কি পেরেছি সেগুলোর কথা বলছ। পারিনি এমন অনেক কিছুও রয়েছে। যেমন ইরানকে পটাতে পারিনি।'

'কথাটা ঠিক নয়,' বলল ব্যারনেস। 'ওরা বাকিতে ডেলিভারি চেয়েছিল, তুমি

দিতে চাওনি।'

'নগদে রাজি করাতে পারিনি, সেটাও তো একটা ব্যর্থতা। আরও এক জায়গায় ব্যর্থ হয়েছি আমি। শেষবার যখন কথা বললাম আমরা, ঠিক হয়েছিল...'

'আমার মনে আছে,' বলল ব্যারনেস। ঠিক হয়েছিল, যদি থাকে তাহলে 'খলিফা'-র একটা প্রিন্ট-আউট সেন্ট্রাল কমিটির সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স কমপিউটার থেকে পাবার চেষ্টা করা হবে।

'তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম, উপকারী এক বন্ধু আছে ওখানে, পারলে একমাত্র সে-ই সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু পারেনি। তার বিশ্বাস, তালিকায় খলিফা যদি থাকেও, আছে ব্র্যাকেটের ভেতর।' তারমানে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া প্রিন্ট-আউট পাবার চেষ্টা করলে অ্যালার্ম বেজে উঠবে। অর্থাৎ কমপিউটারের কাছ থেকে খলিফা সম্পর্কে কিছু জানতে চাইলে কন্ডিশন গ্রীন ঘোষণা করা হবে।'

'তুমি তাকে নামটা বলোনি তো?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ব্যারনেস।

'না। কোন নাম বলিনি, ডিনারে বসে আভাস দিয়ে শুধু গল্প করেছি। তবে যেভাবে বলেছি বুঝতে পেরেছে সে।'

'অন্য কোন উপায় দেখছ?'

'দেখছি, কিন্তু সেটা হবে শেষ উপায়। তার আগে তুমি বলো তোমার উৎস থেকে কি জানতে পেরেছ।'

'আমার উৎস থেকে প্রায় কিছুই জানা যাচ্ছে না,' বলল ব্যারনেস লিনা। 'বনে নেদারল্যান্ডের দূতাবাস যারা দখল করেছে তাদের সাথে খলিফার কোন সম্পর্ক নেই। যা ভেবেছিলাম, ওরা দক্ষিণ মলোক্কান চরমপন্থী। ক্যাথি আর ট্র্যানজিট এয়ারলাইন্সের প্লেন দুটো হাইজ্যাক করেছে অ্যামবিশাস দু'দল অ্যামেচার, নগদ টাকা আর কিকের নেশায়। ইদানীং মাত্র একটা ঘটনাই ঘটেছে যার সাথে খলিফা জড়িত থাকলেও থাকতে পারে—তার স্টাইলের সাথে মিল আছে।'

'প্রিন্স হাশেম আবদেল হাক্কাস?'

পায়চারি থামিয়ে রানার দিকে তাকাল ব্যারনেস, দু'কোমরে হাত রেখে আড়মোড়া ভাঙল। সবুজ কাপড়ের ওপর নখগুলো টকটকে লাল, আঙটিগুলো থেকে দ্যুতি ছড়াচ্ছে হীরে। 'ঘটনাটা থেকে তুমি কি বুঝেছ?' কেমব্রিজ ক্যাম্পাসে শুয়ে থাকার সময় প্রিন্সকে গুলি করে খুন করা হয়। মাথার পিছনে টু-টু বোরের তিনটে বুলেট। বাদশার উনিশ বছরের নাতি ছিল প্রিন্স, তবে যাদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন তাদের কেউ নয়। আবদেল হাক্কাস চশমা পরা মেধাবী ছাত্র ছিল, প্রাসাদ রাজনীতি বা রাজকীয় ক্ষমতা তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। অপহরণ করার চেষ্টা করা হয়নি, কামরায় ধস্তাধস্তির চিহ্ন ছিল না, খোয়াও যায়নি কিছু কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা ঘোরতর শত্রুও ছিল না তার।

'কারণ বা মোটিভ আছে বলে মনে হয়নি,' বলল রানা। 'সেজন্যেই ধারণা করি খলিফার হাত থাকতে পারে।'

'খলিফা ধুরন্ধর–,' দ্রুত পিছন ফিরল ব্যারনেস, নিতম্বের ওপর সবুজ কাপড়ে টান পড়ল। কিন্তু প্যান্টির কিনারা এত সূক্ষ্ম যে বাইরে কোন রেখা ফুটল না।

সুগোল গম্বুজ আকৃতির নিতম্ব। আবার পায়চারি শুরু করল সে, তার পায়ের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম উপলব্ধি করল রানা, হাতের মতই লিনার পা-ও লম্বা আর সরু, চওড়া হাড়ের ওপর পেশীর ফালি দিয়ে সুশোভিত। 'তোমাকে যদি বলি, গত হপ্তায় ওপেকের অন্যান্য সদস্যকে সৌদি আরব জানিয়ে দিয়েছে যে তেলের দাম তো সে বাড়াবেই না, বরং আরও পাঁচ পার্সেন্ট কমিয়ে দেয়ার কথা ভাবছে…'

চেয়ারে ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। 'আর আমি যদি তোমাকে বলি–ইরান, কুয়েত, আর আবুধাবী বলেছে পরবর্তী মীটিঙে প্রস্তাবটা তোলা হলে সৌদি আরবকে সমর্থন করবে তারা, তুমি কি ভাববে?'

'আমি বলব, বাদশার আরও ছেলে, নাতি, এবং আত্মীয়স্বজন আছে, যাদের তিনি প্রিন্স হাক্কাসের চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসেন…'

'সব মিলিয়ে সাতশো জন,' বলল রানা। 'আরও আছে আবুধাবী শেখের আপনজনরা, ইরানী ধর্মীয় নেতারা, কুয়েতী শেখের প্রিয়পাত্ররা…'

'সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে একজন ব্যবসায়ী বলে কিডন্যাপাররা তাঁর ছেলেকে আটকে রেখে বিশ লাখ ডলার আদায় করে নিতে পেরেছে…'

'সৌদি বাদশাও তো তাঁর দুই ভাই-ঝির জন্যে পঁচিশ মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ দিয়েছেন,' বলল রানা। 'নিজের ছেলে বা মেয়ের জন্যে কত দেবেন?' দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, আইডিয়াটা নতুন করে উত্তেজিত করে তুলেছে ওকে।

'বাদশা একজন আরব এবং মুসলমান,' বলল ব্যারনেস। 'মুসলমানরা ছেলে আর নাতি-পুতিকে কি রকম ভালবাসে আমার চেয়ে ভাল জানো তুমি।' রানার সামনে দাঁড়াল সে, মিষ্টি সেন্টের গন্ধে দম আটকে এল রানার। 'কে জানে, বাদশাকেও হয়তো স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, কার কখন মৃত্যু হয় কেউ তা বলতে পারে না।'

'বেশ,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি? আমরা বলতে চাইছি, সহজ একটা ফর্মুলা বেছে নিয়েছে খলিফা? তেল একটা অস্ত্র, অস্ত্রটা নিয়ন্ত্রণ করছে মধ্যপ্রাচ্য, অর্থাৎ আরবরা নিয়ন্ত্রণ করছে পশ্চিম দুনিয়ার অর্থনীতি…'

'এবং আরবদের নেতৃত্ব দিচ্ছে সৌদি বাদশা,' বলল ব্যারনেস। 'বাদশা এবং তার পরিবার সন্ত্রাসবাদের কাছে অসহায়, আগের দৃষ্টান্ত রয়েছে টেরোরিস্টদের দাবি মেনে নিয়েছেন তিনি।'

'আবুধাবীর শেখ এই মুহূর্তে মৌরিতানিয়া ভ্রমণে রয়েছেন, দেড়শো আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে। পশ্চিম ইউরোপের যে-কোন ফাইভ স্টার হোটেলে যাও, দেখতে পাবে বাদশার কোন না কোন প্রিয়পাত্র পাবলিক লাউঞ্জে বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। সহজ টার্গেট ওরা, সংখ্যায় অনেক। একসাথে যদি দু'জন বা তিনজনও খুন হয়ে যায়, কি দেখব আমরা? খবরের কাগজে বড় বড় হেডিঙে ছাপা হবে খবরটা, কিন্তু মনে মনে বেশিরভাগ লোকই ভাববে, এরকমই তো হবার কথা। তেল নামের অস্ত্র দিয়ে গোটা দুনিয়াকে যারা জিম্মি রেখেছিল তাদের জন্যে কেঁদে বুক ভাসাবার লোক তুমি খুব কমই পাবে।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ফাঁদটা কোথায়, বুঝতে পারছ, রানা?' চকচক করছে ব্যারনেসের চোখ

জোড়া। 'এই একই ফাঁদ পেতেছিল খলিফা জিরো-সেভেন-জিরো হাইজ্যাক করে। হাইজ্যাকাররা যে শর্তগুলো দিল, সেগুলো পশ্চিমা শক্তিগুলোর সমর্থন পেয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ভিকটিমের ওপর তারা অতিরিক্ত কিছু চাপও সৃষ্টি করে। ভেবে দেখো, তেল একনায়কদের ওপর খলিফা যদি দাম কমাবার জন্যে চাপ সৃষ্টি করে, পশ্চিমা ক্যাপিটালিস্টিক পাওয়ারগুলোর কাছ থেকে কি রকম সমর্থন পেয়ে যাবে সে?'

'তুমি একজন ক্যাপিটালিস্ট,' বলল রানা। 'খলিফা যদি তেলের দাম কমাতে সমর্থ হয়, তুমিও লাভবানদের একজন হবে।'

'আমি ক্যাপিটালিস্ট, হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে আমি একজন মানুষ—এ থিঙ্কিং হিউম্যান বিইঙ। তোমার কি মনে হয় এই ব্যাপারটায় খলিফা সফল হলে আমরা আর তার নাম শুনব না?'

'আরও বেশি করে শুনব,' বলল রানা। 'প্রতিবার আগেরটার চেয়ে বড় দাবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে সে। প্রতিটি সাফল্যের পর আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে তার।'

'ড্রিঙ্ক না হলে আর চলছে না,' বলে ঘুরে দাঁড়াল ব্যারনেস লিনা, তার হাতের ছোঁয়ায় কফি টেবিলের সমতল মাথা একপাশে সরে গেল, নিচে দেখা গেল সার-সার বোতল আর গ্লাস। 'হুইস্কি, তাই না?' কাঁচের টামব্লারে খানিকটা ঢেলে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

টামব্লারটা ধরার সময় ব্যারনেসের আঙুলের ছোঁয়া পেল রানা হাতে। তার চামড়া এত ঠাণ্ডা আর শুকনো, বিস্মিত হলো ও।

খানিকটা হোয়াইট ওয়াইনে পানি মিশিয়ে নিজের টামব্লারটা ঠোঁটে দু'বার ঠেকাল ব্যারনেস, রানা লক্ষ করল ওয়াইনের লেভেল প্রায় আগের জায়গাতেই রয়েছে। গ্লাসের ওপর দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

'আমাদের ধারণা যদি ঠিক হয়,' নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা। 'এসবের পিছনে যদি খলিফা থাকে, তাহলে তার যে ছবি মনে মনে এঁকেছি আমি সেটা বদলে যায়।'

'কি রকম?' ফুলদানীর তাজা ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকল ব্যারনেস।

'খলিফা—নামটা আরবী। অথচ আরবদের ওপর আঘাত হানছে সে।'

'সেজন্যেই তো তাকে আমি ধুরন্ধর বলি। শিকারীদের বোকা বানাবার জন্যে এ-ধরনের একটা নাম ব্যবহার করছে সে।' এক সেকেন্ড চিন্তা করল ব্যারনেস। 'তবে আরেকটা আইডিয়া আমার মনে আসছে। খলিফা হয়তো নিজেও একজন আরব, সৌদি বাদশার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে তিনি যাতে ফিলিস্তিনীদের আরও সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন। সৌদি আরবের কাছ থেকে আর কি চাওয়ার থাকতে পারে তার?'

'কিন্তু তেলের দাম কমাবার ব্যাপারটা? এটা তো নেহাতই পশ্চিমা দুনিয়ার স্বার্থে। আরেক দৃষ্টিতে বিচার করা যায়, বামপন্থীরা বিশ্বাস করে বন্দুকই সমস্ত ক্ষমতার উৎস, চরমপন্থী কমিউনিস্টরা সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেয়। জিরো-সেভেন-জিরো হাইজ্যাক বা তোমার স্বামীর কিডন্যাপিং—দুটোই ক্যাপিটালিস্টিক সোসাইটির বিরুদ্ধে ছিল।'

'অটারম্যানকে সে কিডন্যাপ করে টাকার জন্যে, আর খুন করে নিজের

পরিচয় গোপন রাখার জন্যে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের ওপর আক্রমণ, তেলের দাম কমাবার জন্যে হত্যাকাণ্ড, নাম হিসেবে খলিফা শব্দটা বেছে নেয়া–এ-সব দেখে যেন মনে হয় ঈশ্বরের ভাবমূর্তি নিয়ে কোন উদ্ধারকর্তার আবির্ভাব ঘটেছে।' আঙুলের দ্রুত চাপে টিউলিপের একটা পাপড়ি ছিঁড়ে ফেলল ব্যারনেস। 'রানা, কি যে অসহায় বোধ করছি!' জানালার সামনে চলে গেল সে, পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। 'অন্ধকার থেকে খলিফাকে বের করে আনার কোন উপায়ই কি নেই?'

'আমাদের দেশের শিকারীরা কি করে জানো? বাঘের হদিস না পেলে টোপ হিসেবে গাছের নিচে ছাগল বেঁধে রাখে তারা।'

'ছাগল?'

'হ্যাঁ।'

'মানে? বুঝলাম না।'

'আমি যদি ছাগল হই?' হাসল রানা। 'খলিফা আমাকে জানে। হাইজ্যাকাররা আমার নাম স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিল। জেসিকাকে আমার কথা বলে সাবধান করে দেয়া হয়। কাজেই আমি পিছনে লেগেছি জানতে পারলে ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেবে খলিফা। ব্যক্তিগতভাবে বেরিয়ে এসে আমার ব্যবস্থা করতে চাইবে সে।'

'রানা...'

'তার কাছাকাছি হওয়ার এই একটাই পথ খোলা আছে।'

'রানা...,' রানার কনুইয়ের ওপরটা ধরল ব্যারনেস, কিন্তু আর কথা বলতে পারল না। নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল সে, সবুজ চোখে অতল গভীরতা। রানা দেখল, তার লম্বা গলায় একটা শিরা লাফাল, কানের ঠিক নিচে। তার ঠোঁট ফাঁক হলো, যেন কথা বলতে যাচ্ছে। একটু যেন ভেজা, কোমল, আর রাঙা ঠোঁট–অরক্ষিত। ঠোঁট বন্ধ করল সে, রানার বাহুতে তার হাতের চাপ বাড়ল, দাঁড়াবার ভঙ্গির সাথে গোটা শরীর আরেক আকৃতি পেল। এমনভাবে সামান্য একটু বেঁকে গেল পিঠ, যেন টলে উঠে রানার দিকে সরে এল সে, খানিক উঁচু হলো গ্রীবা। 'আমি একা,' ফিসফিস করে বলল সে। 'কত দিন ধরে। কি ভয়ঙ্কর একা আজ বুঝলাম–তুমি আমার সাথে রয়েছ বলে।'

গলার ভেতর দম আটকানো একটা অনুভূতি হলো রানার, চোখের পিছনে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছে রক্ত।

'নিঃসঙ্গতা আমাকে মেরে ফেলছে, রানা! এই অভিশাপ থেকে আমি মুক্তি চাই!' একটা ঢোক গিলল ব্যারনেস লিনা, রানার শরীরের সাথে সেঁটে এল। থরথর করে কাঁপছে সে। 'তুমি আমাকে উদ্ধার করতে পারো না?'

রানা বিছানায় নিয়ে যাবার পর একসময় কাঁপুনি থামল ব্যারনেস লিনার।

তেরো

ভোর হবার তিন ঘণ্টা আগে হিম ঠাণ্ডা গাঢ় অন্ধকারে রানার ঘুম ভাঙাল ব্যারনেস লিনা, শ্যালে থেকে ওরা বেরুবার সময়ও চারদিক অন্ধকার থাকল। অনুসরণরত মার্সিডিজে তার নেকড়েরা রয়েছে, বাঁক নেয়ার সময় সেটার হেডলাইটের আলো প্রতিবার সেলুনের ভেতরটা আলোকিত করে তুলল। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে।

জুরিখ থেকে টেক অফ করার সময় লিয়ার জেটের বাঁ দিকের সীটে থাকল ব্যারনেস, পাইলট-ইন-কমান্ড হিসেবে। তার পার্সোনাল পাইলট একজন অভিজ্ঞ ফরাসী, এই মুহূর্তে ব্যারনেসের কো-পাইলট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। টেক অফ করার সময় ব্যারনেসের দক্ষতা লক্ষ করে পিতৃসুলভ গর্বিত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। জুরিখ কন্ট্রোল টাওয়ারের নিয়ন্ত্রিত এয়ারস্পেস পেরিয়ে এসে প্যারিসের ওরলি এয়ারপোর্টের দিকে কোর্স সেট করল ব্যারনেস, তারপর অটো পাইলটের সুইচ অন করে ফিরে এল মেইন কেবিনে। রানার পাশে লেদার চেয়ারে বসলেও, চেহারা থেকে নির্লিপ্ত গাম্ভীর্য মুছে গেল না। বিশ্বাস করা কঠিন কাল রাতে ওরা পরস্পরের মধ্যে কি বিস্ময়কর বৈচিত্র্য খুঁজে পেয়েছে!

উল্টোদিকে বসেছে গাঢ় রঙের স্যুট পরা দু'জন সেক্রেটারি, তাদের নিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে গেল ব্যারনেস। ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলল ওরা, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার–চার হপ্তা চেষ্টা করে ভাষাটা আরও ভালভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছে ও। দুই কি তিনবার মন্তব্য বা পরামর্শের জন্যে রানার দিকে ফিরল ব্যারনেস, চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোন প্রকাশ নেই সেখানে। তাকে রানার নৈর্ব্যক্তিক এবং দক্ষ ইলেকট্রনিক কমপিউটার বলে মনে হলো। বুঝল, কর্মচারীদের সামনে ব্যক্তিগত সম্পর্কটা ফাঁস করতে চায় না লিনা।

ভুলটা একটু পরই ভেঙে দিল ব্যারনেস। কেবিন স্পীকারে তাকে ডাকল কো-পাইলট, 'ওরলি সার্কিটে আমরা জয়েন করব আর চার মিনিট পর, ব্যারনেস।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল ব্যারনেস লিনা, ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলল, 'ক্ষমা করো, শেরি।' রানার নাকের পাশে চুমো খেলো আলতোভাবে। 'প্লেন আমি নিজ হাতে ল্যান্ড করাব। আমার লগবুকে ফ্লাইং টাইম যোগ হওয়া দরকার।'

দ্রুতগতি প্লেনটাকে এমন আলগোছে রানওয়েতে ল্যান্ড করাল সে, যেন টোস্টে মাখন মাখাল। কো-পাইলট রেডিওতে আগেই খবর পাঠিয়েছিল, প্রাইভেট হ্যাঙ্গারে প্লেন পার্ক করার সাথে সাথে উদয় হলো ইউনিফর্ম পরা ইমিগ্রেশন আর কাস্টমস অফিসার। প্লেনে উঠে এসে সমীহের সাথে ব্যারনেসকে অভিবাদন করল তারা, লাল ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টের দিকে একবার তাকাল কি তাকাল না। তবে রানার পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে দেখল একবার।

রানার কানের কাছে ঠোঁট রেখে ব্যারনেস লিনা ফিসফিস করে বলল, 'আমার মত তোমারও একটা লাল বই দরকার।' তারপর অফিসারদের বলল, 'কেউ বলতে পারবে না সকালটা আজ ঠাণ্ডা নয়, কাজেই আপনাদের হাতে গ্লাস থাকা দরকার।' আগেই অবশ্য সাদা জ্যাকেট পরা স্টুয়ার্ট ড্রিঙ্ক পরিবেশনের আয়োজন শুরু করেছে। আরাম করে বসার জন্যে হ্যাট আর পিস্তল বেল্ট খুলে ফেলল অফিসাররা, আয়েশ করে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। ওদের ওখানে রেখেই প্লেন থেকে নেমে পড়ল ব্যারনেস রানাকে নিয়ে।

হ্যাঙ্গারের পিছনে ড্রাইভার আর গার্ড সহ তিনটে গাড়ি অপেক্ষা করছিল। তিনটের মধ্যে একটা মাসেরাতি, দেখেই রানার ঠোঁটের কোণ বাঁকা হয়ে গেল। 'ওটা চালাতে তোমাকে আমি নিষেধ করেছি,' গম্ভীর সুরে বলল ও। 'নিজের বিপদ ডেকে আনতে চাও নাকি?'

নিরাপত্তা ব্যবস্থা নতুন করে সাজানোর সময় গাড়িটা নিয়ে তর্ক করেছে ওরা। মাসেরাতির রঙ ইলেকট্রিক সিলভার-গ্রে, ব্যারনেসের প্রিয় রঙগুলোর একটা। ঝকঝকে বর্শার মত গাড়িটা, সবাই জানে ব্যারনেস অটারম্যান ওটায় চড়তে ভালবাসে। সকৌতুক একটা আওয়াজ করে রানার কাছে সরে এল ব্যারনেস লিনা, 'কি ভালই না লাগছে, কোন পুরুষ আবার কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে আমার ওপর। অনেক দিন পর আবার অনুভব করতে পারছি, আমি আসলে মেয়ে।'

'সেটা অনুভব করাবার আরও অনেক উপায় জানা আছে আমার।'

'জানি,' বলে চকিতে একবার রানার সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হাসল ব্যারনেস, চোখে ঝিক করে উঠল দুষ্টামি। 'এবং ভা-রি পছন্দও করি। কিন্তু এখন নয়, প্লীজ। আমার স্টাফরা ভাববে কি!' পরমুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে উঠল সে। 'মাসেরাতিতে তুমি ওঠো, তোমার জন্যেই আনিয়েছি ওটা। কেউ একজন উপভোগ করুক ওটা। আর শোনো, আজ সন্ধ্যায় আবার দেরি করে ফেলো না। অনেক বুদ্ধি খরচ করে সময় বের করেছি। লা পিয়েরে বেনিতে তোমাকে আমি আটটার সময় চাই।'

মূল শহর প্যারিসে ঢোকার মুখে ট্রাফিক জ্যামের কারণে মাসেরাতির গতি কমাতে হলো রানাকে, ইতিমধ্যে গাড়িটার আসুরিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা পেয়ে গেছে ও। লিনা ঠিকই বলেছে, উপভোগ করার মতই একটা ব্যাপার বটে। সামনে হাজার হাজার গাড়ি, সামান্য একটু ফাঁক-ফোকর পেলেই সেখানে বুলেটের মত মাসেরাতিকে নিয়ে ঢুকছে রানা, দু'পাশের দ্রুতগতি গাড়িগুলোকে ওভারটেক করার অদ্ভুত এক পাগলামি পেয়ে বসেছে ওকে। লিনা কেন যে এটাকে এত ভালবাসে, বোঝা গেল। মাসেরাতি যেন কোন মেশিন নয়, জ্যান্ত একটা ব্যাপার–ড্রাইভারের মনে পুলক জাগাবার জন্যে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে অপেক্ষা করছে।

এলিসি প্রাসাদের কাছাকাছি একটা আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজে ঢুকে গাড়ি থামাল রানা, রিয়ার ভিউ মিররে তাকিয়ে সহাস্যে বলল, 'ব্লাডি কাউবয়!' রোলেক্সের দিকে তাকাল, অ্যাপয়েন্টমেন্টের চেয়ে এক ঘণ্টা আগে পৌঁছে গেছে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় কোবরা পিস্তল সহ শোল্ডার হোলস্টার খুলল ও, মাসেরাতির গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে রেখে তালা লাগিয়ে দিল। নিঃশব্দে আবার হাসল–সশস্ত্র অবস্থায়

ফ্রেঞ্চ ন্যাভাল হেডকোয়ার্টারে ঢুকতে চেষ্টা করলে একটা সিন ক্রিয়েট করা হবে।

তুষারপাত বন্ধ হয়েছে, এলিসি প্রাসাদের ফুলবাগানে কুঁড়িগুলো পাপড়ি মেলছে। কনকর্ড মেট্রো স্টেশনে ঢুকে পাবলিক বুদ থেকে ব্রিটিশ দূতাবাসে ফোন করল রানা। দু'মিনিট কথা বলল মিলিটারি অ্যাটাশের সাথে, রিসিভার রেখে দিয়ে ভাবল, বল ছোড়া হয়ে গেছে, এবার অ্যাকশন শুরু হতে যতক্ষণ লাগে। খলিফা যদি সেন্ট্রাল কমিটির ভেতর ঢুকে শার্ক কমান্ড সম্পর্কে জানার ক্ষমতা রাখে তাহলে শার্ক কমান্ডের প্রাক্তন কমান্ডার যে তার পিছনে লেগেছে এ-খবরও পেয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। প্যারিসের ব্রিটিশ মিলিটারি অ্যাটাশে শুধু পার্টি দেয় আর ভদ্রমহিলাদের হাতে চুমো খায় না, তার আরও গোপন দায়িত্ব আছে।

হাতে ক'মিনিট সময় নিয়ে রু রয়্যালের কোণে, মেরিন হেডকোয়ার্টারের প্রধান ফটকে উপস্থিত হলো রানা। তবে আগে থেকেই ওখানে একজন সেক্রেটারি অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। ভেতরে ঢোকার পথটুকু নিষ্কণ্টক করে তুলল সে, সেন্ট্রিদের পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগোল ওরা। চারতলার আর্মামেন্ট কমিটি রুমে উঠে এল রানা। মিডো থেকে আগেই পৌঁচেছে রানার দু'জন সহকারী, এরই মধ্যে ব্রীফকেস খুলে টেবিলের ওপর কাগজপত্র সাজিয়ে বসেছে তারা।

গত হপ্তায় ফ্রেঞ্চ ফ্ল্যাগ ক্যাপটেন ব্রাসেলসে গিয়ে দেখা করেছিল রানার সাথে, আর্মামেন্ট কমিটি রুমে সে-ই অভ্যর্থনা জানাল। দু'জন অ্যাডমিরালের সাথে করমর্দন করল রানা। কুশলাদি বিনিময়ের পরপরই শুরু হয়ে গেল আলোচনা বৈঠক। দর-দস্তুর অনেক পরের ব্যাপার, রানা শুধু জানতে চায় ফ্রেঞ্চ নেভী মিডোর কেসট্রেল রকেট মটর পেতে কতটুকু আগ্রহী।

দুপুরের পর একজন অ্যাডমিরাল তাঁর ব্যক্তিগত অফিসে আমন্ত্রণ জানালেন রানাকে। সেখানে দু'ঘণ্টা কাটাল ওরা, লাঞ্চ সারল, তারপর সদলবলে চলে এল মিনিস্ট্রি অভ মেরিনের অফিসে। ফ্রেঞ্চদের একটা বদভ্যাস লক্ষ করে বাঙালীদের ওপর পুরানো একটা রাগ একটু কমে গেল রানার। তিন জায়গাতেই, প্রতিবার আবার প্রথম থেকে আলোচনা শুরু করতে হলো ওকে, ফ্রেঞ্চরা একই কথা বারবার শুনতে চায়। ছ'টার দিকে মেজাজ বিগড়ে গেল রানার, প্রতিপক্ষের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বিদায় নিল ও, ঠিক হলো দিন কয়েক পর আবার আলোচনা করা যাবে। এই সময়, একেবারে শেষ মুহূর্তে, অ্যাডমিরালরা জানালেন, মিডো-র কেসট্রেল রকেট মটর পাবার জন্যে অধীর হয়ে আছেন তাঁরা। বিস্ময়ের বিষম একটা ধাক্কা খেলো রানা। কি আশ্চর্য, সারাটা দিন ধরে রানাকে তাঁরা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ওগুলো তাঁদের না হলেও চলে!

'খুশির কথা,' বলে চলে এল রানা। এবং রাস্তায় বেরিয়ে এসেই ভুলে গেল সব, মন জুড়ে ফিরে এল ব্যারনেস লিনা। ওর জন্যে অপেক্ষা করছে সে।

মাসেরাতি নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারেজ থেকে বেরুবার মুখে সামনে গাড়ি থাকায় একবার থামতে হলো রানাকে, রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল ও–অনেক দিনের পুরানো অভ্যেস। মাসেরাতির পিছনে অনেকগুলো গাড়ি, সবগুলো বেরুবার জন্যে লাইন দিয়েছে, কিন্তু মনে দাগ ফেলল শুধু সিট্রনটা। মাসেরাতির পিছনে তিন নম্বর গাড়ি ওটা, চোখে পড়ার কারণ ওটার উইন্ডশীল্ডের কাঁচ চিড় ধরা।

আরও ভাল করে তাকাতে রানা দেখল, সিট্রনের মাডগার্ড তোবড়ানো, কিছুর সাথে ধাক্কা খেয়ে রঙ চটে গেছে।

এলিসি প্রাসাদ ছাড়িয়ে এসে বাঁক নেয়ার সময়ও কালো সিট্রনটাকে পিছনে দেখল রানা। মাথা নিচু করে ড্রাইভারকে দেখার চেষ্টা করল ও, কিন্তু সাথে সাথে সিট্রনের হেডলাইট জ্বলে উঠল। পরবর্তী কয়েক মাইল একই রাস্তায় থাকল গাড়ি দুটো। তবে দুটোর মাঝখানে অন্যান্য আরও কয়েকটা গাড়ি রয়েছে। এভিনিউ দে লা গ্রান্ড আরমি-তে ঢুকে বারবার পিছনে তাকিয়ে সিট্রনটাকে খুঁজল রানা। দেখতে না পেয়ে ভাবল, আশপাশের কোন গলিতে ঢুকে পড়েছে। সিট্রন পিছনে থাকায় যেন একটা কাজে ব্যস্ত ছিল রানা, এখন নিজেকে বেকার মনে হতে লাগল। স্বস্তিবোধ করার কথা, কিন্তু ঘটছে উল্টোটা, খুঁত খুঁত করছে মন। একটু পর অবশ্য ঠিক হয়ে গেল সব, আবার মন জুড়ে ফিরে এল ব্যারনেস লিনা। মাসেরাতির গতি বেড়ে গেল, গাড়ি এবং ড্রাইভার দু'জনেই রোমাঞ্চপ্রিয় হয়ে উঠল যেন। যানবাহনের প্রচুর ভিড় রাস্তায়, পিছনে সিট্রন থাকলেও এখন আর সেটাকে দেখতে পাবার কথা নয় রানার।

ভার্সেই ছাড়িয়ে রঁবুইলে রোডে পড়ে বেশ অনেকক্ষণ পর এই প্রথম পিছনটা অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি, মাঝখানে অন্য কোন গাড়ি নেই। খুঁতখুঁতে ভাবটা আর থাকল না। শেষ বাঁকটা আর বেশি দূরে নয়, তারপরই লা পিয়েরি বেনিতে পৌঁছে যাবে প্রেমিক প্রবর।

ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হলো। বাঁক নেয়ার সাথে সাথে রানার সামনে ভিজে, কুণ্ডলী ছাড়ানো কালো অজগরের মত রাস্তাটা, বহুদূরে এক জায়গায় ফুলে-ফেঁপে উঁচু হয়ে আছে। তীরবেগে গাড়ি ছোটাবার আনন্দে বিভোর হয়ে আছে ও, ঢালের মাথায় উঠে এল ঘণ্টায় দেড়শো কিলোমিটার স্পীডে। ক্লাচ, ব্রেক, আর হুইল নিয়ে মহানন্দে রয়েছে ও। ওর সামনে চকচকে সাদা ক্যাপ মাথায় একজন পুলিস দাঁড়িয়ে আছে, বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছে লোকটা, হাতের লাল আলো সহ ল্যাম্পটা ঘন ঘন মুখের সামনে তুলে দোলাচ্ছে। রাস্তার পাশে খাদে পড়ে আছে একটা পুজোট গাড়ি, হেডলাইটের আলো আকাশের দিকে তাক করা। গাঢ় নীল পুলিসের ভ্যানটা রাস্তা প্রায় বন্ধ করে রেখেছে, ভ্যানের আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে রাস্তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা দুটো স্থির দেহ। অত্যন্ত স্বাভাবিক অ্যাক্সিডেন্ট-পরবর্তী দৃশ্য, পরিবেশে নাটকীয়তা এনে দিয়েছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি।

সময় মতই মাসেরাতির স্পীড কমাল রানা, গুটি গুটি এগোচ্ছে গাড়ি। ইলেকট্রিক মটরের মৃদু গুঞ্জনের সাথে যোগ হলো বৃষ্টির কোমল শব্দ, পাশের জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল রানা। ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা মারল চোখে মুখে। ইউনিফর্ম পরা পুলিস ল্যাম্প নেড়ে একটা বিশেষ জায়গার দিকে ইঙ্গিত করল রানাকে, ঝোপ আর কোম্বি ভ্যানের মাঝখানে মাসেরাতিকে থামাতে বলছে।

অদ্ভুত একটা নড়াচড়া লক্ষ করল রানা। হেডলাইটের আলোয় শুয়ে থাকা একটা দেহ। সামান্য একটু নড়ে আবার স্থির হয়ে গেছে। শুধু পিঠটা একটু ফুলে মত উঠেছিল, শোয়া অবস্থা থেকে কেউ উঠতে চাইলে প্রথমে তো পিঠটাই উঁচু হয়।

লোকটাকে হাত তুলতে দেখল রানা, মাত্র কয়েক ইঞ্চি। উরুর পিছনে কি যেন লুকিয়ে রেখেছে লোকটা। তারপরই জিনিসটা চিনতে পারল রানা। ভাঁজ করা মেশিন পিস্তল, ফুটোওয়ালা ছোট ব্যারেল।

সেই মুহূর্তে এত দ্রুত কাজ শুরু করল মাথা, রানার মনে হলো যা কিছু ঘটছে সবই স্বপ্নের মধ্যে বড় বেশি ধীরগতিতে ঘটছে। মাসেরাতি, ভাবল ও। লিনার জন্যে ফাঁদ পেতেছে ওরা!

মাসেরাতি যেখানে থামবে আন্দাজ করে নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল পুলিস, যাতে ড্রাইভারের পাশে থাকতে পারে সে। তার ডান হাত সাদা রেনকোটের ভেতর, পিস্তল বেল্টের কাছাকাছি।

গ্যাস পেডাল গাড়ির মেঝের-সাথে চেপে ধরল রানা, বুকে গুলি খাওয়া গণ্ডারের মত গর্জে উঠে সাথে সাথে লাফ দিল মাসেরাতি। সামনের চাকা ভিজে রাস্তা ছেড়ে উঠে পড়ল, মৃদু স্পর্শ করে হুইল একটু ঘোরাল রানা। পুলিস লোকটা ভারি সতর্ক, বিপদ দেখতে পাবার আগেই কিভাবে যেন টের পেয়ে গেছে, লাফ দিয়ে জায়গা বদল করল সে। ঝোপের দিকে ডাইভ দিল, হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করছে।

মাসেরাতির একটা পাশ ঝোপ স্পর্শ করল, ঝড় ওঠার শব্দের সাথে ভেঙে পড়ল শুকনো ডালপালা। ডান পা তুলে মাসেরাতির বিদ্যুৎগতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করল রানা, গাড়ির নাক আরেক দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে। মাসেরাতি সিধে হতেই আবার গ্যাস পেডালে চাপ দিল ও, নতুন শক্তি পেয়ে আবার গর্জে উঠল এঞ্জিন, এবার পিছনের চাকা থেকে নীল ধোঁয়া বেরিয়ে এল।

পুলিস কোম্বিতে একজন ড্রাইভার রয়েছে, ভ্যানটা আগে বাড়িয়ে দিয়ে রাস্তাটা পুরোপুরি বন্ধ করার চেষ্টা করল সে। রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এই সময় অবশিষ্ট ফাঁকের মধ্যে চলে এল মাসেরাতি। দুটো গাড়ি স্পর্শ করল পরস্পরকে, ধাতব কর্কশ সংঘর্ষে রানার মাথার ভেতরটা এক সেকেন্ডের জন্যে ভোঁতা হয়ে গেল, দু'সারি দাঁত ঠকাঠক বাড়ি খেলো। দেহ দুটো এখন আর রাস্তায় পড়ে নেই। কাছের লোকটা এক হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বেঢপ মেশিন পিস্তলটা কাঁধের কাছে তুলছে—দেখে মনে হলো অস্ত্রটা স্টার্লিং বা সাইডওয়াইন্ডার হতে পারে। ভাঁজ করা ওয়ায়্যার বাঁট ব্যবহার করছে, কাঁধের কাছে তুলে ফায়ার করার জন্যে এক পলক বেশি সময় লাগছে তার, দ্বিতীয় লোকটার সামনে একটা বাধাও হয়ে আছে সে। পিছনে তার সঙ্গীর হাতেও একটা মেশিন পিস্তল, প্রফেশনালদের মত কোমরের কাছ থেকে গুলি করার জন্যে শিরদাঁড়া ধনুকের মত বাঁকা করে সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

কোম্বি ভ্যানের নাক বিধ্বস্ত করে দিয়ে কামানের গোলার মত বেরিয়ে এল মাসেরাতি। গ্যাস পেডাল থেকে ডান পা তুলে পিছনের চাকার বিদ্যুৎগতি কমিয়ে আনল রানা, একই সাথে বন বন করে ডান দিকে ঘুরিয়ে স্টিয়ারিং হুইল লক করে দিল। কংক্রিটের সাথে তীব্র শব্দে পিষে গেল রাবার, মাসেরাতি তার লেজের ঝাপটা দিল, বাঁ দিকে পিছলে রাস্তার লোক দু'জনের দিকে ছুটল। দরজার নিচে মাথা নামিয়ে নিল রানা। গাড়িটাকে বাঁ দিকে ইচ্ছে করে পিছলে যেতে দিয়েছে ও,

যাতে অন্তত সামান্য হলেও এঞ্জিন কমপার্টমেন্ট আর ধাতব কাঠামোর আড়াল পাওয়া যায়।

নিচু হবার সময় পরিচিত আওয়াজটা কানে এল, এক দৈত্য যেন পুরু ক্যানভাস টেনে ছিঁড়ছে–অটোমেটিক আগ্নেয়াস্ত্রের উদ্গিরণ, প্রতিটি মিনিটে প্রায় দু'হাজার বুলেট। ইস্পাত ছিঁড়ে মাসেরাতির গায়ে ঢুকতে লাগল বুলেটগুলো, কর্কশ আওয়াজে ভোঁতা আর অসাড় হয়ে গেল কান, কাঁচের গুঁড়ো ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল রানার গায়ে। কাঁচের টুকরো রানার পিঠে, খোলা ঘাড়ে আর মুখে আটকে থাকল, গড়িয়ে বা খসে পড়ল না। মাথা ভর্তি কালো চুলে হীরের মত আলো ছড়াচ্ছে।

ম্যাগাজিন শেষ হতেই গুলির আওয়াজ থেমে গেল। সীটে উঁচু হলো রানা, পাপড়িতে কাচের কণা নিয়ে চোখ পিটপিট করে সামনে তাকাল। গাছ আর ঝোপ কালো মেঘের মত ঝুলে রয়েছে মাথার ওপর, শিউরে উঠে মাসেরাতিকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করল ও। উল্টে যেতে শুরু করল গাড়ি, কিন্তু সেদিকে খেয়াল না দিয়ে রানা দেখল আততায়ীরা দ্রুত গড়াতে গড়াতে অগভীর খাদে নেমে যাচ্ছে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে খাদের ঠোঁট পেরোল মাসেরাতির পিছনের একটা চাকা। সামনের দিকে ছিটকে পড়ল রানা, সীট বেল্টের চাপে হুস করে খালি হয়ে গেল ফুসফুস। আতঙ্কিত ঘোড়ার মত পিছিয়ে এল মাসেরাতি, পারলে লেজের ওপর সটান দাঁড়িয়ে পড়ে।

খাদের ঠোঁট পেরিয়ে একবার নামছে মাসেরাতি, আবার ওঠার চেষ্টা করছে, এভাবেই চলল কিছুক্ষণ। নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্যে গিয়ার, ব্রেক, আর হুইলের সাথে যুদ্ধ করছে রানা। পরবর্তী দু'সেকেন্ডের কোন বর্ণনা দিতে পারবে না ও, তবে নিশ্চয়ই পুরো এক পাক ঘুরে গেছে মাসেরাতি–এক ঝলক আলো লাগল চোখে, একজনকে গড়াতে দেখল, আরেকজনকে ছুটতে, সবই বৃষ্টির মধ্যে ঝাপসা আর অস্পষ্ট, সবশেষে আবার সামনে খোলা রাস্তা। ছেড়ে দেয়া হুইল আপনা-আপনি ঘুরে যাচ্ছে, তীরবেগে নাক বরাবর লাফ দিল গাড়ি। একই সময়ে মুখ তুলে রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল রানা।

একচোখ জ্বলছে কোম্বি ভ্যানের, সেটার আলোয় নীল ধোঁয়া আর বাষ্পের মেঘ দেখল রানা–মাসেরাতির টায়ার জ্বলছে। ধোঁয়া আর বাষ্পের ভেতর দিয়ে খাদে দাঁড়ানো দ্বিতীয় লোকটাকে আবছা মূর্তির মত লাগল, তার কোমরের কাছ থেকে মেশিন পিস্তলের মাজল্ ঝলসে উঠল।

মাসেরাতির গায়ে প্রথম দফা বিস্ফোরণের আওয়াজ পেল রানা, কিন্তু নিচু হয়ে মাথাটা আড়াল করার উপায় নেই, বৃষ্টির মধ্যে সামনেই একটা বাঁক, চোখ ধাঁধানো গতিতে কাছে চলে আসছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, মুখের ভেতর হাড়গোড় সব যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে।

পরবর্তী বিস্ফোরণও মাসেরাতির গায়ে লাগল, মনে হলো ঝম ঝম বৃষ্টি পড়ল টিনের ছাদে। পিঠের ওপরের অংশে একটা ধাক্কা খেলো রানা।

বুলেট আটকে গেছে, নিঃসন্দেহে অনুভব করল রানা। হতে পারে রিকোশে, নয়তো পিছনের উইন্ডশীল্ড আর সীটের পিঠ ভেদ করে আসা গতি হারানো

বুলেট।

নিখুঁতভাবে বাঁক নিল গাড়ি, আর তারপরই খক খক করে উঠল এঞ্জিন। একবার গতি হারায়, আবার ছোটে, তারপর আবার গতি হারায়। প্রায় সাথে সাথেই গ্যাসোলিনের গন্ধে ভরে উঠল গাড়ির ভেতরটা। ফুয়েল লাইন ফুটো হয়ে গেছে কোথাও, বুঝতে পেরে ভাগ্যকে অভিশাপ দিল রানা। পিঠ আর পাঁজর বেয়ে রক্তের ধারা নেমে যাচ্ছে। বাম কাঁধের নিচে কোথাও আঘাত পেয়েছে। আরও একটু ভেতরে ঢুকলে ফুটো হয়ে যেত ফুসফুস। হয়েছে কিনা, এখনও বলা যাচ্ছে না। গলা দিয়ে রক্ত ওঠার অপেক্ষায় থাকল ও।

আবার সচল হয়ে অচল হলো এঞ্জিন, ফুয়েলের অভাবে মারা যাচ্ছে। মেশিন পিস্তলের প্রথম দফা বিস্ফোরণই সম্ভবত এঞ্জিন কমপার্টমেন্টে আঘাত করেছিল। সিনেমা হলে এতক্ষণে খুদে ভিসুভিয়াসের মত অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠত মাসেরাতি, বাস্তবে অবশ্য সেরকম তেমন ঘটে না–ছেঁড়া লিড থেকে এখনও প্লাগ আর পয়েন্টগুলোর গ্যাসোলিন সাপ্লাই হচ্ছে।

বাঁক নেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে পিছন দিকটা চট করে একবার দেখে নিয়েছে রানা। তিনজন লোক কোম্বি ভ্যানের দিকে ছুটছে। ড্রাইভারকে নিয়ে ওরা চারজন, একার পক্ষে সামলানো কঠিন। এখুনি চলে আসবে ওরা।

আহত মাসেরাতি আরেকটা লাফ দিল, ধুঁকতে ধুঁকতে আরও পাঁচশো গজ নিয়ে এল রানাকে, তারপর শেষবারের মত থেমে গেল। ওর সামনে, হেডলাইটের আলোর শেষ প্রান্তে, লা পিয়েরে বেনিতের সাদা গেট দেখা যাচ্ছে। ফাঁদটা এমন এক জায়গায় পেতেছে ওরা যেখানে অন্যান্য যানবাহন থেকে দৃষ্টি পড়ার আশঙ্কা কম, জালের ভেতর শুধু যাতে মাসেরাতিকে আটকানো যায়।

মনটাকে কাজের মধ্যে ফিরিয়ে আনল রানা। মেইন গেটের সামনে এস্টেটের লে-আউট স্মরণ করল ও। মাত্র একবার এখানে এসেছিল, সেবারেও অন্ধকারে। তবে স্পাইয়ের চোখ, মনে আছে রাস্তার দু'ধারে গভীর জঙ্গল, রাস্তার আরও খানিক সামনে নিচু একটা ব্রিজ, নিচে খাড়া পাড় সহ খরস্রোতা পাহাড়ী নদী। ব্রিজের পর খাড়াভাবে উঠে গেছে রাস্তা, সরাসরি বাড়িতে। গেট থেকে বাড়িটা আধ মাইল দূরে, পিছনে চারজন সশস্ত্র আততায়ী আর শরীরে বুলেট থাকলে এই আধ মাইলই অনেক দূরের পথ। তাছাড়া, বাড়িতে পৌঁছুতে পারলেও নিরাপত্তা পাওয়া যাবে কিনা তার কোন গ্যারান্টি নেই।

এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলেও মাসেরাতি এখনও গেটের দিকে এগোচ্ছে, ধীরে ধীরে কমে আসছে গতি। গরম তেল আর পোড়া রাবারের গন্ধ পাচ্ছে রানা। এঞ্জিন হুডের রঙ বদলে যেতে দেখল ও। ইলেকট্রিক পাম্প থেকে গরম এঞ্জিনে আরও তেল ছড়াচ্ছে, ইগনিশন অফ করে বন্ধ করল সেটা। জ্যাকেটের ভেতর হাত ভরে যেখানে পাবে বলে আশা করেছিল সেখানেই পেল ক্ষতটা–বাম দিকে, আর নিচে। এতক্ষণে দপ দপ করতে শুরু করেছে, চটচটে আর পিচ্ছিল হয়ে উঠল হাত। বের করে উরুতে মুছল।

ওর পিছন দিকে বৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত আলোর আভা, প্রতি মুহূর্তে জোরাল হচ্ছে। যে-কোন মুহূর্তে বাঁক নিয়ে চলে আসবে ওরা। গ্লাভ কমপার্টমেন্ট খুলে

নাইন-এম এম কোবরাটা বের করে হোলস্টারে ভরল, টেনে বেল্টের সামনে নিয়ে এল সেটাকে। সাথে স্পেয়ার ম্যাগাজিন নেই, ব্রীচও খালি। ম্যাগাজিনে শুধু নয় রাউন্ড গুলি আছে।

এঞ্জিন কমপার্টমেন্টের বনেটের ভেতর থেকে ফাটল আর ফুটো দিয়ে আগুনের খুদে শিখা বেরিয়ে আসছে। সীট বেল্ট খুলে ফেলল রানা, দরজাটা আধ খোলা অবস্থায় রাখল, এক হাতে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে মাসেরাতিকে রাস্তার কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে। এখান থেকে হঠাৎ করে নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে রাস্তা।

এক ঝটকায় স্টিয়ারিং হুইল উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতেই একটা ঝাঁকি মত খেলো রানা, সেই ঝাঁকির সাথে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ির বাইরে। গড়িয়ে রাস্তার মাঝখানে ফিরে গেল মাসেরাতি, থেমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

প্যারাস্যুট ড্রপের ভঙ্গিতে মাটি স্পর্শ করল রানা, পা আর হাঁটুতে ধাক্কা খেলো, তারপর গড়িয়ে দিল শরীরটা। কাঁধ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ব্যথাটা, ক্ষতের ভেতর কি যেন ছিঁড়ে যাওয়ায় অন্ধকার দেখল চোখে। লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল ও। এক সেকেন্ড পর একটু কমল ব্যথা। জঙ্গলের কিনারা লক্ষ্য করে ছুটল ও। কমলা রঙের কাঁপা কাঁপা আলো আসছে আগুন ধরা গাড়িটা থেকে।

কোবরার চেম্বারে এক রাউন্ড গুলি ভরল রানা, বাঁ হাতের আঙুলগুলো ফোলা ফোলা আর অসাড় লাগল। ঠিক তখুনি বাঁকের সামনের রাস্তা বিমূঢ় করা উজ্জ্বল আলোয় ঝলসে উঠল। ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক, যেন মঞ্চের মধ্যিখানে কেউ ওর কাপড় খুলে নিয়েছে।

বৃষ্টি-ভেজা নরম মাটিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল ও, শর্ষে ফুল দেখল চোখে। হামাগুড়ি দিয়ে গাছগুলোর দিকে এগোচ্ছে, ফোঁস ফোঁস করছে নাক। শার্টের ভেতর আবার শুরু হয়েছে রক্তপাত।

রাস্তার বিস্তৃতিটুকু সগর্জনে পেরিয়ে গেল পুলিস ভ্যান। কাদা, মাটি, আর ঘাসের সাথে মুখ সেঁটে পড়ে থাকল রানা। তিনশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে মাসেরাতি, দুটো চাকা এখনও রাস্তায়, বাকি দুটো রাস্তার পাশে মাটিতে। সর্বাঙ্গে আগুন নিয়ে ভালভাবেই জ্বলছে সেটা।

কোম্বি ভ্যান থামল, মাসেরাতির কাছ থেকে সশ্রদ্ধ একটা দূরত্ব রেখে। যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে গাড়িটা। সাদা ক্যাপ আর রেনকোট পরা পুলিসটা ভ্যান থেকে নেমে সামনের দিকে ছুটল। মাসেরাতির ক্যাবের ভেতর একবার উঁকি দিয়েই চিৎকার করে কিছু বলল সে। মনে হলো ভাষাটা ফরাসী, কিন্তু এত দূর থেকে পরিষ্কার শোনা গেল না।

দ্রুত একটা ইউ-টার্ন নিল কোম্বি, মাটিতে ঝাঁকি খেলো, তারপর ফিরে যেতে শুরু করল বাঁকের দিকে—ধীর গতিতে। ভ্যানের সামনে মেশিন পিস্তল হাতে সেই দু'জন লোক রয়েছে, চেইনের সাথে বাঁধা হাউন্ডের মত ছুটছে তারা, দু'জন রাস্তার দুই কিনারা ধরে। রাস্তার নরম কাঁধে রানাকে খুঁজছে তারা। সাদা ক্যাপ মাথায় পুলিসটা দাঁড়িয়ে রয়েছে ভ্যানের রানিংবোর্ডে, শিকারীদের নির্দেশ এবং উৎসাহ দিচ্ছে।

আবার দাঁড়াল রানা, কোমর ভাঁজ করে নিচু হয়ে দৌড়াল। যেমন করে হোক

জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে হবে ওকে। কাঁটাতারের বেড়ায় গোটা শরীর আছাড় খেলো। স্প্রিঙের মত আরেক ধাক্কা দিয়ে পিছন দিকে ছুঁড়ে দিল ওকে বেড়াটা, দড়াম করে চিত হয়ে পড়ে গেল রানা। কাঁটাতারে ছিঁড়ে গেছে ট্রাউজার, আওয়াজ শুনেছে ও। দুইশো সত্তর ডলার দিয়ে স্যাভিল রো থেকে তৈরি করা স্যুট বরবাদ হয়ে গেল, দুঃখের মধ্যেও মৃদু হেসে ভাবল ও। বিশ্রাম নিল না, হামাগুড়ি দিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকল। পিছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল। যাস্ শালা, মাটিতে পায়ের দাগ দেখে ফেলেছে!

তারপর আরেকটা আওয়াজ হলো, আগের চেয়ে জোরাল, উল্লাসে ভরপুর। মাসেরাতির আলোয় ধরা পড়ে গেছে রানা। চিৎকারের পরপরই অটোমেটিক ফায়ারের শব্দ হলো, কিন্তু শর্ট ব্যারেল আর লো ভেলোসিটি অ্যামুনিশনের জন্যে রেঞ্জটা খুব বেশি। বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর মত মৃদু আওয়াজ পেল রানা, মাথার দিকে অনেক ওপর থেকে। এতক্ষণে প্রথম সারির গাছগুলোর কাছে পৌঁছুল ও, একটার পিছনে দাঁড়িয়ে আড়াল নিল।

হাঁপাচ্ছে বটে, কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলতে কোন কষ্ট হচ্ছে না। ক্ষতটা মারাত্মক নয়, হলে এতক্ষণে দুর্বল হয়ে পড়ত শরীর।

এখান থেকে কাঁটাতারের বেড়া পঞ্চাশ মিটার, আন্দাজ করল রানা। কোবরার বাঁট ধরেছে দু'হাতে, অপেক্ষা করছে ওর মত কখন একই দুর্দশায় পড়ে লোকগুলো।

বেড়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে দু'জন ধরাশায়ী হলো, ব্যথা পেয়ে গালিগালাজ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। নিঃসন্দেহ হওয়া গেল, ভাষাটা ফরাসী। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, আগুনের আভায় দেহ-কাঠামোর কিনারা গোলাপী দেখাল। একজন মেশিন গানারের পেট লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল রানা।

তিনশো পঁচাশি ফুট পাউন্ড এনার্জি নিয়ে ছুটে গেল বুলেট, থ্যাচ করে একটা আওয়াজের সাথে ঢুকে গেল মাংস আর হাড়ের ভেতর। মাটি থেকে শূন্যে উঠে পড়ল লোকটা, ছিটকে পড়ল পিছন দিকে। পরবর্তী টার্গেটের দিকে কোবরার ব্যারেল ঘোরাল রানা, কিন্তু বাকিগুলো প্রফেশনাল। অপ্রত্যাশিত আক্রমণের মুখেও হতভম্ব হয়ে পড়েনি, সাথে সাথে অন্ধকার মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। দেখতে না পেলে গুলি করবে না রানা, অ্যামুনিশন কম।

ওদের একজন এক পশলা ব্রাশ ফায়ার করল, সামনের কয়েকটা গাছ থেকে ঝরে পড়ল ছাল, ডাল আর পাতা। মাজল্ ফ্ল্যাশ লক্ষ্য করে একবার গুলি করল রানা, তারপর মাথা নিচু করে জঙ্গলের ভেতর দিকে ছুটল। বেড়া টপকাতে এক কি দুই মিনিট লাগবে ওদের, এই সুযোগে খানিক দূর সরে যাওয়া দরকার।

জঙ্গলের মাথা আর মাসেরাতির মাঝখানে কোন আড়াল নেই, আগুনের ক্ষীণ আভায় অন্ধকার দূর না হলেও কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারল রানা। নাক বরাবর গেলেই নদী পড়বে। কিন্তু দু'তিন গজ এগোবার পরই কাঁপতে শুরু করল ও। বৃষ্টিতে, আর ভেজা ঝোপে ঝাড়ে ঘষা খেয়ে স্যুটটা সপ সপ করছে, জুতোর ভেতর কাদা-পানি ঢুকছে। ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে এই প্রথম বমি পেল রানার। পঞ্চাশ গজের মত এগিয়ে একবার করে থামল পিছনে পায়ের আওয়াজ

শোনার জন্যে। রাস্তার দিক থেকে একবার এঞ্জিনের আওয়াজ পেল, মনে হলো ফুল স্পীডে কোন প্রাইভেট কার ছুটে গেল। রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত পুলিস ভ্যান আর জ্বলন্ত মাসেরাতি দেখে কি মনে করবে আরোহীরা? আসল পুলিসকে খবর দেয়া হলেও, তারা এসে পৌঁছুবার আগেই যা ঘটার ঘটে যাবে। ওদিক থেকে কোন সাহায্যের সম্ভাবনা বাতিল করে দিল রানা।

পিছু নিয়ে কেউ আসছে না বুঝতে পেরে অবাক হলো রানা। কাত হয়ে পড়ে থাকা একটা ওক গাছ দেখে সিদ্ধান্ত নিল এখানে অপেক্ষা করা যেতে পারে। মোটা কাণ্ডের আড়ালে গা ঢাকা দিল ও, পিছনে খোলা পথ থাকল পালাবার।

শত্রুরা এখন তিনজন, আর কোবরায় বুলেট আছে সাতটা। ঠাণ্ডায় আর কাঁধের ব্যথায় আত্মবিশ্বাস শূন্যের কোঠায় নেমে আসতে চাইলেও নিজেকে এই বলে সাহস দেয়ার চেষ্টা করল রানা, এখনও তো বেঁচে আছি। গুলিটা যদি হৃৎপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে যেত, কি করার ছিল?

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল রানা, স্থিরভাবে শুয়ে আছে। প্রতিটি ইন্দ্রিয় সতর্ক, দু'হাতে কোবরার বাঁট ধরে সম্পূর্ণ তৈরি। টার্গেট দেখতে পেলেই গুলি করবে, তারপর বাঁয়ে বা ডানে গড়িয়ে দেবে শরীরটা।

আরও দশ মিনিট পেরোল। হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল রানা, ওরা আসবে না। ফাঁদটা পাতা হয়েছিল ব্যারনেস মিডো অটারম্যানের জন্যে। ভুলটা ওরা দেরিতে হলেও টের পেয়েছে–ফাঁদে ব্যারনেস নয়, একজন পুরুষ ধরা পড়তে যাচ্ছিল, তার ওপর সে সশস্ত্র। এতক্ষণে নিশ্চয়ই তারা ফিরে গেছে।

রানাকে ওরা ব্যারনেসের দেহরক্ষী বা কর্মচারী বলে ধরে নেবে। ব্যারনেসকে আটক করতে পারলে বিশ কি ত্রিশ মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ আদায় করা যেত, তার একজন কর্মচারীকে ধরে কোন লাভই হবে না।

তবু সাবধানের মার নেই, আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করল রানা। তারপর ধীরে ধীরে সিধে হলো ও, নদীর দিকে এগোল। মাসেরাতির আগুন বোধহয় নিভে এসেছে, কারণ মাথার ওপর আকাশ অন্ধকার দেখল রানা। স্মৃতির ওপর নির্ভর করে হাঁটছে, নদীর কাছে পৌঁছুতে চায়। জানে একা, তবু পঞ্চাশ ষাট গজ এগিয়ে একবার করে থেমে কান পাতল।

একসময় নদীর আওয়াজ পেল কানে। নাক বরাবর সামনে, খুব কাছে। হাঁটার গতি বাড়াল, অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে আরেকটু হলে পাড় থেকে পা পিছলে পানিতে পড়ে যাচ্ছিল। পাড়ে বসে একটু বিশ্রাম নিল, কাঁধের ব্যথাটা বাড়তে শুরু করল, ঠাণ্ডায় দুর্বল হয়ে পড়ছে।

সাঁতরে নদী পেরোবার কথা ভাবল রানা, কিন্তু উৎসাহ বোধ করল না। ক'দিন একনাগাড়ে বৃষ্টি হয়েছে, দ্রুতগতি পানির আওয়াজ শুনে স্রোতের টান আন্দাজ করা যায়। তাছাড়া, বরফের মত ঠাণ্ডা হবে পানি। হেঁটে পার হওয়া সম্ভব কিনা তাও জানা নেই, হয়তো কাঁধ পর্যন্ত ডুবে যাবে।

উজানের দিকে কয়েকশো গজ দূরে হবে ব্রিজটা, আন্দাজ করল রানা। শরীরের অবস্থা ভাল নয়, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। খানিকক্ষণ বসে থাকায় রক্ত চলাচল মন্থর হয়ে পড়েছে, আরও বেশি শীত করতে লাগল।

সতর্ক থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হলো রানাকে। পাড় ধরে হাঁটছে, পা ফেলছে অত্যন্ত সাবধানে। কোবরা ধরা ডান হাত শরীরের পাশে আড়ষ্টভাবে ঝুলছে। ঝির ঝির বৃষ্টিতে ঘন ঘন চোখ পিট পিট করছে ও।

গন্ধটা সতর্ক করল ওকে। মানুষের শরীরে তামাকের গন্ধ। মাত্র একবার পেলেও চিনতে ভুল করল না নাক। টার্কিশ তামাক, একদম পছন্দ করে না ও।

পা তুলতে গিয়ে স্থির হয়ে গেল শরীর, অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা হজম করার চেষ্টা করছে মাথা।

রাস্তার দিক থেকে গাড়ির আওয়াজ পেয়েছিল, মনে পড়ল রানার। যারা ভুয়া মোটর অ্যাক্সিডেন্টের ব্যবস্থা করতে পারে, পুলিস ভ্যান আর ইউনিফর্ম যোগাড় করতে পারে, তারা ফাঁদ পাতার আগে গোটা এলাকাটা জরিপ করেনি এ-কথা মনে করার কোন কারণ নেই। শিকার হাত ফস্কে গিয়ে কোথায় লুকাতে পারে, ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে। জানে, আহত হয়েছে রানা। খরস্রোতা নদী পেরোনো ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। কাজেই ওর জন্যে অপেক্ষা করছে তারা। নদীর পাড় আর ব্রিজের মাঝখানে। তারমানে ওটা প্রাইভেট কারের আওয়াজ ছিল না, ছিল কোম্বি ভ্যানের।

কিন্তু ওদের জেদ লক্ষ করে অস্বস্তিবোধ করছে রানা। ও যে ব্যারনেস নয়, ওরা জানে। হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত উপলব্ধি করল ও, ব্যারনেসকে নয়, ওকে মারার জন্যেই পাতা হয়েছে ফাঁদ। এলিসি প্রাসাদের কাছাকাছি গ্যারেজ থেকে অনুসরণ করা হয়েছে ওকে, ব্যারনেস বলে ভুল করার কোন কারণই ছিল না।

স্থির হয়ে যাওয়া পা আবার তুলল রানা, থেমে থাকল এক সেকেন্ড, প্রতিটি পেশী টান টান হয়ে আছে। এক পা এগিয়ে থামল আবার। কালো অন্ধকার রাত, নদীর ছলছল ধ্বনি সমস্ত আওয়াজকে চাপা দিয়ে রেখেছে। অপেক্ষা করছে রানা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকলে প্রতিদ্বন্দ্বী একটু নড়বেই। মাথায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি, কাঁধে ব্যথা, আর সারা শরীরে শীত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও।

শেষ পর্যন্ত লোকটাই নড়ল। পচ্ করে আওয়াজ হলো কাদায়, নাড়া খেয়ে সড় সড় আওয়াজ করল ঝোপ। তারপর আবার নিস্তব্ধতা। খুব কাছে লোকটা, দশ ফিটের মধ্যে, কিন্তু এতটুকু আলো নেই যে চোখ চলে। অত্যন্ত সাবধানে এক পা থেকে আরেক পায়ের ওপর শরীরের ভার চাপাল রানা, মুখ ঘোরাল আওয়াজের দিকে। পুরানো কৌশলটা হলো, আওয়াজ লক্ষ্য করে প্রথমে একটা গুলি করতে হবে, তারপর শত্রুর মাজ্ল্ ঝলসে উঠলে সেটা লক্ষ্য করে ছুঁড়তে হবে দ্বিতীয় গুলি, তবে তিনটে গুলির মাঝখানে সময়ের ব্যবধান হবে ন্যূনতম।

কিন্তু ঝুঁকিটা নিল না রানা। ওরা তিনজন, একজনকে যদি মারতেও পারে, বাকি থাকবে দু'জন। ওদের মেশিন পিস্তল একজন মানুষকে মাঝখান থেকে দু'ভাগ করে দিতে পারে। অপেক্ষা করাই ভাল।

উজানের দিক থেকে আবার এঞ্জিনের আওয়াজ পেল রানা। এবারও অস্পষ্ট, তবে মনে হলো দ্রুত এগিয়ে আসছে। সাথে সাথে কেউ একজন শিস দিল মৃদু-আগে থেকে ঠিক করা কোন সঙ্কেত। দড়াম করে বন্ধ হলো গাড়ির একটা দরজা, এঞ্জিনের এই শব্দটা আরও অনেক কাছে হলো, স্টার্ট নিল নতুন একটা।

অকস্মাৎ আলোকিত হয়ে উঠল বৃষ্টি আর জঙ্গল। সামনে আলোর বন্যা, চোখ পিট পিট করল রানা।

একশো গজ দূরে নদী পেরিয়েছে ব্রিজটা, খনি থেকে সদ্য তোলা কয়লার মত চকচক করছে নদীর কালো পানি।

ব্রিজের গোড়ায় নীল কোম্বি ভ্যানটা দাঁড়িয়ে আছে, বোঝাই যায় রানার জন্যে। তবে এই মুহূর্তে সচল হতে যাচ্ছে ওটা, সম্ভবত অন্য একটা গাড়ি আসছে বুঝতে পেরে ঘাবড়ে গেছে ওরা। এঞ্জিনের আওয়াজটা অত্যন্ত শক্তিশালী, লা পিয়েরে বেনিতের দিক থেকে আসছে।

ভ্যানের ড্রাইভার মেইন রোডের দিকে ফিরে যাচ্ছে। খোলা ডান দিকের দরজা লক্ষ্য করে লাফ দিল ভুয়া পুলিস। রানার অন্ধকার বাঁ দিক থেকে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল।

সঙ্গীরা ফেলে যাচ্ছে মনে করে চিৎকার করছে তৃতীয় লোকটা। ভ্যানের দিকে তেড়ে গেল সে, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে এতটুকু দ্বিধা করল না।

দূরত্ব মাত্র দশ ফিট, ব্যর্থ হবার কোন আশঙ্কা নেই। লোকটার শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে লক্ষ্যস্থির করে ট্রিগার টেনে দিয়েছিল, কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল রানা নিজেকে।

লোকটা ওর দিকে পিছন ফিরে রয়েছে, এই রেঞ্জ থেকে গুলি করা মানে সচেতন ভাবে খুন করা। শুধু এই নীতিবোধই একমাত্র কারণ নয়, গুলি না করার পিছনে একটা স্বার্থও রয়েছে রানার। সবাইকে পালাতে দেয়া যায় না, ওদের পরিচয় জানতে হবে ওকে। কে ওদের পাঠিয়েছে? কেন? কাকে ওরা মারতে এসেছিল?

ভ্যানের নিঃসঙ্গ হেডলাইট আগেই ঘুরে গিয়েছিল, ফলে ড্রাইভার তাদের সঙ্গীকে দেখতে পেল না। দুটো এঞ্জিনের আওয়াজে চিৎকারটাও চাপা পড়ে গেল। রানার সাথে রয়ে গেল লোকটা। ভ্যানের পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে স্পীড বেড়ে গেছে কোম্বির, এখন আর নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়।

রানাও ছুটল, আহত বাঁ হাতে রয়েছে কোবরা।

হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে যাবে লোকটা, তার পিঠের ওপর লাফ দিয়ে পড়ল রানা, অক্ষত ডান হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল গলা, একই সাথে বাঁ হাতের পিস্তল সজোরে নামিয়ে আনার চেষ্টা করল প্রতিপক্ষের খুলিতে।

বিড়ালের মত ক্ষিপ্র, সম্ভবত কাদায় রানার জুতোর আওয়াজ শুনে সাবধান হয়ে গিয়েছিল। বুকের মধ্যে চিবুক লুকাল সে, রানা তার গলাটা ভাল করে জড়িয়ে ধরার আগেই ঢালু করে দিল একদিকের কাঁধ, সেই সাথে আধ পাক ঘুরতে শুরু করল। তার কোমরের ধাক্কা খেয়ে তাল হারিয়ে ফেলল রানা, টের পেল ইস্পাতের মত শক্ত পেশীর লোকটা ওকে গা থেকে ছাড়াতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু ছাড়ল না রানা। ধস্তাধস্তি করতে করতে পিছু হটছে, কোন্ দিকে যাচ্ছে জানে না। লোকটার গলা থেকে হাত ছুটে গেছে ওর, নাগালের মধ্যে পেয়ে অগত্যা তার চুল ধরেছে মুঠোর ভেতর। রানাকে নিয়ে আছাড় খেলো লোকটা, রানার কানের পাশে ছলছল করছে নদী। ভাগ্যিস পাথরের বদলে মাটি রয়েছে

পাড়ে, তা না হলে লোকটার চাপে ভেঙে যেত খুলি।

নিজেকে ছাড়িয়ে দাঁড়াল বটে রানা কিন্তু পাড় থেকে পা পিছলে পড়ে গেল নদীতে। ধারাল কুড়োলের মত কোপ মারল হিম পানি, এক মুহূর্ত পর ঝপাৎ করে পানিতে পড়ল লোকটাও–শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে রানার পা ধরতে চেয়েছিল সে, পাড় থেকে খসে পড়েছে।

পানির মধ্যে আবার শুরু হলো ধস্তাধস্তি। ঠাণ্ডা পানি লোকটাকেও প্রায় অবশ করে ফেলেছে, মেশিন পিস্তলটা আগেই হারিয়েছে সে। হাত বাড়িয়ে তার গলা ধরতে চেষ্টা করল রানা। নাগাল পেয়ে কণ্ঠনালী চেপে ধরল। আতঙ্কে ছটফট করতে লাগল লোকটা, রানা তাকে পানির তলায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

লোকটার ওপর চড়াও হয়ে থাকল রানা, শ্বাস নিতে দেবে না। পানির ওপর হাত তুলে রানার চোখ খুঁজছে লোকটা। মুখ হাঁ করে মাথাটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা, প্রতিপক্ষের শক্ত আঙুলগুলো অনেকটা ভেতরে সেঁধিয়ে গেল, রানার জিভ ধরে টানছে, যেন ছিঁড়ে ফেলবে।

সাথে সাথে মুখ বন্ধ করল রানা, আঙুলগুলোর ওপর এত জোরে দাঁত বসাল যেন চোয়ালের হাড় ভেঙে যাবে। গরম রক্তে ভরে গেল মুখের ভেতরটা।

দাঁত আর হাত-পা দিয়ে লোকটাকে নিচের দিকে টানছে রানা। পানিতে পড়ার পরপরই অবশ আঙুল থেকে নিজের অস্ত্রটা হারিয়েছে ও। বাতাসহীন ফুসফুস আর দু'সারি দাঁতের মাঝখানে আঙুল নিয়ে বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল লোকটা। যতবারই রানার মুখ থেকে আঙুল বের করার চেষ্টা করল সে, রানার কানে মাংস ছেঁড়ার আওয়াজ ঢুকল। রক্তে মুখ ভর্তি হয়ে যাওয়ায় বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো ওর, বুজে আসছে গলা।

হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা বাদ দিয়ে মাটিতে পায়ের ধাক্কা দিয়ে পানির ওপর মাথা তুলতে চেষ্টা করল লোকটা। চোখের পানি নিয়ে ঝাপসাভাবে মাথার ওপর ব্রিজটাকে ঝুলে থাকতে দেখল রানা। নীল কোম্বি অদৃশ্য হয়েছে, তবে ব্রিজের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে ব্যারনেস লিনার মার্সিডিজ লিমুসিন। গাড়ির হেডলাইটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন লোক, ব্যারনেসের দেহরক্ষী। ব্রিজ রেইলের ওপর ঝুঁকে নদীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওরা। মুহূর্তের জন্যে ভয় হলো রানার, ওদের কেউ না এদিকে গুলি করে বসে। পরমুহূর্তে ব্রিজের কংক্রিট পিলারের সাথে ধাক্কা খেলো ওরা, এত জোরে যে পরস্পরের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে গেল দু'জনেই।

পিলারের সাথে মাথা ঠুকে গেল রানার, পিলার ধরে কোন রকমে পানির ওপর মাথা তুলে থাকল ও। স্রোত এখানে তীব্র, ওর প্রতিপক্ষ ছাড়া পেয়ে তাতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা টের পেয়ে পিলার ছেড়ে দিল রানা, এক হাত ব্যবহার করে সাঁতরাতে গিয়ে স্রোতের টানে পাড়ের দিকে সরে যাচ্ছে। মার্সিডিজের আলোয় ব্যারনেসের দেহরক্ষীদের দৌড়াতে দেখল ও, আরও অনেক সামনে রানার প্রতিপক্ষও পাড়ে উঠছে, তাকে ধরতে চাইছে ওরা।

'রিকো!' দেহরক্ষীদের মধ্যে যে আগে রয়েছে তার নাম ধরে ডাকল রানা। 'ওকে থামাও! পালাতে দিয়ো না!'

ব্রিজের সবটুকু না পেরিয়ে থামল রিকো, রেইল টপকে কিনারায় দাঁড়াল,

তারপর লাফ দিয়ে নামল পাড়ে।-

ক্লান্ত, অবসন্ন লোকটা হাঁটু পানিতে হাঁটছে, চুলে ঢাকা পড়ে আছে তার মুখ। নাভির কাছে দু'হাতে পিস্তল ধরে তাকে দেখেছ রিকো।

আচমকা রানা টের পেল কি ঘটতে যাচ্ছে। বমির ভাবটা চেপে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'না! রিকো, না! ওকে জ্যান্ত ধরো! মেরো না, রিকো!'

দেহরক্ষী শুনতে পেল না বা ওর কথা বুঝল না। মাজল্ থেকে বেরিয়ে আসা আগুনের ঝলক রিকো আর আততায়ীর মাঝখানে যেন একটা রক্ত-গোলাপী রশি টেনে দিল। বজ্রপাতের মত আওয়াজ হলো বিস্ফোরণের। আততায়ীর বুক আর পেটে বুলেট তো নয় যেন কাঠুরের কুঠার ঢুকল।

'না!' অসহায়ভাবে চিৎকার করছে রানা। 'ওহ খোদা, না!' হাতের ব্যথা ভুলে দ্রুত সাঁতার দিয়ে এগিয়ে এল ও, জড়িয়ে ধরল একটা লাশকে। এক হাতে টেনে লাশটাকে পাড়ে তুলে আনল ও। দেহরক্ষীরা সাহায্য করল ওকে।

দু'বার দাঁড়াবার চেষ্টা করে শক্তি পেল না রানা। রিকো ওর বগলের নিচে হাত দিয়ে খাড়া করল। কোমর ভাঁজ করে গল গল করে বমি করল রানা।

'রানা!' ব্রিজের ওপর থেকে উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

ডান হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছে চোখ তুলল রানা, নেশাখোর মাতালের মত লাগছে ওকে। ব্রিজ ধরে ছুটে আসছে ব্যারনেস লিনা। লম্বা পায়ে কালো বুট আর স্কি প্যান্ট পরে আছে। সন্ত্রস্ত চেহারা সাদা হয়ে আছে।

কোমর সিধে করে টলতে লাগল রানা। ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরল ব্যারনেস, সিধে হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

'রানা, ওহ্ গড! ডার্লিং, কি হয়েছে···'

লাশটাকে দেখাল রানা। 'কয়েকজন লোক নিয়ে তোমাকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল ও, কিন্তু লোক চিনতে ভুল করে ফেলে।'

লাশের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। পয়েন্ট তিনশো সাতান্ন ম্যাগনাম ব্যবহার করেছে রিকো, বুক আর পেট ধসে গেছে। মুখ ঘুরিয়ে নিল ব্যারনেস।

'ভাল দেখিয়েছ,' রিকোকে বলল রানা। 'ও আর মুখ খুলবে না।'

'আপনি তো, স্যার ওকে থামাতে বললেন,' পিস্তল রিলোড করতে করতে গম্ভীর সুরে বলল রিকো।

'ভাবছি যদি মারতে বলতাম তাহলে কি করতে তুমি।' রাগে, দুঃখে, অন্য দিকে তাকাল রানা। ক্ষতটা ব্যথা করে উঠল। বিকৃত হয়ে গেল চেহারা।

'আহত হয়েছ!' হঠাৎ বুঝতে পেরে আঁতকে উঠল ব্যারনেস লিনা। 'ওর ওদিকের হাতটা ধরো,' রিকোকে হুকুম করল সে। দু'জনের সাহায্যে ব্রিজের গোড়ায়, সেখান থেকে গাড়িতে উঠে এল রানা।

ভিজে আর ছেঁড়া কাপড় খুলে ফেলল ও, ক্যাবের আলোয় ক্ষতটা পরীক্ষা করে নিজের গায়ের উলেন শাল দিয়ে রানাকে ঢেকে দিল ব্যারনেস। ক্ষতটা থেকে এখন আর রক্ত পড়ছে না।

বুলেটের গর্তটা নীল হয়ে গেছে, শক্ত পেশী আর পাঁজরের মাঝখানে আটকে আছে বুলেট, বাইরে থেকে দেখা গেল। 'থ্যাঙ্ক গড!' ফিসফিস করে বলল

ব্যারনেস। 'এখুনি তোমাকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাব। রিকো, যত জোরে পারো চালাও।' পাশের ককটেল কেবিনেট খুলল সে, ক্রিস্টাল ডিক্যান্টার থেকে টামব্লার বের করে হুইস্কি ঢালল তাতে।

মুখে হুইস্কি নিয়ে কুলি করল রানা, তারপর দু'ঢোক গিলে ফেলল। একটু পরেই গরম হয়ে উঠল শরীর। 'কিভাবে আসা হলো তোমার?' জিজ্ঞেস করল ও।

'রবুইলে পুলিসকে কেউ একটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের খবর দেয়। মাসেরাতি ওদের চেনা গাড়ি, ইন্সপেক্টর লা পিয়েরে বেনিতে ফোন করে। আমি ধরে নিলাম...'

গেটের কাছে পৌঁছুল গাড়ি, সামনে মেইন রোড। রাস্তার ধারে মাসেরাতির অবশিষ্ট দুমড়েমুচড়ে পড়ে আছে, সেটাকে ঘিরে পাঁচ-সাত জন পুলিস অস্থিরভাবে ঘোরাফেরা করছে, যেন এরপর কি করতে হবে জানা নেই তাদের। গাড়ির গতি শ্লথ হলো, জানালা দিয়ে মুখ বের করে একজন সার্জেন্টের সাথে কথা বলল ব্যারনেস। সার্জেন্ট সমীহের সাথে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল। পুলিসরা সবাই স্যালুট করল ব্যারনেসকে। আবার স্পীড তুলল রিকো।

'শুধু ব্রিজের কাছে নয়,' বলল রানা, 'সম্ভবত জঙ্গলের কিনারাতেও একটা লাশ পাবে ওরা।'

'সত্যি তুমি যোগ্য লোক, তাই না?' পটলচেরা চোখ সরু করে ওর দিকে তাকাল ব্যারনেস।

'সত্যিকার যোগ্য লোকেরা আহত হয় না।' হাসল রানা, বেঁচে থাকার আনন্দ ফিরে পাচ্ছে আবার।

'মাসেরাতির ব্যাপারে তুমি তাহলে ঠিকই বলেছিলে–ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।'

'সেজন্যেই তো ওটাকে পুড়িয়ে ফেললাম,' বলল রানা, কিন্তু ওর হাসির কোন উত্তর দিল না ব্যারনেস।

রানার হাত চেপে ধরে, ওর অক্ষত কাঁধে মাথা রাখল ব্যারনেস। 'ওহ্ রানা, কি রকম লাগছিল আমার সে তুমি বুঝবে না! পুলিস জানাল, ড্রাইভার বেরোতে পারেনি, গাড়ির সাথে পুড়ে গেছে। মনে হলো...মনে হলো, আমার একটা অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। কি যেন একটা মরে গেল আমার ভেতরে। আমি আসতে চাইনি–কিন্তু ভাবলাম নিজের চোখে না দেখে বিশ্বাস করব না। ব্রিজে ওঠার পর রিকো বলল নদীতে তোমাকে সে চিনতে পারছে...' থরথর করে কেঁপে উঠল সে। 'সব আমাকে বলো, কি ঘটেছে বলো আমাকে সব।' রানার টামব্লারে আরও হুইস্কি ঢালল সে।

কি কারণে রানা নিজেও ভাল জানে না, সিট্রনের কথাটা চেপে গেল ও। নিজেকে যুক্তি দিল, সিট্রনের সাথে ফাঁদের কোন সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। কারণ সিট্রনের ড্রাইভার ফোন করে ভুয়া পুলিসকে জানিয়ে দিতে পারত মাসেরাতিতে ব্যারনেস অটারম্যান নেই। তারমানে সিট্রনের সাথে ফাঁদের সম্পর্ক থাকলে বিশ্বাস করে নিতে হয় তারা ব্যারনেসকে নয়, ওকেই খুন বা কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। মাত্র আজ

সকালে নিজেকে টোপ হিসেবে বাজারে ছেড়েছে রানা, এত তাড়াতাড়ি সেটা গিলতে পারে না প্রতিপক্ষ। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে, এসব নিয়ে পরে চিন্তাভাবনা করা যাবে। তার আগে পর্যন্ত ওকে বিশ্বাস করতে হবে, ফাঁদটা ব্যারনেসের জন্যেই পাতা হয়েছিল, কিন্তু জালে ধরা পড়ে যাচ্ছিল ও।

মন দিয়ে রানার কথাগুলো শুনল ব্যারনেস লিনা। রানার মাথায়, মুখে, আর বুকে হাত বুলিয়ে দিল সে।

রেডিওতে আগেই খবর পাঠিয়েছিল পুলিস, হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে ঢোকার মুখে একজন ডাক্তার আর দু'জন নার্স অপেক্ষা করছিল রানার জন্যে। থিয়েটার ট্রলিতে শুয়ে পড়ল রানা। ইমার্জেন্সীতে ঢোকার আগে, দরজায় হাত রেখে বাধা দিল ব্যারনেস। রানার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে, চুমো খেলো ঠোঁটে। 'আমার জীবনে এখনও তুমি আছ, ঈশ্বরের প্রতি সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, রানা।' রানার কানের লতিতে ঠোঁট ছোঁয়াল সে। 'আবার খলিফা, তাই না?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এ-ধরনের প্রফেশনাল কাজ আর কার দ্বারা সম্ভব জানি না।'

অপারেশন থিয়েটারের দরজা পর্যন্ত ট্রলির সাথে হেঁটে এল ব্যারনেস, তারপর আবার একবার রানার কপালে চুমো খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে রানা, ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পাশে দাঁড়িয়ে আছে ব্যারনেস, বেডের আরেক পাশে ডাক্তার। কেবিনে দু'জন নার্সও রয়েছে, দরজার কাছে।

জাদু দেখাবার ভঙ্গিতে মুঠো খুলল ডাক্তার। 'কাটাছেঁড়া করতে হয়নি, খুঁচিয়েই বের করে এনেছি।' রানাকে বুলেটটা দেখিয়ে বলল সে। 'আপনি খুব ভাগ্যবান মানুষ। রেসের ঘোড়ার মত পেশী বেশি ভেতরে ঢুকতে দেয়নি বুলেটটাকে। খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন।'

'কথা দিয়েছি আমি তোমার দেখাশোনা করব, কাজেই তোমাকে উনি ছেড়ে দেবেন,' ব্যারনেস লিনা বলল। 'কি, দেবেন না, ডাক্তার?'

'আপনার কপালে জুটল দুনিয়ার সেরা সুন্দরী নার্সদের একজন,' রানাকে কথাটা বলে, ভক্তির সাথে ব্যারনেসের উদ্দেশে বাউ করল ডাক্তার।

ডাক্তারের কথাই ঠিক, বুলেটের ক্ষতের চেয়ে কাঁটাতারে ছেঁড়া উরুর ক্ষতটা বেশি ভোগাল রানাকে, কিন্তু ব্যারনেস লিনা এমন আচরণ করতে লাগল রানা যেন দুরারোগ্য কোন ব্যাধিতে ভুগছে, যমে-মানুষে টানাটানি হচ্ছে ওকে নিয়ে। পরদিন বুলেভার্ড দে কাপুসিন, অফিস হেডকোয়ার্টারে জরুরী কাজ থাকায় যেতে হলো তাকে, সেখান থেকে ফোন করল সাত বার, শুধু রানা বেঁচে আছে কিনা জানার জন্যে। ওর জুতো ও কাপড়ের মাপও অবশ্য জেনে নিল। দিনের আলো ফুরাল না, তার আগেই লা পিয়েরে বেনিতে ফিরে এল সে।

মেইন গেস্ট স্যুইটে বসে ছিল রানা, এখান থেকে টেরেস সহ লন আর কৃত্রিম হ্রদটা দেখা যায়। 'এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে?'

'তুমি খুশি হওনি?' বলেই চোখে দুষ্টু ভাব নিয়ে হাসল ব্যারনেস। 'নিষ্ঠুর বা অন্য কিছু ভেবো না–ঘটনাটা ঘটার দরকার ছিল। তোমার কাছে থাকার, আরও

ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়ে গেছি আমি। কাল আমি সারাদিন তোমার সাথে থাকব।'

'সেবা-যত্নে ভাটা পড়লে কি চাইতে হবে জানা হয়ে যাচ্ছে আমার,' বলল রানা। 'খলিফা আবার একটা গুলি ছুঁড়লে যত্ন বেড়ে যাবে, তাই না?'

প্রায় ছুটে এসে রানার ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল ব্যারনেস। 'শেরি, অমন অলক্ষুণে কথা ভুলেও মুখে আনবে না।' শুধু ভয় নয়, বিষাদের কালো ছায়া পড়ল তার চেহারায়। তারপরই তার মুখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল ফুলের মত হাসি। 'দেখো কি এনেছি তোমার জন্যে।'

রানার ব্রীফকেসটা মাসেরাতির ট্রাঙ্কে রয়ে গিয়েছিল, সেটার বদলে কুমীরের কালো চামড়া দিয়ে তৈরি একটা ব্যাগ নিয়ে এসেছে ব্যারনেস। প্যারিসের অভিজাত অনেকগুলো দোকানে ঢুঁ মেরে এটা-সেটা কিনে ভরেছে ওটায়। 'ভুলেই গিয়েছিলাম প্রিয় কারও জন্যে উপহার কিনতে কি মজা লাগে-,' কথা শেষ না করে হাত দিয়ে তুলে সিল্ক ব্রোকেডের একটা ড্রেসিং গাউন দেখাল রানাকে। 'এটা বাছার সময় সেন্ট লরেন্টের সবাই বুঝে নিয়েছে কি ভাবছিলাম আমি···'

কিছুই ভোলেনি ব্যারনেস। শেভিং গিয়ার, সিল্কের রুমাল আর আন্ডারঅয়্যার, নীল একটা ব্লেজার, স্ল্যাকস আর জুতো, এমনকি সোনার কাফলিঙ্ক পর্যন্ত বাদ যায়নি। 'তোমার চোখে ও কিসের হাসি?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আবার বলল, 'ডিনারের জন্যে রেসপেক্টেবল হয়ে আসি। জেমকে বলেছি, এখানেই খাব আমরা। আজ অন্য কোন গেস্ট নেই।'

গানমেটাল বিজনেস স্যুট, আর সিল্কের পাগড়ি পরে ফিরে এল ব্যারনেস। চুল কোমর ছাড়িয়ে নেমে এসেছে, পোশাকের চেয়ে বেশি চকচকে। 'শ্যাম্পেনের বোতল কিন্তু আমি খুলব,' বলল সে। 'দু'হাত দরকার।'

রানা পরেছে ব্রোকেড গাউনটা, বাঁ হাত এখনও স্লিঙের সাথে ঝুলছে। শ্যাম্পেন ভরা গ্লাসের কিনারা দিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। 'আমার ধারণাই ঠিক, তোমার রঙ ব্লু। নীল তোমার বেশি বেশি পরা উচিত।' রানার গ্লাসের সাথে নিজের গ্লাসটা ছোঁয়াল সে, মাত্র একবার চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল। ভাবগম্ভীর হয়ে উঠল চেহারা।

'সুরেত-এ আমার বন্ধু আছে, ওদের সাথে কথা বলেছি আমি। ওদেরও ধারণা, আমাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টাই ছিল ওটা। তুমি সুস্থ হও, তারপর একটা স্টেটমেন্ট দেবে-আমার অনুরোধে অপেক্ষা করতে রাজি হয়েছে ওরা। কাল ওরা একজন লোক পাঠাবে; জঙ্গলের কিনারায় দ্বিতীয় লোককে ওরা পায়নি। হয় হেঁটে চলে গেছে, নয়তো তার লোকেরা গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে।'

'অপর লোকটা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'যে মারা গেছে?'

'তাকে ওরা ভাল করে চেনে, জঘন্য একটা লোক। আলজেরিয়ান, প্রফেশনাল কিডন্যাপার এবং মার্ডারার। চেষ্টা করেও সে তোমাকে মারতে পারেনি, সুরেত-এর ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি ওদেরকে তোমার আসল পরিচয় জানাইনি। ভাল করেছি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সাথে যখন এভাবে থাকি, ভুলে যাই যে তুমিও বিপজ্জনক একটা মানুষ।' রানার চেহারায় কি যেন খুঁজল ব্যারনেস। 'তুমি বিপজ্জনক সেজন্যেই কি তোমার প্রতি এতটা আকর্ষণ আমার? তুমি কাছে না থাকলে কেন আমি কাতর হয়ে পড়ি?' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তুমি ভদ্র, তোমার ব্যবহার কি সুন্দর। কিন্তু কখনও কখনও তোমার হাসির মধ্যে কি যেন একটা থাকে, কখনও কখনও তোমার চোখে জ্বলে ওঠে ঠাণ্ডা একটা আলো, কঠিন আর নিষ্ঠুর। তখন আমার মনে পড়ে অনেক, অনেক লোককে খুন করেছ তুমি। তোমার কি মনে হয়, এরজন্যেই তোমাকে এত ভাল লাগে আমার? সেজন্যেই কি এই টান?'

'অন্য কোন কারণ থাকলে ভাল হয়।'

'রক্ত আর জখম, ধ্বংস আর বিপর্যয় দেখে উত্তেজিত বোধ করে অনেকে–তারা বুল ফাইট আর বক্সিং দেখতে যায়–তাদের চেহারা লক্ষ্য করেছি আমি। নিজের কথা ভেবেছি, আমি কি তাদের একজন? জানি না, রানা। শুধু জানি শক্তিশালী আর কঠিন পুরুষ আমাকে টানে। অটারম্যান সেরকম একজন লোক ছিল। সে চলে যাবার পর আমার জীবনে আর একজন সেরকম লোক তুমি। আজ পর্যন্ত আর কাউকে দেখিনি।'

'নিষ্ঠুরতা শক্তি নয়,' ব্যারনেসকে বলল রানা।

'না, সত্যিকার একজন শক্তিশালী মানুষের মধ্যে কোমলতা আর আবেগ থাকবে। তুমি শক্ত অথচ যখন ভালবাস এত নরম হতে পারো। কিন্তু নরম হলেও তোমার ভেতর কাঠিন্য আর নিষ্ঠুরতা আছে, টের পাই আমি।' রানার পাশ থেকে সরে গিয়ে সোনালি আর ক্রীম কালারে সাজানো ঘরের চারদিকে হাঁটতে লাগল সে। একবার থেমে দেয়ালের পর্দা সরিয়ে বেল বাজাল।

ডিনার ট্রলি নিয়ে ভেতরে ঢুকল লোকজন, নেতৃত্ব দিচ্ছে জেম। জেম নিজের হাতে ওয়াইন গ্লাস ভরল, সাদা গ্লাভস পরে আছে সে। তার লোকেরা চলে যাবার পর দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে, নিজের হাতে পরিবেশন করতে চায়। কিন্তু হাত নেড়ে তাকে বিদায় করে দিল ব্যারনেস।

মোটা প্যাড আকৃতির একটা উপহার রয়েছে টেবিলে, লাল আর সোনালি কাগজে মোড়া। নীল কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে তাতে লেখা রয়েছে, 'প্রিয় ব্যক্তিত্ব মাসুদ রানাকে।' নিচে ব্যারনেস লিনা অটারম্যানের সই।

'উপহার একবার কেনা শুরু করলে আমার আর হুঁশ থাকে না,' বলল ব্যারনেস। 'কিন্তু এবার আমি ভাবলাম, ওই বুলেটটা আমার পিঠেও ঢুকতে পারত।' হঠাৎ অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সে। 'ওটা তুমি খুলবে!'

সাবধানে খুলল রানা, তারপর স্থির হয়ে গেল।

ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে আছে ব্যারনেস, কি যেন খুঁজছে রানার চোখে। 'তুমি খুশি হওনি?'

উপহার নয়, ডকুমেন্টস। মিডো ইন্ডাস্ট্রির দুই পার্সেন্ট শেয়ার লিখে দেয়া হয়েছে রানার নামে। মোটামুটি আন্দাজ করা একটা লভ্যাংশের হিসেবও রয়েছে সাথে–বছরে পাঁচ মিলিয়ন ডলারের মত পাবে রানা। 'লিনা, এ কি ব্যাপার!'

'ভেবো না শুধু ঋণ শোধ করছি,' বলল ব্যারনেস। 'তোমাকে নিজের কাছে

রাখার একটা ষড়যন্ত্রও বলতে পারো। এই শেয়ার তুমি বিক্রি করতে পারবে না, আগামী দু'বছর। ততদিনে প্রেমের আরও কিছু অস্ত্র ব্যবহার করব আমি, যাতে কোনদিন ফাঁদ গলে বেরিয়ে যেতে না পারো।'

'কিন্তু লিনা, এ তুমি কি করছ!' এখনও নিজের চোখ বা কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। গোটা ব্যাপারটা অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে।

'আমি ভেবেছিলাম যতটা না অবাক হবে তারচেয়ে বেশি খুশি হবে তুমি,' মুখ ভার করে বলল ব্যারনেস। 'আমি তোমার মুখে হাসি দেখতে চেয়েছিলাম।'

হাসল রানা, কিন্তু আড়ষ্ট, 'কিন্তু...'

মুখ নিচু করে খেতে শুরু করল ব্যারনেস, রানার কথা যেন শুনতে চায় না। খাওয়ার সময় কেউ আর কোন কথা বলল না। জেম এসে টেবিল পরিষ্কার করল, ট্রলি নিয়ে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। ফায়ার প্লেসের সামনে পাশাপাশি সোফায় বসল ওরা, হাতে কফির কাপ।

'রানা,' ব্যারনেস লিনাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'আজ আমি তিনজনের কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না; তুমি, আমি, আর খলিফা। তুমি পাশে আছ, কাজেই আমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই–তবু আমি ভয় পাচ্ছি। অটারম্যানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। হিংস্র পশুর ওপরও মানুষ ওরকম নির্যাতন চালায় না...'

ব্যারনেস লিনার হাতে হাত রেখে মৃদু চাপ দিল রানা।

'আমার একটা দ্বীপ আছে,' হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল ব্যারনেস। 'একটা নয়, অনেকগুলো–ছোট ছোট নয়টা। ওগুলোর মাঝখানে আছে নয় কিলোমিটার চওড়া একটা লেগুন। এত স্বচ্ছ তার পানি পঞ্চাশ ফিট নিচেও মাছ দেখতে পাবে তুমি। বড় দ্বীপটায় আছে এয়ারস্ট্রিপ, তাহিতি থেকে প্লেনে মাত্র দু'ঘন্টার পথ। ওখানে আমরা আছি কেউ জানতে পারবে না। সারাদিন আমরা সাঁতার কাটতে পারি, হাত ধরাধরি করে হাঁটতে পারি বালির ওপর, আকাশ ভরা মিটিমিটি তারার নিচে ভালবাসতে পারি। তুমি হতে পারো মাটির পৃথিবীতে প্রথম পুরুষ, আদম; আমি হতে পারি প্রথম নারী, ইভ। আমার মত বা আমার চেয়ে ভাল কাউকে ব্যবসার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়তে পরি আমরা। ওখানে শান্তির নীড় বাঁধতে পারি। কোন বিপদ নেই। ভয় নেই। খলিফা নেই। নেই...,' হঠাৎ থেমে গেল সে, যেন শেষ কথাটা ভুল করে বলে ফেলছিল। 'যাবে, রানা? পালাবে আমার সাথে?'

'স্বপ্নটা লোভনীয়,' বিষণ্ণ সুরে বলল রানা।

'চিরকাল ওখানেই থেকে যাব আমরা, তোমাকে নিয়ে সুখী হব আমি। আমি জানি সুখী হতে পারব আমরা।'

কথা না বলে ব্যারনেসের চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকল রানা, যতক্ষণ না ব্যারনেস দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ নিচু করল।

'উঁহু, না।' রানার মনের ভাব বুঝতে পেরে সমর্থন করল ব্যারনেস। 'তা হবার নয়। এই জীবনযাপন কেউই আমরা ছাড়তে পারব না। কিন্তু রানা, আমার বড় ভয় হয়...'

'...?' রানা মুখ তুলে তাকাল, চোখে প্রশ্ন।

'ভয় হয়, কারণ তোমার সম্পর্কে অনেক কথা জানি আমি, ভয় হয় কারণ তোমার সম্পর্কে অনেক কথা জানি না। ভয় হয় কারণ আমার সম্পর্কে অনেক কথা জানো না তুমি, এবং সে-সব কথা কোনদিন আমি তোমাকে বলতেও পারব না। তুমি ঠিকই ভাবছ–খলিফাকে খুঁজে বের করতে হবে, তারপর তাকে ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু, হে ঈশ্বর, আমরা যেন নিজেদের ধ্বংস না করি। এইটুকুই আমার প্রার্থনা, এই সুখ আমরা যেন হারিয়ে না ফেলি।'

'ভাবাবেগ একটা ব্যাধি, তবে সারাবার সবচেয়ে বড় দাওয়াই বিষয়টা নিয়ে কথা বলা।'

'বেশ, এসো তাহলে হেঁয়ালি দিয়ে শুরু করা যাক। প্রথমে আমার পালা। একটা মেয়ের সবচেয়ে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা কি হতে পারে?'

'আমি হার মানলাম।'

'শীতের রাতে একা ঘুমানো।'

'উদ্ধার পাবার উপায় হাতের কাছেই রয়েছে,' আশ্বস্ত করল রানা।

'কিন্তু তোমার বেচারা কাঁধ রাজি হবে কি?'

'আমাদের বিপুল জ্ঞান, বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা যদি এক করি, আমার মনে হয় নিশ্চয়ই একটা কৌশল বেরিয়ে আসবে।'

'আমার ধারণা, বরাবরের মত,' রানার গায়ে ঢলে পড়ে বলল ব্যারনেস লিনা, 'তুমি ঠিকই বলছ।'

চোদ্দ

মিডো-র শীলের কাজ নিয়ে গতকাল বিকেলে লন্ডনে এসেছে রানা। রাতে হোটেল হিলটনে ওর সাথে কথা বলেছে সোহেল আহমেদ। বন্ধুর সাথে বন্ধু দেখা করতে চায়, অফিশিয়াল কোন ব্যাপার নয়। কিছু না ভেবেই গগলের বাড়িতে তাকে আসতে বলে দিয়েছে রানা।

গগলের বান্ধবী ডোরার জন্যে কিছু প্রেজেন্টেশন কিনতে বেরিয়েছে ও, একেবারে খালি হাতে যাওয়া কেমন যেন বেমানান দেখায়। এক দোকান থেকে আরেক দোকানে যাচ্ছে ও, কিন্তু ঠিক যেন মনের মত জিনিসটা পাচ্ছে না। আয়নায় চোখ রেখে পিছনটা দেখে নিল, একই চেহারা, এবার নিয়ে আজ সাতবার। আছে লোকটা।

হাতঘড়ি দেখল রানা। পালা বদলের সময় হয়ে এসেছে, নতুন লোক আসবে। কাল হিথরো এয়ারপোর্টে নামার পর থেকে ওর ওপর নজর রাখছে ওরা। প্রতি পাঁচ ঘণ্টা পরপর পালা বদল।

কুমীরের চামড়া দিয়ে তৈরি একটা হ্যান্ডব্যাগ কিনল রানা, দাম দেয়ার সময় আয়নায় দেখল স্টোর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে লোকটা। নতুন লোকটাকে চিনতে

একটু সময় লাগবে। কারা হতে পারে ওরা কোন ধারণা নেই ওর। সাথে কোন অস্ত্র না থাকায় অস্বস্তি বোধ করছে।

নতুন লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল রানা। পরনে টুইডের স্পোর্টস জ্যাকেট। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে।

'সান অভ এ গান! দিস ইজ এ সারপ্রাইজ!' রানার সামনে এসে বাউ করল কার্ল রবসন। 'কেমন আছ, বস্?'

ক্ষীণ একটু স্বস্তিবোধ করল রানা, শেষ পর্যন্ত জানা গেল কারা ওরা। 'সারপ্রাইজই বটে। তোমার গরিলাদের সাথে কাল বিকেল থেকে ধাক্কা খাচ্ছি আমি।'

'আরে ছাড়ো ওদের কথা।' রানার হাতের দিকে তাকাল রবসন। 'ওটা কি? লেডিস ব্যাগ? মাই গড, বস্, এরই মধ্যে ফাঁসিয়ে ফেলেছ একটাকে?'

'ফাঁসিয়েছি না ফেঁসে গেছি জানি না,' বলল রানা। 'তবে এটা তার জন্যে নয়। আমার বন্ধুর বউয়ের জন্যে।' ইতিমধ্যে রানা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে গগলের বাড়িতে যাবে না, তারমানে সোহেল ওর দেখা না পেয়ে ফিরে যাবে। কিংবা হয়তো আবার টেলিফোন করবে হিলটনে।

হিলটনে রানার স্যুইটে ঢুকে চারদিকে তাকাল রবসন। 'একেই বলে বেঁচে থাকা। সত্যি খুব সুখে আছ, বস্।' রানার হাত থেকে হুইস্কির গ্লাস নিল সে। 'আমাকে অভিনন্দন জানাবে না?'

'সানন্দে।' নিজের গ্লাস নিয়ে জানালার সামনে চলে এল রানা। বিকেলের রোদে পার্কে হাঁটাহাঁটি করছে লোকজন। 'কি করেছ তুমি?'

'ভান কোরো না তো, বস্! শার্ক...তুমি চলে আসার পর ওরা আমাকে তোমার কাজটা দিয়েছে।'

'ওরা আমাকে বিদায় করে দেয়ার পর।'

'তুমি চলে আসার পর,' জোর দিয়ে আবার বলল রবসন। ঢকঢক করে দুঢোক হুইস্কি খেলো সে। 'এ-কথা ঠিক যে অনেক জিনিসই আমরা বুঝি না-আওয়ারস নট টু রিজন হোয়াই, আওয়ারস বাট টু ডু অ্যান্ড ডাই-শেক্সপীয়ার।'

রানার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলেও পিছন থেকে রবসন তা দেখতে পেল না।

'এখন, এখানে তুমি অনেক ভাল আছ, বস্। সবাই জানে, শার্কে তোমার মেধা অপচয় হচ্ছিল। তাছাড়া, দু'হাতে টাকা কামানো চাই, তবে না পুরুষমানুষ!'

'তুমি খুব ভাল করেই জানো মিডোতে চাকরি করছি আমি।'

'মিডোতে, বস্? তুমি মিডোতে আছ? গুড গড, এরচেয়ে ভাল খবর আর কি হতে পারে!'

জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা। 'কে তোমাকে পাঠিয়েছে, কার্ল?'

'মানে? কি বলছ, বস্!'

'এটা মাত্র শুরু।'

'কেন কেউ আমাকে পাঠাতে যাবে? প্রাক্তন বসের সাথে আমি দেখা করতে

পারি না?'
'উনি বোধহয় ভয় করছেন আবার আমি কার না কার ঘাড় মটকাই, তাই না?'
'তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, বস্। মনের টান আছে বলেই না চলে এলাম...'
'মেসেজটা কি, কার্ল?'
'কংগ্রাচুলেশন্স, বস্। তুমি একটা রিটার্ন টিকেট জিতেছ।'
দ্রুত কাজ করছে রানার মাথা। কোথায় যেতে হবে আন্দাজ করতে পারল ও। মনের কাছ থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে, যাওয়া দরকার। কাদা আর ঘোলা পানি থেকে কি যেন একটা উঠে আসতে চাইছে, সুতোর অদৃশ্য প্রান্তটা এবার বোধহয় পাওয়া যাবে। শিকারে নেমেছে ও, এই খবরটা বাতাসে ছড়িয়ে দেয়ার পর এ-ধরনের কিছু একটা ঘটবে বলেই আশা করছিল।
হৃৎপিণ্ডের ওপর একটা হাত রেখে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠল রবসন, 'নিউ ইয়র্ক, নিউ ইয়র্ক, ইট'স আ ওয়ান্ডারফুল টাউন!'
'কখন?'
'কেন বলিনি, এই মুহূর্তে ক্রয়ডনে একটা এয়ারফোর্স জেট অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে?'
'কিন্তু আমার বন্ধু সোহেল...'
'জানি, মি. ভিনসেন্ট গগলের বাড়িতে তার সাথে তোমার দেখা হওয়ার কথা। দুঃখিত, বস্—আড়ি পেতে তোমাদের কথা শুনে ফেলেছি আমরা। মি. সোহেল আহমেদকে মেসেজ পাঠিয়েছি জরুরী একটা কাজে তুমি ব্যস্ত থাকবে, তাই দেখা হবে না...'
রেগে গেলেও কিছু বলল না রানা। ওর চেহারা দেখেও কিছু বোঝা গেল না।

দাবা খেলে আটলান্টিক পাড়ি দিল ওরা। ঠোঁটের কোণে চুরুট রেখে সারাক্ষণ বক বক করে গেল রবসন—নতুন দায়িত্ব কেমন লাগছে, ট্রেনিঙের সময় মজার কি কি ঘটেছে, দু'জনেই যাদের চেনে তাদের এখনকার খবর, সবই জানাল সে। তবে রানার নতুন চাকরি বা মিডো সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করল না। কথার ফাঁকে এক সময় শুধু বলল, আগামী সোমবারে রানাকে লন্ডনে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে সে, তার জানা আছে মিডো-র প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকটা মীটিঙে বসতে হবে রানাকে। কথাটা ইচ্ছা করেই বলল রবসন, বোঝাতে চাইল ওরা রানা এবং তার বর্তমান তৎপরতা সম্পর্কে কতটুকু কি জানে।
মাঝরাতের খানিক পর কেনেডি এয়ারপোর্টে নামল ওরা. একজন আর্মি ড্রাইভার অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে, হাওয়ার্ড জনসনে এয়ারফোর্সের একটা অফিসে ছয় ঘণ্টা ঘুমাবে ওরা।
সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট সারার পরও চোখ থেকে ঘুম ঘুম ভাবটা যেতে চায় না, তাই আরেক কাপ কফি খেলো রানা। নিজে একটা চুরুট ধরিয়ে রানাকে সাধল রবসন, মাথা নাড়ল রানা, তারচেয়ে বিষ খেয়ে মরে যাবে। বাইরে এসে আবার ক্যাডিলাকে চড়ল ওরা, কালকের সেই ড্রাইভারই নিয়ে যাচ্ছে ওদের। ফিফথ আর ওয়ান হানড্রেড ইলেভেন্থ স্ট্রীট-এর চৌরাস্তা হয়ে দক্ষিণ দিকে এগোল

ক্যাডিলাক, মেট্রোপলিটান আর্ট মিউজিয়ামের পাশ ঘেঁষে খানিক দূর এগিয়ে একটা পার্কিং গ্যারেজের বিশাল হাঁ করা মুখের ভেতর ঢুকে পড়ল। গেটে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে, রেসিডেন্টস ওনলি। ইলেকট্রনিক-নিয়ন্ত্রিত গেট, গার্ড কাম অপারেটর হাত নেড়ে ওদেরকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিল। পথ দেখিয়ে সার সার এলিভেটরের সামনে রানাকে নিয়ে এল রবসন, একটায় চড়ে টপ ফ্লোরে উঠে এল ওরা।

প্রকাণ্ড রিসেপশন হলে বেরিয়ে এল রানা, মিলিটারি পুলিসের ইউনিফর্ম পরা একজন গার্ড রবসনের শার্ক আইডেনটিটি কার্ড চেক করল। খাতায় ওদের দু'জনেরই নাম লিখল সে।

অ্যাপার্টমেন্টটা গোটা টপ ফ্লোর জুড়ে, ফ্লোরের চারদিকে কাঁচ মোড়া ঝুলন্ত বাগান। বাগানে দাঁড়ালে মনে হবে মহাশূন্যে দাঁড়িয়ে আছি, আকাশ ছোঁয়া প্যান অ্যাম আর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বিল্ডিং খুব কাছে, সেগুলো আরও উঁচুতে উঠে যেন মেঘের রাজ্যে হারিয়ে গেছে।

এর আগেও এখানে একবার এসেছে রানা, দেয়ালে ঝোলানো শিল্পকর্মগুলোর সাথে পরিচয় আছে। প্রতিটি দেয়ালের নিচের অর্ধেক সিল্কের পর্দা দিয়ে ঢাকা। কামরাগুলো প্রশস্ত, প্রতিটি কোণে কাঁচের ভেতর পাতাবাহার বা ফুল গাছ। সাদা ওকের একটা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রবসন, তার আগে কলিংবেলের বোতামে চাপ দিয়ে নিয়েছে। লম্বা একটা কামরা, পারশিয়ান কার্পেটে মোড়া মেঝে। বুকশেলফ আর ডেস্ক ছাড়াও ভেতরে রয়েছে বড়সড় একটা কনসার্ট পিয়ানো। আরেক প্রান্তে একটা হাই ফাই টার্নটেবল আর লাউডস্পীকার।

ড. এডওয়ার্ড ওয়ার্নার দাঁড়িয়ে আছেন পিয়ানোর পাশে, বীরপুরুষের চেহারা নিয়ে। প্রায় ছ'ফিট লম্বা তিনি, শরীরের তুলনায় কাঁধ দুটো একটু যেন বেশি চওড়া, লম্বা গলায় বসানো প্রকাণ্ড মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে। তাঁর চেহারায় পবিত্র একটা আলো ফুটে আছে, চোখ দুটো আধবোজা, যেন ধ্যানমগ্ন। যন্ত্রসঙ্গীতের সুর মূর্ছনায় দ্রুতগতি একটা আবহের সৃষ্টি হয়েছে, যেন প্রবল ঝড়ে নুয়ে নুয়ে পড়ছে বনভূমি। ভেতরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা আর রবসন, কারণ মনে হলো ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত মুহূর্তে নাক গলানো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তিনি ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন। থরথর করে কেঁপে উঠলেন, যেন সঙ্গীতের প্রভাব থেকে জোর করে মুক্ত করলেন নিজেকে।

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

'মেজর মাসুদ রানা,' ড. ওয়ার্নার অভ্যর্থনা জানালেন ওকে। 'নাকি আমি তোমাকে রানা বলে ডাকব?'

'মি. রানা উইল ডু ভেরি নাইসলি,' বলল রানা, সাথে সাথে বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মৃদু কাঁধ ঝাঁকালেন ড. ওয়ার্নার, করমর্দনের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে না দিয়ে লেদার কাউচের দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'শেষ পর্যন্ত তুমি এলে,' রানা বসার পর বললেন আবার। 'একবারের ডাকে আসবে কিনা সন্দেহ ছিল আমার–সন্দেহ না বলে কৌতূহল ছিল বলা উচিত।' হাসলেন তিনি। 'ব্রেকফাস্ট করেছ?'

'করেছি,' বলল রবসন, রানা শুধু মাথা ঝাঁকাল।

'তাহলে কফি,' বললেন ড. ওয়ার্নার, ইন্টারকমের সুইচ অন করে অর্ডার দিলেন তিনি। তারপর পিছন ফিরলেন ওদের দিকে। 'কোত্থেকে শুরু করা যায়।' দু'হাতের আঙুল চালালেন চুলে।

'শুরু করুন শুরু থেকে,' বলল রানা। 'অ্যালিসকে তাই তো বলেছিল কিং অভ হার্টস।'

'শুরু থেকে-,' কোমল হাসি দেখা গেল ড. ওয়ার্নারের মুখে। '-বেশ, শুরুতে আমি তোমাকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশনে চাইনি।'

'আমি জানি।'

'আমার ধারণা ছিল শার্ক কমান্ডের কমান্ডারের পদটা তুমি প্রত্যাখ্যান করবে, কারণ তোমার যোগ্যতা আরও অনেক বেশি ছিল। কিন্তু পদটা গ্রহণ করে তুমি আমাকে অবাক করে দাও, যদিও এই প্রথমবার নয়।'

সাদা জ্যাকেট পরা একজন চীনা বাটলার ঢুকল ভেতরে, পিতলের চকচকে ট্রে-তে কফির সরঞ্জাম নিয়ে। কফিতে ক্রীম আর রঙিন চিনি মিশিয়ে পরিবেশন করল সে। তারপর চলে গেল।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ড. ওয়ার্নার, 'কেন তোমাকে চাইনি আমি? চাইনি এইজন্যে যে তোমার রেকর্ড আর অ্যাচিভমেন্ট চমৎকার হলেও, আমার ধারণা ছিল পুরানো আর রদ্দি ধ্যান-ধারণা থেকে তুমি কখনও বেরিয়ে আসতে পারবে না। আমি এমন একজন লোক খুঁজছিলাম যে শুধু ব্রিলিয়ান্ট নয়, যার স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভাঙার ক্ষমতা আছে। এ-সব গুণ তোমার মধ্যে আছে তা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি। তবু তুমি শার্কের কমান্ডার হওয়ার প্রস্তাব মেনে নেয়ায় এক রকম বাধ্য হয়েই তোমাকে আমার নিতে হলো। আমরা একসাথে কাজ শুরু করলাম, কিন্তু আমি তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করতে পারলাম না।'

কথা বলার সময় পিয়ানোর কী বোর্ডে হাত বুলালেন ড. ওয়ার্নার, তারপর পিয়ানোর দিকে পিছন ফিরে টুলে বসলেন। 'তা যদি পারতাম, জিরো-সেভেন-জিরো অপারেশনটা অন্যভাবে শেষ হত। এই ঘটনাটা ঘটে যাবার পর তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা বদলে গেল। আমাকে খুব কষ্ট পেতে হলো। তোমার ভেতর যা ছিল না বলে জানতাম, চোখে আঙুল দিয়ে তুমি দেখিয়ে দিলে সেগুলো সবই তোমার ভেতর আছে, নিজের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর আমার আস্থা কমে গেল। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্যে সময় দরকার ছিল আমার, কিন্তু সে সময় তুমি আমাকে দিলে না, তার আগেই পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দিলে।

'এবং আপনি সেটা গ্রহণ করলেন, ড. ওয়ার্নার।'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এখানে অযথা আমরা সময় নষ্ট করছি।' রানার চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি, চেহারা কঠোর।

'প্লীজ, মেজর রানা, আগে আমাকে সবটা ব্যাখ্যা করতে দাও।' একটা হাত এমনভাবে বাড়িয়ে দিলেন ড. ওয়ার্নার, যেন রানাকে চেয়ার ছাড়তে বাধা দিতে

চাইছেন। 'গোটা ব্যাপারটাকে অর্থবহ করতে হলে একটু পিছন থেকে শুরু করতে হবে।'

'তোমার সেই চুরুটটা,' নিচু গলায় বলল রানা।

পকেট থেকে চুরুট আর লাইটার বের করে রানার হাতে নিঃশব্দে ধরিয়ে দিল রবসন, দু'জনে পাশাপাশি বসেছে ওরা।

টুল ছেড়ে কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে এলেন ড. ওয়ার্নার, সরাসরি রানার সামনে এসে থামলেন। 'জিরো-সেভেন-জিরো হাইজ্যাক হবার কয়েক মাস আগের ঘটনা। নানা সূত্র থেকে আমি আভাস পেলাম, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নতুন একটা চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। প্রথমে শুধু আভাস, তারপর কিছু কিছু প্রমাণ। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে থাকল, দুনিয়া জুড়ে যে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চলছে সেগুলোকে নির্দিষ্ট একটা কেন্দ্র বা সেন্টার থেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।'

দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে এক পা থেকে আরেক পায়ে দেহের ভার চাপালেন ড. ওয়ার্নার। 'সেন্টারটা কি ধরনের বা কোথায়, কে বা কারা গোটা দুনিয়ার টেরোরিস্টদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে, এ-সব কিছুই তখন আমরা জানতে পারিনি, এখনও জানি না। বিচ্ছিন্ন সব খবর আসতে লাগল–টেরোরিস্টদের পরিচিত লীডাররা কোথায় যেন মীটিং করেছে, সন্দেহজনক বা রহস্যময় চরিত্রের কিছু লোক কোথাও এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল, মধ্যপ্রাচ্যের বা পুব ইউরোপের রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে কে বা কারা যেন গোপনে সাক্ষাৎ করেছে, এই সব। তারপর হঠাৎ করেই সন্ত্রাসবাদীদের আচরণ বলতে গেলে রাতারাতি বদলে গেল।

'প্রথমে ধনী হিসেবে দুনিয়া জোড়া যাদের খ্যাতি আছে তাদের কিডন্যাপ করা শুরু হলো। মুক্তিপণ হিসেবে শত শত মিলিয়ন ডলার চলে গেল টেরোরিস্টদের হাতে–বা সেন্টারে। ওপেক মন্ত্রীরা কিডন্যাপ হলো। তারপর সৌদি বাদশার আত্মীয়রা। সবশেষে হাইজ্যাক করা হলো জিরো-সেভেন-জিরো।

'সব কথা খুলে ব্যাখ্যা করার সময় ছিল না, আমি তোমাকে কঠোর নির্দেশ দিলাম–হাইজ্যাকারদের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নেয়া চলবে না। টেরোরিজমের এই নতুন ঢেউ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দরকার ছিল আমার। আমি চেয়েছিলাম ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে হলেও হাইজ্যাকারদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু আমি যা বিশ্বাস করতাম না, তাই করে বসলে তুমি।

'স্বীকার করি, মেজর রানা, প্রথমে আমি ভয়ানক রেগে গিয়েছিলাম। পারলে তোমাকে আমি কড়া শাস্তি দিতাম। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা হবার পর হঠাৎ আমি উপলব্ধি করলাম, শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে যেমন লোক আমার দরকার তুমি নিজেকে ঠিক সেই লোক হিসেবে প্রমাণিত করেছ। জানলাম মেজর মাসুদ রানা নিয়ম ভাঙতে পারে, এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

'সেই সাথে আরও একটা ব্যাপার উপলব্ধি করলাম। তোমার ভেতর যে গুণ আমি আবিষ্কার করেছি, প্রতিপক্ষরাও সেই গুণটা দেখে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। টেরোরিস্টরা বুঝবে, ওদের জন্যে চমৎকার একটা হাতিয়ার হতে পারো তুমি। কাজেই, আমি তোমার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ তুমি আমার এজেন্ট

থাকলে, কিন্তু তুমি নিজেও জানলে না। নিখুঁত, তাই না? তুমি জানো তুমি আমাদের কেউ নও, তাই অভিনয় করার দরকার পড়ল না। সবাই জানল শার্ক কমান্ড থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তোমাকে, অর্থাৎ যে-কেউ তোমাকে কাজের অফার দিতে পারে, দিলে তুমি নেবেও। এবং ঘটলও ঠিক তাই। টোপ ফেলা হলো, এবং তুমি গিললে।'

'আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। হাতের চুরুটটা নিভে গেছে।

'ব্যাঙ্কে খবর নিলে বিশ্বাস হত,' বললেন ড. ওয়ার্নার, মিটিমিটি হাসছেন তিনি। পিছিয়ে এসে ডেস্কের দেরাজ থেকে একটা এনভেলাপ বের করলেন, আবার রানার সামনে ফিরে এসে বাড়িয়ে দিলেন সেটা। এনভেলাপ খুলে সুইস ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্টের ওপর চোখ বুলাল রানা। শার্ক কমান্ড থেকে পদত্যাগ করার পরও প্রতি মাসের বেতন জমা হয়েছে ওর অ্যাকাউন্টে, কোন টাকা তোলা হয়নি। 'দেখতেই পাচ্ছ, রানা, এখনও তুমি আমাদের সাথে আছ। তোমাকে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, ভান করার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু ভান করায় লাভ যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

মুখ তুলে তাকাল রানা, এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না কথাগুলো, কিন্তু চেহারায় আগের সেই কাঠিন্য আর নেই। 'কি বলতে চাইছেন, ড. ওয়ার্নার?'

'বলতে চাইছি, শত্রুর বিরুদ্ধে আবার তুমি তৎপর হয়ে উঠেছ।'

'কিন্তু আমি তো শুধু মিডো স্টীলের একজন সেলস ডিরেক্টর মাত্র...'

'হ্যাঁ, এবং মিডো হলো অটারম্যান গ্রুপ অভ ইন্ডাস্ট্রির একটা অংশ। ব্যারন অটারম্যান আর তার স্ত্রী ব্যারনেস লিনা অটারম্যান, অদ্ভুত একটা জোড়া-মানে ছিল আর কি। এই যেমন ধরো, তুমি কি জানো, অটারম্যান ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি মোসাড-এর একজন এজেন্ট ছিল?'

'অসম্ভব!' দ্রুত, অস্বস্তির সাথে মাথা নাড়ল রানা। 'অটারম্যান ছিল রোমান ক্যাথলিক। ইসরায়েলিরা ক্যাথলিকদের দু'চোখে দেখতে পারে না।'

'উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সে ইহুদি হয়ে থাকা বিড়ম্বনা ছিল মাত্র, তাই অটারম্যানের দাদা ধর্ম বদলে ক্যাথলিক হয়। কিন্তু যুবক অটারম্যান তার মা আর দাদীর ভক্ত ছিল, তাদের মত সে-ও তার ধর্ম বদলায়নি। খুন হবার আগ পর্যন্ত ইহুদি ধর্মের প্রতিই তার টান ছিল।'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। এ-সব যদি সত্যি হয়, তাহলে গোটা ব্যাপারটা আবার আকৃতি বদলাচ্ছে। ব্যারনের মৃত্যুর সাথে নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটার সম্পর্ক আছে। ওর জীবনে ব্যারনেস লিনার ভূমিকাও তাহলে অন্য রকম হতে বাধ্য। 'ব্যারনেস? সে কি জানত?'

ডেস্কের কাছে ফিরে গেলেন ড. ওয়ার্নার, পাইপে টোবাকো ভরে অগ্নিসংযোগ করলেন। তাঁর চেহারায় প্রশংসার ভাব ফুটে উঠল। 'সুন্দরী মহিলা, গুণী মহিলা-কিন্তু তার সম্পর্কে আর কি জানি আমরা? পোল্যান্ডে জন্ম, বাবা ছিল ডাক্তার। লিনা যখন ছোট, তাকে নিয়ে পশ্চিমে পালিয়ে আসে। কয়েক বছর পর

প্যারিসে খুন হয়ে যায় সে, রোড অ্যাক্সিডেন্ট। ঘাতক ট্রাকের ড্রাইভার পালিয়ে যায়। মৃত্যুটাকে ঘিরে আজও খানিকটা রহস্য রয়ে গেছে।'

'লিনা তারপর...?'

'এক পরিবার থেকে আরেক পরিবারে হাত বদল হতে লাগল বাচ্চাটা। কিছুদিন থাকল আত্মীয়-স্বজনদের কাছে, কিছুদিন বাবার বন্ধুদের বাড়ি। ইতিমধ্যে তার প্রতিভার কথা জানাজানি হয়ে গেছে। চমৎকার দাবা খেলে, ভাল গাইতে আর বাজাতে পারে, তেরো বছর বয়সেই তিনটে ভাষা শিখে ফেলল। এরপর বেশ লম্বা একটা সময় তার সম্পর্কে আর কোন রেকর্ড পাওয়া যায় না। লিনা যেন সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল। একটু যা আভাস পাওয়া যায় তার ফস্টার মাদারের কাছ থেকে, ছোটবেলায় যে তাকে মানুষ করেছিল। সে এখন অথর্ব, আশির ওপর বয়স, সব কথা ভাল করে মনে করতে পারে না।'

'সে কি বলে?'

'লিনা নাকি তাকে বলেছিল, আমি দেশে যাচ্ছি। দেশ? এর অর্থ আমাদের জানা নেই। দেশ মানে কি পোল্যান্ড? ইসরায়েল?' পাইপে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন ড. ওয়ার্নার।

'আপনি তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর করেছেন,' বলল রানা। যা শুনেছে তাতেই অস্বস্তি বোধ করছে ও, আরও কি শুনতে হবে কে জানে।

'শার্ক কমান্ড ছেড়ে চলে যাবার পর তুমি যাদের সাথে যোগাযোগ করেছ তাদের সবার ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি। তবে ব্যারনেসের ব্যাপারে বিশেষ ভাবে আগ্রহী ছিলাম আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অপেক্ষা করে থাকল রানা, খুঁটিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করলে ব্যারনেসকে যেন অপমান করা হবে।

'অজ্ঞাতবাস থেকে আবার একদিন প্যারিসে ফিরে এল লিনা, উনিশ বছর বয়সে। পাঁচটা ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, অত্যন্ত যোগ্য প্রাইভেট সেক্রেটারি। শুধু মার্জিত আর সুন্দরী নয়, পশ্চিমা ফ্যাশন সম্পর্কে ভারি সচেতন। দেখতে দেখতে প্রভাবশালী মহল তার ভক্ত হয়ে পড়ল। পরিচয় হলো ব্যারন অটারম্যানের সাথে।'

'ব্যারনেসও কি মোসাডের এজেন্ট?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমরা জানি না। তবে সম্ভাবনা খুব বেশি। হয়তো তার কাভারে কোন খুঁত নেই। সেজন্যেই তো তোমার ওপর ভরসা করছি আমরা, ব্যারনেস অটারম্যান ইসরায়েলি এজেন্ট কিনা জানতে হবে তোমাকে।'

'মাই গড!' বিড় বিড় করে বলল রানা।

'ব্যারনেস নিশ্চয়ই জানত তার স্বামী একজন ইহুদি। স্বামীর মৃত্যুর সাথে এই ব্যাপারটার একটা যোগসূত্র আছে, বুঝতে পারার কথা তার। তাছাড়া, সে নিজেও ছয় বছর নিখোঁজ ছিল—তেরো থেকে উনিশ। এই ছয় বছর কোথায় ছিল সে?'

'লিনা কি ইহুদি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তার বাবা কি ইহুদি ছিল?'

'আমাদের তাই বিশ্বাস, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে লোকটা কখনও আগ্রহ দেখায়নি। তার মেয়েও ধর্মকে গুরুত্বের সাথে নেয়নি। ব্যারনের সাথে তার বিয়ে

হয় ক্যাথলিক ধর্মমতে, কিন্তু সেটা স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখার জন্যে।'

শান্ত গলায় রানা বলল, 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি আমরা।'

মাথা নাড়লেন ড. ওয়ার্নার। 'আমার তা মনে হয় না। ব্যারন অটারম্যান তো এই সন্ত্রাসবাদেরই শিকার। ব্যারনেসও শিকার হতে যাচ্ছিল–সন্ত্রাসবাদ বিরোধী একজন এজেন্ট তার সাথে মেলামেশা শুরু করার পরপরই। তাৎপর্য একটা আছে বলে মনে হচ্ছে না তোমার, রানা?'

চুপ করে থাকল রানা।

'সেদিন রাতে লা পিয়েরে বেনিতে যা ঘটল, সে সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

প্যারিস থেকে সিট্রন অনুসরণ করেছিল রানাকে, কিন্তু তথ্যটা চেপে গেল ও। বলল, 'আমাকে নয়, ওরা ব্যারনেসকে খুন বা কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছিল।'

'তুমি তার গাড়ি চালাচ্ছিলে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আর ওই রাস্তা দিয়েই আসা-যাওয়া করত ব্যারনেস।'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে তোমাকে যেতে বলেছিল কেউ। কে?'

'গাড়িটা আমি ব্যারনেসকে ব্যবহার করতে নিষেধ করি...'

'তারমানে কি তুমি স্বইচ্ছায় মাসেরাতি নিয়ে ওখানে যাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ,' নিজেও জানে না রানা কেন মিথ্যে বলছে।

'গাড়িটা যে ব্যারনেস চালাবে না, এ-কথা আর কেউ জানত?'

'না।' ব্যারনেস আর রানা সুইটজারল্যান্ড থেকে ফেরার পর ওদের সাথে দেখা হয় দু'জন দেহরক্ষী আর দু'জন ড্রাইভারের তারা জানত।

'তুমি ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ, জানি,' বলল রানা। 'আমি ছাড়া আর কেউ জানত না।' কিন্তু ব্যারনেস লিনা জানত। রাগের সাথে চিন্তাটা মাথা থেকে বের করে দিতে চেষ্টা করল রানা।

'ঠিক আছে, তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে ব্যারনেসের ওপরই হামলা করা হয়েছিল। কিন্তু হামলাটা কি ছিল–খুনের চেষ্টা, নাকি কিডন্যাপিঙের? যদি খুনের চেষ্টা হয়ে থাকে, আমরা ধরে নিতে পারি প্রতিদ্বন্দ্বী কোন এজেন্টের কাজ ছিল ওটা, ধরে নিতে পারি ব্যারনেসও মোসাডের এজেন্ট। কিন্তু যদি কিডন্যাপিঙের চেষ্টা হয়ে থাকে তাহলে মনে করতে হবে টেরোরিস্টরা দায়ী, উদ্দেশ্য ছিল মোটা টাকা কামানো। তোমার কি মনে হয়, রানা?'

'রাস্তা বন্ধ করে রেখেছিল ওরা,' বলল রানা, কিন্তু পুরোপুরি নয়, মনে আছে ওর। 'ভুয়া পুলিসটা আমাকে থামার ইঙ্গিত দিল–' কিংবা গাড়ির গতি কমাবার ইঙ্গিত ছিল ওটা, হয়তো গুলি শুরু করার আগে সহজ একটা টার্গেট পেতে চাইছিল ওরা। '–আমি থামব না বুঝতে পারার পরই কেবল গুলি শুরু করল ওরা।' কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। 'আমার ধারণা ব্যারনেসকে ওরা জীবিত ধরতে চেয়েছিল।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন ড. ওয়ার্নার। 'আপাতত এটাই মেনে

নেব আমরা।' কার্ল রবসনের দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমার কোন প্রশ্ন আছে নাকি?'

'ধন্যবাদ, স্যার। আমরা এখনও জানি না মিডো-র অফারটা কিভাবে পেল রানা। প্রথমে কে যোগাযোগ করেছিল?'

'লন্ডনের একটা এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি প্রথমে যোগাযোগ করে আমার সাথে,' বলল রানা। 'তারপর ব্যারনেস লিনা সরাসরি...'

'তোমাকে শুধু সেলস ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব নেয়ার কথা বলা হয়? অন্য কোন দায়িত্বের কথা বলা হয়নি? সিকিউরিটি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স...?'

'না। তবে ব্যারনেসের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার পর আমি তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে কথা বলি। সিকিউরিটি সিস্টেমে কিছু রদবদল করা হয়।'

'তার স্বামীর মৃত্যু নিয়ে তোমাদের মধ্যে কথা হয়নি?'

'হয়েছে,' বলল রানা, যথাসম্ভব কম মিথ্যে বলে পার পেতে চাইছে রানা।

'ব্যারনেস তোমাকে বলেনি যে সে তার স্বামীর খুনীকে খুঁজছে বা খুনীকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে তোমার সাহায্য পেলে ভাল হত?'

দ্রুত চিন্তা করল রানা। প্যারিসের ব্রিটিশ দূতাবাসের মিলিটারি অ্যাটাশের সাথে যোগাযোগ করেছিল রানা, খলিফাকে আকৃষ্ট করার জন্যে ওটা একটা টোপ ছিল ওর। যোগাযোগের খবরটা হয় পেয়ে গেছেন ড. ওয়ার্নার, নয়তো পেয়ে যাবেন। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্সের কমপিউটার ব্যবহার করা তাঁর জন্যে কোন সমস্যাই নয়। না, অস্বীকার করে লাভ হবে না। 'হ্যাঁ, এ-ধরনের একটা অনুরোধ সে আমাকে করেছে।'

ডেস্কের ওপর ঝুঁকে নোটবুকে খসখস করে কি যেন লিখলেন ড. ওয়ার্নার। 'অটারম্যানের সাথে বিয়ের আগে আটজন লোকের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক ছিল ব্যারনেস লিনার, আমরা জানি। প্রত্যেকেই তারা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ধনী। তাদের মধ্যে ছয়জন বিবাহিত...'

রেগে গিয়ে ভেতর ভেতর এমন কাঁপতে লাগল রানা, নিজেই অবাক হয়ে গেল। ব্যারনেস লিনাকে অমার্জিতভাবে কলঙ্কিত করায় ড. ওয়ার্নারকে ঘৃণ্য বলে মনে হলো। প্রাণপণ চেষ্টা করে চেহারা শান্ত রাখল ও, হাত দুটো কোলের ওপর শিথিলভাবে পড়ে আছে।

'...এ-সব সম্পর্ক অত্যন্ত সাবধানে লুকিয়ে রাখত সে,' বলে চলেছেন ড. ওয়ার্নার। 'তবে বিয়ের কাছাকাছি সময়ে অন্য কোন পুরুষের সাথে মেলামেশা করেনি। বিয়ের পরও তার জীবনে অন্য কোন পুরুষ ছিল না। কিন্তু স্বামী মারা যাবার পর আবার বিছানার সঙ্গী হিসেবে তিনজনকে জুটিয়ে নেয় ব্যারনেস। একজন ফ্রেঞ্চ সরকারের মন্ত্রী, একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী,' ঝট্ করে নোটবুকের দিকে একবার ঝুঁকেই মাথা তুললেন তিনি। 'অতি সম্প্রতি আরেকজনের সাথে তার অ্যাফেয়ার চলছে।'

খুকখুক করে কাশল রবসন, অস্বস্তিবোধ করছে সে। কিন্তু রানা তার দিকে তাকাল না, ঠাণ্ডা চোখে সরাসরি ড. ওয়ার্নারের চোখে তাকিয়ে আছে।

'আমার ধারণা, তুমি খুব ভাল পজিশনে আছ, রানা। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

অনায়াসে বের করে আনতে পারবে। তোমার আশপাশেই রয়েছে শত্রু, চোখ খোলা রাখলেই চিনতে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ভাবাবেগের বা দুর্বলতার বশে দায়িত্বের কথা ভুলে যাবে কিনা।'

'আমাকে দুর্বল বা ভাবাবেগে আপ্লুত ভাবার কোন কারণ নেই, ড. ওয়ার্নার,' বলল রানা। 'আমার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আপনার ভাল ধারণা থাকার কথা।'

'আছেও, আর সেজন্যেই তোমার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছি আমরা। ব্যারনেস লিনা সম্পর্কে এখন অনেক বেশি জানো তুমি। কাজেই বুঝতে পারছ, কেন আমরা ভদ্রমহিলা সম্পর্কে এত বেশি আগ্রহী।'

'পারছি,' শান্ত সুরে বলল রানা। চেহারায় রাগের কোন চিহ্নমাত্র নেই। 'আপনি চাইছেন সম্পর্কের সুযোগটা নিয়ে আমি তার ভেতরের খবর সংগ্রহ করি, তাই না?'

'তাই। কিন্তু মনে রাখতে হবে উল্টোটাও সত্যি—ব্যারনেস লিনাও সম্পর্কটার সুযোগ নিয়ে তোমার কাছ থেকে আমাদের সম্বন্ধে খবর নেয়ার চেষ্টা করছে।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ড. ওয়ার্নার। 'আমাকে হয়তো একটু অমার্জিত মনে হয়েছে, রানা। সেজন্যে আমি দুঃখিত। আমি হয়তো তোমার রঙিন একটা স্বপ্নে কাদা ছিটালাম, সেজন্যেও দুঃখিত।'

'আমি কি সরাসরি আপনার কাছে রিপোর্ট করব, ড. ওয়ার্নার?'

'সমস্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা রবসন করবে।' এগিয়ে এসে রানার কাঁধে একটা হাত রাখলেন ড. ওয়ার্নার। 'অন্য কোন উপায় থাকলে কাজটা তোমাকে দিতাম না, রানা।'

মাথা নিচু করে বিনয় প্রকাশ করল রানা। 'আমি জানি, ড. ওয়ার্নার।'

পনেরো

ক্লান্তির অজুহাত দেখিয়ে দাবা খেলার প্রস্তাব এড়িয়ে গেল রানা, দীর্ঘ ট্রান্স-আটলান্টিক ফ্লাইটের বেশিরভাগ সময় ঘুমের ভান করে কাটাল। চোখ বন্ধ, মন জুড়ে থাকা সমস্ত চিন্তা-ভাবনা গোছগাছ করে গোটা ব্যাপারটায় একটা আকার পাবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু লাভ হলো না, বারবার তালগোল পাকিয়ে গেল সব। ব্যারনেস লিনার প্রতি ওর অনুভূতি এবং বিশ্বস্ততা সম্পর্কেও নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। 'দৈহিক সম্পর্ক'—ড. ওয়ার্নার ব্যারনেস সম্পর্কে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তথ্যটা যদি সত্যি হয়? বিয়ের আগে আটজনের সাথে দৈহিক সম্পর্ক ছিল ব্যারনেসের, ছয়জন তার মধ্যে বিবাহিত পুরুষ। বিয়ের পর আরও দু'জনের সাথে, দু'জনই ধনী বা প্রভাবশালী লোক। ব্যারনেস লিনার বিবস্ত্র শরীর চোখের পর্দায় ফুটে উঠল। শুধু সুন্দর নয়, পবিত্র বলে মনে হয়েছিল রানার। ওর মনে হলো, ওর সাথে বেঈমানী করা হয়েছে। পরমুহূর্তে নিজেকে তিরস্কার করল রানা—কিশোরসুলভ ভাবাবেগে ভোগার কোন মানে হয় না।

আরও অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলেছেন ড. ওয়ার্নার। মোসাডের সাথে ব্যারনেসের যোগাযোগ। হারিয়ে যাওয়া ছয়টি বছর। দু'জন একান্তে, নিভৃতে যে সময়গুলো কাটিয়েছে তার কথা মনে পড়ে গেল রানার। এমন সুন্দর যার মন, এমন মার্জিত যার রুচি, তার দ্বারা কি এত নোংরা ছলনা সম্ভব? সত্যি কি ওকে ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে ব্যারনেস, আর সব পুরুষকে যেমন ব্যবহার করেছে? তারপর কাজ ফুরিয়ে গেলে আবর্জনার মত ফেলে দেবে, আর সবাইকে যেমন দিয়েছে?

একটা ব্যক্তিগত প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে রানাকে। ব্যারনেস লিনার সাথে কতটুকু জড়িয়ে পড়েছে ও? তার প্রতি কতটুকু দুর্বল ও? কিন্তু হিথরোতে নামার পরও নিজের মন বুঝতে পারল না রানা, চুলচেরা হিসেব করে ভালবাসার গভীরতা মাপা সম্ভব হলো না। হঠাৎ করে ব্যারনেসের একটা প্রস্তাবের কথা মনে পড়ে গেল। মাঝখানে একটা লেগুন নিয়ে নয়টা দ্বীপ, যেখানে ওরা পালাতে পারে। সন্দেহ নেই, ব্যারনেস লিনার জীবনেও সঙ্কট আছে, সেজন্যেই জীবন থেকে পালাতে চায় সে। কিন্তু ওকে নিয়ে কেন? ভালবেসে ফেলেছে, তাই? তাহলে কি তার ভালবাসা অকৃত্রিম?

কে জানে, শেষ পরিণতি কি লেখা আছে দু'জনের কপালে। একজনের আছে টাকা, প্রভাব, আর ইসরায়েলি কানেকশন; আরেকজনের আছে ট্রেনিং, ইসরায়েল বিদ্বেষ, আর প্রতিশোধপরায়ণতা। এমন তো নয় যে দু'জনের পরিচয়ই হয়েছে পরস্পরকে ওরা ধ্বংস করবে বলে?

হোটেল হিলটনে ব্যারনেস লিনার তিনটে আলাদা আলাদা মেসেজ পেল রানা। প্রতিটি মেসেজে রবুইলের টেলিফোন নম্বর দিয়েছে। কাপড়চোপড় না ছেড়েই ডায়াল করল রানা।

'রানা ডার্লিং! কি দুশ্চিন্তায় ছিলাম! কোথায় ছিলে তুমি?' বিশ্বাস করা কঠিন ব্যারনেস লিনা ভান করছে। এবং গা শির শির করা পুলক রানার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল পরদিন দুপুরে, ড্রাইভারকে না পাঠিয়ে চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে নিজেই যখন চলে এল ব্যারনেস।

'আমার তর সইছিল না,' বলল সে, রানার কনুইয়ের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে গা ঘেঁষে এল। 'তোমাকে এক ঘণ্টা আগে দেখতে পাব বলে নিজেই চলে এলাম। মানে হলো, মেজর মাসুদ রানা, নির্লজ্জের মত আচরণ করছি আমি! জানো, তুমি আমাকে আমার কৈশোর ফিরিয়ে দিয়েছ!'

সন্ধ্যা আটটায় একটা পার্টিতে থাকল ওরা, ডিনার খেলো লিমেরী রোঁদা-য়, থিয়েটার দেখল পাপেতি-তে। যেখানেই গেল ওরা, প্রতি মুহূর্ত রানার স্পর্শ নিল ব্যারনেস, যেন ওকে হারাবার ভয়ে অবচেতনভাবে শঙ্কিত হয়ে আছে। মাঝরাতে লা পিয়েরে বেনিতে ফেরার সময়ও নিজের কোলের ওপর রানার হাতটা ধরে থাকল সে।

'টেলিফোনে বলতে পারিনি তোমাকে,' শুরু করল রানা। 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশন থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে আমাকে। ওদের প্রেসিডেন্ট আমাকে নিউ ইয়র্কে ডেকেছিলেন। ওরাও খলিফার পিছনে লেগে আছে।'

রানার হাতের ওপর ব্যারনেসের আঙুলগুলো নড়ল না। একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ পেল রানা। 'কখন বলবে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি, রানা। জানতাম তুমি আমেরিকায় গেছ। কেন যেন মনে হয়েছিল, তুমি মিথ্যে কথা বলতে পারো আমাকে। তা যদি বলতে, কি করতাম জানি না।'

ব্যারনেস জানে নিউ ইয়র্কে গিয়েছিল ও? কিন্তু কিভাবে? তারপর রানার মনে পড়ল, তথ্য পাবার নিজস্ব উৎস আছে তার।

'সব আমাকে বলো, রানা।'

প্রায় সব কথাই বলল রানা, শুধু ব্যারনেস সম্পর্কে ড. ওয়ার্নারের অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলো বাদ দিয়ে গেল–বাদ দিয়ে গেল ব্যারনের মোসাড কানেকশন, ব্যারনেসের হারানো ছয়টা বছর, আর দশজন নামহীন পুরুষ প্রেমিকের প্রসঙ্গ।

'শত্রু খলিফা নামটা ব্যবহার করছে ওরা তা জানে না,' বলল রানা। 'তবে ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে, তুমি তাকে খুঁজছ। ওদের ধারণা, আমার কাছ থেকে সাহায্য চাও তুমি।'

লা পিয়েরে বেনিতে পৌঁছেও আলোচনা থামল না, একটা সোফায় পাশাপাশি গা ছুঁয়ে বসে ফিসফিস করে কথা বলল ওরা। নিজের ভাব সাব লক্ষ করে নিজেই অবাক হয়ে গেল রানা, মন থেকে প্রায় সমস্ত সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেমালুম উবে গেছে বলে মনে হতে লাগল। ব্যারনেসের মধ্যে কি যেন একটা জাদু আছে, কাছে এলেই মুগ্ধ করে ফেলে।

'অর্গানাইজেশনের একজন হিসেবে এখনও আমাকে রেখেছেন ড. ওয়ার্নার,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'প্রত্যাখ্যান বা আপত্তি করিনি আমি। কারণ খলিফাকে খুঁজে বের করতে হবে, অর্গানাইজেশনে আমার একটা পজিশন থাকলে খোঁজার কাজটা সহজ হবে।'

'আমি একমত। হ্যাঁ, আমাদের সাহায্য হবে, বিশেষ করে এখন যখন ওরাও জানে যে খলিফার অস্তিত্ব আছে।'

গভীর রাতে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল লিনা। এ শুধু দুটো দেহ এক হওয়া নয়, কোমল সমস্ত ভাব নিয়ে দুটো কাতর মনের ব্যাকুল মিলন। গোপনীয়তার স্বার্থে দিনের আলো ফোটার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ব্যারনেস লিনা, কিন্তু এক ঘণ্টা পর ব্রেকফাস্টের জন্যে আবার ওরা মিলিত হলো গার্ডেন রূমে।

রানার কাপে কফি ঢালল ব্যারনেস, ইঙ্গিতে প্লেটের পাশে ছোট্ট পার্সেলটা দেখাল রানাকে। 'যতটুকু সাবধান হওয়া দরকার ততটা আমরা হতে পারছি না, শেরি।' রাঙা ঠোঁট টিপে হাসল সে। 'কে যেন জানে কোথায় তুমি রাত কাটাও।'

ডান হাতের তালুতে নিয়ে পার্সেলটার ওজন অনুভব করল রানা। পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার ফিল্ম রোলের আকৃতি পার্সেলটার, বাদামী কাগজে মোড়া, লাল মোম দিয়ে সীল করা।

'কাল সন্ধ্যায় স্পেশাল ডেলিভারি এজেন্সির লোক পৌঁছে দিয়ে গেছে,' কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল ব্যারনেস, তার পটলচেরা সবুজ চোখে কৌতূহল।

পার্সেলের গায়ে একটা চৌকো কাগজ সাঁটা রয়েছে, ঠিকানাটা তাতে টাইপ করা। স্ট্যাম্পগুলো ব্রিটিশ। পার্সেলটা নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে অকারণেই

কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল রানা। দামী আসবাবে সাজানো গার্ডেন রূমে কোথাও যেন ওত্‌ পেতে আছে কি একটা বিপদ।

'কি হলো, রানা?' রানার চেহারা দেখে থতমত খেয়ে গেছে ব্যারনেস।

'না, কই,' বলল রানা। 'কিছু না।'

'হঠাৎ তুমি সাদা হয়ে গেলে কেন? অসুস্থ বোধ করছ, ডার্লিং?'

'না-না। এমনি, মানে...' কথা শেষ না করে টেবিল থেকে ছোট একটা ছুরি তুলে পার্সেলের গা থেকে খুঁচিয়ে মোম তুলতে শুরু করল রানা। তারপর বাদামী কাগজের মোড়ক খুলল। সাদা, স্বচ্ছ কাঁচের তৈরি একটা বোতল, মাথাটা প্যাঁচ বিশিষ্ট ছিপি দিয়ে আটকানো। ভেতরের তরল পদার্থটুকুও স্বচ্ছ—এক ধরনের প্রিজারভেটিভ, সাথে সাথে বুঝল রানা। স্পিরিট বা ফরমাল ডিহাইড।

তরল পদার্থের মাঝখানে ভাসছে সাদাটে একটা জিনিস।

'কি ওটা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল ব্যারনেস।

পেটে একটা আলোড়ন উঠল রানার, গলার কাছে উঠে আসতে চাইল বমি বমি ভাব।

বোতলের ভেতর জিনিসটা ধীরে ধীরে ঘুরছে। হঠাৎ গোড়ার দিকটা লালচে আলোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। লালের মাঝখানে সাদা। হাড়।

কোন মানুষের কাটা আঙুল ওটা। গোড়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। বোতলটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল রানার চোখ জোড়া।'

প্রথমবার রিং হতেই অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ।

'ডোরা...' গগলের বান্ধবী, কণ্ঠস্বর চিনতে পারল রানা—সন্ত্রস্ত।

'ডোরা, আমি রানা।'

'ওহ্, থ্যাঙ্ক গড, রানা!' রুদ্ধশ্বাসে বলল ডোরা। 'গগল বাড়িতে নেই, এদিকে তোমাকে আমি দু'দিন ধরে কোথায় না খুঁজছি! শুনেছ সব...?'

'না।' রানার পায়ের নিচে যেন কাত হয়ে যাচ্ছে গ্রহটা।

'তোমার বন্ধুকে...!' ফুঁপিয়ে উঠল ডোরা। 'এতক্ষণে সে বোধহয় নেই...'

'শান্ত হও, ডোরা,' অনুনয় করল রানা। 'আমার বন্ধু, কার কথা বলছ তুমি? কি হয়েছে তার?'

'মি. সোহেল আহমেদ...'

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। হাতের মুঠোর ভেতর মনে হলো ফোনের রিসিভার গুঁড়ো হয়ে যাবে। 'বলো।'

'আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন উনি, বললাম তুমি আসবে না, মেসেজটা দিলাম...এক কাপ কফি খেয়ে বেরিয়ে গেলেন উনি...রাস্তায় অপেক্ষা করছিল ওরা—।'

'কারা, ডোরা? কারা অপেক্ষা করছিল?' ডোরার নাক টানার আওয়াজ পেল রানা। 'তারপর...?'

'জানি না, রানা। চারদিক থেকে গুলি হচ্ছে দেখে মেঝেতে শুয়ে পড়ি আমি।

ওদের তিনজন মি. আহমেদের গুলিতে সাথে সাথে মারা যায়। দু'জন আহত হয়। তিনটে গাড়িতে করে এসেছিল ওরা। মি. আহমেদ আহত হয়েছেন কিনা আমি দেখতে পাইনি। লাশগুলো ওরা তুলে নিয়ে গেছে। মি. আহমেদকেও...'

'পুলিস সব জানে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে সাংবাদিকদের বলা হয়েছে কিডন্যাপ করা হয়েছে মি. আবদুর রবকে। একজন ইন্সপেক্টর আমাকেও বলে গেছে, সাংবাদিকরা কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি যেন তোমার বন্ধুর নাম মি. আবদুর রব বলি, আর গগলের বন্ধু বলে পরিচয় দেই। আমি কিছুই বুঝতে...'

'বাড়ি থেকে কোথাও যেয়ো না,' বলল রানা। 'এখুনি আমি ইংল্যান্ডে আসছি। কোন মেসেজ থাকলে হিলটনে পাঠিয়ো।' রিসিভার রেখে দিল ও।

ডেস্কের পাশে ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্যারনেস লিনা, হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করা। কোন প্রশ্ন করার দরকার নেই, রানার চেহারাতেই সব লেখা রয়েছে। রানাও কিছু না বলে শুধু ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। ফোনের দিকে ঝুঁকে ছিল রানা, ঝুঁকেই থাকল। আবার ডায়াল করছে।

'কার্ল রবসন,' রিসিভারে হুঙ্কার ছাড়ল রানা। 'বলো আমি মেজর রানা এবং জরুরী।'

ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে অপরপ্রান্তে হাজির হলো রবসন। 'বস্, তুমি?'

'ওরা সোহেলকে নিয়ে গেছে।'

'কারা? বুঝলাম না!'

'শত্রুরা। কিডন্যাপ করেছে সোহেলকে।'

'জেসাস, গড! ঠিক জানো, বস্?'

'হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই। বোতলে করে সোহেলের একটা আঙুল পাঠিয়েছে ওরা।'

অপরপ্রান্তে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রবসন। তারপর বলল, 'দ্যাট্স্ সিক, ক্রাইস্ট, দ্যাট্স্ রিয়েলি সিক!'

'পুলিসের সাথে যোগাযোগ করো, ওরা কি করছে জানো। তোমার সমস্ত প্রভাব কাজে লাগাও। ওরা অনেক জিনিস চেপে যাচ্ছে, কারণ বি.সি.আই. সম্ভবত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করেছে ব্যাপারটা যাতে প্রচার না পায়। সোহেলের কাভার নেম প্রকাশ করেছে পুলিস—আবদুর রব।'

'আমাকে আর কি করতে হবে, বস্?'

'সমস্ত তথ্য যোগাড় করো। কুত্তাগুলোকে আমি নিজের হাতে পেতে চাই। শার্ক কমান্ডকে কন্ডিশন গ্রীন পজিশনে রাখো। এখুনি আমি রওনা হচ্ছি, কোন্ ফ্লাইটে পরে জানাচ্ছি।'

'এই নম্বরে চব্বিশ ঘণ্টা লিসনিং ডিভাইস রাখলাম,' প্রতিশ্রুতি দিল রবসন। 'এয়ারপোর্টে ড্রাইভার পাঠাব, তোমাকে নিয়ে আসবে।' ইতস্তত করল সে। 'বস্, আমি দুঃখিত। তুমি জানো।'

'জানি, কার্ল।'

'আমরা তোমার সাথে আছি, বস্, সবটুকু পথ।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে মুখ তুলল রানা। নিজেও জানে না চোখের কোণ চিকচিক করছে। কারও শুনতে পাবার কথা নয়, ওর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ থেকে প্রতিটি লোমকূপ সোহেল সোহেল বলে নিঃশব্দে চিৎকার করছে। এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল ব্যারনেস লিনা। 'আমি তোমার সাথে লন্ডনে যাচ্ছি।'

হাত বাড়িয়ে ব্যারনেসের কব্জি ধরল রানা। 'না,' নরম গলায় বলল ও। 'ধন্যবাদ, কিন্তু না। ওখানে তোমার করার কিছুই নেই।'

'রানা, তোমার এই কষ্টের সময় আমি সাথে থাকতে চাই। মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটার জন্যে আমিই দায়ী।'

'তুমি কেন দায়ী হতে যাবে!'

'ওকে তুমি খুব ভালবাস।'

'আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। আমার জন্যে স্বেচ্ছায় অকাতরে মরতে পারে। দেখার সময় হয়েছে, ওর জন্যে আমি কি করতে পারি।'

'আমি তোমার সাথে…'

মাথা নাড়ল রানা। 'এখানে থাকলে আরও বেশি সাহায্য করতে পারবে আমাকে। তোমার উৎস থেকে তথ্য যোগাড় করো। সব জানাও আমাকে।'

রানার দৃঢ় চেহারার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর মাথা নিচু করল ব্যারনেস। 'ঠিক আছে, তবে তাই হোক। কোথায় যোগাযোগ করব তোমার সাথে?'

শার্ক কমান্ডের নম্বর দিল রানা, বলল, "এই নম্বরে কার্ল রবসনকে, নাহয় হিলটনের নম্বরে আমাকে পাবে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু অন্তত প্যারিস পর্যন্ত তোমার সাথে যেতে দাও আমাকে।'

হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে নিউজ স্ট্যান্ড থেকে এক কপি ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড কিনল রানা, ঘটনার পুরো বিবরণ ইতিমধ্যে ছাপা হয়েছে কাগজে। লন্ডনে যাবার পথে গাড়িতে বসে পড়ল রানা।

'বাংলাদেশী নাগরিক এবং বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য মি. আবদুর রবকে তার বন্ধু ভিনসেন্ট গগলের বাড়ির সামনে থেকে গত বৃহস্পতিবার কিডন্যাপ করা হয়েছে। কিডন্যাপাররা একটা প্রাইভেট কার, একটা জীপ, আর একটা ল্যান্ড-রোভার নিয়ে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল বাড়ির সামনে। মি. রব বেরিয়ে আসার সাথে সাথে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয় তাকে, কিন্তু তিনি সশস্ত্র ছিলেন। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, অস্ত্রের সাথে মি. রবের কাছে লাইসেন্সও ছিল। বৃদ্ধা একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে জানা গেছে, মি. রব একা প্রায় তিন মিনিট কিডন্যাপারদের সাথে লড়াই করেছেন। মি. রব প্রথম দফা গুলিবর্ষণ করে দু'জনকে গুরুতরভাবে আহত করেন, কিডন্যাপাররা পিছু হটে আড়াল নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সংখ্যায় তারা বারো-তেরো জনের মত ছিল, মি. রবের পালাবার পথ তারা বন্ধ করে দেয়। আড়াল থেকে তারা মি. রবকে লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে, কিন্তু একটা গুলিও নাকি লাগেনি। এক সময় মি. রবের পিস্তল খালি হয়ে গেলেও কিডন্যাপারদের আরও তিনজনকে আহত করেন তিনি।

অপর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা গেছে ঘটনাস্থলেই দুষ্কৃতকারীদের তিনজন মারা যায়, আহত হয় দু'জন। মি. রব নিজের গাড়ির কাছে পৌঁছুতে পেরেছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কারণ তাঁর গাড়ির ভেতর ঘাপটি মেরে বসে ছিল প্রতিপক্ষের তিনজন। তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে গাড়ি থেকে বের করে ল্যান্ড-রোভারে তোলা হয়, এবং চোখের পলকে গাড়ি তিনটে অদৃশ্য হয়ে যায়।

'প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পুলিস সূত্র থেকে সাংবাদিকরা কিছুই জানতে পারেনি, খবর প্রকাশ না করার কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে—মি. রবের পরিচয় সম্পর্কে প্রথমে নাকি কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

'কিডন্যাপারদের গাড়িগুলো সম্পর্কে জানা গেছে, আগের দিন গুগুলো ইস্ট লন্ডন থেকে হাইজ্যাক করা হয়। নিখোঁজ মি. রবের জন্যে দেশব্যাপী অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছে নিচের নম্বরের গাড়িগুলো কেউ যদি দেখেন সাথে সাথে নিকটবর্তী পুলিস স্টেশনে খবর দিতে হবে। কেসটার দায়িত্ব নিয়েছেন ইন্সপেক্টর ব্যারি হোমস। তাঁর টেলিফোন নম্বর···'

সবশেষে মি. রব ওরফে সোহেলের চেহারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, কিডন্যাপ হওয়ার সময় কি পরেছিল তা-ও উল্লেখ করা হয়েছে। দুমড়েমুচড়ে কাগজটা গোল পাকিয়ে সীটের এক কোণে ফেলে দিল রানা। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল ও. প্রচণ্ড রাগ যেন আগুনের লেলিহান শিখা হয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে গোটা শরীর।

ইন্সপেক্টর ব্যারি হোমস মানুষটা ছোটখাট, কিন্তু পাকানো রশির মত হাত-পা। চ্যাপ্টা মুখে অস্বাভাবিক খাড়া নাক চেহারায় কমেডিয়ানের একটা ভাব এনে দিয়েছে। মাথায় টাক পড়ছে, তাই চুল খুব লম্বা রাখে, চকচকে অংশগুলো ঢাকার জন্যে। চোখ জোড়া চঞ্চল আর বুদ্ধিদীপ্ত, কথা বলে সরাসরি এবং দৃঢ় কণ্ঠে।

পরিচিত হবার সময় রানার সাথে করমর্দন করল সে। 'আপনাকে আগেভাগেই জানিয়ে দিচ্ছি, মেজর, পরিষ্কার পুলিসী কেস এটা। তবে ওপর মহল থেকে আরও পরিষ্কারভাবে আমাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, আপনাদের সাহায্য আমাকে নিতেই হবে।'

ইতিমধ্যে তদন্তের কাজ কতটুকু এগিয়েছে তার বিশদ বর্ণনা দিল সে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চারতলায় দুটো কামরায় দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর বসানো হয়েছে, তথ্য যেখান থেকে যা আসছে সেগুলোর সত্যতা যাচাই করছে তারা। টেলিফোনগুলোও সেখানে, এরই মধ্যে চারশোর মত কল রিসিভ করা হয়েছে। যেহেতু কোন সূত্র এখনও পাওয়া যায়নি, প্রতিটি কল চেক করে দেখতে হবে। এই কাজে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বেশ বড়সড় একটা বাহিনীকে মাঠে নামানো হয়েছে। 'সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, মেজর। আরও কিছু ব্যাপার আছে—আসুন আমার সাথে।' রানাকে নিয়ে ভেতরের অফিসে চলে এল সে। ইউনিফর্ম পরা একজন

লোক ওদেরকে চা পরিবেশন করল।

'তিনটে গাড়িই পাওয়া গেছে পরিত্যক্ত অবস্থায়, প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করে দেখছে আমার লোকেরা। ল্যান্ড-রোভারে একটা মানিব্যাগ পাওয়া গেছে, মিস ডোরা সেটাকে মি. আবদুর রবের বলে সনাক্ত করেছেন। তিনশোর মত ফিঙ্গার প্রিন্ট পাওয়া গেছে, সবগুলো প্রসেস করা হয়েছে, তবে মিলিয়ে দেখতে কিছু সময় লাগবে। মিস ডোরার বাড়িতে মি. রব কফি খেয়েছিলেন, কাপ থেকে আমরা তাঁর হাতের ছাপ যোগাড় করেছি...'

'কিডন্যাপারদের দেখেনি কেউ?'

'এক বুড়ি বলছে ল্যান্ড-রোভারের ড্রাইভারের চেহারা তার মনে আছে। আঁইডেনটি কিট পোরট্রেইট তৈরির ব্যবস্থা হয়েছে, তবে আসল চেহারার কাছাকাছি হবে বলে মনে করি না। হাতি-ঘোড়া যাই হোক, টেলিভিশনে প্রচার করব আমরা। আসলে অপেক্ষা করছি আমরা, মেজর। কিডন্যাপাররা মুক্তিপণ চেয়ে যোগাযোগ করবে। কিংবা কেউ ওদের দেখতে পেয়ে ফোন করবে। মিস ডোরার সাথে ওরা যোগাযোগ করবে বলে মনে করি না, তবু তার ফোনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা হয়েছে। মি. ভিনসেন্ট গগলের বাড়ির ওপরও নজর রাখা হচ্ছে। এবার আপনার পালা, মেজর রানা। আশা করছি আপনার কাছ থেকে মূল্যবান কিছু তথ্য পাব আমরা।'

আড়চোখে একবার রবসনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল রানা। 'ভিক্টিম বাংলাদেশী হলেও তার সম্পর্কে তেমন কিছু আমি জানি না, ইন্সপেক্টর।'

ব্যারি হোম আকাশ থেকে পড়ল। 'তবে যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে বলল আপনি প্রয়োজনীয় সব তথ্য দিতে পারবেন?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকল রানা।

ডেস্কের ফোন ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল, ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুলল ইন্সপেক্টর। খানিকক্ষণ কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে, কিছুক্ষণ মুখ ভার করে থাকল। তারপর রানাকে বলল, 'ল্যাবরেটরি থেকে জানানো হলো আঙুলটা মি. রবেরই। আগেই আমরা জেনেছি তাঁর একটা হাত নেই, এবং রক্তের গ্রুপ...'

মনে মনে ক্ষীণ একটু আশা ছিল রানার, আঙুলটা সোহেলের না-ও হতে পারে, কিডন্যাপাররা হয়তো কোন লাশের আঙুল কেটে পাঠিয়েছে। চেহারা কঠোর হয়ে উঠল ওর।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল ওরা, এক সময় ইন্সপেক্টর কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে তাকে বাধা দিল রবসন। 'আপনি তো শার্ক কমান্ড সম্পর্কে শুনেছেন, তাই না, ইন্সপেক্টর?'

'শুনিনি মানে? এই তো কিছু দিন আগে জিরো-সেভেন-জিরো...'

'সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে ভিক্টিমকে ছিনিয়ে আনার ব্যাপারে আমরাই সম্ভবত দুনিয়ার সেরা টীম...'

'কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি, মি. রবসন,' শুকনো গলায় বিড়বিড় করে বলল ইন্সপেক্টর। 'কিন্তু আগে কিডন্যাপারদের সন্ধান পেতে দিন, তারপর দেখা যাবে ভিক্টিমকে উদ্ধার করার সুযোগ কারা পায়।'

রাত তিনটের সময় পার্ক লেনের হিলটনে পৌঁছুল রানা। নাইট রিসেপশনিস্ট বলল, 'স্যুইটটা আপনার জন্যে মাঝরাত থেকে রাখা হয়েছে, মি. রানা।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত দেখাল ওকে। কিডন্যাপার আর সোহেলের সন্ধান পাবার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করা হচ্ছে, এই উপলব্ধি নিয়ে পুলিস হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসেছে ও। ইন্সপেক্টর ব্যারি হোম কথা দিয়েছে, জরুরী যে-কোন খবর পাবার সাথে সাথে ফোনে রানাকে জানাবে সে।

রেজিস্টার বুকে সই করে চাবি নিল রানা, ক্লান্ত চোখের পাতা জোর করে মেলে আছে।

'এই নিন, স্যার, কয়েকটা মেসেজ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ এগেইন, অ্যান্ড গুড নাইট।'

এলিভেটরে চড়ে এনভেলাপগুলোর ওপর চোখ বুলাল রানা। প্রথমটা টেলিফোন মেসেজ, ক্লার্ক লিখে রেখেছে। 'ব্যারনেস লিনা অনুরোধ করেছেন তাকে আপনি ফোন করবেন। হয় প্যারিসে কিংবা রবুইলে-র নম্বরে।'

দ্বিতীয়টাও টেলিফোন মেসেজ। 'মিস ডোরা ফোন করেছিলেন। মি. ভিনসেন্ট গগল এখনও ইংল্যান্ডের বাইরে, বিপদের খবরটা এখনও তিনি জানেন না। মিস ডোরা সিক্স-নাইন-নাইন/থ্রী-ওয়ান-থ্রী-তে ফোন করতে বলেছেন।'

তৃতীয়টা সীল করা এনভেলাপ, দামী সাদা কাগজ। রানার নাম লেখা রয়েছে গোটা গোটা অক্ষরে। কোন স্ট্যাম্প নেই। তারমানে হাতে করে দিয়ে গেছে কেউ।

বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে লাগল রানার।

এনভেলাপটা ছিঁড়ে ভেতর থেকে একটা চিরকুট বের করল ও। সেই একই গোটা গোটা অক্ষরে লেখা হয়েছে চিঠিটা। রুদ্ধশ্বাসে পড়তে শুরু করল রানা।

'একটা আঙুল ইতিমধ্যে পেয়েছেন, এরপর হাতটা পাবেন, তারপর একটা পা। এভাবে আরেকটা পা, দুটো চোখ, সবশেষে মাথাটা।

'বিশে এপ্রিলে দ্বিতীয় পার্সেলটা পাবেন। তারপর থেকে প্রতি সাত দিন অন্তর একটা করে পার্সেল।

'এটা ঠেকাতে হলে জীবনের বদলে জীবন চাই আমরা। যেদিন ড. এডওয়ার্ড ওয়ার্নার খুন হবেন সেদিনই আপনার বন্ধু আপনার কাছে ফিরে যাবেন, জীবিত এবং সুস্থ।

'চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলুন, এটার কথা কাউকে জানাবেন না। জানালে অপেক্ষা না করে সাথে সাথে ডেলিভারি দিতে হবে মাথাটা। খলিফা।'

সই করা নামটা দেখে রানা যেন পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলো। স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলেও, সারা শরীর কাঁপতে লাগল। দু'বার কাগজটা ভাঁজ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, অগত্যা মুচড়ে ছোট করে ভরে রাখল পকেটে। পোর্টার ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এলিভেটর থামার পর রানাকে নামতে না দেখে ঘাড় ফেরাল সে। এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেল রানা। নিজের স্যুইটে ঢুকে টাকা দিল পোর্টারকে, কত বলতে পারবে না। দরজা বন্ধ হবার সাথে সাথে দোমড়ানো কাগজটা বের করে ভাঁজ খুলল সেটার।

বারবার পড়ল রানা, এক সময় শুধু পড়ে গেল, শব্দগুলোর কোন অর্থ পাচ্ছে না। উপলব্ধি করল, জীবনে এই প্রথম পরিপূর্ণ আতঙ্ক গ্রাস করেছে ওকে। সম্পূর্ণ দিক্‌ভ্রান্ত আর বোধবুদ্ধিহীন লাগছে নিজেকে।

বুক ভরে বাতাস টেনে চোখ বন্ধ করল রানা। এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনল ধীরে ধীরে, সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত করল মাথাটাকে। তারপর নির্দেশ দিল নিজেকে:

'ভাবো!'

বেশ, ওর গতিবিধি সম্পর্কে খবর রাখছে খলিফা। এমনকি কখন ওর হিলটনে আসার কথা তাও তার জানা। কে কে জানত ব্যাপারটা? ডোরা। কার্ল রবসন। ব্যারনেস লিনা। রবুইলে-তে ব্যারনেসের সেক্রেটারি, সেই তো স্যুইটটা রিজার্ভ করেছিল। আরও জানে হিলটনের কর্মচারীরা। তারমানে অনেক লোক জানে, এদের কার কাছ থেকে খলিফা খবরটা পেয়েছে বের করা প্রায় অসম্ভব।

'ভাবো!'

আজ এপ্রিলের চার তারিখ। ষোলো দিন পর খলিফা সোহেলের হাতটা পাঠাবে। আতঙ্কে আবার কাঁপতে শুরু করল রানা, মনের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে শান্ত করল নিজেকে।

'ভাবো!'

খলিফা ওর ওপর নজর রাখছিল, খুঁটিয়ে মাপছিল, ওর মূল্যায়ন করছিল। রানার মূল্য হলো, কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক না করে ওপর মহলে আসা-যাওয়া করতে পারে। ইচ্ছে করলেই একটা অনুরোধের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে পারে ও। শুধু কি তাই, ইমার্জেন্সী দেখা দিলে যে-কোন বন্ধু রাষ্ট্রের সরকার প্রধানের সাথেও অল্প সময়ের নোটিশে দেখা করতে পারবে ও।

মদ আগেও খেয়েছে রানা, আজ একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হলো। কেবিনেট থেকে বোতল বের করল, গ্লাস বা বরফ খোঁজার ধৈর্য হলো না, বোতল থেকে সরাসরি গলায় ঢালল খানিকটা। আয়নায় অচেনা মুখ, ওকে যেন ভেঙচাচ্ছে। বিষম খেয়ে খকখক করে কাশল রানা। বোতল রেখে দিয়ে আবার পড়ল চিঠিটা।

'ভাবো, রানা!'

খলিফা তাহলে এভাবে কাজ করে। নিজে কখনও আত্মপ্রকাশ করে না। দক্ষ, প্রফেশনাল লোকদের দিয়ে কাজ করায়। লোকগুলো বেশিরভাগ ফ্যানাটিক, জেসিকার মত। ট্রেনিং পাওয়া খুনী, লা পিয়েরে বেনিতের নদীতে যাকে মারা হয়েছে ও তার মত।

পুরানো একটা কথা আছে, তাতে রানার বিশ্বাস ছিল না। কথাটা হলো—সব মানুষেরই একটা মূল্য আছে। নিজেকে আর সবার চেয়ে আলাদা ভাবত ও। এখন জানে, তা নয়। এই নতুন উপলব্ধি অসুস্থ করে তুলল ওকে।

খলিফা ওর, মাসুদ রানার, মূল্য জেনে গেছে। সোহেল, প্রিয় বান্ধব।

নিজের অজ্ঞাতেই কাগজটা মুঠোর ভেতর দলা পাকিয়ে ফেলল রানা। সামনে রাস্তা দেখতে পেল, যে পথে নিয়তি ওকে টেনে নিয়ে যাবে। মনের চোখে দেখতে

পেল, ইতিমধ্যেই রাস্তাটায় প্রথম পা ফেলা হয়ে গেছে তার। জোহানেসবার্গ এয়ারপোর্টের টার্মিনাল ভবনে জেসিকাকে মেরে ফেলে এই প্রথম পদক্ষেপটা নিয়েছে সে।

রাস্তাটা ওকে খলিফা দেখিয়েছে। খলিফাই ওকে সেই রাস্তা ধরে সামনে টেনে নিয়ে যাবে।

অকস্মাৎ যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেল রানা, ড. ওয়ার্নার প্রাণ হারালেই ওর পথ চলা ফুরাবে না। খলিফার ফাঁদে একবার পা দিলে চিরকালের জন্যে বাঁধা পড়ে যাবে ও। কিংবা দু'জনের একজন, রানা বা খলিফা, পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে।

আবার বোতলটা তুলে নিল রানা।

হ্যাঁ, সোহেল হলো রানার মূল্য। সঠিক মূল্যই নির্ধারণ করেছে খলিফা। সোহেলের বদলে অন্য কেউ হলে রানা বোধহয় তার দেখানো পথে বেরুত না।

কাগজটা পুড়িয়ে ফেলল রানা। কাপড়চোপড় না ছেড়ে জানালার সামনে সোফায় বসে পড়ল ধপাস করে, গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল। এতক্ষণে বুঝতে পারল কি রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। উরুর নার্ভগুলো থরথর করে কাঁপছে।

ড. ওয়ার্নারের কথা ভাবল রানা। এ-ধরনের একটা মানুষ মানবসভ্যতাকে অঢেল দিতে পারেন, মানবকল্যাণে অপরিসীম অবদান রাখতে পারেন। আমি কি করব জানি না, কিংবা জানি কিন্তু স্বীকার করছি না। যদি ঠিক করি সোহেলের জন্যে অন্যায় কাজ করব, তাহলে ব্যাপারটাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে মনে হয় খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল আমাকে, ড. ওয়ার্নারকে নয়। ঘটনাচক্রে মারা গেছেন তিনি। গুলিটা আমাকে না লেগে, লেগেছে তাঁকে।

'বোমা হলে ভাল হয়,' ভাবল রানা। বোমার প্রতি একটা ঘৃণা আছে ওর মনে। বোমা যেন বিবেকহীন ভায়োলেন্সের প্রতীক। 'কিন্তু বোমা হলে ভাল হয়।' গুলির মত সরাসরি ছুঁড়তে হয় না। 'কিন্তু এ-কাজ আমার দ্বারা কিভাবে সম্ভব!'

সম্ভব।

না।

হয়তো শেষ পর্যন্ত খলিফারই জিত হবে। রানা জানে, খলিফার মত লোক সোহেলের সন্ধান পাবার কোন সুযোগ রাখেনি।

সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না রানা। ভোরের আলো ফোটার পর হকচকিয়ে গেল ও। এখনও প্ল্যান করছে, কিভাবে খুন করা যায় ড. ওয়ার্নারকে।

শ্বেত সন্ত্রাস-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

এক

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। চারতলার একটা কামরায় পায়চারি করছে ইন্সপেক্টর ব্যারি হোমস। 'ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না!' ভুরু কুঁচকে বিস্ময় প্রকাশ করল সে। 'এখনও ওরা মুক্তিপণ চেয়ে যোগাযোগ করছে না কেন! আজ পাঁচ দিন, তাই না?'

'অথচ ওরা জানে কোথায় পাওয়া যাবে বসকে।' দামী ডাচ চুরুট ধরাল কার্ল রবসন, তারপর অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

বি.বি.সি. টিভি থেকে কিডন্যাপারদের উদ্দেশে একটা আবেদন প্রচার করেছে মাসুদ রানা, ওর বন্ধু আবদুর রব (সোহেল আহমেদের ছদ্মনাম)-কে যেন আর নির্যাতন করা না হয়। জনসাধারণকেও সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে, আবদুর রবকে উদ্ধার করার সহায়ক যে-কোন তথ্য সরাসরি যেন মাসুদ রানার নামে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়। একজন কিডন্যাপারের পুলিস আইডেনটি-কিট পোর্টরেট-ও দেখানো হয়েছে দর্শকদের। তিনটে গাড়ি নিয়ে এসেছিল কিডন্যাপাররা, সোহেলকে তোলা হয় একটা ল্যান্ড-রোভারে, একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে ড্রাইভারের ছবিটা তৈরি করে পুলিস বিভাগের শিল্পী।

সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল। চব্বিশঘণ্টা বাজতে লাগল টেলিফোনগুলো। উৎসাহের সাথে তৎপর হয়ে উঠল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পুলিস। আবদুর রব ওরফে সোহেল আহমেদের সাথে চেহারার মিল আছে এই খবর পেয়ে এগোরোটা জায়গায় হানা দিল তারা।

কালো চুল, কালো চোখ, হাত মাত্র একটা, বয়স হবে আটাশ কি উনত্রিশ। কিন্তু হানা দেয়ার পর জানা গেল, লোকটা মেক্সিকান, বউকে খুন করে ইংল্যান্ডে পালিয়ে এসেছে, ড্রাগ খেয়ে লুকিয়ে আছে হোটেলে।

আরেক হোটেলে হানা দিয়ে একজন ভারতীয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করল পুলিস। লোকটা তার কিশোরী শ্যালিকাকে নিয়ে ফূর্তি করার জন্যে হোটেলে আশ্রয় নিয়েছে।

ল্যান্ড-রোভারের ড্রাইভারের সাথে এক লোকের চেহারার মিল আছে, এই খবর পেয়ে উত্তর স্কটল্যান্ডের একটা পরিত্যক্ত বাড়ি ঘেরাও করা হলো। পরে জানা গেল, লোকটা বাড়িতে এল.এস.ডি. তৈরি করে। চারজন খদ্দের সহ গ্রেফতার করা হলো তাকে।

সবগুলো ফল্স অ্যালার্ম, ছুটোছুটিই সার হলো।

ইন্সপেক্টর ব্যারি হোমসের ওপর রেগে গেল রানা। 'প্রতিটা জায়গায় দেরি

করে পৌঁচেছে আপনার লোকজন। রব ও-সব জায়গায় থাকলেও তাকে আমরা উদ্ধার করতে পারতাম না। এরপর হানা দেয়ার জন্যে যাবে শার্ক কমান্ডোরা!' শার্ক কমিউনিকেশনস নেটওয়র্কের সাহায্যে সরাসরি ড. এডওয়ার্ড ওয়ার্নারের সাথে কথা বলল রানা।

'আমরা আমাদের সমস্ত ক্ষমতা কাজে লাগাব,' ড. ওয়ার্নার রানার সাথে একমত হলেন, তাঁর চেহারায় দরদ এবং উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'রানা, এই দুঃসময়ে প্রতিটি মুহূর্ত তোমার সাথে আছি আমি। কেউ অভিযোগ না করলেও আমি জানি তোমার এই বিপদের জন্যে আমিই দায়ী। কল্পনাও করিনি হামলাটা ওরা তোমার বন্ধুর ওপর করবে। আমি ব্যবস্থা করছি, এখন থেকে হানা দেবে শার্ক কমান্ড। তুমি জানো, যে-কোন সাহায্য চাইলেই আমার কাছ থেকে পাবে তুমি।'

'ধন্যবাদ, ড. ওয়ার্নার।' একটা অপরাধবোধ দুর্বল করে ফেলল রানাকে। আজ থেকে দশ দিনের মধ্যে এই ভদ্রলোককে খুন করার কথা ওর। তা না হলে কিডন্যাপাররা মেরে ফেলবে সোহেলকে।

ড. ওয়ার্নারের প্রভাবে কাজ হলো সাথে সাথে। পুলিস কমিশনারের মাধ্যমে নির্দেশটা ছয় ঘণ্টা পর ডাউনিং স্ট্রীট থেকে পৌঁছে গেল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। এরপর সন্দেহবশত কোথাও হানা দেয়ার দরকার হলে দায়িত্বটা নেবে শার্ক কমান্ড।

বি.সি.আই. এবং রানা এজেন্সির সাথে যোগাযোগ করল রানা। বস মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) রাহাত খান জানালেন, বি.সি.আই. ইউরোপে তার সমস্ত তৎপরতা বন্ধ করে দিয়ে শুধু সোহেলকে খোঁজার কাজে ব্যস্ত থাকছে। রানা এজেন্সিও তাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সোহানা চৌধুরীর নেতৃত্বে। এদিকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর ইন্টারপোল তাদের সাধ্য অনুযায়ী যতটুকু করার করছে।

রয়্যাল এয়ারফোর্স থেকে একজোড়া হেলিকপ্টার দেয়া হয়েছে শার্ক কমান্ডকে, দুর্গম এবং বৈরী পরিস্থিতিতে অবরোধ ভেঙে ভেতরে ঢোকার ও প্রাণ বা মাল-পত্র নিয়ে বেরিয়ে আসার কঠিন ট্রেনিঙে সেগুলো ব্যবহার করছে শার্কের অ্যাসল্ট ইউনিট। রানার সাথে রবসনও কাজ করছে ট্রেনার হিসেবে।

ট্রেনিঙের ফাঁকে দিনের বাকি সময়টা ঘেরাও করা পিস্তল রেঞ্জে কাটায় রানা, এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে অপেক্ষা করে। কিন্তু এক এক করে পেরিয়ে যাচ্ছে দিনগুলো ফলস অ্যালার্ম আর বিপথু সূত্রের মধ্যে দিয়ে।

রোজ রাতে অল্প পরিমাণে হলেও হুইস্কি খেতে হয় রানাকে, তা না হলে ঘুম আসে না। হাতে গ্লাস নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায় ও। দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে চেহারা–ঝুলে পড়ছে মুখ, চোখের নিচে কালি, দৃষ্টিতে সন্ত্রস্ত ভাব।

ডেডলাইনের ছয় দিন বাকি, ব্রেকফাস্ট না করেই হোটেল কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা। গ্রীন পার্কের কাছে টিউব ধরে নেমে এল ফিনসবারি পার্কের কাছে। স্টেশনের কাছাকাছি একটা দোকান থেকে বিশ পাউন্ড অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট গার্ডেন ফার্টিলাইজার কিনল। হিলটনে নিজের কামরায় ফিরে এসে প্লাস্টিক ব্যাগে ভরা নাইট্রেট সুটকেসে রেখে তালা দিল, সুটকেসটা রাখল ক্লজিটের ভেতর ট্রেঞ্চ কোটের পিছনে।

কিডন্যাপাররা কি ওর ওপর নজর রাখছে? রানার জানা নেই। কিন্তু ধরে

নিতে হবে নজর রাখছে। কাজেই ও যে ড. ওয়ার্নারকে খুন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সেটা দেখানো দরকার।

এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসেনি রানা। আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই, চাইলে ড. ওয়ার্নারকে অবশ্যই খুন করতে পারবে ও। কিন্তু প্রশ্ন হলো করবে কিনা। বেপরোয়া একটা মানুষ কি না পারে, বিবেকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখাও তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রিয় বন্ধুর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে রানা কি নিরীহ একজন জ্ঞানসাধককে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবে?

সে রাতে ব্যারনেস লিনার সাথে আবার কথা হলো রানার। আগের মতই লন্ডনে রানার পাশে আসার অনুমতি চাইল সে। 'আমি কি তোমার কোন সাহায্যেই আসব না? সাহায্যে না আসি, তোমার পাশে দাঁড়াবার অধিকারটুকুও কি নেই আমার? শুধু তোমার হাত দুটো ধরার সুযোগ পেলেও মনে হবে তোমাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারলাম…'

'না, লিনা। ও-ধরনের ছেলেমানুষি করার পর্যায় আমরা পেরিয়ে এসেছি।' গলার সুরটা যে নিষ্ঠুর আর কর্কশ রানা নিজেও তা টের পেল। জানে, সংযমের শেষ কিনারায় পৌঁছে গেছে, যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে। 'তোমার উৎস থেকে তুমি কিছু জানতে পেরেছ কিনা বলো।'

'দুঃখিত, রানা। কিচ্ছু জানা যাচ্ছে না, একদম কিচ্ছু না। তবে আমার লোকেরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করছে না…'

মাথায় স্ক্রু লাগানো একটা কন্টেইনারে করে পাঁচ লিটার ডিজেল কিনে আনল রানা। বাথরুমে বসে নাইট্রেট আর ডিজেল নিয়ে কাজ করতে বসল। এক সময় তৈরি হয়ে গেল একুশ পাউন্ড হাই এক্সপ্লোসিভ। কন্টেইনারটাই বোমা হয়ে গেল, মুখে থাকল একটা ফ্ল্যাশলাইট বালব। পুরো একটা স্যুইট ধ্বংস করবে এই বোমা, স্যুইটে কেউ থাকলে তার বাঁচার কোন উপায় নেই।

মনে মনে একটা হোটেলও বেছে রেখেছে রানা। হোটেল ডরচেস্টার। আগেই একটা স্যুইট ভাড়া করে রাখবে ও। খলিফা সম্পর্কে জরুরী একটা তথ্য আছে, এই কথা বলে ড. ওয়ার্নারকে ডরচেস্টারে আনানো সম্ভব। বলবে, তথ্যটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সাক্ষাতে এবং গোপনে দিতে হবে।

সে রাতে ঘুমাতে যাবার আগে আয়নায় নিজের চেহারা দেখে চমকে উঠল রানা। মনে হলো দুরারোগ্য কোন ব্যাধিতে ভুগছে লোকটা। হুইস্কির বোতলটা শেষ করল রানা। তবু ঘুমাতে পারল না।

আইরিশ সী থেকে তীরের তীক্ষ্ণতা নিয়ে ছুটে আসছে হিম বাতাস, বাতাসের আগে আগে উইকলো পাহাড় শ্রেণীর ওপর দিয়ে ছুটছে সীসা রঙের মেঘমালা।

মেঘের স্তরে কোথাও কোথাও ফাঁক দেখা গেল, সেই ফাঁক গলে প্রায় নিষ্প্রভ সূর্যের ম্লান আলো পড়ল সবুজ গাছপালা ঢাকা ঢালগুলোয়। তারপরই শুরু হলো বৃষ্টি।

দুর্যোগ মাথায় করে গ্রামের নির্জন পথে বেরিয়ে এল একটা লোক।

ট্যুরিস্টরা এখনও আসতে শুরু না করলেও তাদের স্বাগত জানানোর জন্যে

রাস্তার দু'পাশে বাড়িগুলোর ফটকে রঙচঙে সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে—'রাতের জন্যে নরম বিছানা আর সকালের জন্যে গরম নাস্তা পেতে হলে...' রাস্তার ডান পাশে পাব, সেটাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল লোকটা। তার পরনে টকটকে লাল কোট, দৃষ্টিকে পীড়া দেয়। গ্রামটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে ব্রিজটা, মাথা নিচু করে সেটা পেরোল সে। ব্রিজের গায়ে বড় বড় হরফে শ্লোগান লেখা রয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরা নিপাত যাক। ব্রিজের নিচে খরস্রোতা নদী তুমুল বেগে ছুটে চলেছে সাগরের দিকে। চওড়া কার্নিস সহ সুতী ক্যাপ লোকটার মাথায়, প্রায় ঢেকে রেখেছে চোখ দুটোকে। চোরা চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে সে। পায়ে গোড়ালি ঢাকা বুট, কিন্তু হাঁটছে বিড়ালের মত সতর্কতার সাথে। গ্রামে মাত্র দু'একটা বাড়ি দোতলা বা তিনতলা, বৃষ্টি আর ঝড়ো বাতাসের মধ্যে পরিত্যক্ত বলে মনে হলো। কিন্তু তার জানা আছে, পর্দা ঘেরা জানালা দিয়ে নজর রাখা হচ্ছে তার ওপর।

উইকলো পাহাড়ের নিচের ঢালে এই গ্রাম ডাবলিন থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে। বড় শহরের এত কাছাকাছি আশ্রয় নেয়া উচিত হয়নি। কিন্তু সিদ্ধান্তটা তার নয়। এখানে লোকজন কম, যে-কোন আগন্তুককে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। হয় শহরের ভেতর নাহয় শহর থেকে অনেক দূরে নির্জন কোন এলাকায় থাকতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তাকে কোন কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়নি।

গ্রামে ওরা আসার পর আজ নিয়ে তিন বার বাইরে বেরুল সে। প্রতিবার জরুরী কোন জিনিসের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় বেরুতে হয়েছে। বুদ্ধি করে আগেই যদি জিনিসগুলোর ব্যবস্থা করে রাখা হত তাহলে আর বেরুতে হত না। এমন অব্যবস্থার শিকার হতে হবে জানলে কাজটা হয়তো নিত না সে। তবে হ্যাঁ, স্বীকার করতে হবে টাকাটা খুব বেশি। এত টাকা এক সাথে দেখেনি সে। এই টাকায় সারাজীবন বসে খেতে পারা যায়। স্বপ্ন বলে মনে হয়—এক লাখ পাউন্ড! পঞ্চাশ হাজার অগ্রিম দেয়া হয়েছে, বাকি পঞ্চাশ হাজার পাবে কাজ শেষ হলে।

কিন্তু তবু কয়েকটা ব্যাপার মেনে নিতে মন চায় না। সহকারী একজন দরকার ছিল তা ঠিক, কিন্তু তাই বলে একজন বদ্ধ মাতালকে গছিয়ে দেয়ার কি দরকার ছিল! দায়িত্বটা তাকে দিলে সে-ই তো যোগ্য একটা লোক বেছে নিতে পারত!

অসন্তুষ্ট লোকটার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। ক'দিন ধরে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল, আজ একেবারে মুষলধারে শুরু হয়েছে। বাড়িটায় সেন্ট্রাল হিটিং থাকলেও সেটা তেলে চলে, এবং কাজ করছে না। ছোট একটা ফায়ার প্লেস আছে, কিন্তু কয়লা থেকে ধোঁয়া ওঠে। বাড়িটা স্যাঁতসেঁতে, দেয়াল আর ছাদ থেকে পানি পড়ে। প্রতিটি কোণে মাকড়সার জাল। টিকটিকি, ইঁদুর, তেলেপোকা, আর পিঁপড়েদের রাজত্ব। কে জানে, সাপও থাকতে পারে, গর্ত তো আর এক-আধটা নয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা ঠাণ্ডা, আর সময় কাটানো। হাফ-বুড়ো একটা মাতালের সাথে কি কথা বলবে সে!

নিজের কাজে সে দক্ষ, আন্ডারগ্রাউন্ডে তার সুনামও আছে। কিন্তু কাজটা নেয়ার পর দেখা যাচ্ছে, চাকরের ভূমিকা দেয়া হয়েছে তাকে। কিছু কেনার জন্যে

মাতালটাকে বাইরে পাঠানো সম্ভব নয়, কাজেই বাধ্য হয়ে তাকেই বারবার বেরুতে হচ্ছে।

মুদী দোকানদার তাকে আসতে দেখল। চাপা গলায় বউকে ডাকল সে, 'অ্যাই, দেখে যাও, দেখে যাও, পোড়োবাড়ির লোকটা আবার আজ আসছে।'

পিছনের দরজা ঠেলে দোকানে বেরিয়ে এল দোকানদারের কুমড়োমুখী বউ, চোখ জোড়া চকচক করছে কৌতূহলে। 'শহুরে লোক গ্রামে ঠাই নিয়েছে, তারপর আবার এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে বাইরে না বেরিয়ে পারেনি–তুমি যাই বলো, আমি কিন্তু একটা কেচ্ছার গন্ধ পাচ্ছি!'

পোড়োবাড়ির নতুন বাসিন্দাদের সম্পর্কে এরই মধ্যে নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, যদিও গ্রামবাসীরা এই একজনকে ছাড়া আর কাউকে দেখেনি এখনও। স্থানীয় এক্সচেঞ্জের টেলিফোন অপারেটর মেয়েটা প্রথম জানায়, পোড়োবাড়িতে একাধিক মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। দেশের বাইরে টেলিফোন কল করা হয়েছে দুটো। পরবর্তী খবর পাওয়া গেল মিউনিসিপ্যালিটির ট্রাক ড্রাইভারের কাছ থেকে, ডাস্টবিন থেকে শুধু ক্যান পাওয়া গেছে। তারমানে পোড়োবাড়ির লোকেরা তাজা শাক-সজি বা মাংস খায় না, টিনজাত খাবার খেয়ে বেঁচে আছে। ডাস্টবিনে কিছু তুলো আর গজ পাওয়া গেছে, কারণটা অজ্ঞাত। কারও কারও ধারণা, বাড়িটায় অসুস্থ কোন লোক আছে, বা হয়তো আহত হয়েছে কেউ।

'আমার ধারণা, বাড়িটায় কোন খারাপ কাজ হচ্ছে,' কনুই দিয়ে স্বামীর পাঁজরে মৃদু গুঁতো দিয়ে বলল দোকানদারের বউ।

'চুপ, চুপ!' স্ত্রীকে সাবধান করল দোকানদার। 'বিপদ ডেকে আনতে চাও নাকি, অ্যাঁ?'

দোকানে ঢুকে শহুরে লোকটা ক্যাপ খুলল, দরজার ফ্রেমে আছাড় মেরে পানি ঝাড়ল। ওদের দিকে ফিরে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সে।

'গুড মর্নিং, মি. হ্যারি। সব ভাল তো?'

পোড়োবাড়ির হ্যারি জবাব না দিয়ে শুধু মাথা ঝাঁকাল। শেলফের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে কি কি আছে।

'তা বইটা কত দূর লেখা হলো, স্যার?' হ্যারি দুধওয়ালাকে জানিয়েছে, সে নাকি একটা বই লিখছে। অসম্ভব নয়, ভাবল দোকানদার। উইকলো পাহাড়ে সারা বছরই কিছু লেখক আসে লেখার কাজ শেষ করার জন্যে। এলাকাটা নিরিবিলি তো বটেই, তাছাড়া আয়ারল্যান্ড সরকার লেখক-শিল্পীদের ট্যাক্স কনসেশন দিয়ে থাকে।

'একটু একটু করে লিখছি,' বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল হ্যারি। কি কি লাগবে মুখস্থ করে এসেছে সে, দোকানদার জিনিস-পত্র নামাতে শুরু করল শেলফ থেকে।

সবগুলো নামানো শেষ হলে খাতা পেন্সিল হাতে নিল দোকানদার, নাম আর দাম লিখবে। একটা জিনিস হাতে নিয়ে হ্যারির দিকে তাকাল সে, চোখে প্রশ্ন। কিন্তু হ্যারি কোন জবাব দিল না, বরং তার চেহারা কেমন যেন কঠোর হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি জিনিসটা নামিয়ে রেখে লেখা শেষ করল দোকনদার। যোগ করল সে, বলল, 'তিন পাউন্ড বিশ পেন্স।'

দাম চুকিয়ে বেরিয়ে গেল হ্যারি। পিছন থেকে দোকানদার বলল, 'ঈশ্বর আপনার সহায় হোন, মি. হ্যারি।' কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

স্বামীর পাঁজরে আবার গুঁতো মারল দোকানদারের বউ। 'কেমন বদমেজাজী, তাই না? নিশ্চয়ই কোন মেয়েকে জোর করে আটকে রেখেছে বাড়িটায়।'

'হুঁ,' চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল দোকানদার। 'প্যাড, ব্রেসিয়ার, প্যান্টি–চিন্তারই কথা।'

দ্রুত হাতে চুলে চিরুনি চালাতে শুরু করে দোকানদারের বউ বলল, 'যাই, পাশের বাড়ির নতুন বউটার সাথে একটু দেখা করে আসি।' কোন সন্দেহ নেই, এক ঘণ্টার মধ্যে খবরটা গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়বে। শুধু মেয়েলি জিনিসই নয়, অ্যান্টিসেপটিক মলম আর ব্যান্ডেজ কিনেছে পোড়োবাড়ির লোকটা।

সরু একটা গলির শেষ মাথায় বাড়িটা, গলির দু'পাশে বারো ফুট উঁচু পাঁচিল। বাড়ির সামনের পাঁচিলও বারো ফুট উঁচু, বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। দরজা পুরানো হলেও, তালাটা নতুন। সেটা খুলে ভেতরে ঢুকল হ্যারি। ভেতরে প্রথমে একটা একচালা, গ্যারেজ বলা যেতে পারে। গ্যারেজে গাঢ় নীল রঙের একটা অস্টিন রয়েছে, দু'হপ্তা আগে বহু দূর এক শহর থেকে চুরি করা। চুরি করার পর রঙ বদলানো হয়েছে গাড়িটার, বদলানো হয়েছে নম্বর প্লেট। রোজ দু'বার করে স্টার্ট দেয় হ্যারি, দরকারের সময় ঠিকমত কাজ করবে কিনা চেক করে রাখে। তার যা পেশা, এক সেকেন্ড এদিক ওদিক হয়ে গেলে প্রাণ হারাতে হতে পারে। ইগনিশনে ঢুকিয়ে চাবি ঘোরাতেই স্টার্ট নিল অস্টিন। আধ মিনিট ধরে এঞ্জিনের আওয়াজ শুনল সে, সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল। স্টার্ট বন্ধ করার আগে অয়েল প্রেশার আর ফুয়েল গজও চেক করল। গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল কিচেনের সামনের উঠানে।

আগাছায় ভরে আছে উঠানটা, চারদিকে ব্যাঙের ছাতা। কিচেনে ঢুকে ক্যাপ আর ব্যাগ মেঝেতে নামিয়ে রাখল হ্যারি। একটা দেরাজ খুলে পিস্তলটা বের করল। ভাল মত পরীক্ষা করে নিয়ে বেল্টে গুঁজে রাখল সেটা। পকেট ফুলে থাকবে বলে সাথে করে নিয়ে যায়নি বাইরে, ফলে এতক্ষণ অসহায় বোধ করছিল। গ্যাসের চুলো জ্বেলে তাতে কেটলি চাপাল সে। পাশের ঘর থেকে মাতালটার গলা ভেসে এল।

'ফিরলে নাকি?'

হ্যারি জবাব দিল না। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল বিশালদেহী ডাক্তার, দু'হাতে দরজার ফ্রেম ধরে থাকলেও একটু একটু দুলছে সে। লোকটার ফোলা ফোলা মুখ দেখেই বলে দেয়া যায়, নেশাখোর।

'সব পেয়েছ?'

ব্যাগটার দিকে হাত তুলল হ্যারি। 'যা পেয়েছি ওতে আছে, ডাক্তার।'

'খবরদার!' রাগে ফেটে পড়ল মাতাল লোকটা। 'ওই নামে আমাকে ডাকবে না! অনেক দিন থেকে আমি আর ডাক্তার নই!'

'ডাক্তার নও?' ঠোঁট-বাঁকা হাসি দেখা দিল হ্যারির মুখে। 'কিন্তু মেয়েরা যে

বলে তুমি তাদের বোঝা নামাও?'

'দেখো, ভাল হবে না কিন্তু…!' টলতে টলতে ঘুরে দাঁড়াল মাতাল লোকটা। হ্যাঁ, এককালে সত্যি খুব ভাল একজন ডাক্তারই সে ছিল বটে। কিন্তু এখন শুধু গর্ভপাতের জন্যে ডাকা হয় তাকে। কিংবা ফেরারী কোন আসামী বন্দুক যুদ্ধে আহত হলে তার খোঁজ করা হয়। মদের কারণে পসার, খ্যাতি, নিরাপত্তা, সবই হারাতে হয়েছে তাকে। কয়েক সেকেন্ড পর আবার দোরগোড়ায় ফিরে এল সে। উবু হয়ে বসে ব্যাগটা খুলল। 'তোমাকে না আমি অ্যাডেসিভ টেপ আনতে বলেছিলাম?'

'দোকানে নেই। ব্যান্ডেজ আর মলম এনেছি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু এসব কি? ব্রেসিয়ার, প্যান্টি?' অবাক চোখ তুলে তাকাল সে।

'তোমাকে যারা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে তারাই ভাল জানে,' ঝাঁঝের সাথে বলল হ্যারি। 'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না।' ব্যাপারটা সত্যি রহস্যময়, ভাবল সে। অগ্রিম টাকা দেয়ার সময় তাকে বলা হয়েছিল, পোড়োবাড়িতে আশ্রয় নেয়ার ক'দিন পর এই জিনিসগুলো কিনে রাখতে হবে। কারণ? কারণ পোড়োবাড়িতে একটা মেয়েকেও পাঠানো হবে। কিন্তু কবে, কার সাথে, কিছুই তাকে জানানো হয়নি।

'কিন্তু অ্যাডেসিভ টেপ ছাড়া তো…'

ডাক্তারকে থামিয়ে দিয়ে হ্যারি বলল, 'এবার থেকে তোমার যা দরকার তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসবে, আমি এনে দিতে পারব না!'

'কি আশ্চর্য, আমি কি জানতাম আহত একজন লোকের চিকিৎসা করতে হবে!'

'কানের কাছে ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না তো!' কাপে কফি ঢালল হ্যারি। 'পারলে ব্যান্ডেজ দিয়ে আঙুলটা বাঁধো, না পারলে যেমন আছে তেমনি থাক–পচে যাক আঙুল, আমার কি!'

ঘরে ঢুকে আবার ফিরে এল ডাক্তার, হাতে রক্ত মাখা তুলো। 'লোকটার অবস্থা ভাল নয়, হ্যারি। ওর ওষুধ দরকার। অ্যান্টিবায়োটিক দরকার। মরফিন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখছি বলে মনে কোরো না…'

'অ্যান্টিবায়োটিকের কথা ভুলে যাও।'

পাশের ঘর থেকে অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল।

'লোকটা মারা গেলে আমাকে দায়ী করতে পারবে না।'

'আমি কে, অ্যাঁ? ভেবেছ তোমার লোকেরা তোমাকে ছেড়ে দেবে?'

'আমার লোকেরা? ওদের কাউকে আমি চিনিই না! অচেনা একজন লোক দেখা করে বলল, মোটা টাকা পাবে, আমিও রাজি হয়ে গেলাম। কাজ কিছুই না, একজনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে। তারপর না শুনলাম, কিছু কাটাকাটির কাজও করতে হবে, প্রতিবারের জন্যে দশ হাজার পাউন্ড মজুরি। বেশ ভালই। কিন্তু তার মানে কি এই নাকি যে ওষুধপত্রের ব্যবস্থা থাকবে না, অথচ রোগী মারা গেলে আমাকে দায়ী করা হবে?'

'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না, আমি কিছু জানি না।'

হঠাৎ দাঁত বের করে হাসল ডাক্তার, চেহারায় কাঙালের মিনতি ফুটে উঠল। 'এবার দেবে নাকি? বেশি না, মাত্র দু'ঢোক।'

ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে মাথা নাড়ল হ্যারি। 'পরে।'

বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে তুলোগুলো পানি দিয়ে ধুতে ধুতে মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'হাতটা আমার দ্বারা কাটা সম্ভব বলে মনে হয় না।' তার হাত কাঁপছে। 'একটা আঙুল কেটেছি তাই যথেষ্ট। হাত-টাত কাটতে পারব না।'

'তোমার বাপ কাটবে,' কর্কশ কণ্ঠে বলল হ্যারি। 'টাকা নিচ্ছ, কাজ করবে না কেন? আমি যা বলব তাই করতে হবে তোমাকে।'

দুই

ভিনসেন্ট গগলের বাড়ির সামনে থেকে কিডন্যাপ করা হয় আবদুর রবকে, সাংবাদিকদের জানানো হয়েছিল আবদুর রব ভিনসেন্ট গগলের ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু। সোহেলের সাথে গগলের পরিচয় থাকলেও, বন্ধুত্ব ছিল এ-কথা বলা যায় না। গগলের বন্ধু রানা। এবং তার জানা আছে, সোহেলকে কতটুকু ভালবাসে মাসুদ রানা। বন্ধুর এই মানসিক অশান্তির সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল গগল, কিডন্যাপারদের সম্পর্কে কেউ কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারলে দু'লাখ পাউন্ড পুরস্কার দেয়া হবে বলে ঘোষণা করল সে। ঘোষণাটা টেলিভিশন, রেডিও, আর খবরের কাগজে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হলো।

টেলিফোন রিসিভ করার জন্যে দু'জন লোক রাখা হয়েছিল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে, সংখ্যা বাড়িয়ে চারজন করা হলো। অসংখ্য টেলিফোন কল আসছে, বেশিরভাগই ভুয়া বা ভিত্তিহীন খবর নিয়ে। এক বুড়ি মহিলা ফোন করে জানাল, আবদুর রবকে সে তার ঘরে আটকে রেখেছে, ত্রিশ লাখ পাউন্ড দিলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গেটে রেখে আসবে তাকে। মহিলা পাগল, রোজই একবার ফোন করে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে, বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। আরেক লোক জানাল, আবদুর রবকে কিডন্যাপাররা কোথায় রেখেছে সে জানে, কিন্তু তার ছেলেকে জামিনে খালাস দেয়া না হলে বলবে না। মুশকিল হলো, সবগুলো কল চেক করে দেখতে হচ্ছে।

'আপনার সাথে যোগাযোগ…?' রানাকে জিজ্ঞেস করল ইন্সপেক্টর ব্যারি হোমস। নিজেও জানে, শুধু শুধু জিজ্ঞেস করা। রানার টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র বসানো হয়েছে–শার্ক কমান্ডের হেডকোয়ার্টার আর হোটেলে।

'না,' মিথ্যে কথা বলল রানা। এখন খুব সহজেই মিথ্যে বলতে পারছে ও, যেমন খুব সহজেই ভাবতে পারছে সোহেলকে উদ্ধার করার জন্যে কি করতে হবে ওকে।

'ব্যাপারটা আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না, মেজর। ওরা যোগাযোগ করছে না কেন? চুপচাপ থাকার একটাই অর্থ হতে পারে–মুক্তিপণের জন্যে নয়, আপনার'

বন্ধুকে ওরা কিডন্যাপ করেছে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে।'

রানা কোন মন্তব্য করল না।

'কাল ডেপুটি-কমিশনার ফোন করেছিলেন। জানতে চাইছিলেন, স্পেশাল ইউনিট আর কতদিন রাখতে হবে আমাকে?'

'আপনি কি বললেন?'

'বললাম, দশ দিনের মধ্যে কোন দাবি না জানানো হলে আমরা ধরে নেব আবদুর রব বেঁচে নেই।'

'হুঁ।' সম্পূর্ণ শান্ত থাকল রানা। আসল ব্যাপার শুধু একা সে জানে। খলিফার দেয়া সময়ের মধ্যে এখনও বাকি রয়েছে চারদিন।

কবে কি করতে হবে ঠিক করে ফেলেছে রানা।

ফোনে কাল সকালে ড. ওয়ার্নারের সাথে কথা বলবে ও। জরুরী খবর আছে, দেখা হওয়া দরকার। আশা করা যায় বারো ঘণ্টার মধ্যে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। প্রস্তাবটা যথেষ্ট লোভনীয় করে তুলবে রানা, ফলে না এসে উপায় থাকবে না ড. ওয়ার্নারের।

কিন্তু যদি কোন কারণে ড. ওয়ার্নার না আসেন, ডেডলাইনের আগে রানার হাতে আরও তিনটে দিন থাকছে। বিকল্প প্ল্যানের জন্যে যথেষ্ট সময়। বিকল্প প্ল্যান মানে ওকেই ড. ওয়ার্নারের কাছে যেতে হবে। অবশ্য প্রথম প্ল্যানটাই সব দিক থেকে ভাল। কিন্তু সেটায় যদি কাজ না হয়, যে-কোন ঝুঁকি নিতে রাজি আছে রানা। হঠাৎ ওর খেয়াল হলো, ইন্সপেক্টর ব্যারি হোমস হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমি দুঃখিত, মেজর। আপনার মনের অবস্থা কি রকম বুঝতে পারি। কিন্তু আমি চাইলেও ইউনিটকে অনির্দিষ্টকালের জন্যে আটকে রাখতে পারি না। এমনিতেই আমাদের লোকজন কম...'

'আমি জানি, ইন্সপেক্টর।' হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল রানা। বিধ্বস্ত চেহারায় পরাজয়ের ভাব ফুটে উঠল।

'এই, আমাদের কফি দাও!' রানার হাত ধরে একটা চেয়ারের দিকে এগোল ইন্সপেক্টর। 'বসুন আপনি, মেজর। চিন্তা করে কোন লাভ নেই, যা হবার তা তো হবেই...'

পাশের ঘর থেকে মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, মহিলা পুলিসরা কথা বলছে ফোনে। দু'জনের বয়স বিশ থেকে বাইশের মধ্যে, বাকি দু'জন মাঝ বয়েসী। চারজনের মধ্যে একজনের চুল সোনালি।

শান্ত মিষ্টি গলা তার। 'গুড মর্নিং। দিস ইজ পুলিস স্পেশাল ইনফরমেশন ইউনিট-'। আজ বারো দিন এই চেয়ারে বসে একই কাজ করছে সে।

অপরপ্রান্ত থেকে কথা বলল কেউ, কথার সুরে বিদেশী টান, 'আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন পরিষ্কার?'

'ইয়েস, স্যার।'

'তাহলে মন দিয়ে শুনুন। সাইরাস কারচিভাল তাকে আটকে রেখেছে...'

লোকটা বিদেশী নয়, ইচ্ছে করে গলা বিকৃত করছে।

'সাইরাস কারচিভাল?' জিজ্ঞেস করল সোনালি-চুল মেয়েটা।
'হ্যাঁ, সাইরাস কারচিভাল। ভদ্রলোককে লারাগ-এ আটকে রেখেছে সে।'
'শব্দটা বানান করুন, প্লীজ।'
লারাগ বানান করার সময় আবার বিদেশী টানটুকু থাকল না কণ্ঠস্বরে।
'লারাগ জায়গাটা কোথায়, স্যার?'
'কাউন্টি উইকলো, আয়ারল্যান্ড।'
'ধন্যবাদ, স্যার। আপনার নামটা যেন কি বললেন?'

লোকটা তার নাম বলেনি, বললও না, রিসিভার নামিয়ে রাখল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেসেজটা প্যাডে লিখল মেয়েটা, লেখার সময় চোখ তুলে হাতঘড়িতে সময় দেখল। 'সাত মিনিট পর টি-ব্রেক,' বলে প্যাড থেকে কাগজটা ছিঁড়ে মাথার ওপর দিয়ে পিছন দিকে বাড়িয়ে ধরল। পিছনে বসে আছে অল্প বয়েসী মোটাসোটা সার্জেন্ট, হাতে তুলে নিল সেটা।

'চলো, তোমাকে স্যান্ডউইচ খাওয়াব,' প্রস্তাব দিল সার্জেন্ট।

'আমি সুন্দরী বলে, নাকি আমাকে আরও মোটা দেখতে চাও?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

কাগজটা পড়ছে সার্জেন্ট। 'সাইরাস কারচিভাল। নামটা আমার চেনা চেনা লাগছে কেন?'

বয়স্ক আরেক সার্জেন্ট মুখ তুলল। 'সাইরাস কারচিভাল?' হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'দেখি, আমাকে দেখতে দাও!' কাগজটা পড়ে ঝট্ করে মুখ তুলল। 'নামটা চেনো কারণ ওয়ান্টেড পোস্টারে দেখেছ, টিভিতেও দেখে থাকতে পারো। সাইরাস কারচিভাল, একজন টেরোরিস্ট। বোমাবাজ। সন্দেহ করা হয় বেলফাস্টের চীফ কনস্টেবলকে সেই বোমা মেরে খুন করেছে।'

মোটাসোটা সার্জেন্ট ঠোঁট গোল করে শিস দিল। 'তাহলে তো রুই। জাল ফেললেই...'

দ্বিতীয় সার্জেন্ট তার কথা শুনছে না, নক না করেই ইনার অফিসে ঢুকে পড়ল ঝড়ের বেগে।

সাত মিনিটের মধ্যে ডাবলিন পুলিসের সাথে যোগাযোগ করল ইন্সপেক্টর ব্যারি হোমস।

তার কানের কাছে মাছির মত ভন ভন করল রানা, 'কঠোর ভাষায় কথা বলুন, ওদের কানে যেন পানি ঢোকে-কোন অবস্থাতেই হামলা করা যাবে না...'

ইন্সপেক্টর ওকে থামিয়ে দিল, 'আমার ওপর ভরসা রাখুন, কি করতে হবে আমার জানা আছে।' কানেকশন পাওয়া গেল, এক মিনিট পর একজন ডেপুটি কমিশনারের সাথে কথা বলতে শুরু করল সে। শান্তভাবে দশ মিনিট কথা বলার পর রিসিভার নামিয়ে রাখল। 'স্থানীয় কনস্টেবলরাই ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখবে, ডাবলিন থেকে লোক পাঠালে শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে। তদন্তে যাই জানা যাক, ওরা হানা দেবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে ধন্যবাদ জানাল রানা। 'জায়গার নামটা আগে কখনও

শুনিনি। লারাগ। সম্ভবত ছোট একটা জায়গা…'

'ম্যাপ আনতে পাঠিয়েছি,' বলল ইন্সপেক্টর, তারপর ম্যাপ এসে পৌঁছুবার সাথে সাথে দু'জন হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেটার ওপর। 'লারাগ-উইকলো পাহাড়ের ঢালে, উপকূল থেকে দশ মাইল ভেতরে।' লার্জ-স্কেল ম্যাপ থেকে তার বেশি কিছু জানা গেল না। 'আবার ডাবলিন পুলিস যোগাযোগ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'না। আমি চাই আপনি যোগাযোগ করুন। ওদের বলুন ওরা যেন সার্ভেয়ার-জেনারেলের সাথে কথা বলে। তার কাছে ডিটেল্ড ম্যাপ পাওয়া যাবে-গ্রামের ম্যাপ, এরিয়াল ফটোগ্রাফস, স্ট্রীট লে-আউট। ওদের বলুন, এ-সব একজন লোককে দিয়ে যেন এনিসকেরী এয়ারফিল্ডে পাঠিয়ে দেয়া…'

'এখুনি কি এতটা ব্যস্ত হওয়া উচিত হবে? এটাও যদি ফলস অ্যালার্ম হয়?'

স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না রানা, লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করল। 'এক গ্যালন পেট্রল আর ড্রাইভারের সময় খরচ হবে, তাই না? ফলস অ্যালার্ম? হতে পারে, কিন্তু আমার তা মনে হয় না। জানোয়ারটার গন্ধ পাচ্ছি আমি।'

হতভম্ব হয়ে রানার দিকে তাকাল ইন্সপেক্টর।

সেটা লক্ষ করে তাড়াতাড়ি বাতাসে হাত ঝাপটা দিল রানা, বলল, 'ও কিছু না, এ ম্যানার অভ স্পীচ।' পরমুহূর্তে মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল। হেলিকপ্টার ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু তাতেও সমস্যা আছে, মাঝপথে রিফুয়েলিঙের দরকার হবে। তিন সেকেন্ড চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছল ও। ইন্সপেক্টরের ডেস্কের সামনে থেমে ক্রেডল থেকে ফোনের রিসিভার তুলে শার্ক কমান্ডে কার্ল রবসনের প্রাইভেট নম্বরে ডায়াল করল।

'কার্ল,' উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়েছে রানা, চাপা গলায় কথা বলছে। 'এইমাত্র একটা ইনফরমেশন পাওয়া গেছে। এখনও কনফার্মড কিছু নয়। তবে আমার মন বলছে, এখানেই।'

'কোথায়?' ব্যগ্রকণ্ঠে জানতে চাইল রবসন।

'আয়ারল্যান্ড।'

'মাই গড, এত থাকতে ওই নরকে!'

'এনিসকেরীতে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে হেলিকপ্টারের?'

'এক সেকেন্ড।' রানা শুনতে পেল, কার সাথে যেন পরামর্শ করছে রবসন, সম্ভবত রয়্যাল এয়ারফোর্সের কোন পাইলটের সাথে। ত্রিশ সেকেন্ড পর লাইনে ফিরে এল সে। 'মাঝপথে ফুয়েল নিতে হবে ওদের, রানা।'

'হ্যাঁ?'

'চার ঘণ্টা তিরিশ মিনিট,' রবসন জানাল।

'দশটা বিশ এখন, তাই না? এনিসকেরীতে পৌঁছুতে প্রায় তিনটে বেজে যাবে। আবহাওয়ার যা অবস্থা, পাঁচটার মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে।' দ্রুত চিন্তা করছে রানা। আয়ারল্যান্ড অনেক দূরের পথ, শার্ক কমান্ডকে পাঠানো উচিত হবে কি? ওখানে পৌঁছুবার পর যদি জানা যায় ব্যাপারটা ফলস অ্যালার্ম, আর ঠিক

তখনই যদি সঠিক কোন খবর স্কটল্যান্ড বা হল্যান্ড থেকে আসে? উঁহুঁ, এত কথা ভাবলে চলবে না। মনের কথা শুনতে হবে। জানোয়ারটার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু গ্রীন কন্ডিশন ঘোষণা করার জন্যে রবসনকে অর্ডার করতে পারে না ও। ড. এডওয়ার্ড ওয়ার্নার মুখে যা-ই বলুন, শার্ক কমান্ডের কমান্ডিং অফিসার এখন রানা নয়, রবসন। 'কার্ল,' বলল রানা, 'আমার একটা অনুরোধ রাখবে? আমরা যদি আধ ঘন্টাও দেরি করি, অন্ধকার হবার আগে সোহেলকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। তুমি কি কন্ডিশন গ্রীন ঘোষণা করবে?'

অনেকক্ষণ কথা বলল না রবসন। শুধু তার হালকা নিঃশ্বাসের আওয়াজ পেল রানা। তারপর শুনতে পেল, 'খুব বেশি হলে চাকরিটা হারাতে হবে। ঠিক আছে, বস্, কন্ডিশন গ্রীন ঘোষণা করা হলো। পনেরো মিনেটের মধ্যে হেলিপ্যাড থেকে আমরা তোমাকে তুলে নেব, তৈরি থেকো।'

মেঘের রাজ্যে ভাঙচুর শুরু হয়েছে, কিন্তু আগের চেয়ে আরও চঞ্চলমতি হয়ে উঠেছে বাতাস। খোলা হেলিপ্যাডে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় হি হি করছে রানা আর ইন্সপেক্টর ব্যারি হোমস। ট্রেঞ্চ কোট, ব্লেজার, আর রোলনেক জ্যাকেট পরে আছে রানা, সব ভেদ করে চামড়ায় হুল ফোটাচ্ছে হিম বাতাস। অশান্ত টেমস নদীর ওপারে, দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, যে-কোন মুহূর্তে হেলিকপ্টারগুলোকে দেখা যাবে।

'এনিসকেরীতে আপনারা পৌঁছুবার আগেই এখানে বসে আমি যদি কনফার্ম নিউজ পেয়ে যাই?'

'রয়্যাল এয়ারফোর্সের ফ্রিকোয়েন্সিতে পাবেন আমাদের,' বলল রানা।

বাতাসে উড়ে যাবার ভয়ে হ্যাটটা এক হাতে চেপে ধরে আছে ইন্সপেক্টর। তার জ্যাকেটের কিনারা পতাকার মত পত পত করে উড়ছে। 'আশা করি আপনাকে কোন দুঃসংবাদ দিতে হবে না।'

বাড়িগুলোর ছাদ প্রায় ছুঁয়ে ছুটে এল কপ্টার দুটো। একশো ফিটের মধ্যে আসার পর একটা কপ্টারের দোরগোড়ায় কার্ল রবসনকে চিনতে পারল রানা।

'গুড হান্টিং,' রোটরের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ইন্সপেক্টরের কণ্ঠস্বর 'এদিকে কাজ না থাকলে আপনাদের সাথে আমিও যেতাম।'

হালকা পায়ে ছুটল রানা, কংক্রিট প্যাডে হেলিকপ্টারের গিয়ার নামার আগেই লাফ দিল। ওকে ধরে ফেলল রবসন, দু'হাতে জড়িয়ে নিয়ে ভেতরে ঢোকাল, বরাবরের মত দামী ডাচ চুরুট ঠিকই ঝুলে আছে ঠোঁটে।

'ধন্যবাদ, বস্,' নিঃশব্দে হেসে বলল সে। 'ট্রেনিং নিতে নিতে ক্লান্ত হয়ে গেছি, এবার দেখা যাক অ্যাকশন দেখাবার সুযোগ পাই কিনা।'

'ভদ্রলোকের অবস্থা ভাল নয়।' ভেতরের কামরা থেকে বেরিয়ে এসে সিঙ্কের সামনে দাঁড়াল ডাক্তার, প্লেটের খাবার সিঙ্কের নিচে একটা বালতিতে ফেলে দিল 'কিছুই খাওয়াতে পারলাম না।' ঝট করে ঘাড় ফেরাল সে। 'নিয়মিত ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হচ্ছে, তারপর আবার হাত-পা বেঁধে রাখার দরকারটা কি বলতে পারো

আমাকে?'

একমনে খাচ্ছে সাইরাস কারচিভাল, প্লেট থেকে মুখ তুলল না। সে ভাবছে, এরকম একটা দুর্বলচিত্তের লোককে কেন তার ঘাড়ে চাপানো হলো! মেয়েদের গর্ভপাত ঘটায়, আহত টেরোরিস্টদের চিকিৎসা করে, কিন্তু লোকটার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ আর বিবেক পুরোমাত্রায় রয়ে গেছে এখনও-অন্তত কোন কোন ব্যাপারে। তার ওপর, নেশাখোর। মদ না পেলে এমনিতেই এই লোকের পাগল হবার কথা। সাবধান হওয়া দরকার, যে-কোন মুহূর্তে উদ্ভট কিছু একটা করে বসতে পারে ডাক্তার।

তার নিজের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়। গোটা ব্যাপারটা এত অগোছাল যে মনে হয় যেন একটা ষড়যন্ত্রের জালে ফেলা হয়েছে তাকে। ডাক্তার একটা উপদ্রব। লারাগের এই পোড়োবাড়িতে আশ্রয় নেয়াটা হাস্যকর রকম বোকামি। মেয়ের দেখা নেই, অথচ মেয়েলি জিনিসগুলো কিনতে হলো। খেতে খেতেই চিন্তায় মাথাটা নুয়ে এল সাইরাস কারচিভালের। গ্রাম থেকে বেরিয়ে যাবার একটাই মাত্র পথ, পালাতে হলে ওই পথ ধরেই যেতে হবে। কেন, এরকম একটা গ্রামে আসতে বলার কি দরকার ছিল? এক জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে না থেকে বার বার জায়গা বদল করা অনেক বেশি নিরাপদ, কিন্তু তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেন?

আর এই শালার বৃষ্টি!

উচিত ছিল হাত, পা আর মাথা কেটে রেখে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, তারপর দেহটা মাটির নিচে পুঁতে ফেলা। সেক্ষেত্রে ডাক্তারকে সঙ্গে রাখা দরকার হত না।

তারপর ভাবল সে, আচ্ছা, এই খলিফা লোকটা কে?

মেক্সিকোয় ওরা তার সাথে যোগাযোগ করে। বলল, কাজটা খলিফার, এক লাখ পাউন্ড পুরস্কার। এমনভাবে বলল, খলিফা যেন এই দুনিয়ার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। কাজটা ও নেবে কিনা সেটা জানার জন্যে অপেক্ষা করেনি ওরা, তার আগেই ওর ছবিসহ পাসপোর্ট যোগাড় করে ফেলেছিল। প্রফেশনাল, কোন সন্দেহ নেই। শুধু যে টাকার লোভে কাজটা নিয়েছে কারচিভাল তা নয়, ভয়েরও একটা অবদান আছে। লোকগুলো তার মনে খলিফার ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কে এই খলিফা?

খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরাল কারচিভাল। নামটা কেমন যেন। ভুরু কুঁচকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে কেন যেন শিউরে উঠল সে। মারামারি কাটাকাটি করে অনেক বছর কাটাল সে, বিপদের গন্ধ আগে থেকেই পেয়ে যায়।

কাজটায় অনেক ত্রুটি রয়েছে, সেগুলোর পিছনে গুরুতর কারণ না থেকে পারে না। সুতী ক্যাপটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কারচিভাল।

'কোথায় যাচ্ছ শুনি?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

'একটু হেঁটে আসি।'

'তোমার ভাবসাব আমার ভাল লাগছে না। এত ঘন ঘন বাইরে যাবার কি দরকার?'

জ্যাকেটের ভেতর থেকে পিস্তলটা বের করে চেক করল কারচিভাল, তারপর বেল্টে গুঁজে রাখল আবার। 'তোমার কাজ সেবিকার ভান করা, তুমি তাই করো। পুরুষের কাজটা আমাকে করতে দাও।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

বৃষ্টির মধ্যে আরোহীদের দেখা গেল না, ছোট একটা কালো অস্টিন এসে থামল গ্রামের একমাত্র মুদী দোকানের সামনে। রাস্তার দু'পাশে জানালার পর্দাগুলো নড়ে উঠল, আরোহীদের নামতে দেখে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল ঘরে ঘরে। শীতকালীন নীল ইউনিফর্ম পরে আইরিশ পুলিস বিভাগের দু'জন লোক নামল, মাথার হ্যাটে হাত রেখে ছুটে ঢুকে পড়ল দোকানের ভেতর। 'গুড মর্নিং, লিজা, ওল্ড লাভ,' দোকানদারের কুমড়োমুখী বউকে বলল সার্জেন্ট।

'হাওয়ার্ড ম্যাকলিন, আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়ে বলতে চাই…,' দোকানদারের বয়স্কা বউ হেসে কুটি কুটি হলো। ত্রিশ বছর আগে ওরা দু'জন একজন প্রিস্টের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের পাপ স্বীকার করেছিল, সেই থেকে বিচ্ছেদ, এবং পদস্খলনের ইতি, তারপর দু'জনেই ওরা অন্য মানুষকে বিয়ে করে সুখে ঘর-সংসার করছে। মাঝে মধ্যে ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়, বন্ধুর মত হাসি-ঠাট্টা করে। 'তা কি মনে করে আমাদের এই অজ পাড়া-গাঁয়ে…?'

'তোমার হাসি, লিজা, তোমার হাসি–মনে পড়লেই চলে আসতে হয়। তা নতুন কিছু ঘটল নাকি এদিকে? দু'একটা অচেনা মুখ চোখে পড়ে?'

'নতুন মুখ কোত্থেকে আসবে…ওহে, রসো–পোড়োবাড়িতে একজন উঠেছে বটে। একজন কি ক'জন তা বাপু বলতে পারব না…'

একটা নোটবুক খুলে লিজার সামনে ধরল সার্জেন্ট ম্যাকলিন, ভেতরে একটা ফটো রয়েছে। 'দেখো তো, ওল্ড লাভ, এই লোকটা কিনা।'

কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর মাথা নাড়ল লিজা। 'উঁহুঁ। আমরা যাকে দেখেছি এ সে লোক নয়। মি. হ্যারির বয়স আরও বেশি, গোঁফ আছে, তবে গার্লফ্রেন্ডের বয়স বেশি হবে বলে মনে হয় না…'

'ছবিটা দশ বছর আগে তোলা।'

দোকানদার তার বউয়ের পাশে এসে দাঁড়াল, ফটোটা দেখে কথা বলার জন্যে হাঁ করল সে। তার বউ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি থামো! সার্জেন্ট হাওয়ার্ড, কথাটা তোমার আগেই বলা উচিত ছিল। হ্যাঁ, তাহলে এটা মি. হ্যারির ছবি।'

'পোড়োবাড়ি বলছ? টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি তো?'

'পুলিসী কাজে?' জিজ্ঞেস করল দোকানদার। 'তাহলে তোমাকে পয়সা দিতে হবে।'

'পয়সাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়ো,' তিরস্কার করল লিজা স্বামীকে। পরমুহূর্তে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে, 'তোমাকে আমি বলিনি, গোটা ব্যাপারটার মধ্যে একটা রসাল কেচ্ছা আছে?' সার্জেন্ট ম্যাকলিন স্থানীয় এক্সচেঞ্জের অপারেটর মেয়েটার সাথে কথা বলছে। 'সার্জেন্ট হাওয়ার্ড, ব্যাপারটা কি জানতে পারি? নিশ্চয়ই কোন নাবালিকা মেয়েকে ভাগিয়ে এনেছে, তাই না?'

ঘাড় ফিরিয়ে সার্জেন্ট শুধু হাসল একটু।

তিন

ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে কেউ কোথাও নেই, তবু বাগানের ভেতর দিয়ে পাথুরে পাঁচিল ঘেঁষে শিকারী বিড়ালের মত সন্তর্পণে এগোল সাইরাস কারচিভাল। বাগানের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে একটা আপেল গাছে চড়ল, পাঁচিলের ওদিকে রাস্তায় তাকাল।

বিশ মিনিট নড়ল না কারচিভাল। রাস্তায় কোন লোককে দেখেনি সে, কোন জানালার পর্দাও নড়ছে না। গাছ থেকে পাঁচিলের মাথায়, সেখান থেকে রাস্তার ধারে নেমে পড়ল সে।তারপর রাস্তার দু'দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল।

বিপদের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু খুঁতখুঁতে ভাবটা থেকেই যাচ্ছে। কয়েক পা হেঁটে একটা লোহার গেট টপকে আরেক বাগানে ঢুকল সে, ঝোপের ভেতর দিয়ে এক কোণে চলে এল, তারপর উঁকি দিয়ে নিচু পাঁচিলের ওদিকে তাকাল। এখানটায় বাঁক নিয়েছে রাস্তা, বহুদূর পর্যন্ত নির্জন, তারপর সব ঝাপসা।

কেন মনে হচ্ছে বিপদ বেশি দূরে নয়?

সমস্ত ঘটনা এক এক করে স্মরণ করল কারচিভাল। খলিফার কাছে একটা মাত্র পার্সেল পাঠিয়েছে সে-বোতলে ভরা লোকটার আঙুল। টেলিফোন করেছে দু'বার।

বোতলটা পাঠানো হয় লোকটাকে কিডন্যাপ করার দু'ঘণ্টা পর, ওষুধের প্রভাবে লোকটা তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ডাক্তার, মি. ওয়াইন নাম দিয়েছে সে, লাল একটা পুরানো ফোর্ড ডেলিভারি ভ্যানে বসে কাজটা সারে। ভ্যানটা নিয়ে কেমব্রিজ রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছিল ওরা, লোকটাকে নিয়ে একটা ল্যান্ড-রোভার এল। তখন সন্ধে লাগছে, রাস্তার ধারের একটা কফি শপের পার্কিং লটে ছিল ওরা। ডাক্তারের সাথে যন্ত্রপাতি আর ঘুমের ওষুধ ছিল, কিন্তু অন্যান্য ওষুধ কিছুই ছিল না। মাতাল ডাক্তারের হাত কাঁপছিল, কাজটা ভালভাবে সারতে পারেনি। ভরপেট মদ খাওয়া অবস্থায় ছিল সে, তার ওপর পিস্তলের মুখে কাজটা করানো হয়। টাকার লোভ দেখিয়েও প্রথমে আঙুল কাটতে রাজি করানো যায়নি ব্যাটাকে। অবশ্য আঙুল কাটার পর রোগীকে ছেড়ে পালাবার কোন লক্ষণ তার মধ্যে দেখা যায়নি। কাটা অংশে ইনফেকশন দেখা দিয়েছে।

একটা পিকআপ কারে বোতলটা পৌঁছে দিয়ে আসে কারচিভাল। ঠিক জায়গাতেই ছিল গাড়িটা, আগে থেকে ঠিক করা সঙ্কেত পেয়ে এগিয়ে যায় সে। পাশে ভ্যানটা দাঁড় করিয়ে বোতলটা ছুঁড়ে দেয় ভেতরে, তারপর সবেগে চলে আসে। সরাসরি আয়ারল্যান্ডের লারাগে।

লারাগে পৌঁছেই প্রথম ফোনটা করে সে। ইন্টারন্যাশনাল কল ছিল ওটা, আগেই নির্দেশ দেয়া ছিল তাকে, শুধু একটা বাক্য উচ্চারণ করতে হবে। 'আমরা নিরাপদে পৌঁছেছি।'

এক হপ্তা পর ওই একই নম্বরে ডায়াল করে সে, সেবারও তাকে শুধু একটা বাক্য উচ্চারণ করতে হয়, 'সময়টা আমরা উপভোগ করছি।'

কারচিভালের মনে আছে, লোকাল এক্সচেঞ্জের অপারেটর মেয়েটা দু'বারই তাকে পাল্টা ফোন করে জিজ্ঞেস করে, কলটা সন্তোষজনক হয়েছে কিনা। ইন্টারন্যাশনাল কলে কম কথাই বলে মানুষ, তাই বলে এত কম? সন্দেহ নেই হতভম্ব হয়ে পড়েছিল মেয়েটা।

চারদিকে সন্দেহের বীজ ছড়ানো হচ্ছে, বুঝতে পেরেছিল কারচিভাল। এ-ধরনের ভুল-ভাল করে বলেই তো পুলিসের হাতে ধরা পড়ে যায় অপরাধীরা। প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থাকলেও সুযোগ ছিল না তার, খলিফাকে সে পাবে কোথায়? ইন্টারন্যাশনাল ফোন নম্বরটা ছাড়া তার সাথে যোগাযোগ করার আর কোন মাধ্যম নেই।

গাছ থেকে নেমে গেটের পাশে দাঁড়াল কারচিভাল, সিদ্ধান্ত নিল তৃতীয় ফোনটা চারদিন পর করার কথা থাকলেও করবে না সে। কিন্তু তারপরই তার মনে পড়ল, হাতটাও ডেলিভারি দেয়ার কথা চারদিন পর। সে ফোনে যোগাযোগ করলে তাকে জানানো হবে কোথায়, কিভাবে ডেলিভারি দিতে হবে হাতটা।

অস্বস্তি আরও বেড়ে গেল তার। এভাবে জেনেশুনে নিজেকে জালে জড়াবার কোন মানে হয় না! হতে পারে টাকা অনেক বেশি, তাই বলে বোকার মত ধরা পড়ার ঝুঁকি কেন নিতে যাবে সে! তার মনে হতে লাগল, গোটা ব্যাপারটার ভেতর গোপন কিছু একটা আছে, তাকে জানানো হয়নি।

তবে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড পাবার সাথে সাথে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে রেখেছে সে, ধরা পড়লেও সে টাকায় হাত দেয়ার সাধ্য কারও নেই। এমনকি খলিফাও এখন আর তার ওই টাকা কেড়ে নিতে পারবে না।

গেটের পাশ থেকে উঁকি দিয়ে আবার রাস্তায় তাকাল কারচিভাল। চোখের কোণে কি যেন একটা নড়ে উঠতে শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা ঢেউ নেমে গেল।

প্রায় চারটে বাজে; কালচে খয়েরী আর ঠাণ্ডা সবুজাভ পাহাড়ে অন্ধকার নামছে। পাহাড়ের মাথায়, আঁকাবাঁকা রাস্তার ওপর ছারপোকা আকৃতির সচল কি যেন একটা দেখা গেল। ঢালু রাস্তা দিয়ে সবেগে নেমে আসছে ব্রিজের দিকে। তারপর চিনতে পারল কারচিভাল। ছোট একটা সেলুন কার। একটু পর ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেল সেটা।

ফোন কলগুলোর কথা ভেবে আবার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সে, গাড়িটার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই। ফোনগুলো করার কোন প্রয়োজন ছিল কি? খলিফা কি কারণে এ-ধরনের ঝুঁকি নিতে গেল?

ব্রিজ পেরিয়ে সোজা ছুটে এল গাড়িটা। কালো একটা অস্টিন। বৃষ্টির জন্যে আরোহীদের দেখা গেল না। হঠাৎ আবার শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল কারচিভালের। গাড়ির গতি কমে গেছে। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। ছুটতে ছুটতে মুদী দোকানে ঢুকল তারা।

পুলিস!

বাগানের ভেতর দিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল কারচিভাল। যতক্ষণ বিপদের আশঙ্কা

ছিল উত্তেজনায় ছটফট করছিল সে, কিন্তু বিপদ এসে গেছে দেখে সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে পড়ল। বাড়িতে ফিরে এসে কিচেনে কাউকে দেখল না, দড়াম করে পাশের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে।

রোগীর সেবা করছে ডাক্তার, বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'তোমাকে না বলেছি ভেতরে ঢোকার আগে নক করবে?'

ঝাঁঝটুকু গায়ে না মেখে কারচিভাল বলল, 'আমরা পালাচ্ছি।'

'ওর অবস্থা দেখছ?' সোহেলের দিকে তাকাল ডাক্তার। ওষুধের প্রভাবে অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। ইনফেকশন মারাত্মক হয়ে ওঠায় তার গায়ের রঙ বদলে গেছে। কাটা আঙুলের ক্ষতটা দগদগ করছে, ফুলে চাঁপা কলার মত দেখাচ্ছে পাশেরটাকে। হাতটার অন্যান্য আঙুল সহ কনুই পর্যন্ত সবটুকু ফুলছে। পচন ধরতে আর বেশি দেরি নেই। রোগী কি রকম কষ্ট পাচ্ছে তা শুধু ডাক্তারই আন্দাজ করতে পারে। মরফিনের মাত্রা বাধ্য হয়ে বাড়াতে হয়েছে তাকে, তা না হলে ঘুম ভেঙে গিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিত। 'এই অবস্থায় ওঁকে নড়ানো যাবে না।'

'তাহলে আর কি করা,' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল কারচিভাল। 'ওকে এখানে রেখেই যেতে হবে।' বেল্ট থেকে পিস্তলটা বের করল সে, তালুর ধাক্কায় হ্যামার টেনে বিছানার দিকে এগোল।

'খুন করবে?' কারচিভালের পথ আটকে দাঁড়াল ডাক্তার।

তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল কারচিভাল, দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেলো ডাক্তার।

'তুমি ঠিকই বলছ। এ একটা বোঝাই বটে।' সোহেলের কপালের পাশে পিস্তলের মাজল ঠেকাল কারচিভাল।

'না!' আর্তনাদ করে উঠল ডাক্তার। 'তোমার পায়ে পড়ি, মেরো না ওকে! নেব, আমি ওকে নিয়ে যাব!'

'অন্ধকার হবার সাথে সাথে বেরিয়ে পড়ব আমরা,' পিছিয়ে এসে বলল কারচিভাল। 'তৈরি থাকো।'

নিচে আইরিশ সী যেন ক্ষতবিক্ষত সীসার পাত। লীডারের চেয়ে একটু পিছনে আর ওপরে রয়েছে দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটা। সিরনারভোঁ থেকে নতুন করে ফুয়েল নিয়েছে ওরা, ওয়েলশ কোস্ট ছাড়ার পর অনুকূল বাতাস থাকায় অল্প সময়ে অনেকটা পথ পেরিয়ে আসতে পেরেছে। তবু সময়ের আগে পৌঁছুনো সম্ভব হবে না, চারদিক কালো করে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। কয়েক সেকেন্ড পরপরই হাতঘড়ি দেখছে রানা।

খোলা সাগরের ওপর দিয়ে মাত্র নব্বই মাইল পেরোতে হবে, রানার কাছে মনে হলো গোটা আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছে ওরা। হোল্ডের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা বেঞ্চটা, রানার পাশে বসে একমনে চুরুট টানছে কার্ল রবসন, যদিও অনেক আগেই নিভে গেছে সেটা। শার্ক টীমের বাকি সবাই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েবসে আছে, কেউ কেউ অস্ত্রগুলোকে ব্যবহার করছে বালিশ হিসেবে।

একা শুধু রানাই অস্থির। জানালায় উঁকি দেয়ার জন্যে আবার একবার উঠল ও। অবশিষ্ট দিনের আলো পরীক্ষা করল, যাচাই করল দিগন্তরেখার কতটা ওপরে

রয়েছে মেঘে ঢাকা সূর্য।

বেঞ্চে আবার ফিরে এল রানা, রবসন সান্ত্বনা দিল ওকে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে, বস।'

'কার্ল, আমাদের একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এই হামলায় প্রায়োরিটি কি হবে?'

'কিসের প্রায়োরিটি, বস? এই অপারেশনে একটাই অবজেক্ট–সোহেলকে ছিনিয়ে নেয়া, নিরাপদে।'

'কিন্তু বন্দীদের ইন্টারোগেট করব না?'

'কাউকে বন্দী করতে চাওয়া মানে সোহেলের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়া। তার ক্ষতি করার কোন সুযোগ কেন আমরা দেব শত্রুদের? টার্গেট এরিয়ার ভেতর কিছু নড়তে দেখলেই গুলি করে উড়িয়ে দেব।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওখানে অবশ্য চুনোপুঁটি ছাড়া নেই কেউ, ইন্টারোগেট করলেও পালের গোদার সাথে কোন যোগাযোগ বের করা যাবে না। কিন্তু ড. ওয়ার্নারকে বুঝ দেবে কিভাবে তুমি? কাউকে বন্দী করা হয়নি শুনে রেগে যাবেন না?'

'ড. ওয়ার্নার?' ঠোঁটের কোণ থেকে চুরুট নামাল রবসন। 'কই, নামটা শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না। এখানে সিদ্ধান্ত নেয় চাচা রবসন।' ঠোঁট টিপে হাসল সে। এই সময় কেবিনে ঢুকে চিৎকার করে উঠল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার।

'সামনে আইরিশ কোস্ট–সাত মিনিটের মধ্যে আমরা এনিসকেরীতে নামছি, স্যার।'

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল এনিসকেরী এয়ারপোর্টে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে। ল্যান্ড করার জন্যে পৌঁছে গেছে তিনটে প্লেন, পাইলটদের নির্দেশ দেয়া হলো সার্কিট অলটিচ্যুডের কিছুটা ওপরে উঠে গিয়ে অপেক্ষা করো। যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে রয়্যাল এয়ারফোর্সের একজোড়া হেলিকপ্টার, সাথে সাথে ল্যান্ড করার সুযোগ দিতে হবে ওগুলোকে।

মেঘের ভেতর থেকে অকস্মাৎ বেরিয়ে এল কপ্টার দুটো। সাবলীল ভঙ্গিতে হ্যাঙ্গার অ্যাপ্রনে নামল। সাথে সাথে দুই হ্যাঙ্গারের মাঝখান থেকে ছুটল একটা পুলিস কার। রোটরের ব্লেড তখনও পুরোপুরি থামেনি, লীডার কপ্টারের পাশে ঘ্যাঁচ করে থামল কার। আইরিশ পুলিসের একজন অফিসার আর সার্ভেয়ার জেনারেলের একজন প্রতিনিধি নামল টারমাকে।

'রানা,' নিজের পরিচয় দিল রানা। শার্ক কমান্ডের ড্রেস পরে রয়েছে ও–এক প্রস্থ কাপড়ে তৈরি কালো স্যুট, সফট বুট। উরুর কাছে ওয়েরিং বেল্টে রয়েছে পিস্তলটা।

'মেজর, কনফার্ম খবর পাওয়া গেছে,' হ্যান্ডশেক করার সময় বলল পুলিস ইন্সপেক্টর। 'ফটো দেখে গ্রামবাসীরা সাইরাস কারচিভালকে চিনতে পেরেছে। কোন সন্দেহ নেই গ্রামে ঠাঁই নিয়েছে কারচিভাল।'

'গ্রামের কোথায়?'

'কিনারায়, স্যার। পোড়ো একটা বাড়িতে।' চশমা পরা সার্ভেয়ারকে কাছে ডাকল ইন্সপেক্টর। ফাইলটা বুকের সাথে চেপে ধরে আছে সার্ভেয়ার। হেলিকপ্টারের খোলে কোন চার্ট টেবিল নেই, সার্ভে ম্যাপ আর ফটোগ্রাফগুলো ডেকের ওপর মেলা হলো।

দ্বিতীয় হেলিকপ্টার থেকে ডেকে নেয়া হলো অন্যান্যদের। বিশজন কমান্ডো হুমড়ি খেয়ে পড়ল ম্যাপ আর ফটোর ওপর। 'এই যে, এখানে বিল্ডিংটা।' নীল পেন্সিল দিয়ে ম্যাপের একজায়গায় ছোট একটা বৃত্ত আঁকল সার্ভেয়ার।

'ভাল,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রবসন। 'নদী বা রাস্তা ধরে যেতে পারব আমরা, ব্রিজ বা চার্চ পর্যন্ত—বাড়িটা ও-দুটোর মাঝখানে।'

'বাড়িটার ব্লো আপ নেই, ভেতরের কোন প্ল্যান?' শার্ক কমান্ডের একজন জানতে চাইল।

'দুঃখিত, ভাল করে খুঁজে দেখার সময় পাইনি আমরা,' ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল সার্ভেয়ার।

'ক'মিনিট আগে লোকাল পুলিস রেডিওতে আবার রিপোর্ট করেছে। উঁচু পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা, ভেতরে কাউকে দেখা যায়নি।'

'কি!' প্রায় আঁতকে উঠল রানা। 'কড়া নির্দেশ ছিল বাড়িটার কাছাকাছি যাওয়া চলবে না!'

'পাবলিক রোড দিয়ে মাত্র একবার গাড়ি চালিয়ে গেছে ওরা।' ইন্সপেক্টরকে অপ্রতিভ দেখাল। 'জানার দরকার ছিল...'

'লোকটা যদি কারচিভাল হয়, গাড়িটাকে একবার দেখেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে!' পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে রানা, চোখ দুটো রাগে জ্বলছে। 'কেউ যদি কোন নির্দেশ মানে!' পাইলটের দিকে তাকাল ও। হলুদ লাইফ-জ্যাকেট, হেলমেট, আর বিল্ট-ইন মাইক্রোফোনসহ ইয়ারফোন পরে আছে সে। 'তুমি আমাদের সরাসরি ওখানে নিয়ে যেতে পারবে?'

সাথে সাথে উত্তর না দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল পাইলট। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার। 'দশ মিনিটের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে। এখানে আমরা এয়ারপোর্ট ভি.ও.আর. বীকন-এর সাহায্যে পৌঁছুতে পেরেছি–,' তাকে সন্দিহান দেখাল। '–টার্গেট চেনে এমন কেউ থাকবে না। কপ্টারে... । ধেত্তেরি, ঠিক জানি না। এটুকু বলতে পারি, কাল সকালে প্রথম আলোয় আপনাদের আমি পৌঁছে দিতে পারব...'

'আজ রাতে, এখনই। পারবে?'

'লোকাল পুলিস যদি টার্গেট দেখিয়ে দেয় তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি–টর্চ বা ফ্লেয়ার দরকার হবে।'

'আলোর ব্যবস্থা করা যাবে না,' বলল রানা। 'শত্রুরা টের পেয়ে যাবে।'

কপ্টারের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল।

'এখানে বসে দেরি করা মানে...,' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'মনে করো মস্ত একটা ঝুঁকি নিতে হবে তোমাকে, নেবে কি?' প্রায় আবেদনের সুরে কথা বলছে রানা। একজন পাইলটকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাধ্য করতে পারে

না ও।

মাথা নিচু করে পাইলট বলল, 'এই আবহাওয়ায় ঢাল পেরোতে হবে, তাই না?'

'একবার চেষ্টা করে দেখো না, ভাই,' বলল রানা। 'প্লীজ।'

আরও পাঁচ সেকেন্ড ইতস্তত করল পাইলট। 'লেট'স গো!' আওয়াজটা হঠাৎ তার গলা থেকে বেরুতেই কমান্ডোদের মধ্যে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। দ্বিতীয় কন্টারের লোকেরা লীডার কন্টার থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত। তাদের পিছু পিছু নামল পুলিস ইন্সপেক্টর আর সার্জেন্ট।

বাতাসের প্রবল চাপ আর ঝাপটায় ইতস্তত করতে করতে এগোল হেলিকন্টার। শক্ত কিছু হাতের কাছে যে যা পেয়েছে ধরে আছে, তবু গড়াগড়ি খাওয়া থেকে রেহাই পেল না। নিচে ঘর-বাড়ি, খেত-খামার, বনভূমি খুব কাছে মনে হলো, সবেগে পিছন দিকে ছুটছে-কিন্তু দুর্যোগময় কালো রাতে পরিষ্কারভাবে কিছুই দেখার উপায় নেই। গ্রাম্য এলাকার নির্জন পথে নিঃসঙ্গ একজোড়া হেডলাইটের আলোয় কোন বাড়ির বারান্দা হয়তো এক পলকের জন্যে আলোকিত হয়ে উঠল, পাইলট আন্দাজ করে নিল কোন লোক-বসতির ওপর দিয়ে যাচ্ছে তারা। মাঝে মধ্যে নিচেটা চকচকে লাগল, আন্দাজ করে নিতে হয় ওখানে কোন খাল-বিল বা নদী আছে। নিকষ কালো অন্ধকারের বিস্তৃতি দেখে বুঝে নিতে হলো, জঙ্গলের ওপর দিয়ে যাচ্ছে তারা, কিংবা মাটি আর কন্টারের মাঝখানে ঘন মেঘের স্তর রয়েছে।

মেঘের আড়াল থেকে যতবারই বেরুল ওরা, দিনের ক্ষীণ রশ্মি আরও একটু করে কম লাগল চোখে। এনিসকেরী এয়ারকন্ট্রোলের সাথে রেডিও যোগাযোগ রাখা দরকার, কন্টারগুলো তাই খুব বেশি উঁচুতে উঠতে পারছে না। মাঝখানের দূরত্ব যত বাড়ছে ততই নিচে নামতে হলো। অন্ধকারে কোথায় কি আছে বোঝার উপায় নেই, মেঘ মনে করে ভেতরে ঢোকার সময় কোন ঢালের গায়ে ধাক্কা খেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

দুই পাইলটের মাঝখানের জাম্প সীটে বসে আছে রানা, ওর পিছনে ঠাঁই করে নিয়েছে রবসন। সবাই ওরা নিঃশব্দে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। উত্তেজনায় টান হয়ে আছে পেশী, চার জোড়া চোখ উপকূল রেখা খুঁজছে।

তীর দেখা গেল, মাত্র পনেরো ফিট নিচে সাদা ফেনা টগবগ করে ফুটছে যেন। তীর রেখা ধরে দক্ষিণ দিকে কোর্স বদল করল পাইলট। কয়েক সেকেন্ড পরই উজ্জ্বল আলোর একটা মালা দেখা গেল।

'উইকলো,' বলল পাইলট, সে থামতেই কো-পাইলট নতুন দিক নির্দেশনা দিল। একটা চিহ্ন যখন পাওয়া গেছে, এবার সরাসরি লারাগের দিকে যেতে পারবে ওরা।

উপকূল থেকে অল্প দূরে রাস্তা, সেটাকে অনুসরণ করল ওরা।

'চার মিনিট পর টার্গেট,' রানার কানের কাছে চেঁচাল পাইলট, আঙুল দিয়ে খোঁচা মারার ভঙ্গিতে সামনের দিকটা দেখাল ওকে।

কোন মন্তব্য না করে কুইক-রিলিজ হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা টেনে বের করল রানা। চেক করার সময় ভাবল, কিন্তু সোহেলকে পাওয়া যাবে তো?

ছোট একটা এয়ারব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ভরে নিল সাইরাস কারচিভাল। বিছানা সহ খাটটা সরিয়ে দেয়াল খানিকটা উন্মুক্ত করল সে, হার্ডবোর্ডের আবরণ এক টানে নামাতেই বেরিয়ে পড়ল গোপন একটা শেলফ।

শেলফে ছোট একটা প্লাস্টিকের মোড়ক রয়েছে, নতুন পাসপোর্ট আর প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র আছে ওটায়। ধলিফা এমনকি ভিকটিমের কাগজ-পত্রও যোগান দিয়েছে–মি. সোহরাব হোসেন, ডক্টর ময়নিহানের রোগী। নতুন পরিচয়-পত্রে মি. হ্যারি হলো মেইল নার্স, ডাক্তার ময়নিহানের সহকারী। প্লাস্টিকের প্যাকেট খুলে কাগজগুলো পকেটে ভরল সে। প্যাকেটে পিস্তলের জন্যে অতিরিক্ত কিছু অ্যামুনিশন আর পনেরোশো পাউন্ড ট্রাভেলার্স চেক রয়েছে। সেগুলোও পকেটে চালান করল সে। তারপর বেরিয়ে এল কিচেনে।

'রেডি?'

'সাহায্য করো।'

এয়ারব্যাগ মেঝেতে ফেলে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কারচিভাল। দিনের অবশিষ্ট আলো দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, মেঘগুলো এত কাছে মনে হলো যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। বনের ভেতর দৃষ্টি চলে না, অন্ধকার হয়ে গেছে।

'আমি একা ওকে বয়ে নিয়ে যাব কিভাবে!' ঘ্যান ঘ্যান করে উঠল ডাক্তার, ঝট করে তার দিকে ফিরল কারচিভাল।

আবার ছোটা শুরু হলো। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল কারচিভাল। পালিয়ে পালিয়ে যতদিন বেঁচে থাকা যায়। অদ্ভুত এবং রোমাঞ্চকর জীবন, কোন কাজ না করে প্রচুর মালপানি কামানো যায় এই পেশায়। কিন্তু ভুল করলে তার খেসারত দিতে হয় জীবনের বিনিময়ে। এবার একসাথে অনেকগুলো ভুল হয়ে গেছে। সে নয়, আর কেউ দায়ী।

'কি হলো, একটু ধরবে না?'

একাই বিছানা থেকে সোহেলকে কাঁধে তোলার চেষ্টা করেছিল ডাক্তার, পারেনি। ঘুমে অচেতন শরীরটা বিছানা থেকে ঝুলে আছে অর্ধেক।

'সামনে থেকে সরো!' হেঁড়ে গলায় ধমক লাগাল কারচিভাল, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ডাক্তারকে। সোহেলের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে।

সোহেলের চোখ বন্ধ, ভেতরে মণি দুটো একটু একটু নড়ছে। মুখ খোলা, কেঁপে উঠল ঠোঁট জোড়া। ফুলে ফুলে উঠল নাকের ফুটো। 'আমি কি বেঁচে?' বিড়বিড় করে বলল সে।

ভুরু কুঁচকে ডাক্তারের দিকে তাকাল কারচিভাল। 'কি বলে?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল ডাক্তার।

সিধে হলো কারচিভাল, কি যেন ভাবছে। তার স্থির ভাব দেখে ভয় পেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল ডাক্তার।

'একে বাঁচিয়ে রাখা মানে বিপদে পড়া, পালাতে দেরি হয়ে যাবে...,'

আপনমনে কথা বলছে কারচিভাল।

'না! খলিফা বলেছেন, কোন অবস্থাতেই তাঁর নির্দেশ ছাড়া ওকে খুন করা যাবে না!'

হঠাৎ যেন সংবিৎ ফিরে পেল কারচিভাল। 'হ্যাঁ, ভুলিনি।' দু'হাতে ধরে সোহেলকে তুলল সে, কাঁধে ফেলে দরজার দিকে এগোল। উঠানে বেরিয়ে এসে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ব্রিজের দিকে তাকাল সে। কিন্তু অন্ধকারে ব্রিজটা দেখা গেল না।

ইতিমধ্যে গ্যারেজে ঢুকে গাঢ় নীল অস্টিনের দরজা খুলে ফেলেছে ডাক্তার। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

গাড়িতে সোহেলকে তুলে ড্রাইভিং সীটে বসল কারচিভাল। 'এখনও ঠিক করিনি। উত্তরে একটা সেফ হাউস আছে, কিংবা সাগর পেরিয়ে ইংল্যান্ডেও চলে যেতে পারি...'

'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কেন, এমন হুট করে?'

উত্তর না দিয়ে আবার গাড়ি থেকে নামল কারচিভাল। ওরা যে এখানে ছিল, তার কোন চিহ্ন রাখা চলবে না। কিচেনে ঢুকে দরজা বন্ধ করল সে, বন্ধ দরজার গায়ে এলোপাতাড়ি লাথি মারতে শুরু করল। পুরানো কাঠ, ভেঙে গেল কবাট। পাশের ঘর থেকে চেয়ার আর টেবিল নিয়ে এসে জড়ো করল এক জায়গায়। সেগুলোর ওপর খবরের কাগজ রাখল; তারপর আগুন ধরাল। বাকি দরজা আর জানালাগুলো খুলে দিল সে।

গ্যারেজের সামনে ফিরে এসে স্থির ভাবে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল কারচিভাল। উপকূলের দিক থেকে কি রকম যেন একটা যান্ত্রিক আওয়াজ আসছে। হয়তো পাহাড়ী পথ বেয়ে কোন ভারী ট্রাক যাচ্ছে। উঁহুঁ। বড় বেশি দ্রুত বাড়ছে শব্দটা। মনে হলো মেঘে মেঘে ছড়িয়ে পড়ছে যান্ত্রিক গুঞ্জন।

তারপর চিনতে পারল কারচিভাল আওয়াজটা। রোটরের শব্দ। পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে হাতে। ছুটল গাড়ির দিকে।

'কি হলো?' গাড়ির ভেতর থেকে কারচিভালকে লক্ষ করছিল ডাক্তার, ঘুমন্ত সোহেলকে দু'হাতে আগলে ধরল সে। 'কি করতে চাও তুমি?'

চার

'বৃথা চেষ্টা!' ঘাড় বাঁকা করে রানার উদ্দেশে চিৎকার করল পাইলট, ফ্লাইট ইন্সট্রুমেন্ট থেকে চোখ সরায়নি। দ্বিতীয় কপ্টারটাকে হারিয়ে ফেলেছে ওরা। 'অন্ধ হয়ে গেছি, দেখতে পাচ্ছি না কিছু।' জানালা আর উইন্ডস্ক্রীনের ঠিক বাইরে কিনারা উপচানো দুধের মত ফুটছে মেঘ। 'মেঘের ওপরে উঠে এনিসকেরীর দিকে ফিরে যেতে হবে আমাকে। যে অবস্থায় আছি, যে-কোন মুহূর্তে নাম্বার টু-র সাথে

ধাক্কা লাগতে পারে।'

সাত মিনিট হলো মেঘ ওদেরকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে, তারও বেশ ক'মিনিট আগে হারিয়ে গেছে দ্বিতীয় কপ্টারটা। হারিয়ে গেছে মানে হয়তো আশপাশেই কোথাও আছে সেটা, কিন্তু মেঘের স্তর আর বৃষ্টির পর্দার জন্যে দেখতে পাচ্ছে না ওরা। কপ্টারের মাথায় বীকন লাইট দপদপ করছে, কোমল মেঘে প্রতিফলিত হচ্ছে আলো, কিন্তু দ্বিতীয় কপ্টারের পাইলট সময় থাকতে আলোটা দেখতে পাবে না।

'আরেকটু দেখি। আর শুধু এক মিনিট,' এঞ্জিন আর রোটরের আওয়াজের সাথে পাল্লা দিয়ে গলা ফাটাল রানা। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের আলোয় ভূতের মত দেখাল ওর চেহারা। গোটা অপারেশন ওর চোখের সামনে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। জানে, যে-কোন মুহূর্তে মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হতে পারে ওরা। কিন্তু তবু ওকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নিচে দু'পাঁচ মাইলের মধ্যে কোথাও আছে প্রাণপ্রিয় সুহৃদ। এত দূর এসে কিভাবে তাকে ফেলে যায় ও?

'কোন লাভ নেই–,' শুরু করল পাইলট, পরমুহূর্তে শিউরে উঠল সে, গলা থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এল, একই সাথে বিদ্যুৎ খেলে গেল দু'হাতে। অকস্মাৎ কাত হলো হেলিকপ্টার, দ্রুত এক পাশে সরে যাবার সাথে সাথে লাফ দিয়ে ওপরেও উঠল খানিকটা–মনে হলো নিরেট কিছুর সাথে যেন ধাক্কা খেয়েছে ওরা।

মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে লাফ দিয়েছিল চার্চের একটা মিনার। ফ্লাইট ডেকে ওরা যেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে সেখান থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে এক ঝলক দেখা গেল সেটাকে, সগর্জনে পাশ কাটাল হেলিকপ্টার। দেখা দিয়েই চোখের পলকে পিছন দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে মিনারটা।

'চার্চ! চার্চ!' পাইলটের কাঁধ খামচে ধরল রানা। 'পেয়েছি! ঘোরো!'

কপ্টারের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করছে পাইলট, মেঘ, বাতাস, আর বৃষ্টির মধ্যে অন্ধের মত কোথায় চলেছে ওরা কেউ জানে না। তার চিৎকার শুনতে পেল রানা, 'ঘোরাতে গিয়ে মারা পড়ব নাকি! কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না!'

'রেডিও অলটিমিটার–একশো সত্তর ফিট,' বলল কো-পাইলট। মাটি থেকে কপ্টারের এটাই সঠিক দূরত্ব, তবু নিচের দিকে কিছুই ওরা দেখতে পাচ্ছে না।

'গেট আস ডাউন। ফর গডস সেক, গেট আস ডাউন,' অনুরোধ করল রানা।

'এরকম ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। কোন ধারণাই নেই কি আছে নিচে।' ইন্সট্রুমেন্টের আলোয় পাইলটের চেহারা ফ্যাকাসে গোলাপী আর অসুস্থ দেখাল, চোখ দুটো যেন খুলির গায়ে গভীর গর্ত। 'মেঘের ওপরে উঠে ফিরে যাচ্ছি আমি...'

হাতটা নিচের দিকে বাড়াল রানা, আঙুলের ভেতর লাফ দিয়ে উঠে এল ওয়ালথারটা জ্যান্ত একটা প্রাণীর মত। মনের অবস্থা উপলব্ধি করে নিজেই অবাক হয়ে গেল রানা–পাইলটকে খুন করার মানসিক প্রস্তুতি রয়েছে ওর, তারপর কো-পাইলটকে বাধ্য করবে ল্যান্ড করতে। ঠিক সেই মুহূর্তে মেঘের স্তরে একটা ফাঁক দেখা গেল, নিচের কালচে মাটির খানিকটা পরিষ্কার ধরা পড়ল চোখে।

'নামো, নামো, নামো!' উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, সিলিঙে মাথা ঠুকে

যেতে বসে পড়ল আবার। সরাসরি নিচের দিকে খসে পড়ার ভঙ্গিতে নামতে শুরু করল হেলিকপ্টার, হঠাৎ করেই বেরিয়ে এল মেঘের গ্রাস থেকে।

'ওই তো নদী,' চকচকে পানি দেখতে পেল রানা। 'ব্রিজ, ব্রিজ!'

'চার্চের উঠান ওটা!' ব্যগ্র কণ্ঠে ঘোষণা করল রবসন। 'আর ওই যে, ওই যে টার্গেট!'

টালির ছাদ ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, খোলা জানালা দরজা দিয়ে ধোঁয়ার সাথে বেরিয়ে আসছে আগুনের গোলাপী শিখা। বাড়িটার দিকে ডাইভ দিল কপ্টার।

হামাগুড়ি দিয়ে কেবিনের দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল রবসন। 'ইয়েলো! আমরা ইয়েলো কন্ডিশনে যাচ্ছি!' ইয়েলো কন্ডিশন মানে কাজে বাধা পেলে দেখামাত্র শত্রুকে খুন করা যাবে। রবসনের ঘোষণা শেষ হতেই ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার কেবিন হ্যাচের কাভার খুলে ফেলল, রোটরের বাড়ি খাওয়া বৃষ্টির মিহি ছাঁট ছোট ছোট মেঘের মত ঢুকে পড়ল কেবিনের ভেতর।

শার্ক কমান্ডোরা দাঁড়িয়ে পড়েছে, খোলা হ্যাচের দু'দিকে পজিশন নিচ্ছে তারা। রবসন রয়েছে সবার আগে, তার পজিশনের নাম পয়েন্ট।

কালচে মাটি ছুটে উঠে এল ওদের দিকে, থো করে চুরুট ফেলে দোরগোড়া আঁকড়ে ধরল রবসন। 'যা নড়বে তাই বাধা, গুলি করে সরিয়ে দেবে,' নির্দেশ দিল সে। 'বাট ফর গডস সেক, ওয়াচআউট ফর দ্য জেন্টলম্যান! লেট'স গো, গ্যাং। লেট'স গো!'

জাম্প সীটে আটকে গেছে রানা, পা ছাড়াতে গিয়ে মূল্যবান কয়েক সেকেন্ড নষ্ট করল, তবে উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

বাড়িটায় আগুন জ্বলছে দেখে বুকটা ধড়ফড় করতে লাগল ওর। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে ওরা সোহেলকে? উঠানটা অন্ধকার, মনে হলো কি যেন নড়ছে। ছুটে গেল একটা মানুষের আকৃতি, নাকি ভুল দেখল?

খোলা উঠানের দশ ফিট ওপরে ঝুলে থাকল হেলিকপ্টার, মৃদু দুলছে এদিক ওদিক। বাড়ির পিছন দিক এটা। কালো পোশাক পরা শার্ক কমান্ডোরা ঝুপ ঝুপ করে নামল, বাড়িটার জানালা দরজা দিয়ে পিল পিল করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ধোঁয়ার ভেতর হারিয়ে গেল ওরা।

সবশেষে নামছে রানা। লাফ দেয়ার আগে কেন যেন খোলা হ্যাচের সামনে দাঁড়িয়ে চারদিকটা একবার দেখে নেয়ার ইচ্ছে হলো ওর। খানিক আগে সামনের উঠানে কিছু একটা নড়তে দেখেছিল, সম্ভবত সেটা ভোলেনি বলেই। তাকাবার সাথে সাথে পাথুরে পাঁচিলের মাঝখানে সরু রাস্তা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। কোন গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠেছে। অন্ধকার বাড়িটা থেকে সগর্জনে বেরিয়ে এল গাড়িটা।

খোলা হ্যাচের কিনারায় টলমল করতে লাগল শরীরটা, লাফ দিতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়েছে রানা। তাল সামলে নিয়ে দরজার ওপর হাত তুলে নাইলন লাইনটা খপ্ করে ধরে ফেলল। বাঁক নেয়ার জন্যে মন্থর হলো গাড়ির গতি, তারপর ব্রিজের দিকে ছুটল। ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ারের কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকি

দিল রানা, অপর হাতটা তুলে ধাবমান গাড়িটাকে দেখাল। লোকটার কান থেকে ওর ঠোঁট মাত্র দু'ইঞ্চি দূরে।

গলার রগ ফুলে উঠল রানার, 'পালাচ্ছে, থামাতে হবে!'

মাইক্রোফোনে দ্রুত কথা বলল ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার, সরাসরি পাইলটের সাথে। ইতস্তত না করে কপ্টার ঘুরিয়ে নিল পাইলট, বদলে গেল রোটরের আওয়াজ। তীরবেগে ব্রিজের দিকে ছুটল যান্ত্রিক ফড়িং।

সামনেটা দেখার জন্যে হ্যাচ ধরে ঝুলে থাকতে হলো রানাকে, তীব্র বাতাস নির্মম কৌতুকে মেতে উঠল ওকে নিয়ে। হেডলাইট অনুসরণ করছে পাইলট। ব্রিজ পেরিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরেছে গাড়ির ড্রাইভার, উপকূলের দিকে যাচ্ছে।

মাঝখানে দুশো গজ ব্যবধান, গাছের কালো মাথাগুলো যেন হ্যাচের সমান উঁচু, তীরবেগে ছুটে আসছে রানার দিকে। ব্যবধান কমে এল, আর একশো গজ। হেডলাইটের আলোয় ঘন ঝোপ আর পাথুরে পাঁচিল আলোকিত হয়ে উঠল। এদিকে দুই খেতের মাঝখানে প্রায়ই একটা করে পাঁচিল দেখা যায়।

গাড়িটা ছোট, নীল রঙের : দক্ষ ড্রাইভার, বেপরোয়া ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

'বীকন লাইট অফ করতে বলো,' নির্দেশ দিল রানা, চায় না গাড়ির ড্রাইভার বুঝতে পারুক তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। কিন্তু ফ্লাইট এঞ্জিনিয়ার মাউথপীস মুখে তুলতেই নিচের রাস্তা অন্ধকার হয়ে গেল। হেডলাইট অফ করে দিয়েছে ড্রাইভার।

আলোর পর গাঢ় অন্ধকারে সব কিছু ঢাকা পড়ে গেল; নিচে যেন গাড়ির কোন অস্তিত্বই ছিল না।

হতাশায় ক্লান্তি বোধ করল রানা। এই অন্ধকারে গাছের মাথা ছুঁয়ে উড়ে যাওয়া ভয়ানক বিপজ্জনক। কপ্টার ঝাঁকি খেলো একবার, তারপর সিধে হলো। পর মুহূর্তে নিচের দিকে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে গেল। ল্যান্ডিং লাইট জ্বেলেছে পাইলট, বুঝতে পারল রানা। ফিউজিলাজের দু'দিকে দুটো উৎস থেকে আলো পড়ল রাস্তায়, গাড়ির একটু সামনে।

আলোর জালে আটকা পড়ল নীল অস্টিন।

আরও নিচে নামল কপ্টার। টেলিগ্রাফ পোল আর গাছ দিয়ে ঘেরা সরু রাস্তার মাঝখানে ঢুকছে।

গাড়ির ছাদে র‍্যাক দেখল রানা। বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। র‍্যাক থাকায় ঝুঁকিটা নেয়া যায়।

ব্যাক সীট থেকে ডাক্তারই প্রথম দেখল হেলিকপ্টারটাকে। বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দে রোটরের আওয়াজ চাপা পড়ে ছিল, চেহারা গম্ভীর হলেও মনে মনে নিজের প্রশংসা করছিল সাইরাস কারচিভাল। যোদ্ধা লোকগুলোকে হেলিকপ্টার থেকে নামার সুযোগ ইচ্ছে করে দিয়েছে সে, সবাই নেমে গেছে দেখে তারপর হেডলাইট জ্বেলে বেরিয়ে এসেছে গ্যারেজ থেকে। জানে, প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝতে সময় লাগবে অ্যাসল্ট টীমের। প্রথমে আবিষ্কার করবে, বাড়ি খালি। হৈ-হাঙ্গামার মধ্যে সবাইকে এক জায়গায় জড়ো করা সহজ কাজ নয়। সবশেষে আবার হেলিকপ্টারে

চড়ে খুঁজতে বেরুতে হবে। ততক্ষণে বহু দূরে সরে আসবে সে। ডাবলিনে তার একটা সেফ-হাউস আছে—অন্তত এক সময় ছিল, চার বছর আগে। বলা যায় না, সেটার অস্তিত্ব হয়তো ফাঁস হয়ে গেছে এত দিনে। সেক্ষেত্রে ভিকটিম আর ড. ওয়াইনকে ত্যাগ করবে সে। দুটো বুলেট খরচ করলেই ঝামেলা শেষ। তারপর অস্টিনটাকে আইরিশ সাগরে ফেলে দিলেই চলবে।

ব্যাক সীটে ব্যথায় গোঙাচ্ছে লোকটা, তার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে ডাক্তার। ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল কারচিভাল, দৃশ্যটা দেখে হেসে উঠল সে। বাঁক নেয়ার সময় ঝোপের সাথে ঘষা খেলো গাড়ি। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ি সিধে করল ও।

'ওরা আসছে,' আর্তনাদ করে উঠল ডাক্তার।

রিয়্যারভিউ মিররে তাকাল কারচিভাল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের রাস্তায়। কিছুই দেখতে পেল না। 'কি বললে?'

'হেলিকপ্টার…!'

পাশের জানালার কাঁচ নামাল কারচিভাল, এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে বাইরে মাথা বের করল। বীকন লাইটটা খুব কাছে আর গাড়ির সামান্য পিছনে দেখতে পেল সে। ঝট্ করে মাথা টেনে নিল ভেতরে। অফ করে দিল হেডলাইট।

গাঢ় অন্ধকারেও গাড়ির স্পীড কমাল না সে। এবার তার হাসির শব্দ বেপরোয়া আর উন্মত্ত শোনাল ডাক্তারের কানে।

'তুমি পাগল হয়ে গেছ,' ছটফট করে উঠল ডাক্তার। 'আমাদের সবাইকে খুন করবে!'

'খুন করাই তো আমার পেশা, মি. ওয়াইন!' আবার হাসল কারচিভাল। 'তোমার যেমন মেয়েদের বোঝা নামানো।' চোখে সয়ে আসছে অন্ধকার, শেষ মুহূর্তে দেখতে পেয়ে একটা পাথুরে পাঁচিলকে এড়িয়ে যেতে পারল। বেল্ট থেকে পিস্তল বের করে পাশের সীটে রাখল সে। 'ওরা যদি ভেবে থাকে…' উজ্জ্বল আলো ঘুসির মত আঘাত করল তাকে, হেলিকপ্টারের ল্যান্ডিং লাইট জ্বলে উঠেছে। সামনের রাস্তা দিনের মত আলোকিত। পরবর্তী বাঁক নেয়ার সময় কংক্রিটের সাথে ঘষা খেলো চাকা।

'থামো, দোহাই লাগে!' সোহেলকে দু'হাতে জড়িয়ে রেখে আবেদন জানাল ডাক্তার। প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি, ঘুমন্ত লোকটাকে ছেড়ে দিলে সীট থেকে পড়ে যাবে। 'ধরা দিলে বেঁচে যাব! তা না হলে মেরে ফেলবে ওরা…!'

'শুধু পাইলট, যারা মারতে পারে তারা কেউ নেই ওটায়,' খেঁকিয়ে উঠল কারচিভাল। 'ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না!'

'ধরা দাও!' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল ডাক্তার। 'তোমার পায়ে পড়ি, এসো সবাই আমরা বাঁচি!'

'এই সাহস নিয়ে তুমি মেয়েদের পেট কাটো?' খিক খিক করে হেসে উঠল কারচিভাল।

'প্লীজ, প্লীজ! চিন্তা করো, ভাই! একটু ভাবো! বাঁচার সুযোগ যখন আছে কেন মরতে চাইব?'

ছোঁ দিয়ে পিস্তলটা তুলে মাথা আর ডান কাঁধ জানালা দিয়ে বাইরে বের করে দিল কারচিভাল, ঘাড় বাঁকা করে ওপর দিকে তাকাল। চোখ-ধাঁধানো আলো ছাড়া কিছুই দেখল না সে। সেই আলোর দিকেই গুলি ছুঁড়ল। রোটর আর বাতাসের শব্দে চাপা পড়ে গেল পিস্তলের আওয়াজ।

গাড়ির ভেতর মাথা টেনে নিয়ে আবার হাসল কারচিভাল। ডাক্তারকে বলল, 'ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, মি. ওয়াইন। তিনটে বুলেট রিজার্ভ রাখা আছে। আমাদের তিনজনের জন্যে। সাইরাস কারচিভাল ধরা দেবে না।'

খোলা হ্যাচের কিনারায় দাঁড়িয়ে গোলাপী মাজল্ ফ্ল্যাশ শুনল রানা। পাঁচটা গুলি হলো, কিন্তু বুলেটের পাশ ঘেঁষে ছুটে যাবার আওয়াজ পেল না।

'গেট লোয়ার!' শুধু চিৎকার নয়, জরুরী ভঙ্গিতে হাত নেড়ে সঙ্কেতও দিল রানা। ছুটন্ত অস্টিনের দিকে আরও খানিকটা নামল হেলিকপ্টার।

সাবধানে লাফ দেয়ার একটা ভঙ্গি নিল রানা, রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকল সঠিক মুহূর্তটির জন্যে। তারপর যখন লাফ দিল মনে হলো হ্যাচওয়ে থেকে কেউ বোধহয় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে ওকে।

চার হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল শূন্যে, পতনের সমাপ্তি ঘটার আগে রানার মনে হলো সময়ের হিসেবে ভুল হয়ে গেছে—অস্টিনের পিছনে রাস্তায় পড়বে সে। কিসের সাথে যেন ধাক্কা খেলো অস্টিন, মুহূর্তের জন্যে মন্থর হলো গতি, ছাদের ওপর দড়াম করে পড়ল রানা। অনুভব করল, শরীরের নিচে দেবে গেল ছাদ। গড়িয়ে কিনারার দিকে চলে এল, শরীরের বাঁ দিকটা পুরোপুরি অসাড় হয়ে গেছে ছাদের সাথে বাড়ি খেয়ে। শুধু ডান হাত দিয়ে ছাদ হাতড়াচ্ছে, নখ দিয়ে চেঁছে রঙ তুলে ফেলার যোগাড় করল ছাদের; কিন্তু কোনভাবেই পিছলে যাওয়াটা থামানো গেল না। গাড়ির বাইরে শূন্যে ছটফট করছে পা দুটো।

রাস্তায় খসে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে র‍্যাকের ফ্রেমে আঙুল প্যাঁচাতে পারল রানা, এক হাতের ওপর বাদুড়ের মত ঝুলে থাকল গাড়ির কিনারায়। এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে নিজেকে তুলে নিল, কিন্তু ড্রাইভার টের পেয়ে গেছে ছাদে লোক। সাথে সাথে নিষ্ঠুর কৌতুকে মেতে উঠল সে। ঘন ঘন হুইল ঘুরিয়ে গাড়িটাকে রাস্তার এদিক ওদিক ফেরাতে লাগল সে, একদিক থেকে আরেক দিকে ছোটার সময় একপাশের চাকা রাস্তা ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল। তীব্র, কর্কশ প্রতিবাদ জানাল চাকাগুলো, ছাদে ঘষা খেয়ে বারবার এদিক ওদিক ছিটকে গেল রানার শরীর। ডান হাতের পেশী আর জয়েন্টে প্রচণ্ড টান পড়ল, মনে হলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে অসাড় হয়ে যাওয়া বাঁদিকটায় দ্রুত স্পর্শবোধ ফিরে আসছে।

এভাবে গড়াগড়ি খেলে ছাদে বেশিক্ষণ টেকা যাবে না। গাড়ির মতিগতি আন্দাজ করে নিয়ে খালি হাতটা লম্বা করে দিল রানা, একই সাথে নরম বুটের ডগা রুফ ক্যারিয়ারের একটা ফাঁকে ঢুকিয়ে আটকে ফেলল আঙটার মত।

হেলিকপ্টারের আলোয় সামনে একটা প্রায় খাড়াভাবে নেমে যাওয়া বাঁক দেখল ড্রাইভার। গাড়ি সিধে করতে বাধ্য হলো সে। বাঁকের পর রাস্তাটা ঘন ঘন

একেঁবেঁকে নেমে গেছে উপকূলের দিকে।

মাথা তুলল রানা, উঠে বসতে যাচ্ছে, এই সময় নাকের ঠিক ছয় ইঞ্চি সামনে ছাদের ছোট্ট একটা অংশ ওপর দিকে বিস্ফোরিত হলো। নিখুঁত একটা গর্ত তৈরি করে বেরিয়ে গেল বুলেট। সেই সাথে কানের পর্দায় জোরধাক্কা দিল পিস্তল শটের তীক্ষ্ণ আওয়াজ। ড্রাইভিং সীটে বসে আন্দাজের ওপর নির্ভর করে ছাদে গুলি করছে ড্রাইভার, প্রথমবার মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে লক্ষ্য ভেদে ব্যর্থ হয়েছে সে।

কোণঠাসা বিড়ালের মত বেপরোয়া হয়ে উঠল রানা, সমস্ত শক্তি এক করে ছাদের কিনারায় সরে যাবার চেষ্টা করল। মুহূর্তের জন্যে রুফ ক্যারিয়ার থেকে ছুটে যাচ্ছিল পা। ছাদ ফুটো করে আরেকটা বুলেট বেরিয়ে এল, এইমাত্র যেখানে পেট ছিল রানার।

মরিয়া হয়ে উঠল রানা। গাড়ির পিছন দিকে গুটিয়ে নিয়েছে শরীরটা, এক কিনার থেকে আরেক কিনারায় ঘন ঘন জায়গা বদল করছে। পরবর্তী বিস্ফোরণের সাথে সাথে চুল পোড়ার গন্ধ পেল ও, গরম আঁচ অনুভব করল খুলিতে।

কিছুটা কৌশল, বাকিটা ভাগ্যগুণে বেঁচে যাচ্ছে রানা। কিন্তু ভাগ্য প্রতিবার সহায়তা করবে না। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছে এই বুঝি লাগল একটা বুলেট। কিন্তু না, ড্রাইভার আর গুলি করছে না।

এতক্ষণে মনে পড়ল রানার, হেলিকপ্টারের দিকে ছুঁড়ে কয়েকটা বুলেট বাজে খরচ করেছে ড্রাইভার। ধীরে ধীরে আরেকটা ব্যাপারে সজাগ হলো রানা, এঞ্জিন আর রোটরের আওয়াজকে চাপা দিয়ে একটা শব্দ বাড়তে চেয়েও পারছে না। দুই সেকেন্ড দিশেহারা বোধ করল রানা। তারপর শব্দটা কোত্থেকে আসছে বুঝতে পেরে শরীরে অসুরের শক্তি অনুভব করল। ঘুম জড়ানো কণ্ঠস্বর, অনেকটা গোঙানির মত। ওষুধের প্রভাব কেটে যাওয়ায় চারপাশে কি ঘটছে আন্দাজ করতে পারছে সোহেল। চিৎকার করে কি যেন বলার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু গলা চড়াতে পারছে না।

হাত-পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে বিড়ালের মত সিধে হলো রানা, হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে এগোল। ড্রাইভিং সীটের ঠিক ওপরে থামল ও।

আবার চিৎকার করার চেষ্টা করল সোহেল। এবার তার কণ্ঠস্বর নিঃসন্দেহে চিনতে পারল রানা। কুইক-রিলিজ হোলস্টার থেকে ওয়ালথার বের করে এক ঝটকায় হ্যামার কক করল ও, একই সময় চোখ তুলে দেখে নিল দ্রুত ছুটে আসা আরেকটা বাঁককে। দু'হাতে হুইল ধরে গাড়ির নিয়ন্ত্রণ ঠিক রাখতে হবে ড্রাইভারকে।

ছাদের সামনের কিনারা থেকে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল রানা। মাথা নিচের দিকে, তাকিয়ে আছে পিছন দিকে, হতভম্ব ড্রাইভারের চোখে, মাঝখানে মাত্র আঠারো ইঞ্চির ব্যবধান।

দু'জোড়া চোখের দৃষ্টি এক সেকেন্ড বাধা পড়ল। সাইরাস কারচিভালের ফটো দেখেছে রানা, নির্দয় খুনীর ঠাণ্ডা চোখে ঘৃণা আর আক্রোশ ফুটে উঠতে দেখল।

দু'হাতে গাড়ি চালাচ্ছে সাইরাস কারচিভাল, পিস্তলটা এখনও এক হাতে ধরা-চেম্বার খোলা, কিন্তু রিলোডিঙের সময় পায়নি। খাঁচায় বন্দী হিংস্র পশুর মত

মুখ ঝামটা দিল সে, উইন্ডশীল্ডের কাঁচে মাজল্ ঠেকিয়ে গুলি করল রানা।
ঝাপসা হয়ে গেল সামনের দৃশ্য, অসংখ্য চিড় ধরে সাদা হয়ে গেছে কাঁচ। পরমুহূর্তে খসে পড়ল উইন্ডশীল্ডের ফ্রেম থেকে। চকচকে কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল অস্টিনের ভেতর।
দু'হাতে মুখ ঢেকেছে কারচিভাল, আঙুলের ফাঁক গলে হড়হড় করে বেরিয়ে আসছে উজ্জ্বল রক্ত, কয়েকটা ধারায় ঝরে পড়ছে কালো লোম ঢাকা বুকে।
এখনও ওপর দিকে পা আর নিচের দিকে মাথা দিয়ে ঝুলে আছে রানা। বিধ্বস্ত উইন্ডস্ক্রীনের ভেতর ওয়ালথার ধরা হাতটা লম্বা করে দিল ও, মাজল্ ঠেকাল কারচিভালের গায়ে। বুকের ওপর, পাঁজরে গুলি করল, পর পর দুটো। এক্সপ্লোসিভ ভেলেক্স বুলেট হাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যাবে, শরীর থেকে বেরিয়ে আর কাউকে আহত করবে না। সোহেলের গলা নিস্তেজ হয়ে এলেও, পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। এখন আর কিছু বলার চেষ্টা করছে না, শুধুই গোঁ গোঁ করে গোঙাচ্ছে। বুলেটের ধাক্কায় সীটের গায়ে হেলান দিল কারচিভাল, মাথাটা এদিক ওদিক দুলছে। এঞ্জিনের আওয়াজ কমে যাবে বলে আশা করল রানা, লাশের পা অ্যাকসিলারেটর থেকে নেমে আসার কথা।
কিন্তু তা ঘটল না। লাশটা সামনের দিকে নেমে গেছে, পা আরও চেপে বসেছে অ্যাকসিলারেটরে। ঢালু রাস্তা ধরে তীর বেগে ছুটছে অস্টিন, দু'পাশে উঁচু পাথুরে পাঁচিল থাকায় মনে হলো টানেলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা।
লক্ষ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরছিল হুইল, একটা হাত দিয়ে সেটা ধরে ফেলল রানা। পাঁচিলের সাথে ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা দূর হলো, কিন্তু গতি এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরে।
এভাবে পায়ের পাতা আর হাঁটুর ওপর বেশিক্ষণ ঝুলে থাকা সম্ভব নয়। উইন্ডস্ক্রীনে থেকে যাওয়া ভাঙা কাঁচে হাত ঠেকে রয়েছে। তীব্র টানা বাতাস প্রবল শক্তিতে গাড়ির মাথার সাথে চেপে রেখেছে শরীরটা। সময় মত হুইল ঘোরাতে পারেনি রানা, ডান দিকের পাঁচিলে ঘষা খেলো গাড়ি। পিছন দিকে আগুনের ফুলকি দেখল রানা, সেই সাথে কর্কশ আওয়াজে রী রী করে উঠল সারা শরীর। হুইল ঘুরিয়ে রাস্তার মাঝখানে আবার ফিরিয়ে আনল রানা গাড়িটাকে। কিন্তু আবার হুইল ঘোরাবার আগেই বাঁ দিকের পাঁচিলের সাথে ঘষা খেলো। হুইল থেকে ছিটকে পড়ল রানার হাত। ভাঙা কাঁচের ওপর হাতের চাপ লেগে কেটে গেল মাংস। পাঁচিল ভেঙে খাদের কিনারায় চলে এল অস্টিনের নাক। রানা আবার ধরার আগে নিজেই ঘুরতে শুরু করল হুইল, খাদের কিনারা আর ভাঙা পাঁচিলের ভেতর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় ফিরে এল গাড়ি।
শেষ রক্ষা হবে না, এক সময় খাদে পড়বেই অস্টিন, জানে রানা। ওর উচিত ঝুঁকি নিয়ে লাফ দিয়ে পড়া, প্রথমে নিজের জান বাঁচানোর চেষ্টা করা। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত গাড়ির ছাদে তবু সেঁটে থাকল ও, কারণ সোহেলকে বিপদের মধ্যে ফেলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।
হুইলটা আবার ধরেছে রানা, গাড়ির বাইরে মাথা বের করে তাকাতেই পাঁচিলের গায়ে কাঠের একটা ফটক দেখতে পেল। ফটকের দিকে চোখ রেখে

হুইলটা আস্তে আস্তে ঘোরাতে শুরু করল। তীরবেগে ছুটে এল ফটক।

ধাক্কা লাগল, কাঠের কবাট ভেঙে ভেতরে ঢুকল অস্টিন। বিস্ফোরিত রেডিয়েটর থেকে গরম পানি ছড়িয়ে পড়ল রানার হাত আর মুখে। খোলা মাঠে খ্যাপা ষাঁড়ের মত ঢুকে পড়ল গাড়ি, ছড়ানো পাথরের ওপর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটছে। পাথরগুলোর মাঝখানে নরম মাটি, চাকা বসে যেতে লাগল, সেই সাথে কমে এল গতি। সরু একটা নালার মধ্যে পড়ল অস্টিন, দু'বার ড্রপ খেয়ে স্থির হয়ে গেল।

শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে গাড়ির পাশে নামল রানা। হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলতেই ক্যাব থেকে মাটিতে ঢলে পড়ল একজন লোক, বিড়বিড় করে কি যেন বলছে সে। ডান হাঁটু দিয়ে তার চিবুকে প্রচণ্ড আঘাত করল ও, জ্ঞান হারিয়ে স্থির হয়ে গেল ডাক্তার ওয়াইন। তাকে টপকে অস্টিনের ভেতর মাথা ঢোকাল রানা।

দু'হাতের ওপর সোহেলকে নিয়ে সিধে হলো রানা, হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে। পা টলছে রানার, থেমে থেমে হেলিকপ্টারের দিকে হাঁটছে ও। খানিক দূরে মাটিতে নেমেছে সেটা।

ঠোঁট নড়ছে সোহেলের, কিন্তু আওয়াজ বেরুচ্ছে না। চোখ বন্ধ। রানার কাঁধ আর পিঠ খামচে ধরে আছে সে।

কপ্টার থেকে ছুটে এল শার্ক ডাক্তার। রানার অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, 'আর কোন চিন্তা নেই। এই দেখ, আমি এসে গেছি। দেখ, চোখ খোল, শালা।'

হঠাৎ লজ্জা পেল রানা। উপলব্ধি করল, গাল বেয়ে ওটা ঘাম নয়, চোখের পানি নামছে। শেষ কবে কেঁদেছে ওর মনে পড়ল না। কবে কেঁদেছে, এখন কেন কাঁদছে, এসব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়। এখন যখন প্রাণপ্রিয় বন্ধু তার বুকের মাঝখানে ফিরে এসেছে।

গগলের বাড়ি ফিলবি'স্ ইয়ার্ডে সোহেলকে দেখার জন্যে দেশী-বিদেশী বহু লোকের ভিড় জমে উঠল। শার্ক কমান্ডের ডাক্তার, রানা, আর মমতাময়ী সেবিকা ডোরা ছাড়া সোহেলের কামরায় কাউকে অবশ্য ঢুকতে দেয়া হলো না। মাঝখানে একবার শুধু সোহেলের জবানবন্দি নিয়ে গেছে পুলিসের লোকেরা। সাক্ষাৎপ্রার্থীরা বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই রানা এজেন্সি আর বি.সি.আই-এর এজেন্ট হলেও চেহারা বা পোশাক দেখে বোঝার উপায় নেই।

অ্যান্টিবায়োটিক দেয়া হয়েছে সোহেলকে, সুফল ফলতে দেরি হলো না। তিন দিন পর ডাক্তার জানাল, বিপদ কেটে গেছে। প্রতিদিন নতুন করে ব্যান্ডেজ বাঁধা হলো আঙুলে, হাতটা ঝুলে থাকল গলার সাথে স্লিঙে। দু'ঘণ্টা পর পর জোরজার করে কিছু না কিছু খাওয়াচ্ছে ডোরা, ধীরে ধীরে দুর্বলতাও কাটিয়ে উঠছে সোহেল।

'একটাই মাত্র হাত, তাও শালাদের নজর পড়ে গেল!' এক সন্ধ্যায় হাসতে হাসতে বলল সে।

'দু'হাত থাকলে তোকে ওরা ধরতেই পারত না,' বলল রানা। 'তুই বোধহয় জানিস না, কিডন্যাপারদের তিনজনকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলি? দু'জন গুরুতর আহত হয়, তারাও বোধহয় কোন সেফ হাউসে মারা গেছে!'

'কিন্তু ধরা পড়ার পর আমাকে একদম কাবু করে ফেলল ওরা,' সখেদে মাথা নাড়ল সোহেল। 'জেগে থাকার কম চেষ্টা করিনি, কিন্তু...'

'সারাগে তোর সাথে দু'জন ছিল ওরা,' বলল রানা। 'একজন সাইরাস কারচিভাল, আরেকজন ডাক্তার–তার লাইসেন্স বাতিল হয়ে গেছে কয়েক বছর আগে।'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল সোহেল, রানার সাথে দ্বিমত পোষণ করল। 'দু'জন নয়, তিনজন ছিল,' বলল সে।

'একটা মেয়ে, তাই না?' রানার মনে পড়ল, আয়ারল্যান্ড পুলিস রেডিওযোগে জানিয়েছিল, পোড়োবাড়ির নতুন বাসিন্দা কারচিভাল মেয়েলি জিনিস-পত্র কিনেছে গ্রামের দোকান থেকে।

আবার মাথা নাড়ল সোহেল। 'না, মেয়ে নয়। অন্তত কোন মেয়েকে আমি দেখিনি।'

'আরেক জন পুরুষ?' বিস্মিত হলো রানা।

'হ্যাঁ। কিন্তু তাকেও আমি দেখিনি। তবে বুঝতে পারছিলাম, ওরা দু'জনেই তাকে ভীষণ ভয় করে।'

'দেখিসনি তো বুঝলি কিভাবে?'

'ওদের কথা শুনে বুঝলাম,' বলল সোহেল। 'মাঝে মধ্যে মরফিনের প্রভাব কমে এলে ওদের কথা শোনার চেষ্টা করতাম। ওরা দু'জন তর্ক করত, অপর লোকটা কি করবে না করবে...'

'নাম কি তার?'

'দিলি তো বিপদে ফেলে!' স্মরণ করার চেষ্টা করল সোহেল। 'আসলে ঘুমের ঘোরে কি শুনেছি মনে নেই। ক্যাসপার বা ওরকম কিছু একটা হবে।'

'ক্যাসপার?'

'উঁহুঁ, না। ধ্যেৎ, মনে করতে পারছি না।' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সোহেলের চেহারা। 'পেয়েছি! হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই–খলিফা! কে বলত, চিনিস নাকি?'

পাঁচ

ফিলবি'স ইয়ার্ড থেকে দু'বার ফোন করল রানা ব্যারনেস লিনাকে, দু'বারই তার ব্যক্তিগত নম্বরে, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। কেউ তার কোন খোঁজ দিতে পারল না, রানার জন্যে কোন মেসেজও রেখে যায়নি সে। ইয়েলো কন্ডিশনে সোহেলকে উদ্ধার করার পর পাঁচ দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, ব্যারনেস লিনার কোন হদিশ নেই।

এর আগে ড. এডওয়ার্ড ওয়ার্নার একবার দেখে গেছেন সোহেলকে, তাঁর রাশভারি ব্যক্তিত্ব আবার একবার মুগ্ধ করেছে রানাকে। গগল সম্পর্কে রানা আর রবসনের কাছ থেকে আগেই কিছু কিছু জেনেছিলেন ড. ওয়ার্নার, বাড়িতে এসে তার সাথে অনেকক্ষণ গল্প করা থেকে বোঝা গেল গগলকে তাঁর পছন্দ হয়েছে।

সুযোগ পেয়ে ড. ওয়ার্নারের মত তাত্ত্বিককে নিজের ধ্যানধারণার খানিকটা আভাস দিতে ভুল করেনি ভিনসেন্ট গগল। ড. ওয়ার্নার শুনে চমৎকৃত হলেন যে পুঁজিবাদের সমর্থক হয়েও রানার বন্ধু মানবকল্যাণে সাধ্য মত অবদান রাখতে আগ্রহী। গগল তাঁকে আরও বলল, পশ্চিমী দুনিয়ার নিরস্ত্রীকরণে বিশ্বাসী নয় সে, কারণ প্রতিপক্ষরা নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি মেনে চলছে কিনা পরীক্ষা করে দেখার নিশ্ছিদ্র কোন উপায় আসলে নেই। তার সাথে একমত হয়ে ড. ওয়ার্নার যোগ করলেন, যেহেতু শ্বেতাঙ্গরাই সব দিক থেকে এগিয়ে আছে তাই তাদেরকেই বাকি দুনিয়ার কল্যাণ সাধনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে যেতে হবে, তবে আরও অনেক দ্রুতগতিতে এবং দক্ষতার সাথে। দেখা গেল, দু'জন দুই মেরুর বাসিন্দা হলেও অনেক বিষয়েই একমত হতে পারছে।

ডিনারের পর স্টাডিরুমে শুধু ড. ওয়ার্নার আর রানা থাকল, ওদেরকে কফি দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ডোরা। পাইপে আগুন ধরিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করলেন ড. ওয়ার্নার।

'পাঁচ দিন হলো আমেরিকার বাইরে রয়েছি। বেশিরভাগ সময় হোয়াইট হলে কেটেছে আমার।'

রানা জানে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি হিসেবে ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের সাথে কথা বলেছেন ড. ওয়ার্নার, সম্ভবত বার দুয়েক।

'শুধু যে আমাদের অর্গানাইজেশন সম্পর্কে কথা হয়েছে তা নয়, আরও অনেক বিষয়ে আলাপ করেছি। তবে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টিটেরোরিজম অর্গানাইজেশন সম্পর্কেই বেশি কথা হয়েছে। তুমি জানো, আটলান্টিকের দুই তীরেই আমাদের বিরোধিতা করা হচ্ছে। তাদের যুক্তি ফেলে দেয়ার মত তা আমি বলি না। আমাদের অর্গানাইজেশন বা সেন্ট্রাল কমিটি এককভাবে অন্য যে কোন সংগঠনের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ভোগ করছে–আমাদের সামরিক শক্তিও তুলনাহীন। ওরা বলছে, একজন বা মাত্র কয়েকজন এলিট লোকের হাতে এত ক্ষমতা থাকা মানে একটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করা। যা তুমি ধ্বংস করতে চাও এই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তার চেয়েও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। তুমি কি বলো, রানা?' মিটিমিটি হাসছেন ড. ওয়ার্নার।

'নির্ভর করছে যিনি সংগঠনটা নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁর ওপর, ড. ওয়ার্নার। আমার ধারণা, যোগ্য এবং সঠিক ব্যক্তির ওপরই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।'

'ধন্যবাদ, রানা। সেন্ট্রাল কমিটি বিস্ময়কর কিছু সাফল্য অর্জন করেছে–জোহানেসবার্গে, তারপর এবার আয়ারল্যান্ডে। কিন্তু তার ফলে সংগঠনটা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। লোকে এখন জানে, আমরা যদি আরও বেশি ক্ষমতা চাই, দ্বিধা না করে তা বরাদ্দ করা হবে। আর মুশকিল কি জানো, সত্যি যদি আমরা কাজ করতে চাই, আরও বেশি ক্ষমতা আমাদের দরকারও বটে। এই ব্যাপারটা নিয়ে বড়ই দুর্ভাবনায় আছি আমি...'

'কাজ বলতে–হ্যাঁ, অশুভ কোন শক্তিকে ধ্বংস করা। ঠিক, তার সাথে পাল্লা দিতে হলে আরও ক্ষমতা আমাদের দরকার।'

'কিন্তু' ভেবে দেখেছ কি, খুব বেশি ক্ষমতা পেলে আমরা সেটাকে ব্যবহার

করব কিভাবে? কিভাবে বুঝব ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে না? ঠিক কখন আইনে
শাসনকে শক্তির শাসন ছাড়িয়ে যাচ্ছে তা বোঝার উপায় কি?'

'বর্তমান দুনিয়ায় আইনের শাসন অনেক ক্ষেত্রেই অকেজো হয়ে গেছে, কারণ কিছু লোক প্রায় অজেয় শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছে, আইনের প্রতি তাদের কো শ্রদ্ধাবোধ নেই। সে-সব লোককে চিহ্নিত করা এমন কোন কঠিন কাজ নয় তাদেরকে সামলাতে হলে শক্তি দিয়েই সামলাতে হবে।'

'আরেকটা ধারণার কথা বলি, রানা। বহু বছর ধরে বিষয়টা নিয়ে ভাবি আমি। মানুষের ওপর যদি অন্যায় আইনের শাসন চাপিয়ে দেয়া হয়? কেউ যদি নির্যাতনের আইন চালু করে? একজন লোক কালো রঙ নিয়ে জন্মেছে বা সে তার স্রষ্টাকে অন্য নামে ডাকে বলে কেউ যদি তাকে নিকৃষ্ট ভেবে শাসন ও শোষণ করার চেষ্টা করে? জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটা পার্লামেন্ট যদি বর্ণ বৈষম্যের পক্ষে আইন পাস করে, কিংবা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ যদি ঘোষণ করে যে ইহুদি, ইসলাম, বা খ্রিস্টান ধর্ম আসলে সাম্রাজ্যবাদেরই অন্য এক রূপ তাহলে?'

'ধরো যদি মুষ্টিমেয় কিছু লোক দুনিয়ার তাবৎ সম্পদের মালিক বনে যায় ব সে সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে এবং তাদের তৈরি আইনের দ্বারা যদি ব্যক্তিগত উচ্চাশা বা লোভ চরিতার্থ করার চেষ্টা করে, তখন? আরও পরিষ্কার করে বলি—ওপেক কমিটি যদি সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের হাতে তেল আছে, তেলটাই অস্ত্র এবং এই অস্ত্র দিয়েই তারা মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে, তখন? ওপেকের বা মোসাডের পক্ষে এ-ধরনের চিন্তা করা অসম্ভব কিছু নয়।' অসহায় একটা ভঙ্গি করে হাত নাড়লেন ড. ওয়ার্নার। 'তখন কি আমরা তাদের তৈরি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাব? যদি বুঝি ওদের তৈরি আইনগুলো অন্যায় আইন, তাহলেও?'

রানা জানে, ড. ওয়ার্নারের এই ভয় ভিত্তিহীন নয়। মোসাড, ওপেক, ব শক্তিশালী অনেক রাষ্ট্র, কিংবা সুপারপাওয়ারগুলো চলছেই ব্যক্তি বিশেষে নিয়ন্ত্রণে, কেউ একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সেই কেউ একজন ক্ষমতা লোভে উন্মাদ হয়ে উঠলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া, এরই মধ্যে অনেক রাষ্ট্র বা সংগঠন এমন সব নিয়ম-নীতি চালু করেছে বা আইন পাস করেছে যেগুলোকে অন্যায় আইন ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না। মোসাড চায়, প্রতি মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকুক, আগুন জ্বালাই তাদের একমাত্র কাজ। আর ওপেক তেলের দাম যত খুশি বাড়িয়ে নিজেদের পকেট ভারী করতে চাইছে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তাতে অচল হয়ে পড়লে তাদের কিছু যায় আসে না। রাশিয়া চাইছে গোটা দুনিয়া কমিউনিস্ট হয়ে যাক, আর আমেরিকা চাইছে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাকি দুনিয়া তাদের পক্ষে যোগ দিক। যুক্তিহীন শর্ত অন্যায় আইন, বেআইনী নিষেধাজ্ঞা, অসম কোটা, আকাশচুম্বি দ্রব্যমূল্য, আ নির্মম ব্ল্যাকমেইলিঙের শিকার হচ্ছে গরীব দেশগুলো। 'না,' বলল রানা। 'অন্যায় আইনের বিরোধিতা করব আমরা। যথেষ্ট ক্ষমতা থাকলে, সে-সব আইনের বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে।'

'তারমানে, এককভাবে কোন সংগঠন যত ক্ষমতা রাখে তারচেয়ে বেশি

ক্ষমতা পেতে হবে আমাদের, তাই না?' ড. ওয়ার্নার একটু হাসলেন, সোফা ছেড়ে রানার সামনে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। 'সেন্ট্রাল কমিটির জন্যে আরও ক্ষমতা চেয়েছি আমি, আশা করছি পেয়ে যাব। ক্ষমতা না বলে এটাকে আসলে সুযোগ বলা উচিত। অনেক রকম সুযোগ দেয়া হবে আমাদের, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের আমরা ক্ষমতাবান এবং দুর্জয় করে তুলতে পারি। কিন্তু সেজন্যে যোগ্য লোক দরকার হবে আমাদের, রানা। যোগ্য এমন সব মানুষ, যারা বুঝবে কোন্‌টা অন্যায় আইন কোন্‌টা নয়। যারা বুঝবে কেন, কিসের বিরুদ্ধে লড়ছে তারা।' রানার সামনে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে একটা হাত রাখলেন তিনি।

মুখ তুলে তাকাল রানা।

'তুমি তেমন একজন মানুষ, রানা। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।' রানার কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিয়ে সিধে হলেন ড. ওয়ার্নার, তাঁর চেহারা বদলে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। 'ব্যবস্থা করেছি, কাল রবসনের সাথে আমাদের দেখা হবে। আইরিশ অপারেশনের গোটা ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখছে সে। তার রিপোর্ট পাবার পর বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারব। শার্ক কমান্ডে, বেলা দুটোয়, ঠিক আছে?'

'জী।'

'তাহলে এসো মেজবান ভদ্রলোককে একটু সঙ্গ দিই এবার...,' দরজার দিকে এগোলেন ড. ওয়ার্নার।

'ড. ওয়ার্নার, এক মিনিট,' তাঁকে থামিয়ে দিল রানা। 'আপনাকে একটা কথা বলার আছে আমার। সব শোনার পর আমার সম্পর্কে আপনার এখনকার ধারণা পাল্টেও যেতে পারে।'

'ইয়েস?'

দরজার দিকে পিছন ফিরে রানার দিকে তাকালেন ড. ওয়ার্নার।

'আপনি জানেন, সোহেলকে যারা কিডন্যাপ করেছিল তারা মুক্তিপণ চায়নি, বা কারও সাথে কোন যোগাযোগ করেনি।'

'হ্যাঁ, এবং ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে একটা রহস্য হয়ে আছে।'

'কথাটা সত্যি নয়। ওরা যোগাযোগ করেছিল।'

'তোমার কথা বুঝলাম না।' চিন্তার ভাঁজ পড়ল ড. ওয়ার্নারের কপালে, তীক্ষ্ণ চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, রানার মুখে কি যেন খুঁজছেন।

'কিডন্যাপাররা আসলে আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল। চিঠিটা আমি পুড়িয়ে ফেলি।'

'কেন?' ড. ওয়ার্নারের কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল।

'বলছি। সোহেলকে ছাড়ার ব্যাপারে একটা মাত্র শর্ত দিয়েছিল ওরা, শর্তটা দু'হপ্তার মধ্যে পূরণ করতে হবে। তা না হলে ওরা সোহেলকে মেরে ফেলবে। প্রথমে আঙুল কেটে পাঠায়, তারপর হাত কাটবে, তারপর পা এবং সবশেষে মাথা পাঠাবে বলে জানায়।'

'কি স্পর্ধা?' বিড় বিড় করে বললেন ড. ওয়ার্নার। 'কি অমানবিক! শর্তটা কি ছিল?'

'জীবনের বদলে জীবন,' বলল রানা। 'সোহেলকে ফেরত পেতে হলে আপনাকে আমার খুন করতে হবে।'

'আমাকে?' চমকে উঠলেন ড. ওয়ার্নার, বিস্ময়ের ধাক্কায় তাঁর মাথা পিছন দিকে ঝাঁকি খেলো। 'ওরা আমাকে চেয়েছিল?'

উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। ড. ওয়ার্নারও তাকিয়ে থাকলেন। তারপর নড়ে উঠলেন তিনি, আঙুল চালালেন মাথার চুলে।

'গোটা ব্যাপারটা তাহলে বদলে গেল। সব কিছু সাবধানে, নতুন করে ভেবে দেখতে হবে আমাকে।' মাথা নাড়লেন ড. ওয়ার্নার। 'আমাকে? সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্টকে? কেন? ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশনে এককভাবে আমি সবচেয়ে বেশি ক্ষমতার অধিকারী, তাই? সেন্ট্রাল কমিটি, শার্ক কমান্ড, কোবরা কমান্ড, আর চিতা কমান্ডকে নেতৃত্বহীন অবস্থায় দেখতে চায় কেউ?' দেয়ালের দিকে চোখ রেখে আপনমনে মাথা নাড়লেন তিনি। 'উঁহু, তা নয়।'

'তাহলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সম্ভাব্য মাত্র একটাই ব্যাখ্যা আছে। মনে আছে, তোমাকে আমি বলেছিলাম নির্দিষ্ট একটা কেন্দ্র বা সেন্টার থেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদকে? কেউ একজন প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়ে মাথাচাড়া দিচ্ছে, রানা। জ্ঞাত-অজ্ঞাত সমস্ত টেরোরিস্ট গ্রুপগুলোকে এক করছে সে, একজন পাপেটমাস্টার। তোমাকে তাহলে বলেই ফেলি, রানা—এই লোকটাকে খুঁজছি আমি। তোমার সাথে শেষবার দেখা হবার পর তার সম্পর্কে আরও অনেক খবর পেয়েছি আমি—তার অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ নেই।'

'কে সে, ড. ওয়ার্নার?'

কিন্তু তিনি যেন রানার কথা শুনতেই পাননি, বলে চলেছেন, 'সেন্ট্রাল কমিটির জন্যে আরও ক্ষমতা সেজন্যেই চেয়েছি আমি, লোকটা বাড়তে বাড়তে নাগালের বাইরে চলে যাবার আগে তাকে আমি ধ্বংস করতে চাই।' একটু থেমে কি যেন ভাবলেন। তারপর আবার বললেন, 'আমি যেমন তার সম্পর্কে সচেতন, এখন জানা গেল সে-ও আমার সম্পর্কে সচেতন। আমি যে তার বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছি, সে জানে। তোমার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করার ভান করে আমি যখন তোমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করলাম, ভেবেছিলাম শত্রু তোমার সাথে যোগাযোগ করবে। কিন্তু, গড নোজ, যোগাযোগটা এ-ধরনের হবে তা আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিনি।'

নিভে যাওয়া পাইপে আগুন ধরালেন তিনি। আবার পায়চারি শুরু করলেন। 'অবিশ্বাস্য! যাকে আমি ভুলেও সন্দেহ করতাম না—তুমি। ওহ্ রানা, যে-কোন সময় অনায়াসে আমার কাছে পৌঁছুতে পারো তুমি। আর হয়তো দুই কি তিনজন এই সুযোগ ভোগ করে। এবং দেখো, লিভার হিসেবে কি ব্যবহার করেছে ওরা! তোমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু! ওহ্ গড, শত্রুকে আমি ছোট করে দেখেছি!'

'আপনি কি কখনও খলিফা নামটা শুনেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কর্কশ কণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ড. ওয়ার্নার, 'তুমি কোথেকে শুনলে?'

'চিঠিটায় সই ছিল, কারচিভাল আর ডাক্তারের মুখে সোহেলও নামটা শুনেছে।'

'খলিফা।' মাথা ঝাঁকালেন ড. ওয়ার্নার। 'হ্যাঁ, নামটা আমি শুনেছি, রানা। তোমার সাথে শেষবার দেখা হবার পর।' নিঃশব্দে কিছুক্ষণ পাইপ টানলেন তিনি, তারপর মুখ তুললেন। 'কাল শার্কে দেখা হলে কিভাবে, কখন, সব তোমাকে বলব। আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে, তাই না? অন্তত আমার রাতের ঘুম হারাম করার জন্যে যথেষ্ট। বিরাট একটা ফাঁড়া কাটল মনে হচ্ছে!'

দরজার কাছে পৌঁছে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন ড. ওয়ার্নার। 'রানা, কাজটা কি তুমি করতে?' শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে উত্তর দিল রানা, 'আমি জানি না, ড. ওয়ার্নার। নিজের অজান্তেই প্ল্যান শুরু করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি করতাম সত্যিই জানি না।'

'যদি করতে, কিভাবে করতে, রানা?'

'এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করতাম...'

'বিষের চেয়ে ভাল,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন ড. ওয়ার্নার। 'তবে পিস্তলের চেয়ে খারাপ।' পরমুহূর্তে রেগে গেলেন তিনি। 'লোকটাকে আমাদের থামাতে হবে, রানা! এ এমন একটা দায়িত্ব যেটাকে সব কিছুর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।'

'এইমাত্র আমি যা বললাম, তাতে আমাদের সম্পর্ক কি আগের মত থাকছে?' জানতে চাইল রানা। 'আমি আপনাকে খুন করতে পারতাম, এটা জানার পর আপনি কি আমাকে আগের মত বিশ্বাস করতে পারবেন?'

'মজার কথা কি জানো, তোমার সম্পর্কে আমার যে ধারণা, এই ঘটনা থেকে সেটা আরও দৃঢ় হলো। আমাদের যেমন রূঢ়, নির্দয় লোক দরকার তুমি ঠিক তাই। সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে তোমার মত লোক ছাড়া আমার চলবে না।' ক্ষীণ একটু হাসলেন তিনি। 'কথাটা ভেবে আজ রাতে আমি হয়তো ঘেমে গোসল হব বিছানায়, কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমার আমার কাজ বা দায়িত্ব তাতে বদলাবে না।'

চুরুট ফুঁকছে রবসন, তার সামনে বসে পাইপ টানছেন ড. ওয়ার্নার, যেন প্রতিযোগিতা চলছে কার আগে কে ঘরটা ভরে তুলতে পারে ধোঁয়ায়। শার্ক কমান্ডের অস্থায়ী হেডকোয়ার্টারে এখনও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়নি। ওদের কীর্তিকাণ্ড দেখে নিজে আর ধূমপান করতে সাহস পেল না রানা। অস্বস্তি বোধ করলেও, এমন সব কথা শুনতে হলো ওকে যে খানিক পর ধোঁয়ার অস্তিত্ব চোখে বা নাকে আর ধরাই পড়ল না।

আইরিশ অপারেশন সম্পর্কে রিপোর্ট দিচ্ছে রবসন। 'লারাগের পোড়োবাড়ি সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গেছে, কিছুই উদ্ধার করা যায়নি। অস্টিনটা চুরি করা হয় ডাবলিন থেকে, নতুন রঙ আর রুফ ক্যারিয়ার পরে লাগানো হয়। গাড়িতেও কিছু পাওয়া যায়নি। বাড়ি বা গাড়ি, দুটোই এক্সপার্টরা পরীক্ষা করে দেখেছে।'

'লোকগুলো সম্পর্কে বলো।' নড়েচড়ে বসল রানা।

'ইয়েস, বস্। প্রথমে যে মারা গেছে। সাইরাস কারচিভাল, উনিশশো আটান্ন সালে বেলফাস্টে জন্ম–,' সামনের টেবিল থেকে একটা ফাইল তুলে খুলল রবসন, পাঁচ ইঞ্চি মোটা। '–সব পড়ার দরকার আছে কি? মনে হয় না। লোকটা পরিচিত টেরোরিস্ট, বহুবার জেল ভেঙে পালিয়েছে। এই কেসটার সাথে কিভাবে সে জড়াল জানা যায়নি। এবার, তার পকেটে যা পাওয়া গেছে।' ফাইল বন্ধ করল সে। 'তেমন কিছু নয়, অন্তত আমাদের কাজে আসার মত কিছু নয়। পনেরোশো পাউন্ড ট্র্যাভেলার্স চেক, পয়েন্ট থারটি-এইট অ্যামুনিশন আটত্রিশ রাউন্ড। একটা পাসপোর্ট পাওয়া গেছে, সোহরাব হোসেনের। পাসপোর্টে ফটো রয়েছে মি. সোহেল আহমেদের। পালের গোদা হয়তো চেয়েছিল, মি. সোহেলকে দূর কোন দেশে পাঠিয়ে দেবে, ঠিক জানি না। পরিচয়-পত্র পাওয়া গেছে ড. ময়নিহানের, মি. সোহরাব হোসেন তার রোগী। আরেকটা পরিচয়-পত্র মি. হ্যারির নামে, ড. ময়নিহানের সহকারী। এটা আসলে কারচিভালের জাল পরিচয়-পত্র। ড. ময়নিহান আসলে ড. অ্যালিস টিসডেল–বদ্ধ মাতাল এবং কুখ্যাত অ্যাবরশনিস্ট। বিরাশি সালে তার মেডিকেল সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়। এই কেসে তার পনেরো বছর জেল হবে, বাজি ধরে বলতে পারি।'

'সে মুখ খোলেনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল রবসন, 'খুলেছে, বস্। গুরুত্বপূর্ণ একটাই তথ্য পেয়েছি তার কাছ থেকে। দলটা ছিল দু'জনের, লীডার ছিল কারচিভাল। যা কিছু করেছে সে কারচিভালের নির্দেশে করেছে, আর কারচিভাল অন্য একজনের কাছ থেকে নির্দেশ পেত। এই অন্য একজনের নাম আমরা আগেই শুনেছি। খলিফা।'

'এখানে একটা পয়েন্ট রয়েছে,' বাধা দিয়ে বললেন ড. ওয়ার্নার। 'খলিফা তার নাম ব্যবহার করতে পছন্দ করে। রানাকে লেখা চিঠিতেও সে তার নিজের নাম সই করেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে খুব নিচুস্তরের শিষ্যদেরও নিজের নাম জানতে দিয়েছে সে। কেন?'

'উত্তরটা আমি দিতে পারব।' মাথা তুলল রানা। 'সে চায় আমরা জানি তার অস্তিত্ব আছে। ভয় আর ঘৃণা কাকে করব? একজন থাকতে হবে তো? নামটা প্রচার করছে সে, আর কাজের মধ্যে দিয়ে অবয়বের একটা ধারণা দিচ্ছে, আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি ভীতিকর সে।'

'তোমার সাথে আমি একমত।' প্রকাণ্ড মাথাটা গম্ভীরভাবে ঝাঁকালেন ড. ওয়ার্নার। 'নিজের নাম ব্যবহার করে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করছে সে, এক সময় এটা থেকে অনায়াসে ফায়দা লুটবে। ভবিষ্যতে খলিফা যখন খুন করার বা ক্ষতি করার হুমকি দেবে আমরা ধরে নেব সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছে এবং আপোষের কোন প্রশ্ন থাকবে না। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে সে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে। সে, বা তারা, চতুর সাইকোলজিস্ট।'

'আইরিশ অপারেশনের একটা দিক নিয়ে একটু মাথা ঘামানো দরকার,' বলল রানা। 'কে আমাদের খবরটা দিল, তার টেলিফোন করার পিছনে কারণ কি? পুরস্কার দাবি করল না কেন?'

সবাই ওরা চুপ করে থাকল, অবশেষে রবসনের দিকে ফিরল রানা। 'তোমার

কি ধারণা?'

'পুলিসের সাথে এ-বিষয়ে কথা বলেছি আমি। ওদের কাছেও ব্যাপারটা রহস্যময়। ইন্সপেক্টর ব্যারি হোমসের বিশ্বাস, আয়ারল্যান্ডকে বেছে নেয়ার কারণ জায়গাটা সাইরাস কারচিভালের পরিচিত, ওখানে তার পুরানো বন্ধুরা আছে। এক সময় ইরার সাথে ছিল সে।'

রানার নির্লিপ্ত চেহারা দেখে রবসন বুঝল, ব্যাখ্যাটা ওর মনে ধরছে না।

'বন্ধু যেমন ছিল, তেমনি ওখানে শত্রুও ছিল কারচিভালের,' আবার শুরু করল রবসন। 'ইরা ত্যাগ করার পর অনেকেই তার ওপর খেপে ছিল। একজন মুক্তিযোদ্ধা দল ছেড়ে ডাকাত হয়ে গেলে যা হয়। পুলিসের মত আমারও ধারণা, তার পুরানো বন্ধুদেরই কেউ প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে আমাদের টেলিফোন করে।'

স্থিরভাবে রবসনের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, কোন মন্তব্য করল না।

'রেকর্ড করা ফোন কলটা ভাষা বিশেষজ্ঞকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছে, কমপিউটরের ভয়েস প্রিন্টের সাথেও মেলাবার চেষ্টা করেছি। ওই কণ্ঠস্বরের নমুনা আমাদের কমপিউটরে নেই, আবার থাকতেও পারে। কথা বলার সময় ইচ্ছে করে কণ্ঠস্বর বিকৃত করা হয়, নোজ প্লাগ ব্যবহার করা হয়েছিল, অথবা মুখে রুমাল ধরা ছিল। ভাষা বিশেষজ্ঞের ধারণা, কোন আইরিশ লোক ফোনে কথা বলেছে। টেলিফোন ডিপার্টমেন্ট থেকে জানা গেছে, কলটা করা হয় দেশের বাইরে থেকে—বেশিরভাগ সম্ভাবনা আয়ারল্যান্ড থেকে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।' মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে রানার দিকে তাক করল রবসন। 'এবার তোমার কি ধারণা বলো, বস।'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ, গোটা ব্যাপারটাই কোইন্সিডেন্স। কারচিভালের দুর্ভাগ্য, পুরানো এক শত্রুর সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সৌভাগ্য, কারচিভালের শত্রু আমাদেরকে খবরটা জানাবার সিদ্ধান্ত নেয়। সোহেলের ভাগ্য, তার হার্ত কাটার চব্বিশ ঘণ্টা আগেই খবরটা পেয়ে যাই আমরা। শার্ক কমান্ডের সৌভাগ্য, ঠিক যখন কারচিভাল পালাচ্ছে তখন সেখানে পৌঁছুতে পারি আমরা। এই ব্যাখ্যাই তো দিতে চাইছ, তাই না?'

'অনেকটা তাই,' স্বীকার করল রবসন।

'দুঃখিত, কার্ল। পরপর এতগুলো দৈব-ঘটনা আমি বিশ্বাস করি না।'

'ঝেড়ে কাশো,' আমন্ত্রণ জানাল রবসন। 'শোনা যাক আসলে ঠিক কি ঘটেছে।'

'কি ঘটেছে আমি জানি না।' তিক্ত একটু হাসল রানা। 'কিন্তু আমার শুধু মনে হচ্ছে, খলিফা যেখানে জড়িত সেখানে এতগুলো কেন, কোন দৈব-ঘটনাই ঘটতে পারে না। আমার বিশ্বাস, খলিফাও কো-ইন্সিডেন্স বিশ্বাস করে না।'

'ঠিক কি বলতে চাও?'

'কারচিভালের ব্যাপারে এইটুকু যে, প্রথম থেকেই তার কপালে মৃত্যু-চিহ্ন এঁকে দেয়া হয়েছিল। গোটা প্ল্যানেরই একটা অংশ—কারচিভালের এই মৃত্যু।'

'তোমার মনে হওয়াটা খুব মজার,' একটু যেন রেগে উঠল রবসন। 'কিন্তু মনে হওয়ার ভেতর যুক্তি আর প্রমাণ না থাকলে তার দাম কি?'

আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল রানা। 'ঠিক আছে, শান্ত হও। ধরা যাক, তোমার ব্যাখ্যাটাই ঠিক। তাহলে...'

'কিন্তু?'

'কোন কিন্তু না। অন্তত যতক্ষণ অকাট্য প্রমাণ না পাওয়া যায়।'

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকাল রবসন, তার চেহারা গম্ভীর। 'অকাট্য প্রমাণ, তাই না? ট্রাই দিস ওয়ান ফর সাইজ–'

'থামো, রবসন,' দ্রুত, কর্তৃত্বের সুরে বাধা দিলেন ড. ওয়ার্নার। 'এ-প্রসঙ্গে কিছু বলার আগে আরও কথা আছে।' অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল রবসন, ধীরে ধীরে শান্ত হলো তার চেহারা, ড. ওয়ার্নারের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে পরিচিত হাসি হাসল একটু।

'একটু পিছিয়ে যাই আমরা, কেমন?' কথা বলছেন ড. ওয়ার্নার। 'রানা এল খলিফার নাম নিয়ে। তারও আগে এই একই নাম শুনেছি আমরা, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য এক উৎস থেকে। রানাকে আমি কথা দিয়েছি, আমাদের উৎস সম্পর্কে বলব ওকে। বলব, কারণ, গোটা ব্যাপারটা তাহলে সম্পূর্ণ নতুন এক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

'এমন একটা দিক থেকে খবরটা এল, রীতিমত তাজ্জব ব্যাপার। তবে নামের ধরনটা বিবেচনা করলে আশ্চর্য হওয়া চলে না। পুব দিক, রানা। পরিষ্কার করে বলি, রিয়াদ। সৌদি আরবের রাজধানী, তেল সাম্রাজ্যের বাদশার প্রাসাদ। কেসটার কথা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। বাদশার উনিশ বছরের নাতি, প্রিন্স হাশেম আবদেল আব্বাস। সে খুন হয়ে যাবার পর বাদশা সি.আই.এ-র সাহায্য চান।' রানার মনে পড়ল, ব্যারনেস লিনার সাথে এ-প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে ওর, মাত্র তিন হপ্তা আগে। প্রিন্স হাশেমের চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসেন বাদশার এমন নিকট আত্মীয়ের সংখ্যা সাতশোর মত, আরও আছে আবুধাবী শেখের আপনজনরা, ইরানের ধর্মীয় নেতারা, কুয়েতী শেখের প্রিয়পাত্ররা–এদের সবাইকে নিখুঁতভাবে প্রোটেকশন দেয়া সম্ভব নয়, কাজেই যে কেউ খলিফার শিকারে পরিণত হতে পারে।

'বাদশার কাছে ওদের দাবিটা কি ছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দাবি একটা জানানো হয়েছিল শুধু এটুকুই জানি আমরা। নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার দিকটা দেখার জন্যে সি.আই.এ-র সহযোগিতা চান বাদশা। দাবিটা জানানো হয়েছিল খলিফা নামে কোন লোক বা এজেন্সির পক্ষ থেকে। দাবিটা কি ছিল তা না জানলেও, খবর পেয়েছি যে ইরান, কুয়েত, আর আবুধাবীর সাথে সুর মিলিয়ে সৌদি আরবও ঘোষণা করেছে ওপেকের পরবর্তী বৈঠকে ক্রুড অয়েলের দাম বাড়াবার প্রস্তাব তারা সমর্থন করবে না। তারা বরং আরও পাঁচ পার্সেন্ট কমাবার জন্যে চেষ্টা করবে।'

'তারমানে খলিফার চাপের মুখে নতি স্বীকার করছে দেশগুলো!' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'অন্তত দেখে তো তাই ভাবতে হয়।' পাইপে আগুন ধরালেন ড. ওয়ার্নার। 'তারমানে আমরা যা ভয় করেছিলাম সেটা সত্যি–খলিফার অস্তিত্ব একটা বাস্তব

ঘটনা।'

'শুধু যে অস্তিত্ব আছে তাই নয়, দিনে দিনে তার সাহসও বাড়ছে।'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমরা আসলে ঘাস কাটছি,' ঝাঁঝের সাথে বলল রবসন। 'জোহানেসবার্গে সে-ই জিতল। রিয়াদেও সে-ই জিতছে। এরপর কোথায় হাত বাড়াবে সে? পশ্চিম জার্মানীর শ্রমিক সংগঠনে? গ্রেট ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়নে? কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি শুনি রাজীব গান্ধীকে খলিফা খুন করেছে, একটুও আশ্চর্য হব না। লোকটা এরকম একটা হুমকি হয়ে থাকবে আর আমরা বসে বসে দেখব?' একে একে রানা আর ড. ওয়ার্নারের দিকে তাকাল সে, তারপর আবার বলল, 'আমাদের বোঝা উচিত, এককভাবে কোন গ্রুপ যদি যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে সে গ্রুপের পক্ষে যে-কোন দেশের ভাগ্য বদলে দেয়া সম্ভব। ছোট আর দুর্বল দেশগুলোর জন্যে ব্যাপারটা আতঙ্কজনক।'

'শুধু ছোট আর দুর্বল দেশগুলোর জন্যে নয়, গোটা পৃথিবীর জন্যেই ব্যাপারটা ভীতিকর। দুনিয়ার বড় বড় সিদ্ধান্ত যাঁরা নেন তাঁদের সংখ্যাও কম নয়, তাঁদের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে রক্ষা করা অসম্ভব একটা ব্যাপার।' এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'আমরা একটা বুদ্ধিমান শত্রুর পিছনে লাগতে যাচ্ছি। প্রথম দুটো টার্গেটের কথা ভেবে দেখো। দক্ষিণ আফ্রিকা আর সৌদি আরব। একটা দেশ কালোদের নির্যাতন করছে, আরেকটা দেশ তেলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে—এদের প্রতি সাধারণ মানুষের কোন সমর্থন বা সহানুভূতি নেই। তারমানে সাধারণ মানুষের মনে একটা ধারণা জন্ম নিচ্ছে, খলিফা আসলে মানবসভ্যতার মঙ্গল চায়। এভাবে জনপ্রিয়তা অর্জনের পিছনে নিশ্চয়ই তার কোন উদ্দেশ্য আছে। সে কি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ভাবছে, নাকি রবিন হুড? দুনিয়ার বুক থেকে দুর্নীতি আর অবিচার মুছে ফেলে বাসযোগ্য একটা স্বর্গ গড়ে তুলতে চায়?'

'তুমি আমাকে অকাট্য প্রমাণের কথা বলছিলে, বস্,' স্মরণ করিয়ে দিল রবসন। 'এখুনি শুনতে চাও?'

সোফা ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। অপেক্ষা করে আছে।

'আইটেম ওয়ান। মি. সোহেলকে আটকে রাখার সময় পোড়োবাড়ি থেকে দুটো টেলিফোন কল করা হয়। দুটোই ইন্টারন্যাশনাল কল। চলতি মাসের পয়লা তারিখে প্রথমটা, তারমানে যেদিন ওরা বাড়িটায় আশ্রয় নিয়েছিল। আমরা ধরে নিতে পারি, মেসেজের মূল কথা ছিল, "এদিকে সব ঠিক আছে"। দ্বিতীয় কলটা করা হয় সাত দিন পর, সকাল সাতটায়, সেই একই নম্বর। ধরে নিতে পারি এটাও আরেকটা মেসেজ, যাতে বলা হয়েছে, "এখনও সব ঠিক আছে"। অল্প সময়ের কল ছিল ওগুলো, আগে থেকে ঠিক করা এক বাক্যের একটা মেসেজ পাঠাতে যতক্ষণ লাগে।' থেমে ড. ওয়ার্নারের দিকে তাকাল রবসন।

'বলো,' অনুমতি দিলেন ড. ওয়ার্নার।

'কলগুলো একটা ফ্রেঞ্চ নাম্বারে করা হয়েছিল রঁবুইলে ৪৭-৯৭-৯৭।'

তলপেটে বেমক্কা একটা ঘুসি খেলো যেন রানা। ঝাঁকি খেয়ে একটু কুঁজো হয়ে গেল ও। মুহূর্তের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল চোখ। এই নম্বরে কত বার ফোন করেছে ও। তারপর চোখ খুলে দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়ল। 'না! এ আমি বিশ্বাস

করি না!'

'কথাটা সত্যি, রানা,' নরম সুরে বললেন ড. ওয়ার্নার।

ধীরে ধীরে জানালার দিকে পিছন ফিরল রানা, ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে এসে নিজের সোফায় বসে পড়ল।

কামরার ভেতর জমাট বেঁধে থাকল নিস্তব্ধতা। বাকি দু'জনের কেউই সরাসরি রানার দিকে তাকাল না।

রবসনের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করলেন ড. ওয়ার্নার। লাল রঙের একটা বক্স ফাইল, টেবিলের ওপর দিয়ে ড. ওয়ার্নারের দিকে ঠেলে দিল রবসন।

ফাইলটা খুললেন ড. ওয়ার্নার। ডবল স্পেস দিয়ে টাইপ করা পাতা, এক সেকেন্ড করে চোখ বুলিয়েই উল্টে গেলেন। নির্দিষ্ট পাতায় চোখ রেখে অপেক্ষা করে থাকলেন, রানাকে শান্ত হবার সময় দিচ্ছেন।

শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে রানা, সরাসরি সামনের দেয়ালে স্থির হয়ে আছে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। ওর সারা শরীরে অসাড় একটা ভাব, এবং গলার কাছে বিবমিষা। আবার চোখ বুজল রানা, থই থই যৌবন নিয়ে একহারা নারীদেহ ভেসে উঠল মনের পর্দায়, চেহারায় হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা ফুটিয়ে আত্মসমর্পণ করছে ওর কাছে। মার্জিত এবং অভিজাত, সুন্দরী এবং বিদুষী। বিশ্বাসঘাতিনী? ওকে ব্যবহার করেছে?

চোখ খুলে আরও একটু সিধে হলো রানা, এবং মুহূর্তটি চিনতে পেরে রানার দিকে ফাইলটা উল্টো করে ধরলেন ড. ওয়ার্নার।

ফাইলের কাভারে লেখা রয়েছে, টপ সিক্রেট। তার নিচে নামটা টাইপ করা: অটারম্যান, মিডো লিনা।

ফাইলটা সিধে করলেন ড. ওয়ার্নার, তারপর শুরু করলেন। 'তোমাকে আমি আগেই বলেছি, মেয়েটার প্রতি আমাদের বিশেষ কৌতূহল আছে। নিউ ইয়র্কে তুমি আমার সাথে দেখা করার পর তার সম্পর্কে নতুন নতুন আরও অনেক তথ্য পেয়েছি আমরা, প্রতিটি তথ্য তার সম্পর্কে কৌতূহলের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করার বেশিরভাগ কৃতিত্ব রবসনের–বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে ধরনা দিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। সি.আই.এ, ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স, এবং এমনকি কে.জি.বি-র কাছ থেকেও সহযোগিতা আদায় করেছে ও।

'নারী রহস্যময়ী। নারী ছলনাময়ী। পুরানো হলেও, কথাগুলো আজও কারও কারও বেলায় সত্যি। মেয়েটা...এক কথায় অঘটন-ঘটনপটিয়সী। তার কৃতিত্ব রীতিমত অবিশ্বাস্য। সুপুরুষ বাছাইয়ে তার রুচি আর দক্ষতা স্বীকার করে নিতে হয়। কি রকম কষ্ট পাচ্ছ তা আমি বুঝি, রানা। কিন্তু দুঃখিত, তোমার ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে কৌশলে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার সময় আমাদের হাতে নেই। স্পষ্ট ভাষায় তিক্ত কথা বলব আমি।

'আমরা জানি, ব্যারনেস লিনা অটারম্যান তোমাকে একজন লাভার হিসেবে গ্রহণ করেছে। বুঝতে পারছ কি, বাক্যটা আমি নির্বাচিত শব্দ দিয়ে সাবধানে সাজিয়েছি? ব্যারনেস লিনা লাভার গ্রহণ করে, উল্টোটা ঘটে না। সে লাভার বাছাই

হৃদয়ে ভবিষ্যতের কথা ভেবে, নিজের স্বার্থে, এবং নিখুঁত পরিকল্পনার সাহায্যে। নিছক ভাবাবেগের কোন মূল্যই দেয় না সে।'

রানার মনে পড়ল ব্যারনেস লিনা ওকে বলেছিল, 'মন দেয়া-নেয়ার ব্যাপারে আমি একদম কাঁচা, রানা–কোন অভিজ্ঞতা নেই। শুধু জেনো, তোমাকে আমি সুখী করতে চাই, সেই সাথে তোমাকে নিয়ে সুখী হতে চাই।'

'লাভ-মেকিং-এ ট্রেনিং পাওয়া মেয়ে, এ বিষয়ে তার জুড়ি গোটা পশ্চিমা জগতে আর হয়তো দু'একজন থাকতে পারে। আর এই ট্রেনিং সে প্যারিস, লন্ডন, বা নিউ ইয়র্কে পায়নি।' ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকালেন ড. ওয়ার্নার। 'এসবই গুজব, রানা। তুমিই ভাল বলতে পারবে কতটা কি সত্যি বা মিথ্যে।'

রানার নির্লিপ্ত চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। ব্যারনেস লিনা কৌশলে ওকে প্রেমের জালে আটকেছে, এ কথা এখনও বিশ্বাস করতে চায় না। লিনার সাথে থাকার সময় মধুর একটা আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে ওর গোটা অস্তিত্ব, তনু-মন ছেয়ে থাকে পরম পুলকে। মিষ্টি ভুবনভোলানো হাসি, মৃদু কোমল স্পর্শ, কিংবা কোন দুর্লভ উপহার দিয়ে ওকে সম্মোহিত করে ফেলে। সবটুকুই কি কৌশল বা ষড়যন্ত্রের অংশ, হৃদয়ের নির্যাস বা অন্তরের সুধা এতটুকু নেই? ড. ওয়ার্নারের প্রশ্নের উত্তর দিল না রানা, বিড়বিড় করে বলল, 'আপনি বলে যান, প্লীজ।' নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে ও, ওর ডান হাত কোলের ওপর শিথিল ভঙ্গিতে পড়ে আছে, আঙুলগুলো ছড়ানো।

'ভাষা আর অঙ্কে ছোটবেলা থেকেই অসম্ভব ভাল সে। তার বাবা সৌখিন অঙ্কবিদ ছিলেন, দাবাতেও খুব ভাল ছিলেন। তাঁর মেয়ে লিনা সবার দৃষ্টি কাড়ে, কারণ তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। দুঃখিত, রানা–এটা একটা নতুন তথ্য তাই তোমাকে আগে জানানো সম্ভব হয়নি। ফ্রেঞ্চদের কাছ থেকে পেয়েছি তথ্যটা, রাশিয়ানরা কনফার্ম করেছে। পার্টি মীটিঙে মেয়েকে সাথে করে নিয়ে যেতেন বাবা, এবং দেখা গেল রাজনীতির প্রতি দারুণ আগ্রহ আছে মেয়ের।

'বাবার মৃত্যু বেশ একটু রহস্যময়। কিন্তু ফ্রেঞ্চ বা রাশানরা এ-ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি নয়। বাবার বন্ধুরা প্রায় সবাই পার্টি মেম্বার ছিল, তারাই এতিম লিনার দায়িত্ব নিল। এক পরিবার থেকে আরেক পরিবারে ঘুরে বেড়াতে লাগল লিনা।' ড. ওয়ার্নার পোস্টকার্ড সাইজের একটা ফটোগ্রাফ রাখলেন রানার সামনে নিচু টেবিলে। 'তার তখনকার ছবি।'

বুকের দু'পাশে বেণী করা চুল, ছোট স্কার্ট পরা একজন স্কুলছাত্রী, দু'হাতে বুকের সাথে একটা কালো বিড়ালকে ধরে আছে। বিকেলবেলা ফরাসী কোন পার্কে দাঁড়িয়ে তোলা হয়েছে ছবিটা।

'এরপর তার কাকা তাকে চিঠি লেখে দেশ থেকে। চিঠির সাথে তার মা-বাবার কম বয়েসের ফটো ছিল। কিশোরী মেয়েটা মুগ্ধ হয়ে যায়। বাবা-মা যেখানে শৈশব কাটিয়েছে সে জায়গাটা না জানি কেমন! সে জানত না তার একজন কাকা আছে। বাবা কখনও আত্মীয় স্বজনদের প্রসঙ্গে কথা বলেননি। বেচারি এতিম মেয়েটা এই প্রথম জানল, তার একটা পরিবার আছে। আরও কয়েকটা চিঠি আদান-প্রদান হলো, বিনিময় হলো আনন্দ আর স্নেহ, তারপরই

সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়ে গেল। কাকা নিজে এল ভাইঝিকে নিয়ে যেতে, তার সাথে জন্মস্থান পোল্যান্ডে ফিরে গেল লিনা কুটচিনস্কি।' ড. ওয়ার্নার তাঁর হাত দুটো মেলে দিলেন। 'গোটা ব্যাপারটা এই, পানির মত সোজা।'

'হারানো বছরগুলো,' বলল রানা, নিজের কানেই অদ্ভুত শোনাল কণ্ঠস্বর। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করল ও, ড. ওয়ার্নারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি নিয়ে নড়েচড়ে বসল।

'এখন আর বছরগুলোকে হারানো বলা যাবে না, রানা। তেরো থেকে উনিশ, এই ছয়টা বছর নিরুদ্দেশ ছিল লিনা, তাই না? কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জানার পর আমরা জানতে চেষ্টা করি কারা এবং কেন নিয়ে গিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট পক্ষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল...'

'রাশিয়ানরা?' জিজ্ঞেস করল রানা, চেহারায় অবিশ্বাস। 'ওরা এভাবে সহযোগিতা করছে, ব্যাপারটা সন্দেহজনক নয়? আপনাদেরকে মূল্যবান তথ্য দেয়ার লোক তো নয় ওরা।'

'এই কেসটায় দিয়েছে, তার কারণও আছে–সময় হলে বলব।'

'বেশ।'

'কাকার সাথে পোল্যান্ড, ওয়ারশ-এ ফিরে এল লিনা। পরিবারটা আসল, নাকি ষড়যন্ত্রের অংশ আমরা জানতে পারিনি। কাকার ইচ্ছায় পরীক্ষা দিল লিনা, খুব ভাল রেজাল্ট করল, চেষ্টা-তদবির করায় সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা এলিট কলেজে পড়ার স্কলারশিপ-ও পেয়ে গেল সে।

'কলেজটা ছিল কৃষ্ণ সাগরের কাছে ওডেসা-য়। নাম নেই এমন একটা কলেজ, মেধাবীদের মধ্যে থেকে শুধু সেরা ছেলেমেয়েদের বাছাই করে আনা হয় এখানে। লিনাকে বিশেষ করে তালিম দেয়া হলো ভাষা, রাজনীতি, ফাইন্যান্স, আর অঙ্কে। সতেরো বছর বয়সে একটা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাস করল সে, কলেজের আরও স্পেশালাইজড ব্রাঞ্চে ভর্তি হলো। এখানে তাকে শেখানো হলো স্মরণশক্তি বাড়াবার কৌশল। ওডেসা কলেজের মান অনুসারে সহজ একটা পরীক্ষার নমুনা হলো–একশোটা বিষয়ে চল্লিশটা লাইন লেখা থাকে একটা কাগজে, কাগজটা ষাট সেকেন্ড দেখতে দেয়া হয়। ষাট সেকেন্ড পর অন্য একটা কাগজে না দেখে লেখাগুলো লিখতে হয়, চব্বিশ ঘণ্টা পর।' প্রশংসাসূচক ভঙ্গিতে আবার মাথা নাড়লেন ড. ওয়ার্নার।

'একই সাথে তাকে পাশ্চাত্যের অভিজাত শ্রেণীর জীবনধারা শেখানো হলো। সাজ-সজ্জা, আহারাদি, পানীয়, প্রসাধন, আদব-কায়দা, জনপ্রিয় সঙ্গীত আর সাহিত্য, সিনেমা-থিয়েটার, গণতান্ত্রিক রাজনীতি, বাণিজ্য কৌশল, স্টক মার্কেট, পণ্য বন্টন, সেক্রেটারিয়াল কোর্স, আধুনিক নাচ, বশীকরণ মন্ত্র, সম্মোহন–এরকম আরও অনেক কিছু, সবই বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে–ফ্লাইং, স্কিইং, মার্ডারিং, মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ একজন প্রথম সারির এসপিওনাজ এজেন্টকে যা যা শেখানো দরকার।

'ব্যাচে সেই ছিল মক্ষিরাণী; মেধা এবং মননে সবার সেরা, এবং তোমার চোখে সে ধরা দেয় দুর্লভ একটা উপহার সামগ্রীর আদলে। অভিজাত,

কামিনীসুলভ কোমল, ঐশ্বর্যময়ী, দক্ষ, উদ্যোগী এবং বিপজ্জনক।

'উনিশ বছর বয়সে, বয়সের দ্বিগুণ অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান-বুদ্ধি অর্জন করে সে। তার ট্রেনিঙে একটাই মাত্র ছোট্ট খুঁত থেকে গিয়েছিল, সেটা প্রকাশ পায় পরে। বড় বেশি বুদ্ধিমতী সে, এবং বড় বেশি অ্যামবিশাস।' বিশ মিনিটে এই প্রথম হাসলেন ড. ওয়ার্নার। '-অ্যামবিশন, যার অপর নাম লোভ। তার প্রভুরা এই দোষটা লক্ষ করেনি।'

রবসনের দিকে না তাকিয়ে একটা হাত পাতল রানা। ওর হাতে চুরুট আর লাইটার ধরিয়ে দিল রবসন।

'লোভ সে তো অযোগ্য আর নির্বোধ লোকের মধ্যেও থাকে,' আবার শুরু করলেন ড. ওয়ার্নার। 'শুধু অত্যন্ত উন্নতমানের মেধা যার, সে-ই টাকার লোভ আর ক্ষমতার লোভ এক করে দেখে।' রানার চোখে প্রতিবাদ লক্ষ করে তাড়াতাড়ি মাথা নাড়লেন তিনি। 'না, না-আমি সাধারণ ক্ষমতার কথা বলছি না। নাগালের মধ্যে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, সে জিনিস নয়। আমি সত্যিকার ক্ষমতার কথা বলছি। একটা রাষ্ট্র বা জাতির ভাগ্য বদলে দেয়ার ক্ষমতা। যে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কাইজার বা নেপোলিয়ান। যে ক্ষমতার অধিকারী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। ব্যারনেস লিনার এই ক্ষমতাটা দরকার, রানা। মহান হবার লোভে ক্ষমতাটা দরকার তার। দুনিয়াটাকে উদ্ধার করতে চায় সে। ঈশ্বরের প্রতিনিধি সাজতে চায়।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন ড. ওয়ার্নার, তারপর রবসনের দিকে ফিরে অনুরোধ করলেন, 'তুমি কি বলো, রবসন, একটু কফি হলে ভাল হত না?'

কফি মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রবসন।

বিরতি পেয়ে চিন্তা করার সুযোগ হলো রানার। ড. ওয়ার্নারের কাহিনীতে খুঁত খুঁজল, কিন্তু পেল না। ব্যারনেস লিনার সাথে কাটানো সময়গুলোর কথা মনে পড়ে গেল। তার স্পর্শ, মধুর সংলাপ, কোমল কটাক্ষ, ব্যাকুল উদ্বেগ-মনে পড়লেই পুলকে শিরশির করে ওঠে শরীর। কোন মেয়েকে ট্রেনিং দিয়ে এতটা ঝানু নিখুঁত করা সম্ভব কি?

নিচু টেবিলে সবার সামনে কফির কাপ রাখল রবসন। আবার শুরু করলেন ড. ওয়ার্নার।

'তারপর সে প্যারিসে ফিরে এল, এবং তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল প্যারিস। এল, এবং জয় করল লিনা।' ফাইল থেকে লিনার কয়েকটা ছবি বের করলেন তিনি। এলিসি প্রাসাদে নাচছে লিনা, ব্লু রয়্যালের সামনে একটা রোল্সস-রয়েসে চড়ছে, সফররত মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে করমর্দন করছে, বরফ ঢাকা নিরিবিলি প্রান্তরে স্কি করছে, ঘোড়ার পিঠে বসে তীরবেগে মাঠ পেরোচ্ছে। অভিজাত ভঙ্গি, হাসিখুশি, গর্বিত। প্রতিটি ছবিতে তার সঙ্গে পুরুষ আছেই। ধনী, সুদর্শন, ক্ষমতাবান পুরুষ।

'তোমাকে আমি আগেই জানিয়েছি, ছয়জনের সাথে যৌন সম্পর্ক ছিল তার,' চেহারায় অস্বস্তি এবং তিক্ত ভাব নিয়ে বললেন ড. ওয়ার্নার। 'সংখ্যাটা বদলাবার কারণ ঘটেছে। ফ্রেঞ্চরা এ-সব ব্যাপারে খুঁটিয়ে জানতে পছন্দ করে, তালিকাটা

আরও লম্বা করে দিয়েছে তারা। পল বার্না, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি মিনিস্টার, এবং অ্যারন রোজেনবার্গ, আমেরিকান কনসুলেটে হেড অভ দি মিশন।' ফটোগুলো রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

একবার চোখ বুলিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বলে যান।' ওগুলো হাত দিয়ে ছুঁলো না।

'তার প্রভুরা কি রকম খুশি হয়েছিল বুঝতেই পারছ। একজন পুরুষ এজেন্টকে দিয়ে কাজ পেতে হলে অনেক সময় দশ বারো বছর অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু লিনা সাথে সাথে ডিম পাড়তে শুরু করল। তার সাফল্য সম্পর্কে বিশদ আমরা জানতে পারিনি, রাশিয়ানরা সব কথা বলেনি আমাদের। তবে তারা বুঝতে পারে লিনা তাদের একটা অমূল্য সম্পদ। কিন্তু সেই সাথে এ-ও তারা উপলব্ধি করে, লিনার রূপ-যৌবন একদিন শেষ হয়ে যাবে। আমরা ঠিক জানি না, লিনার প্রভুরাই ব্যারন মিডো অটারম্যানকে নির্বাচন করেছিল কিনা। সম্ভবত তাই। পশ্চিম ইউরোপের অন্যতম একজন ধনী ব্যক্তি, যিনি স্টীল আর এঞ্জিনিয়ারিং ব্যবসার বেশিরভাগটাই নিয়ন্ত্রণ করেন, যাঁর রয়েছে এককভাবে সেরা আর্মামেন্ট কমপ্লেক্স, ইলেকট্রনিক্স সাম্রাজ্য, টার্গেট হিসেবে আদর্শ নয়? ব্যারনের স্ত্রী গত হয়েছে, কোন সন্তানাদি নেই, কাজেই আবার তিনি বিয়ে করলে তার দ্বিতীয় স্ত্রীই হবে বিপুল সম্পত্তি আর বিত্ত-বৈভবের একমাত্র উত্তরাধিকারী। ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ধীরে ধীরে হারছেন ভদ্রলোক, অর্থাৎ তাঁর আয়ু বেশিদিন নেই। তিনিও একজন ইহুদি, এবং মোসাডের পুরানো ও বিশ্বস্ত এজেন্ট। ভেবে দেখো, রানা, এ-ধরনের একজন লোকের সাথে নিজেদের এজেন্টকে ভিড়িয়ে দিতে পারলে কি লাভ।

'ব্যারন সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানা আছে আমার। আরেকজন অসাধারণ মানুষ। সিংহের মত দুর্জয় সাহস, সমস্ত বিষয়ে সেরা জিনিসটির ভক্ত। কৌশলে, এবং ধীরে ধীরে তার কাছাকাছি হলো লিনা। এবং নিজ গুণে জয় করল তাঁর মন। দু'বছর কাটল, লিনা প্রমাণ করল তাকে ছাড়া ব্যারনের চলে না। কিন্তু নিজেকে সস্তা হতে দেয়নি লিনা, ব্যারনের যৌন-ক্ষুধার খোরাক হতে দেয়নি শরীরটাকে।

'ব্যারনের নারী-প্রীতি ছিল কিংবদন্তীর মত, ইউরোপের যে কোন সুন্দরীকে চাইলেই পেত সে, এবং চাইতেও দ্বিধা করত না। সন্তানাদি না হওয়ার অবশ্য একটা কারণ ছিল–যুবা বয়সের পদস্খলন দায়ী। হ্যাঁ, সিফিলিস। রোগটা অবশ্য পরে সম্পূর্ণ সেরে যায়, কিন্তু ক্ষতিটা পূরণ করা যায়নি। ব্যারন সন্তানোৎপাদনে অক্ষম হয়ে পড়েন।'

ড. ওয়ার্নার আরেকটা ফটো উল্টো করে ধরলেন রানার দিকে। গভীর মনোযোগের সাথে ব্যারন অটারম্যানকে দেখল রানা: শালপ্রাংশু শরীর, ষাঁড়ের মত চওড়া কাঁধ, ইস্পাত-কঠিন নিরেট চোয়াল। যৌন-কাতর এবং কামুক অনেক লোকের মতই তার মাথায় চুল নেই, কামানের গোলা আকৃতির খুলির কিনারায় কাঁচাপাকা কয়েক গাছি ফিতের মত সেঁটে আছে শুধু। হাসছে না, কিন্তু ঠোঁটের বঙ্কিম রেখা, আর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির ভেতর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে নির্দয় কৌতুকের ভাব। ক্ষমতার প্রতিমূর্তি, ভাবল রানা।

'অবশেষে যখন ব্যারনকে শরীর জয় করার অধিকার দিল লিনা, নিশ্চয়ই বজ্রপাত সহ তুমুল ঝড়-ঝঞ্ঝার মত ছিল ব্যাপারটা।' ড. ওয়ার্নার লিনা অটারম্যানের যৌন-জীবন নিয়ে বেশি কথা বলছেন, যে তথ্যগুলো পাচ্ছে রানা সেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আপত্তি করতে গিয়েও নিজেকে সামলে রাখল ও। 'দু'জনেই সব দিক থেকে অসাধারণ, পরস্পরের উপযুক্ত। এক কোটি মানুষের মধ্যে ব্যতিক্রম একজোড়া নর-নারী। ওদের একটা বাচ্চা হতে পারলে কি ঘটত, গবেষণার বিষয় বৈকি। আমার ধারণা, বাচ্চাটা হত মঙ্গোলিয়ান গর্দভ।' ঠোঁট টিপে একটু হাসলেন তিনি। 'লাইফ ইজ লাইক দ্যাট।'

অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে বসল রানা, আলোচনার এই পর্যায়টাকে ঘৃণা করছে

'ওদের বিয়ে হয়ে গেল। পশ্চিমা ইন্ডাস্ট্রি জগতে নিজের একজন এজেন্টকে সাফল্যের সাথে বসাতে পারল কে.জি.বি.। মিডো স্টীল আর অটারম্যান আর্মামেন্টস কমপ্লেক্সে তৈরি হচ্ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আর আমেরিকার জন্যে মিসাইল। নতুন ব্যারনেস মিডো স্টীলের ডেপুটি চেয়ারম্যান হলো। আমরা ধরে নিতে পারি, মিসাইল ব্লু-প্রিন্ট ব্রীফকেসে করে নয়, ট্রাকে করে পাচার করা হয়। প্রায় রোজ রাতেই পশ্চিমা জগতের রাজনীতিক আর ভাগ্য বিধাতারা নতুন ব্যারনেসের সাথে মীটিঙে বসতেন, ব্যারনেস তাদেরকে মদ খাইয়ে খুশি করত আর তথ্য সংগ্রহ করত। প্রতিটি তথ্য মনে গেঁথে নিত ব্যারনেস, একবার কিছু শুনলে জীবনে কখনও ভোলে না। ধীরে ধীরে ব্যারনের ক্ষমতা কমতে লাগল, প্রতিদিন আরও বেশি করে স্ত্রীর ওপর নির্ভর করতে শুরু করলেন তিনি। ঠিক কখন থেকে লিনা ব্যারনের মোসাড তৎপরতায় সহযোগিতা করতে শুরু করে আমরা জানি না, তবে ব্যাপারটা ঘটতে শুরু করার সাথে সাথে রাশিয়ানদের প্ল্যান পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করে। লিনার মাধ্যমে ব্যারন অটারম্যান হয়ে উঠল কে.জি.বি-র ডান হাত। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, পশ্চিমা জগতের হেভি ইন্ডাস্ট্রির সিংহভাগের নিয়ন্ত্রণ চলে এল রাশিয়ার হাতে।

'গোটা ব্যাপারটা চমৎকার শৃঙ্খলার সাথে চলছিল, কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে শুরু করল ব্যারনেসের আসল চেহারা। এক সময় কে. জি. বি. টের পেয়ে গেল, ব্যারনেস নিজের জন্যে কাজ করছে। লিনাকে যারা নিয়ন্ত্রণ করত, তাদের চেয়ে অনেক উন্নত ব্রেনের অধিকারিণী সে, এবং প্রকৃত ক্ষমতার স্বাদ পেতে শুরু করেছে।'

জাত গল্প বলিয়ের মত ড. ওয়ার্নার জানেন শ্রোতাদের কিভাবে উত্তেজিত করে তুলতে হয়। মাথা নিচু করে কফির কাপে চুমুক দিলেন তিনি। বিরতির সুযোগে উঠল রবসন, সবার কাপ ভরে দিল আবার।

'স্বভাবতই শেষ অস্ত্রটা ব্যবহার করল কে.জি.বি–ভয় দেখাল লিনার কাভার ফাঁস করে দেবে তারা। অটারম্যানের মত ব্যক্তি যদি জানতে পারেন তাঁকে বোকা বানানো হয়েছে, গজব নেমে আসবে। সন্দেহ নেই, সাথে সাথে লিনাকে ডিভোর্স করবেন তিনি। ফ্রান্সে কাউকে ডিভোর্স দেয়া কঠিন, কিন্তু অটারম্যানের জন্যে কিছুই কঠিন নয়। তাঁর প্রোটেকশন ছাড়া লিনা মূল্যহীন–কারণ রাশিয়ানদের কাছে

তার আর কোন গুরুত্বই থাকবে না। অটারম্যানকে হারালে লিনার ব্যক্তিগত স্বপ্নও ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তাই বলতে হয়, কে.জি.বি-র হুমকিটা কাজের জিনিসই ছিল। কিন্তু এ-ধরনের হুমকিতে কাজ হয় শুধু সাধারণ মানুষের বেলায়। কিন্তু আমরা এখানে একজন অসাধারণ মানুষকে নিয়ে আলোচনা করছি।'

নিভে যাওয়া চুরুটটা আবার ধরাল রানা। ওর সমস্ত নড়াচড়া নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে লক্ষ করলেন ড. ওয়ার্নার। তারপর ক্ষীণ একটু হাসলেন।

'কথা একা শুধু আমিই বলছি। এবার তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাই, রানা। সামান্য হলেও তুমিও তাকে চেনো, এবং গত এক ঘণ্টায় তার সম্পর্কে অনেক কিছু জানলে–ধারণা করতে পারো, এরপর কি করল সে?'

মাথা নাড়তে শুরু করে হঠাৎ থেমে গেল রানা, যেন প্রচণ্ড শক্তিতে কেউ ওকে ঘুসি মেরে বসেছে। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হলো, বিস্ফারিত চোখে ড. ওয়ার্নারের দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

'তুমি আন্দাজ করতে পেরেছ,' মাথা ঝাঁকালেন ড. ওয়ার্নার। 'হ্যাঁ, আমরা ধরে নিতে পারি, এ পর্যায়ে এসে লিনা নিজেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। পটল তুলতে বড় বেশি দেরি করছিল ব্যারন।'

'গুড গড, ইট'স হরিবল।' যেন ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল রানা।

'একদিক থেকে কথাটা ঠিক,' রানাকে সমর্থন করলেন ড. ওয়ার্নার। 'কিন্তু একজন দাবা খেলোয়াড়ের দৃষ্টিতে যদি তাকাও? অপূর্ব একটা চাল ছিল ওটা, রানা। লিনা ব্যবস্থা করল, মনে হলো অটারম্যানকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। সেদিন ব্যারনের সাথে যাবার জন্যে জেদ ধরে সে, সাক্ষী আছে। ব্যারনের শরীর ভাল ছিল না, নৌ-বিহারে যেতেই চাননি তিনি। কিন্তু লিনা তাঁকে জোর করে নিয়ে যায়,–তাজা বাতাস আর রোদ দরকার স্বামীর। নৌ-বিহারে যাবার সময় কখনোই দেহরক্ষী নিতেন না ব্যারন। তীর থেকে খানিক দূরে দ্রুতগামী একটা ক্রুজার অপেক্ষা করছিল–,' হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিলেন তিনি। '–খুঁটিনাটি সবই তো তোমরা জানো, তাই না?'

'না,' অস্বীকার করল রানা।

'ক্রুজারটা সরাসরি ছুটে এসে ধাক্কা মারে ইয়টকে। পানি থেকে ব্যারনকে তোলা হয়, কিন্তু ব্যারনেস হাবুডুবু খেতে থাকে। এক ঘণ্টা পর একটা রেডিও মেসেজ রিসিভ করে কোস্টগার্ড, তারা গিয়ে উদ্ধার করে ব্যারনেসকে–তখনও বিধ্বস্ত ইয়টের ভাসমান টুকরো ধরে ভেসে ছিল সে। ব্যারনেস যাতে বেঁচে থাকে তার ব্যবস্থা কিডন্যাপাররাই করে রেখে গিয়েছিল।'

'তারা হয়তো চেয়েছিল দর কষাকষি করতে হলে স্বামী-ভক্ত স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার।'

'তা সম্ভব। এবং তারপর আদর্শ স্ত্রীর ভূমিকাই পালন করে সে। মুক্তিপণ চাওয়া হলো, ব্যারনেস লিনা অটারম্যান ইন্ডাস্ট্রির বোর্ড অভ ডাইরেক্টরদের বাধ্য করল পঁচিশ মিলিয়ন ডলার হাতছাড়া করতে। সে একা মুক্তিপণের টাকা কিডন্যাপারদের দিয়ে আসতে গেল–সম্পূর্ণ একা।'

'কিন্তু টাকার তার দরকার ছিল না।'

'কেন ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল!' দ্বিমত পোষণ করলেন ড. ওয়ার্নার। 'ব্যারনেসের ওপর যতই নির্ভর করুন অটারম্যান, স্বভাবে তিনি কড়া হিসেবী ছিলেন। চেক বই কখনও তিনি হাতছাড়া করেননি। ধনী একজন লোকের স্ত্রী হিসেবে লিনা যা খুশি তাই চাইতে পারত, চেয়ে পেতে পারত–ফার, অলঙ্কার, চাকর-বাকর, গাড়ি, কাপড়চোপড়, দ্বীপ বা বাড়ি, ঘোড়া বা ইয়ট, হাত খরচা–বছরে দু'লাখ ডলার, বেতন হিসেবে। সাধারণ একজন স্ত্রী এতেই সন্তুষ্ট থাকত, কিন্তু লিনা তা ছিল না। বিপুল ক্ষমতার অধিকারিণী হবার জন্যে বিপুল টাকার দরকার ছিল তার। পঁচিশ মিলিয়ন ডলার পুঁজি হিসেবে খুব কম নয়, পরে মূল তহবিলে তো হাত পড়বেই। গাড়িতে করে টাকা নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে–প্রতিটি এক হাজার সুইস-ফ্রাঙ্কের নোট ছিল ওগুলো, আমার ধারণা। পরিত্যক্ত একটা এয়ারফিল্ডে পৌঁছায় সে, একটা প্লেন এসে টাকাগুলো তুলে নিয়ে যায় সুইটজারল্যান্ডে। নিখুঁত, তাই না?'

'কিন্তু–,' প্রতিবাদ করার জন্যে উপযুক্ত শব্দ খুঁজল রানা। '–কিন্তু ব্যারনকে নির্যাতন করা হয়। লিনা কিভাবে···?'

'মৃত্যু মৃত্যুই, নির্যাতন হয়তো অন্য কোন উদ্দেশ্য পূরণ করে থাকবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আমরা একটা ইস্টার্ন ব্রেন নিয়ে আলোচনা করছি। হতে পারে ব্যারনকে নির্যাতন করা হয় স্ত্রীর ওপর থেকে সন্দেহ দূর করার জন্যেই। দেখো না, নির্যাতনের প্রসঙ্গ তুলে তুমিও লিনাকে নির্দোষ বলে ভাবতে চাইছ।'

কথাটা সত্যি, ভাবল রানা। স্বামীকে কেউ যদি খুন করতে পারে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করা তার জন্যে অসম্ভব কি। না, প্রতিবাদ করার আর কিছু নেই ওর।

'এবার এসো, দেখা যাক এ পর্যন্ত কি পেল লিনা। বিপুল ক্ষমতা অর্জনের পথে ব্যারন একটা বাধা ছিল, বাধাটা আর থাকল না। লিনার অনেক ইচ্ছায় বাদ সাধতেন তিনি, সে-সব সমস্যাও দূর হলো–যেমন, লিনা চাইত মিডো দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ত্র বিক্রি করবে না, কিন্তু ব্যারন বাজার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভারি পছন্দ করতেন, এবং জাতিসংঘ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার আগে পর্যন্ত স্ত্রীর আপত্তি কানে না তুলে দক্ষিণ আফ্রিকায় এয়ারক্রাফট, মিসাইল, আর লাইট আর্মামেন্টস বিক্রি করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতি সহানুভূতি ছিল ব্যারনের, অবশ্যই তার একটা কারণ এই যে সে-দেশের শ্বেতাঙ্গ সরকার ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ব্যারনেস লিনার দক্ষিণ আফ্রিকা বিরোধী মনোভাবের কথা ভুলে যেয়ো না, এ-প্রসঙ্গে পরে আমরা ফিরে আসব।

'দু'নম্বর বাধা ছিল রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণ, তাদের সাথে সম্পর্কের ইতি ঘটিয়ে সে বাধাও দূর করল লিনা। নিজেকে রক্ষার জন্যে প্রাইভেট একটা বাহিনী মোতায়েন করল সে। অটারম্যান মারা যাবার পর তাঁর সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হলো লিনা, সে তখন ফরাসী সরকারের মর্যাদার অন্যতম প্রতীক, প্রাক্তন প্রভুরা তাকে স্পর্শ করার সাহস পেল না। পুঁজি হিসেবে তার হাতে এসেছে পঁচিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এই টাকার হিসেব কাউকে তার দিতে হবে না। ইন্ডাস্ট্রিগুলোয় রয়েছে তথ্য

সংগ্রহের বিপুল আয়োজন, ফলে ফরাসী সরকার পর্যন্ত সমীহ করতে শুরু করল তাকে। লিনা ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সকেও যতদূর পারে নিজের কাজে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করে নিল। তারপর, মোসাড কানেকশন তো ছিলই...'

হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল রানার, লিনা প্রায়ই ওকে তার তথ্য সংগ্রহের উৎসের কথা বলেছে, কিন্তু উৎসগুলোর পরিচয় প্রকাশ করেনি কখনও। লিনা কি নিজের প্রাইভেট এজেন্সির মত একই ভাবে ফ্রেঞ্চ আর ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্সকে ব্যবহার করার যোগ্যতা রাখে? অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। কিন্তু ব্যারনেস লিনার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব...।

'এরপর আরেক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লিনা। কোম্পানী থেকে স্বামীর ভক্ত আর বন্ধুদের কৌশলে সরাতে লাগল সে, যারা তার কাজে বাধা দিতে পারে। কাজটা কৌশলে আর সময় নিয়ে করল সে। কৌশলে আর সময় নিয়ে এবার আসল কাজেও হাত দিল লিনা। গোটা মানবজাতির নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিতে হলে প্রথমে আয়ত্তে আনতে হবে ছোট ছোট কয়েকটা রাষ্ট্রকে। এখানে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার, রানা। ব্যারনেস লিনার স্বপ্নটা আসলে কি? মানবজাতির কল্যাণ চায় সে, কিন্তু মানব বলতে বোঝে শুধু শ্বেতাঙ্গদের। তার চোখে কালো, পীত বা অন্য কোন রঙ নিকৃষ্ট, তাই তাদের অস্তিত্বের মর্যাদা দিতে রাজি নয় সে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কালোদের চাপের মুখে দুর্বল হয়ে পড়ছে, যে-কোন দিন হার স্বীকার করে পাততাড়ি গোটাতে পারে তারা–এই ভয়ে অস্থির ছিল লিনা। সেজন্যেই প্রথম টার্গেট হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বেছে নেয় সে। দেশটাকে দখল করতে পারলে নিজের লোককে দিয়ে সরকার গঠন করাবার প্ল্যান ছিল তার, সেই স্বৈরাচারী সরকারকে দিয়ে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালাত, দক্ষিণ আফ্রিকার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত কালো মানুষ। কেন সে খলিফা নামটা বেছে নিল তা অবশ্য বলতে পারব না...'

'আপনি বোধহয় ভুল করছেন, ড. ওয়ার্নার।' আঙুল দিয়ে চোখের কোণ টিপে ধরল রানা। 'ব্যারনেস লিনাকে আপনি ঠিক চিনতে পেরেছেন বলে মনে হয় না...'

'আমি কেন, কেউ তাকে চেনে বলে বিশ্বাস করি না, রানা,' বিড়বিড় করে বললেন ড. ওয়ার্নার, পাইপের তামাক ঝাড়লেন অ্যাশট্রেতে। 'দুঃখিত, খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছি আমি। কোন প্রশ্ন করার জন্যে আরেকটু পেছনে যেতে চাও তুমি, রানা?'

'না, ঠিক আছে।' চোখ মেলল রানা। 'আপনি বলে যান, প্লীজ।'

'খুব চালাকির সাথে প্ল্যানটা করে লিনা। দক্ষিণ আফ্রিকার কালোদের পক্ষে কেউ যদি কিছু করতে চায়, গোটা দুনিয়ার সমর্থন পেয়ে যাবে তারা; এই কথাটা মনে রেখে জিরো-সেভেন-জিরোকে ওখানে নিয়ে যায় সে। শর্ত দেয় কালোদের নেতাদের মুক্তি দিতে হবে, সাথে দিতে হবে চল্লিশ টন সোনা। আমরা ধরে নিতে পারি, নেতারা কোন দুর্ঘটনায় মারা যেত, ফলে কালোদের হয়ে কথা বলার আর কেউ থাকত না। আর চল্লিশ টন সোনা লিনার সুইস ব্যাংকে জমা পড়ত।

'প্ল্যানটা প্রায় সফল হতে যাচ্ছিল, তাই না? শুধু একজন লোক বাদ সাধে।

তুমি, রানা। তবু বলতে হবে, লিনার হার হয়নি। তার অনেকগুলো ধারণা সত্যি প্রমাণিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার দুর্বল, এটা প্রমাণিত হয়। বিপদের সময় এই সরকারকে আমেরিকা বা ব্রিটেন সাহায্য করবে না। কাজে হাত দেয়ার আগে প্রচুর টপ সিক্রেট ইনফরমেশন যোগাড় করেছিল সে, জানা গেল প্রতিটি তথ্য ছিল নির্ভুল। অপারেশনের জন্যে যে-সব লোকদের বাছাই করেছিল সে, দুনিয়ার সেরা ছিল তারা। এমনকি এই তথ্যও জানা ছিল তাঁর যে নেগোশিয়েটর হিসেবে তোমাকে পাঠানো হবে। চারজন জিম্মিকে হত্যা করার পর তার প্রতিপক্ষরা হতভম্ব হয়ে যায়, অসহায় বোধ করে–কিন্তু তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় একজন মাত্র লোক। স্বভাবতই সেই লোকের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে সে। মেয়েলি ইনটিউশনের সাহায্যে সে বুঝতে পারে লোকটার মধ্যে উন্নতমানের কিছু গুণ রয়েছে যা নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারলে সোনায় সোহাগা।

'গল্পের এই অংশে নিজেকে আনতে হয়। আমাকে আভাস দেয়া হয়েছিল, খলিফার অস্তিত্ব আছে। যার উদ্দেশ্য অনেকটা হিটলারের মত। শ্বেতাঙ্গদের জন্যে স্বর্গরাজ্য গড়তে চায়। মিডো অটারম্যানকে খুন করার পর দক্ষিণ আফ্রিকা দখলের প্ল্যান করেছিল লিনা, তা না-ও হতে পারে। মাঝখানে আরও কিছু দুষ্কর্ম করে থাকতে পারে সে। দুটো কিডন্যাপিঙের ঘটনা তার স্টাইলের সাথে মেলে। একটা হলো, ভিয়েনা থেকে ওপেক তেল মন্ত্রীদের কিডন্যাপিং। তবে আমরা নিশ্চিত নই। আমাকে সাবধান করা হয়, খলিফা আবার কখন মাথাচাড়া দেবে তার অপেক্ষায় ওত পেতে ছিলাম আমি। প্লেন হাইজ্যাকারদের জেরা করার সুযোগ পেয়েও হারালাম···'

'ওরা আপনাকে কিছু বলতে পারত না,' বাধা দিল রানা। 'ওরা স্রেফ ঘুঁটি ছিল, আয়ারল্যান্ডের সেই ডাক্তারের মত।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড. ওয়ার্নার। 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক, রানা। কিন্তু তখন আমার বিশ্বাস ছিল হাইজ্যাকাররা মারা যাওয়ায় একমাত্র সূত্রটা হারালাম, খলিফাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আঘাতটা সামলে ওঠার পর হঠাৎ আমার মনে হলো, সূত্র হারায়নি, আছে। তুমি, রানা, তোমাকে আমি সূত্র হিসেবে চিনতে পারলাম। সেজন্যেই শার্ক কমান্ড থেকে তোমার পদত্যাগ মেনে নিলাম আমি, অর্থাৎ মেনে নেয়ার ভান করলাম। তুমি পদত্যাগ না করলে তোমাকে আমি বরখাস্ত করতাম, বুঝলে। কিন্তু তার দরকার হলো না, আমার মনের আশা পূরণ করে তুমিই পদত্যাগ করলে। সেজন্যে তোমার ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে, দেয়ার কথা মনে ছিল না···'

'ধন্যবাদ দেয়ার কোন দরকার নেই,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'শার্ক কমান্ডে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি।'

'সবাই জানল, শার্ক কমান্ডে নেই তুমি। লিনা সময় নষ্ট করেনি, তোমার জন্যে টোপ ফেলল সে। প্রথমে তোমার সম্পর্কে সম্ভাব্য সব জানার চেষ্টা করল–প্রমাণ আছে আমার কাছে। তুমি পদত্যাগ করার চার দিন পর ইন্টারপোলের কমপিউটর অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করা হয়। সব জানার পর তোমাকে তার মনে ধরে। কনভেনশনাল চ্যানেলের মাধ্যমে তোমাকে মিডোতে,

যোগ দেয়ার প্রস্তাব পাঠানো হলো। তুমি প্রত্যাখ্যান করায় আগ্রহ আরও বেড়ে গেল লিনার। মি. ভিনসেন্ট গগলের সাথে যোগাযোগ ছিল তার, তোমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্যে তাকে ব্যবহার করল সে। তোমাদের দেখা হলো, এবং তুমি মুগ্ধ হলে–ব্যারনেস লিনা সুন্দরী, অভিজাত, বিদুষী, সত্যিকার একজন পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, রানা।

'লিনা জানতে চাইছিল ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-টেরোরিজম অর্গানাইজেশন অর্থাৎ আমরা তার সম্পর্কে কতটুকু কি জানি। ইতিমধ্যে সে জেনেছে, তাকে আমরা সন্দেহ করি। তোমাকে পেয়ে আসলে আমাদের অর্গানাইজেশনের ভেতর নিজের একটা কান পেয়ে গেল সে। তুমি শার্কের বাইরে থাকায় তার কাছে তোমার দাম কমেনি, কারণ অন্যান্য আরও বহু জায়গায় তোমাকে দিয়ে তার কাজ হবার কথা। বোনাস হিসেবে পাওয়া যাবে মিডোতে তোমার সার্ভিস। তার সব আশাই পূরণ হলো। তুমি এমনকি তার জীবনের ওপর একটা হামলাও বানচাল করে দিলে...'

ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা।

'রঁবুইলেতে সে রাতে কি ঘটেছিল? এখানে আমরা শুধু আন্দাজ করতে পারি, তবে আন্দাজটাকে বিশ্বাস্য করার মত যথেষ্ট তথ্যও আমাদের হাতে এসেছে। ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক খারাপ করতে চায়নি রাশানরা, তাই লিনার ওপর প্রতিশোধ নেয়নি তারা, কিন্তু তাই বলে ক্ষমাও করেনি। তারা আসলে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। লিনা-ই যে খলিফা, এ-সন্দেহও তাদের মনে দেখা দিয়ে থাকবে, ঠিক জানি না। কে.জি.বি. হয়তো সরাসরি লিনাকে খুন করার প্ল্যানটা করেনি, তবে আর্থিক সাহায্য নিশ্চয়ই তারা দিয়েছে, কিংবা মোসাডকে তারা জানিয়ে দেয় ব্যারন অটারম্যানকে খুন করেছে লিনা। যাই হোক, হয় কে.জি.বি. ভাড়াটে খুনী নিয়োগ করে, কিংবা মোসাড তার এজেন্টদের পাঠায়–রঁবুইলে রোডে পাতা হয় একটা অ্যামবুশ। কিন্তু সে অ্যামবুশে গিয়ে পড়ো তুমি। আমি জানি, রানা,-কো-ইন্সিডেন্স, তুমি বিশ্বাস করো না–কিন্তু তুমি মাসেরাতি চালাচ্ছিলে, এবং ব্যাপারটা কো-ইন্সিডেন্স ছাড়া অন্য কিছু নয়।'

'বেশ,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'বাকি সব যদি গিলতে পারি, এটা হজম করা কি আর এমন কঠিন।'

'ওই হামলাটা সতর্ক করে দেয় লিনাকে। কারা দায়ী, সে জানত না। তার সন্দেহ হয়, এর পিছনে আমাদের হাত আছে। এই ঘটনার পরপরই তুমি জানাও, আমাদের সন্দেহ মিথ্যে নয়, খলিফা নামে সত্যি একজন কেউ আছে। তোমাকে আমি আমেরিকায় ডেকে পাঠাই, রবসন তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসে, তারপর ফিরে গিয়ে লিনার সাথে কথা বলো তুমি। হয় তুমি নিজেই সব বলেছ তাকে, নয়তো তোমার সাথে কথা বলে সে বুঝে নেয় আমাদের অর্গানাইজেশন এবং বিশেষ করে ড. এডওয়ার্ড ওয়ার্নার তার পিছনে লেগেছে। এখানেও আমি কল্পনার আশ্রয় নিচ্ছি, রানা। তুমিই ভাল বলতে পারবে কতটুকু কি সত্যি। কি অনেস্ট, ম্যান।'

রানা তার দিকে তাকিয়ে থাকল, চেষ্টা করছে চেহারায় যাতে কোন ভাব না

ফোটে। ঝড় বয়ে চলেছে মনের ভেতর। ড. ওয়ার্নার যা কল্পনা করেছেন ঠিক তাই ঘটেছিল।

'আমরা সবাই খলিফাকে খুঁজছিলাম। এ-প্রসঙ্গে লিনার সাথে আলোচনা করাটাকে বিপজ্জনক বলে মনে করোনি তুমি।' স্বীকার করার জন্যে রানাকে প্ররোচিত করলেন ড. ওয়ার্নার, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তুমি বিশ্বাস করেছিলে আমাদের এবং লিনার উদ্দেশ্য আলাদা নয়,' নরম সুরে বললেন ড. ওয়ার্নার। 'তুমি ভেবেছিলে আমরা সবাই খলিফাকে ধ্বংস করতে চাই।'

'লিনা জানত আমেরিকায় আপনার সাথে দেখা করতে গেছি আমি। কিভাবে জানতে পারে বলতে পারব না, কিন্তু জানত।' আড়ষ্ট বোধ করল রানা, নিজেকে বিশ্বাসঘাতকের মত লাগল।

'আমি বুঝি, রানা। কারও প্রতি দুর্বলতা জন্মালে এ-ধরনের ভুল মানুষ করে, সেজন্যে আমি তোমাকে দোষ দেই না। তোমার সাথে কথা বলার পর লিনা জেনে গেল, কে তাকে শিকার করতে চায়। জেনে গেল, তার জন্যে আমি একটা ভয়ঙ্কর বিপদ। একমাত্র তুমিই কোন রকম সন্দেহ সৃষ্টি না করে আমার কাছে পৌঁছুতে পারো। কিন্তু তোমাকে বললে কাজটা করতে তুমি রাজি হবে না। লিনা জানত, তুমি খুনী নও। সে তোমার দুর্বলতা খুঁজতে লাগল। পেতে বেশি দেরি হলো না। এমন একজনকে খুঁজে বের করল সে, যার জন্যে নিজের জীবন দিতে পারো তুমি—সোহেল আহমেদ। এক ঢিলে দুটো পাখি মারার প্ল্যান করল লিনা। বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে তুমি খুন করলে দুটো কাজ হত তার। এক, শত্রু নিপাত যেত। দুই, চিরকালের জন্যে তার ফাঁদে আটকা পড়তে তুমি। কাজটা করার পর খলিফার মুঠো থেকে বেরুতে পারতে না কোনদিন। একের পর এক তোমাকে দিয়ে খুন করাত সে। খুন করাত, আর তোমার শরীরটাকে ব্যবহার করত। তার যৌন-ক্ষুধা সম্পর্কে তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি।'

রানার প্রচণ্ড ইচ্ছে হলো এক ঘুসিতে ভদ্রলোকের চোয়াল ভেঙে দেয়।

'তবে শুধু যৌন-সুখ দিয়ে তোমাকে ভেড়া বানানো সম্ভব নয় এটুকু বুঝতে পেরেছিল লিনা। সেজন্যেই সোহেলকে কিডন্যাপ করল সে। কিডন্যাপ করার পরপরই তার একটা আঙুল কেটে ফেলল, তার স্টাইলের সাথে মিলে যায়, তাই না? জোহানেসবার্গের কথা স্মরণ করো। কোন রকম দ্বিধা না করেই জিম্মিদের হত্যা করে সে। দুনিয়ার লোককে তো বোঝাতে হবে যে খলিফাকে ভয় পাওয়া দরকার।

'নির্দিষ্ট সময়ের আগে তুমি আমাকে খুন না করলে কি হত, রানা? সোহেলকে খুন করত সে। কিন্তু আমরা বেঁচে গেলাম সাইরাস কারচিভালের একজন শত্রু দয়া করে ফোন করায়। এই সময় রাশিয়ানরাও আমাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। নিজেদের সমস্যা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার সুবর্ণ একটা সুযোগ ছিল তাদের ওটা। লিনার প্রায় সম্পূর্ণ ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দিল তারা।'

'কিন্তু এখন আমাদের করণীয় কি?' জিজ্ঞেস করল রবসন। 'আমাদের হাত

তো বাঁধা। আমরা কি অপেক্ষা করব–আবার কখন আঘাত হানবে খলিফা সেই আশায়?' একটু থেমে আবার বলল, 'এরপর হয়তো খবর আসবে সৌদি বাদশার কোন ছেলেকে খুন করেছে খলিফা। কিংবা কিডন্যাপ করেছে ইরানের প্রেসিডেন্ট...'

'ওপেক তেলের দাম বাড়ালে সে-ধরনের ঘটনা ঘটবে, অবশ্যই ঘটবে,' বললেন ড. ওয়ার্নার। 'তেলের দাম কমলে এককভাবে আর কেউ তার মত উপকৃত হবে না। বাকি যারা উপকৃত হবে, বেশির ভাগই উন্নত বিশ্ব অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ সরকারগুলো। লিনা অতুলনীয়া–ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক স্বার্থ কি সুন্দরভাবে মেলাতে পেরেছে।'

'ধরুন এই কাজে সফল হবে সে, ওপেক সদস্যরা তার ভয়ে তেলের দাম বাড়াবে না,' বলল রবসন। 'কিন্তু তারপর? খলিফার পরবর্তী টার্গেট কি হবে?'

'এ-ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়,' নিচু গলায় বললেন ড. ওয়ার্নার, তাঁর সাথে রবসনও রানার দিকে তাকাল।

ক্লান্ত, এবং বিধ্বস্ত দেখল ওরা রানাকে। শুধু চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

'আমি চাই তুমি আমার এই কথাগুলো বিশ্বাস করো, রানা। এতক্ষণ বকবক করেছি তোমার ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যে নয়। ধীরে সুস্থে পাইপে তামাক ভরলেন ড. ওয়ার্নার। 'সব কথা তোমাকে আমি বলিনি, যতটুকু প্রয়োজন বলে মনে করেছি ততটুকু বলেছি। বলেছি এই জন্যে, মায়াবিনীর পাতালপুরীতে যদি ঢোকার সিদ্ধান্ত নাও, আমি চাই তুমি সতর্ক অবস্থায় থাকবে। না, রানা, আমি তোমাকে তার কাছে ফিরে যাবার অর্ডার করছি না। ঝুঁকিটা খাটো করে দেখার উপায় নেই। তোমার বদলে অন্য কেউ যেতে চাইলে ব্যাপারটাকে আমি সুইসাইডাল বলে ধরে নিতাম। তবে তোমার কথা আলাদা। যেহেতু তোমাকে সতর্ক করা হয়েছে, একমাত্র তোমার পক্ষেই তার নিজের জায়গায় তাকে ধ্বংস করা সম্ভব। এই কথাটার ভুল অর্থ করবে না, প্লীজ। আমি খুন করার পরামর্শ দিচ্ছি না। আমি বরং তোমাকে এ-লাইনে চিন্তা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করছি। তবু যদি তুমি এ-ধরনের কিছু করে বসো, আমি সেটা অনুমোদন করব না, তোমাকে আমি বিচারকের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড় করাব।

'আমি শুধু চাই, খলিফার কাছাকাছি থাকো তুমি, বুদ্ধি দিয়ে তাকে হারাও। তার কুকীর্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করো, সাক্ষী হও আর প্রমাণ যোগাড় করো, আমরা তাকে আইনের সাহায্যে কাবু করব। আমি চাই ইমোশন্যাল ইস্যুগুলো ভুলে থাকো তুমি–জিরো-সেভেন-জিরোর জিম্মিদের কথা মুছে ফেলো মন থেকে, ভুলে যাও বন্ধু সোহেলের কথা। আমরা বিচারক নই, রানা। আমরা জল্লাদও নই।'

রানা ভাবছে, খলিফাকে ঠেকাবার একটাই রাস্তা আছে। ব্যারনেস লিনা অটারম্যানের মত ব্যক্তিত্বকে ফরাসী কোর্টে দাঁড় করানোর আশা হাস্যকর। ড. ওয়ার্নার যাই বলুন, ওর সিদ্ধান্ত তাতে বদলাবে না।

রানা ভাবতে চেষ্টা করল, ওর সিদ্ধান্তে প্রতিশোধের কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু একটু পরই উপলব্ধি করল, নিজেকে বোকা বানাতে চেষ্টা করছে সে।

হ্যাঁ, প্রতিশোধ নিতে চায় বলেই এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে ওকে।

ব্যক্তিগত ভাবে অপমান করা হয়েছে ওকে, বোকা ভেবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে ওর বুদ্ধিবৃত্তিকে, ওর সরলতার সুযোগ নেয়া হয়েছে, সযত্নে ফাঁদ পেতে ব্যবহার করা হয়েছে ওকে। প্রতিশোধ তো নেবেই ও।

জার্মান মেয়ে জেসিকাকে খুন করেছে রানা। খুন করেছে সাইরাস কারচিভালকে। ওদের খুন করার সময় অপরাধবোধে ভোগেনি, বা সিদ্ধান্তগুলোর জন্যে নিজেকে ঘৃণা করেনি। ওদের খুন করা যদি উচিত কাজ হয়ে থাকে, তাহলে খলিফাকে খুন করা আরও কয়েক হাজার গুণ বেশি উচিত কাজ হবে।

সেই উচিত কাজটা করার মত লোক একজনই মাত্র আছে।

ছয়

পরিচিত সুর-মাধুর্য সারা শরীরে শিরশিরে একটা শীতল ভাব এনে দিল। হালকা, প্রলম্বিত কণ্ঠস্বর, আন্তরিক এবং উদ্বিগ্ন। শুনে হাঁপ ধরে গেল রানার, যেন অনেকটা পথ দৌড়ে এসেছে।

'ওহ্ রানা! শুধু তোমার এই গলা পেয়েই আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি! কি রকম উদ্বেগে ছিলাম জানো না! আমার টেলিগ্রাম পেয়েছ?'

'না, কিসের টেলিগ্রাম?'

'সোহেলকে মুক্ত করেছ শোনার পর রোম থেকে তোমাকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাই...'

'পাইনি, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না...'

'ভায়া মিডো, ব্রাসেলসে পাঠিয়েছিলাম ওটা...'

'হয়তো ওখানে আমার টেবিলে পড়ে আছে। সময়ের অভাবে খবর নেয়া হয়নি।'

'কেমন আছেন উনি, রানা?'

'ভাল।' লিনার নাম উচ্চারণ বা অন্য কোনভাবে সম্বোধন করছে না রানা, ভয় হতে লাগল গলার আওয়াজ থেকেই না টের পেয়ে যায় মনের ভাবটুকু। 'নতুন করে কেউ ওকে স্পর্শ করতে পারবে না, নিরাপদ জায়গায় পজিশন নিয়ে আছে, সম্পূর্ণ তৈরি।' ওর ধারণা হলো, লিনা হয়তো জানতে চাইবে কোথায় আছে সোহেল।

'তুমি কেমন আছ, শেরি, মাই লাভ?'

'আছি একরকম। খুব ধকল গেছে, বুঝতেই পারো।'

'জানি, রানা, জানি। কি রকম অসহায় বোধ করছিলাম সে তোমাকে বোঝাতে পারব না। খবর সংগ্রহের জন্য কি না করেছি, কোথায় না গেছি–সেজন্যেই তোমার সাথে যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন কোন খবরই আসেনি...'

'এখন সব মিটে গেছে,' শুকনো গলায় বলল রানা।

'আমার তা মনে হয় না,' দ্রুত বলল ব্যারনেস লিনা। 'কোত্থেকে বলছ তুমি?'
'লন্ডন।'
'তুমি ফিরবে কখন?'
'এক ঘন্টা আগে ব্রাসেলসে ফোন করেছিলাম। জরুরী ব্যাপার, মিডোতে আমাকে দরকার। আজ বিকেলে ফ্লাইট ধরব।'
অপরপ্রান্ত থেকে কয়েক সেকেন্ড শুধু ঘন ঘন নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ শুনল রানা। তারপর লিনা বলল, 'রানা, তোমার সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার। অনেক দিন তোমাকে কাছে পাই না। কিন্তু, হায় ঈশ্বর, আজ রাতে আমাকে ভিয়েনায় থাকতে হবে। দাঁড়াও, একটু ভাবতে দাও–এই, শোনো, পেয়েছি! এখুনি যদি তোমাকে আনার জন্যে লিয়ারটা পাঠিয়ে দেই আমাদের দেখা হতে পারে, অন্তত এক ঘন্টার জন্যে হলেও। তুমি রাত করে ওরলি থেকে ব্রাসেলসের ফ্লাইট ধরতে পারো আর আমি লিয়ার নিয়ে ভিয়েনায় চলে যেতে পারি। প্লীজ, রানা! তোমার অভাব আমাকে···প্লীজ, চলে এসো, একটা ঘন্টা একসাথে কাটাই আমরা!'

লিয়ার থেকে রানা নামতেই এয়ারপোর্টের একজন সহকারী ম্যানেজার অভ্যর্থনা জানাল, পথ দেখিয়ে নিয়ে এল ভি.আই.পি লাউঞ্জে।
লাউঞ্জে ঢুকেই রানা দেখল লম্বা পা ফেলে ওর দিকে দ্রুত হেঁটে আসছে ব্যারনেস লিনা ও ভুলে গিয়েছিল ব্যারনেসের উপস্থিতি কিভাবে একটা কামরাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে।
হাতে সেলাই করা জ্যাকেটের সাথে ম্যাচ করা স্কার্ট পরেছে সে, গান মেটাল গ্রে তার রঙ। হাঁটা নয় যেন নাচ, লম্বা পায়ে মন কাঁপানো ছন্দ যেন সরু কোমর থেকে উৎসারিত হচ্ছে। আড়ষ্ট হয়ে গেল রানা, পা দুটো বিষম ভারী, কারণ শত্রু আর অমঙ্গলের উপস্থিতি সম্পর্কে ওর গোটা অস্তিত্ব সচেতন।
'রানা, মাই লাভ! ওরা তোমার একি অবস্থা করেছে!' মায়া ভরা কোমল চোখ উদ্বেগে ভরাট হয়ে উঠল লিনার, হাত তুলে রানার মুখ স্পর্শ করল সে।
গত কয়েক দিন তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছে রানা, লাবণ্য হারিয়েছে চেহারা। দাড়ি-গোঁফ কামায়নি, মাথায় এলোমেলো হয়ে আছে লম্বা চুল। চোখ দুটো প্রায় লাল।
'ডারলিং, ওহ্ ডারলিং!' ফিসফিস করে বলল লিনা; লাউঞ্জের আর কেউ যাতে শুনতে না পায়। রানাকে নিজের দিকে টানল সে, পায়ের পাতায় ভর দিয়ে রানার মুখের সামনে ঠোঁট তুলল।
আগেই ভেবে রেখেছে রানা, ওকে সাবধান থাকতে হবে। ও যা জানে সেটা গোপন করে রাখাটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বোঝে। লিনাকে কোনভাবেই জানতে দেয়া চলবে না যে তার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হবে সেটা। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে ওকে। সতর্কই ছিল, তবু মুহূর্তের জন্যে চোখের সামনে ভেসে উঠল সোহেলের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটা। টান পড়ল পেশীতে, সেটা গোপন করার জন্যে তাড়াতাড়ি একটু ঝুঁকে এগিয়ে দিল মুখটা। দু'জোড়া ঠোঁট

এক হলো।

ঠোঁট দুটো লিনার মত করতে চাইল রানা—কোমল, উষ্ণ, ভেজা ভেজা। যে নারীদেহ পাকা টসটসে ফলের মত, এ ঠোঁট তার; যেন থেঁতলানো পাপড়ি। শরীরটাকে আদরের কাঙাল, ভালবাসায় থরথর করে তুলতে চেষ্টা করল রানা, ঠিক লিনা যেমন ওর আলিঙ্গনের ভেতর তাপ দগ্ধ মোমের মত গলে যাচ্ছে, চাপ দিয়ে সেঁধিয়ে যেতে চাইছে শরীরের ভেতর। মনে হলো পাকা অভিনেতার মত উৎরে গেছে ও, আর ঠিক তখুনি মৃদু ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল লিনা, আলিঙ্গন মুক্ত করল নিজেকে। দ্রুত, অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে রানার মুখে কি যেন খুঁজল লিনা। গাঢ় সবুজ চোখে আলো ছিল, ধীরে ধীরে নিভে গেল সেটা।

কিছু একটা দেখে ফেলেছে লিনা। কিন্তু দেখার তো কিছুই ছিল না! দেখেনি, অনুভব করেছে। রানার সতর্কতা তার মনের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। কোন সন্দেহ নেই এ-ধরনের একটা প্রতিক্রিয়া রানার মধ্যে খুঁজছিল সে। শুধু একটু আভাস পাওয়ার দরকার ছিল—প্রয়োজনের চেয়ে জোরে চুমো খাওয়া, স্থির অপলক দৃষ্টি, ক্ষীণ একটু আড়ষ্ট ভাব।

বুকটা দুরু দুরু করে উঠল রানার। তবে কি ধরা পড়ে গেলাম!

রানার নীল কাশ্মীরী জ্যাকেটের কিনারা ছুঁলো লিনা। 'বলেছিলাম, এটাই তোমার রঙ। আমার কথা মনে করে কিনেছ?'

কেনার সময় খলিফার পরিচয় জানত না রানা, লিনার কথা ভেবেই কিনেছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে লিনার আচরণ কেমন যেন ভঙ্গুর মনে হলো। দু'জনের মাঝখানে অদৃশ্য একটা পাঁচিল তৈরি হচ্ছে।

'এসো,' বলেই রানার দিকে পিছন ফিরল লিনা, যেন মুখ লুকাল। পথ দেখিয়ে রানাকে পিকচার উইন্ডোর নিচে নরম সোফার কাছে নিয়ে এল। এয়ারপোর্ট অফিসারদের কেউ একজন কিছু তাজা ফুলের ব্যবস্থা করতে পেরেছে—হলুদ টিউলিপ, বসন্তের প্রথম উপহার। এক পাশে বার এবং কফি মেশিন।

সোফায় রানার পাশেই বসল লিনা, কিন্তু গা ছুঁয়ে নয়। মাথা ঝাঁকিয়ে সেক্রেটারিকে বিদায় করে দিল সে। লোকটা দূরে সরে গিয়ে দেহরক্ষীদের সাথে দাঁড়াল, ওদের কথা শুনতে পাবে না।

'কি হয়েছে আমাকে সব বলো, রানা, প্লীজ।' আবার রানার দিকে অনুসন্ধানী চোখ মেলে তাকাল লিনা, কিন্তু চোখের সেই কোমল আলো আর জ্বলল না। প্রথম থেকে শুরু করল রানা, কিভাবে কিডন্যাপ করা হয় সোহেলকে। মনোযোগ আর আন্তরিকতার সাথে শুনছে লিনা, চেহারায় সহানুভূতি আর উদ্বেগ; তবে দৃষ্টিতে আগের সেই প্রেমের ঘোর একেবারেই অনুপস্থিত।

লিনা সম্ভবত বিশদ বিবরণ পেয়ে গেছে বা পেয়ে যাবে, কাজেই রাখ-ঢাক না করে সত্যি যা ঘটেছে সব বলে গেল রানা। বলল, খলিফা ড. এডওয়ার্ড ওয়ার্নারের জীবন চেয়েছিল। সেই সাথে ওর প্রতিক্রিয়াটাও ব্যাখ্যা করল। 'কাজটা আমি হয়তো করতাম, লিনা; ঠিক জানি না।'

শিউরে উঠে দু'হাত দিয়ে নিজেকে আলিঙ্গন করল লিনা। 'গড, নো!'

অজ্ঞাতনামার ফোন কল সম্পর্কে বলল রানা, তার দয়াতেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে সোহেলকে। কিভাবে আঙুলটা কাটা হয়, সংক্রমণের ফলে হাতটার কি অবস্থা হয়েছিল, বিস্তারিত বর্ণনা দিল ও। সারাক্ষণ সতর্কতার সাথে লিনার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কোন অপরাধবোধ দেখতে না পেয়ে নিজেকে বোকা বলে তিরস্কার করল মনে মনে–পাকা অভিনেত্রী লিনা, মনের ভাব চেহারায় ফুটতে দেবে কেন! লিনাকে লিনা হিসেবে নয়, এখন থেকে খলিফা হিসেবে দেখতে হবে।

'কয়েকটা দিন ওর সাথে থাকতে হয়েছে আমাকে,' বলল রানা। 'ওকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিয়ে স্বস্তি বোধ করছি।'

কব্জি তুলে হাতঘড়ি দেখল লিনা। 'সেরেছে, আর বেশি সময় নেই!' মুখ তুলল সে। 'এসো, এক ঢোক শ্যাম্পেন খাই। ধরো আমরা উৎসব পালন করছি। মি. সোহেল আহমেদ বেঁচে আছেন।'

বোতল খুলে গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল রানা। দু'জনের হাতে দুটো গ্লাস, পরস্পরকে স্যালুট করল ওরা।

'তুমি কাছে থাকলে আনন্দে হাবুডুবু খাই,' গ্লাসের কিনারার একটু ওপরে লিনার চোখ, চেয়েখে সেই অনুসন্ধানী দৃষ্টি। 'কি যে এর পরিণতি জানি না। তুমি না শেষ পর্যন্ত আমাকে মেরেই ফেলো!'

কি দারুণ অভিনয়, প্রশংসা না করে পারল না রানা। তোমার প্রেমে উন্মাদিনী হয়ে গেছি, এই ভাবটা এমন নিখুঁতভাবে ফুটল লিনার চেহারায়, মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেল রানা। 'কেন, এ-কথা বলছ কেন?'

'তোমাকে হারাবার কথা ভাবতে পারি না, রানা,' ফিসফিস করে বলল লিনা। 'তুমি সরে গেলে আমি বাঁচব না। সেরকম ইচ্ছে থাকলে, যেয়ো চলে।'

সরে গিয়ে মারব না, মেরে সরে যাব, ভাবল রানা। হঠাৎ উপলব্ধি করল, এখানে এবং এখনই লিনাকে খুন করতে পারে ও। কোন অস্ত্রের দরকার নেই। খালি হাতেই কাজটা করতে পারবে, যদিও লেদার জ্যাকেটের ভেতর কোবরা পিস্তলটা রাখা আছে। লিনাকে খুন করা সম্ভব, কিন্তু পর মুহূর্তে দেহরক্ষীরা ওকে ঝাঁঝরা করে ফেলবে। লিনার সাথে ওদের একজনকে হয়তো মারা যাবে, কিন্তু দ্বিতীয় লোকটা খুন করবে ওকে। সেরা প্রফেশনাল ওরা, ওর নিজের বাছাই করা লোক।

'সময়ের এত অভাব আমাদের,' খেদ প্রকাশ করল রানা। মিটিমিটি হাসি ধরে রেখেছে মুখে। 'ভাল লাগে না!'

'ভাল কি আমারও লাগে, ডারলিং' রানার কনুই ধরল লিনা। 'কিন্তু ভুললে চলবে না সামনে আমাদের অনেক কাজ। তুমিও ব্যস্ত থাকবে, আমিও–পরস্পরকে আমরা ক্ষমা করতে পারি।'

কথাগুলোর হয়তো বিশেষ কোন অর্থ আছে। লিনার চোখে মুহূর্তের জন্যে আবার সেই কোমল সবুজ আলো জ্বলে উঠতে দেখল রানা। ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ, নিশ্চয়ই প্রেমের নয়। ধীরে ধীরে প্রথমবার শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিল লিনা, চোখের পাতা নামল, যেন রানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে চোখ দুটোকে বাঁচালি।

'ক্ষমা, লিনা? ভয়ঙ্কর এমন কিছু কি আমাদের জীবনে ঘটবে যা ক্ষমা করার

যোগ্য নয়?'

'ঘটবে না, রানা, আমি ঘটতে দেব না!'

ঘটতে দেবে না? তারমানে কি ওকে ঠেকাবে লিনা? হুমকি দিচ্ছে?

চোখ তুলে মুহূর্তের জন্যে তাকাল লিনা, তার চোখে চোখ রেখে মনে মনে নিজেকে শোনাল রানা, পারি–এখুনি এই অপরূপ সৌন্দর্য আমি ধ্বংস করে দিতে পারি। কিন্তু লিনার চোখে নতুন একটা ভাষা, চিন্তায় বাধা পেল রানা। লিনার দৃষ্টিতে কিসের যেন আবেদন–সম্ভবত করুণা প্রার্থনা করছে। পিস্তল, নাকি খালি হাত? দু'হাত দিয়ে গলা টিপে ধরতে পারলে ভাল হয়, ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ হয়! ওর বুক আর উরুর নিচে মোচড় খাবে থরথর যৌবন, কয়েক ইঞ্চি দূর থেকে দেখতে পাবে রানা, প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছে।

কোণের একটা ডেস্কে ঝন ঝন করে উঠল টেলিফোন। দ্বিতীয়বার বেল বাজতে সহকারী ম্যানেজার রিসিভার তুলল, তারপর ধরিয়ে দিল সেক্রেটারির হাতে। দু'একটা কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে, ওদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল। 'মাই ব্যারনেস, প্লেন রেডি।'

'এখুনি রওনা হব,' সেক্রেটারিকে বলল লিনা, তারপর রানার দিকে ফিরল। 'আমি দুঃখিত, রানা।'

'আবার কখন দেখা হবে আমাদের?'

কাঁধ ঝাঁকাল লিনা, সামান্য ছায়ায় ঢাকা পড়ল চোখ জোড়া। 'বলা কঠিন। ঠিক জানি না···তোমাকে আমি টেলিফোন করব। কিন্তু এখন আমাকে যেতে হয়, রানা। গেলাম, প্রিয়তম।'

লিনা চলে যাবার পর জানালার সামনে দাঁড়িয়ে এয়ারফিল্ডের দিকে তাকাল রানা। বাইরে সোনালি আলো ঝরা বসন্তের বিকেল। টারমাকের কিনারায় ছোট ছোট বাগানে রঙচঙে ফুল ফুটেছে। ফুলগুলোকে ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে ফড়িং আর মৌমাছি। রঙিন ডানা ঝাপটে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল। লিয়ার জেটের বিকট আওয়াজ ওগুলোকে যেন স্পর্শই করছে না।

সাক্ষাৎকারের প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণ করল রানা। লিনার চেহারা কতবার কখন কখন বদলেছে, সব মনে আছে ওর। ঠিক কোন্ সময়টা খোলস ঝেড়ে ফেলে বেরিয়ে এসেছিল খলিফা।

সন্দেহের আর কোন অবকাশ নেই। আগেও ছিল কি? ও আসলে মনে মনে, হয়তো অবচেতন ভাবে চাইছিল এমন কিছু ঘটুক যাতে প্রমাণিত হয় লিনা খলিফা নয়। কিন্তু না, তেমন কিছু ঘটেনি, ঘটার নয়।

এখন কাজটা করার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার ওর। তোমাকে আরও কঠিন হতে হবে, রানা। আগে যেমন সহজ ভেবেছিলে, কাজটা তারচেয়ে অনেক শক্ত। মুহূর্তের জন্যেও একা ছিল না ওরা, সারাক্ষণ দেহরক্ষীরা নজর রাখছিল ওদের ওপর। এ-ও আরেকটা লক্ষণ, লিনা সতর্ক হয়ে আছে। নিরিবিলিতে কোথাও দু'জন একা হবে, সে সুযোগ আর আসবে বলে মনে হয় না। তারপর রানার মনে পড়ল, যাবার সময় 'গেলাম, প্রিয়তম' বলে গেল লিনা।

গেলাম মানে কি? আর কখনও দেখা হবে না, চলে গেল চিরতরে? ড.

ওয়ার্নার রানাকে বলেছিলেন, প্রয়োজন ফুরালে আর সব পুরুষ প্রেমিকের মত রানাকেও বাতিল কাগজের মত ফেলে দেবে ব্যারনেস। নাকি কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হুমকি লুকিয়ে আছে?

আশ্চর্য, মন এত খারাপ কেন? এরপর শুধু গানসাইটে চোখ রেখে লিনাকে দেখতে হবে, তাই?

এয়ারফিল্ডে তাকিয়ে আছে রানা, কিন্তু কিছুই দেখছে না। মনে পড়ল প্রথমবার খলিফা নামটা শোনার পর কিভাবে ওর ক্যারিয়ার আর জীবন ভেঙে পড়তে শুরু করে।

কাঁধের পিছন থেকে নরম একটা কণ্ঠস্বর ওর সংবিৎ ফিরিয়ে আনল। সহকারী ম্যানেজার জানল, 'কে.এল.এম-এর ব্রাসেলস ফ্লাইট রেডি, মেজর।'

ওভারকোট আর ব্রীফকেসটা তুলে নিয়ে এগোল রানা। ব্রীফকেসটা উপহার পেয়েছে ও। মেয়েটা বলতে চায়, সে নাকি ওকে প্রাণ মন দিয়ে ভালবাসে। তাকেই খুন করতে হবে রানার।

রানার নতুন অফিসের ডেস্কে গাদা গাদা চিঠি আর ফাইল জমা হয়ে আছে, কাজে ডুবে যেতে হলো ওকে। নিজের অজান্তেই স্বস্তি বোধ করল ও-খলিফার বিরুদ্ধে প্ল্যানটা আপাতত স্থগিত রাখার একটা অজুহাত পাওয়া গেছে।

একটু অবাক হয়ে উপলব্ধি করল রানা, অস্ত্র বিক্রি করার নতুন এই দায়িত্ব উপভোগ করছে সে। ক্রেতা দেশের প্রতিনিধিরা সবাই প্রথম শ্রেণীর ব্রেন, শাণিত বুদ্ধির অধিকারী, যে-কোন পণ্ডিত অধ্যাপককেও বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিতে পারে। জাতির ভবিষ্যৎ যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের মন-মানসিকতা বোঝার একটা সুযোগও পেয়ে গেল রানা। কিভাবে সময় কাটতে লাগল নিজেও টের পেল না। ডেস্কে ফিরে আসার তিন দিন পর ইরাকী এয়ারফোর্সের সাথে একটা চুক্তিতে পৌঁছুল রানা। এই প্রথম মিড়ো কেসট্রেল মিসাইলের অর্ডার দিল ওরা। একশো বিশ ইউনিট, দাম পড়ল দেড়শো মিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি। চুক্তিপত্র সই করার পর অদ্ভুত একটা আনন্দঘন অনুভূতি হলো রানার, সেই সাথে একটা মোহ স্পর্শ করল ওকে। এই মোহ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, এক সময় অ্যাডিক্টেড হয়ে ওঠাও বিচিত্র নয়

এর আগে পর্যন্ত টাকাকে একটা ঝামেলা বা বিড়ম্বনা বলে মনে করে এসেছে রানা, কিন্তু এখন উপলব্ধি করতে পারল এ আরেক ধরনের টাকা। খলিফা যে জগতে বাস করে তার ছবি এক পলক দেখার সুযোগ ঘটেছে ওর, জেনে ফেলেছে এ-ধরনের টাকা কোন মানুষ যখন একবার নাড়াচাড়া করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন ঈশ্বরতুল্য ক্ষমতার স্বপ্ন দেখা তার জন্যে অবাস্তব বলে মনে হয় না।

মানুষের স্বপ্ন এবং উচ্চাশা কখন আর কেন সীমা ছাড়ায় বোঝে রানা, কিন্তু ক্ষমা করতে রাজি নয় ও। আর তাই ব্রাসেলসে ফিরে আসার সাতদিন পর কর্তব্যের দিকে মুখ ফেরাতে নিজেকে বাধ্য করল।

ব্যারনেস লিনা অটারম্যান নির্লিপ্ত আচরণ করছে। শেষবার ওরলি এয়ারপোর্টে অল্প সময় কথা হওয়ার পর রানার সাথে আর যোগাযোগ করেনি সে।

রানা বুঝতে পারল, ওকেই তার কাছে যেতে হবে।

খুন করার জন্যে যথেষ্ট কাছে পৌঁছুনো এখনও সম্ভব ওর পক্ষে, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত রানা। ওরলিতে যে ধরনের সুযোগ পেয়েছিল, সে-ধরনের সুযোগ আবার তৈরি করে নেয়া কঠিন হবে না। তবে ওখানে যদি কাজটা করত, আত্মহত্যা করারই নামান্তর হত সেটা। দেহরক্ষীদের দ্রুত পাল্টা আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেও, আইনের যন্ত্রণাকর প্যাঁচ থেকে নিজেকে ছাড়ানো সম্ভব না-ও হতে পারত। খুব গভীরভাবে চিন্তা না করেই ধরে নিল, খলিফার গল্পটাকে আত্মরক্ষার জন্যে ব্যবহার করতে পারবে না সে। দুনিয়ার কোন কোর্ট ওর কথা বিশ্বাস করবে না। সেন্ট্রাল কমিটি বা ব্রিটিশ ও মার্কিন ইন্টেলিজেন্সের সমর্থনহীন মাসুদ রানাকে ম্যানিয়াক বলে চিত্রায়িত করা হবে। ওরা যে সমর্থন করবে না, এ ব্যাপারেও রানা নিশ্চিত। খলিফাকেও খুন করলে ওরা খুশি হবে, কিন্তু ওর সমর্থনে টুঁ-শব্দটিও না করে ওকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে দেবে।

তারমানে সম্পূর্ণ একা রানা। সেন্ট্রাল কমিটি যে সাহায্য করবে না, ড. ওয়ার্নার সেটা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন। এবং অকালে প্রাণ হারানোর কোন ইচ্ছে রানার নেই। খলিফাকে থামানোর জন্যে নিজেকে বলি দিতে প্রস্তুত নয় সে-অন্তত অন্য কোন উপায় থাকা পর্যন্ত। এক-আধটা উপায় নিশ্চয় আছে।

প্ল্যান করার সময় শিকারকে শুধু খলিফা হিসেবে কল্পনা করল রানা, একবারও লিনা অটারম্যান হিসেবে নয়। তাতে সমস্যাটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা সহজ হলো। ওর সামনে তিনটে প্রশ্ন-কোথায় খুন করা যায়, কখন, কিভাবে।

খলিফার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা নতুন করে সাজিয়ে ব্যাপারটাকে নিজেই জটিল করে তুলেছে ও। এমন একটা সিস্টেম করে দিয়েছে, খলিফা কোথায় কখন থাকবে বা যাবে আগে থেকে জানার কোন উপায় নেই। রাষ্ট্রীয় গোপন দলিল যেভাবে পাহারা দেয়া হয়, খলিফার সফরসূচী লেখা খাতাটা তারচেয়েও নিখুঁতভাবে পাহারা দেয়া হয়। খলিফা কোথাও যাবার পর খবরটা প্রকাশ পায়, যাবার আগে কিছুই জানানো হয় না প্রেসকে।

তাকে যদি এলিসি প্রাসাদে ডিনার খাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়, খবরটা প্রেসে যায় পরদিন, আগের দিন নয়। তবে বাৎসরিক কিছু উপলক্ষ্য বা অনুষ্ঠান আছে বটে, ভুলেও অনুপস্থিত থাকে না খলিফা। তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিষয়ে আলাপ করার সময় এই দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে জেনেছিল রানা। তখন লিনার আসল পরিচয় জানত না ও, দুর্বলতাগুলো দূর করার জন্যে কিছু পরামর্শ দিয়েছিল। মনে আছে, হাসতে হাসতে প্রতিবাদ করেছিল লিনা।

'তুমি চাওটা কি, শুনি-আমাকে কয়েদী বানাবে? এগুলো আমার জীবনের সত্যিকার আনন্দ, আমি বিশ্বাস করি না এ-সব তুমি কেড়ে নিতে পারো!'

বছরের প্রথমবার যখন ইভস সেন্ট লরেঁত-এর কালেকশন দেখানো হয়, প্রথম দিনই সেখানে যাওয়া চাই খলিফার। লংচ্যাম্পে অনুষ্ঠিত হয় গ্র্যান্ড প্রি ডি প্যারিস, ওখানেও যাবে সে। আইস লেপার্ড নামে তার একটা বিখ্যাত ঘোড়া আছে, বছরে মাত্র দু'বার দৌড়ায়, প্রতিটি রেসে উপস্থিত থাকবে সে।

সম্ভাব্য বধ্যভূমির তালিকা তৈরি করল রানা। তারপর এক এক করে বাতিল করে ছোট করল তালিকাটা। যেমন, লা পিয়েরে বেনিত। এর একটা সুবিধে হলো বাড়ি সহ বিশাল এস্টেটটা রানার পরিচিত। সৈনিকের চোখ দিয়ে লক্ষ করেছে ও, টেরেসগুলোর সামনে লনগুলো লেকের দিকে নেমে যাওয়ায়, লেকের কিনারা থেকে জঙ্গলের ভেতর দাঁড়িয়ে গুলি করা সম্ভব। আর বাড়ির পিছনে রয়েছে মাটির ঢিবি, ঢিবির মাথা থেকে আস্তাবল আর প্রশস্ত উঠান পরিষ্কার দেখা যায়, দূরত্বও খুব বেশি নয়। কিন্তু গোটা এস্টেটে পাহারার ব্যবস্থা নিখুঁত। তাছাড়া, শিকারের গতিবিধি সম্পর্কে আগাম কিছু জানা প্রায় অসম্ভব। সে যখন রোম বা নিউ ইয়র্কে থাকবে, সাতদিনের জন্যে বাড়ির কাছাকাছি কোন জঙ্গলে অ্যামবুশ পেতে বসে থাকতে পারে রানা। আরেকটা চিন্তার বিষয় হলো, পালানোর পথ ঝুঁকিবহুল। গোটা এস্টেটে লোকবসতি কম হলেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সবগুলোই পথের ধারেকাছে, আর পথও মাত্র দুটো। দ্রুত এবং সহজেই সেগুলো বন্ধ করে দিতে পারে পুলিস। না, লা পিয়েরে বেনিত তালিকা থেকে বাদ দেয়াই ভাল।

শেষ পর্যন্ত তালিকায় মাত্র দুটো জায়গার নাম থাকল। লংচ্যাম্প, আর ইভস সেন্ট লরেঁত মিউজিয়াম-ছেচল্লিশ নম্বর, এভিনিউ ভিক্টর হুগো।

আশেপাশের কোন বিল্ডিঙে অফিস ঘর ভাড়া করা যেতে পারে। ভুয়া পরিচয় দেবে রানা। তবে দুটোর মধ্যে কোন্ জায়গাটা, পরে ঠিক করবে ও। তার আগে দেখে আসবে।

খলিফাকে এই দু'জায়গায় মারতে চাইলে একটা বিশেষ সুবিধে পাবে রানা। দূর থেকে গুলি করতে হবে ওকে। কাছ থেকে হলে ছুরি, পিস্তল বা হাত ব্যবহার করতে হত। না, কাছ থেকে তাকে মারতে চায় না রানা।

এই কাজের জন্যে শার্কের পয়েন্ট টু-টু-টু স্নাইপার রাইফেল সবচেয়ে উপযোগী। এক্সট্রা লং ব্যারেল, ম্যাচ গ্রেড অ্যামুনিশন ব্যবহার করার জন্যে তৈরি করা হয়েছে, সাথে রয়েছে নতুন লেযার সাইট-সাতশো গজ দূর থেকেও অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ সম্ভব।

স্নাইপারকে শুধু বাঁ হাত দিয়ে স্টকের মাথায় বোতামটা টিপতে হবে, সাথে সাথে রওনা হয়ে যাবে লেযার রশ্মি-রশ্মি যে পথে গেছে সেই একই পথ ধরে যাবে বুলেটও। সিকি আকৃতির উজ্জ্বল সাদা মুদ্রার মত দেখাবে ওটাকে, সাইটের টেলিস্কোপিক লেন্সে চোখ রেখে সাদা আলোটাকে পরিষ্কার দেখতে পাবে স্নাইপার। টার্গেটের ঠিক জায়গায় ওটাকে দেখতে পাবার সাথে সাথে ট্রিগার টানবে সে। এমনকি অদক্ষ একজন মার্কসম্যানেরও ব্যর্থ হবার কোন আশঙ্কা নেই।

চাইলে কার্ল রবসন ওকে একটা না দিয়ে পারবে না। শার্ক কমান্ডের কমান্ডিং অফিসার হিসেবে এমন ব্যবস্থাও তার পক্ষে করা সম্ভব, প্যারিসের মার্কিন দূতাবাস থেকে নিজে এসে সিনিয়র একজন মিলিটারি অ্যাটাশে রানাকে উপহার দিয়ে যাবে রাইফেলটা।

অথচ রানা উপলব্ধি করল প্ল্যানটা নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করছে সে, কাজে নেমে পড়ার কোন তাগাদা অনুভব করছে না।

ব্রাসেলসে ফেরার পর ষোলো দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, আজ শুক্রবার। সকালটা শহরের উত্তরে ন্যাটো রেঞ্জে কাটাল রানা। শর্টরেঞ্জ অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক মিসাইলে যে রাডার গাইডেন্স থাকে সেটাকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে মিডো নতুন একটা ইলেকট্রনিক শীল্ড বানিয়েছে, পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল সেটা। তারপর মিশরীয় অফিসারদের সাথে হেলিকপ্টার যোগে শহরে ফিরে এল ও, ওদেরকে নিয়ে লাঞ্চ খেলো ইপাউলে দে মুর্ত এ। লাঞ্চে বসে গল্পগুজব চলল অনেকক্ষণ, তিনটে ঘণ্টা অপব্যয় হওয়ায় অপরাধবোধ দূর করার জন্যে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ করল অফিসে।

চারদিকে অনেক আগেই অন্ধকার নেমে এসেছে, পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রানা। জানে অন্ধকার রাস্তায় খলিফার লোক ওত পেতে থাকতে পারে, সেজন্যে সম্ভাব্য সতর্কতা অবলম্বনে অবহেলা করেনি। কবে কোন্ দরজা দিয়ে বেরোয় কেউ বলতে পারবে না, কখন বেরোয় তারও কোন ঠিক নেই। প্রতিদিনই আলাদা রাস্তা ব্যবহার করে। গ্র্যান্ড প্যালেস থেকে আজ কয়েকটা সান্ধ্য পত্রিকা কিনল ও, চৌরাস্তার প্রায় সবটুকু দেখা যায় এমন একটা কফি শপে বসে প্রথমে ইংরেজি পত্রিকাটা পড়ল।

হেডিংটা লাফ দিয়ে উঠে এল চোখে।

অপরিশোধিত তেলের দাম কমল

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে রিপোর্টটা পড়ল রানা, ভুরুর ওপর কুঁচকে থাকল চামড়া। পড়া শেষ করে মুখ তুলল ও। রাস্তা দিয়ে ট্যুরিস্টরা দল বেঁধে হাঁটছে, হাসি-আনন্দে মুখর সবাই।

ব্যাপারটা ব্ল্যাকমেইল। প্রাণ হরণের হুমকিতে কাজ হয় কিনা তার পরীক্ষা। আন্তর্জাতিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করার প্রথম প্রচেষ্টা খলিফার। পুরোপুরি সফল হয়েছে সে।

তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে। ক্ষমতার লোভে সীমা ছাড়িয়ে নির্দয় হয়ে উঠবে সে। হত্যাযজ্ঞের নায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবার।

রানা জানে আর তার দেরি করা উচিত নয়। দ্রুত কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। মিথ্যে একটা অজুহাত তৈরি করে সোমবার সকালে লন্ডনে যাবে ও, আগেই ব্যবস্থা করবে এয়ারপোর্টে যাতে দেখা হয় রবসনের সাথে। তাকে সব কথা জানানোর দরকার আছে। রানা জানে, তার কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবে বলে আশা করতে পারে ও। তারপর ফিরে আসবে প্যারিসে, শেষবার দেখে নেবে বধ্যভূমি। কালেকশনের প্রদর্শনী শুরু হতে এখনও দু'হপ্তা বাকি। আরও ভালভাবে প্ল্যান করার জন্যে যথেষ্ট সময় থাকবে হাতে।

হঠাৎ করেই ক্লান্তি অনুভব করল রানা, যেন সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে শরীরের অতিরিক্ত শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। এতই ক্লান্ত, হোটেল পর্যন্ত সামান্য পথ হেঁটে আসতে দম ফুরিয়ে গেল ওর। হুইস্কির অর্ডার দিল ও, গ্লাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে চাঙা হতে চেষ্টা করল।

মিডোর তরফ থেকে হিলটনের দুটো স্যুইট সারা বছর সিনিয়র এক্সিকিউটিভ আর গুরুত্বপূর্ণ ভিজিটরদের জন্যে রিজার্ভ রাখা হয়, তারই

একটায় থাকছে রানা। গ্লাস হাতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে হাঁটা-হাঁটি করল কিছুক্ষণ, কিন্তু নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল না।

আজ বড় বেশি একা লাগছে। মনে হলো, ওর জীবনের কোন অর্থ নেই। প্রশ্ন জাগল মনে, ভাগ্যটাই বিরূপ, নাকি ওর প্রকৃতির মধ্যে গুরুতর কোন গলদ রয়েছে? সোহানা ওকে ভালবাসত, সে-ও ভালবাসত সোহানাকে; কিন্তু তবু ওরা সুখী হতে পারেনি। দু'জন হয়তো আজও পরস্পরকে ভালবাসে, কিন্তু দু'জনেই জানে ওদের ভালবাসার কোন পরিণতি নেই।

একে একে আরও কয়েকজন মেয়ের কথা মনে পড়ল। কেউ কেউ ওকে একতরফা ভাবে ভালবেসেছিল, নিজেও বলতে পারবে না কেন সাড়া দেয়নি সে। দু'একজন মেয়েকে ওর ভাল লেগেছিল, কিন্তু ওর মধ্যে তারা কি দেখেছিল কে জানে, চোখের পানি লুকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে দূরে সরে গেছে।

নাকি ওর পেশাটাই একটা বাধা? প্রতিটি মুহূর্ত ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় যাকে, কোন মেয়ে কেন তার সাথে নিজেকে জড়াবে? এই পেশা বেছে নিয়ে দেশ এবং মানব সমাজের নিরাপত্তা বিধানে যৎসামান্য অবদান রাখতে পারছে সে, এতদিনে ব্যাপারটা অনেকটা নেশার মত হয়ে উঠেছে, ত্যাগ করা সম্ভব নয়। পেশাটা ওর কাছে প্রিয় এবং রোমাঞ্চকর, ত্যাগ করতে চায়ও না সে।

নিঃসঙ্গতা অনেক দিন থেকেই কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। ব্যারনেস লিনাকে চোখে দেখার আগেই ওর মনে হয়েছিল, একটা মেয়ে ওর জীবনে আসছে, ওর নিঃসঙ্গতা দূর করে দেবে সে, অর্থবহ করে তুলবে জীবনটাকে। লিনাকে দেখার পর মনে হলো, এই তো সেই মেয়ে।

তারপর সব ওলটপালট হয়ে গেল। জানা গেল খলিফার আসল পরিচয়।

শ্বেতাঙ্গদের জন্যে পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ একটা বিশ্ব গড়ে তুলতে চায় সে। শ্বেতাঙ্গরা ছাড়া বাকি সব নোংরা আবর্জনা, কাজেই তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে।

তাকে খুন না করে উপায় কি? এবং করলে তাড়াতাড়ি করতে হবে, তা না হলে উন্নত বিশ্ব বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ-প্রধান দেশগুলোর কাছে থেকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা পেতে শুরু করবে খলিফা, তখন তাকে ঠেকানোর সাধ্য কারও থাকবে না। খলিফার আদর্শ, স্বপ্ন, পরিকল্পনা সম্পর্কে এখনও ভাল ধারণা নেই কারও, সেটাই রক্ষা। জার্মানরা এত উন্নত জাত, অথচ তারাই হিটলারকে সমর্থন করেছিল। স্বজাতির একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ আছে দেখলে শ্বেতাঙ্গ কোন সরকারই সেটা হাতছাড়া করতে চাইবে না।

হঠাৎ আবিষ্কার করল রানা, খালি গ্লাস নিয়ে হাঁটাহাঁটি করছে সে। দাঁড়িয়ে পড়ল খোলা জানালার সামনে, নিঃসঙ্গতা আবার ওকে পেয়ে বসল। অকস্মাৎ সুরেলা প্রলম্বিত কণ্ঠস্বর বাজল কানে, মনে পড়ে গেছে কথাগুলো।

'আমি একা। কতদিন ধরে। নিঃসঙ্গতা আমাকে মেরে ফেলছে, রানা। এই অভিশাপ থেকে আমি মুক্তি চাই। তুমি আমাকে উদ্ধার করতে পারো না?'

স্মৃতি বড় বেদনাদায়ক। খলিফার কথা আলাদা, কিন্তু লিনার কথা মুছে

ফেলতে হবে মন থেকে। প্রায় ছিটকে জানালার সামনে থেকে সরে এল রানা, বেরিয়ে এল কামরা থেকে। নিচের লবিতে এক মিনিট দাঁড়াল, প্রায় অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ব্যস্ত হাতে সিগারেট ধরাল একটা। মাথা ধরেছে, কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা বাতাস পাওয়া দরকার।

লম্বা-চওড়া এক মেয়ে রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথে উঠে এল। ঠোঁটে লাল টকটকে লিপস্টিক মেখেছে। রানার পথ আগলে দাঁড়াল সে, ফিসফিস করে প্রস্তাব দিয়ে রূঢ় বাস্তবে ফিরিয়ে আনল রানাকে।

'মার্সি।' দ্রুত মাথা নেড়ে তাকে পাশ কাটাল রানা, হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। দু'মাইল হেঁটে আবার হিলটনের সামনে চলে এল ও, বুকস্টলের সামনে দাঁড়াল। একটা র‍্যাকে অনেকগুলো মেয়েদের ম্যাগাজিন, নেড়েচেড়ে দেখল কয়েকটা। একটা ভোগ-এর পাতা ওল্টাচ্ছে, ইভস সেন্ট লরেঁত প্রদর্শনী সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা খুঁজছে। তার বদলে একটা মেয়ের ছবি লাফ দিয়ে উঠে এল চোখে।

চকচকে কালো চুল এমনভাবে ব্যাকব্রাশ করা, টান টান হয়ে আছে কপালের চামড়া। পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে লম্বা চুলগুলো বিনুনি করা হয়েছে, তারপর কান জোড়ার ওপর মাথার দু'পাশে উঁচু করে বাঁধা হয়েছে দুটো খোঁপা। উঁচু চোয়ালের দ্রাভিক গড়ন সহজেই টের পাওয়া যায়, চেহারায় দৃঢ় মানসিকতার একটা ভাব এনে দিয়েছে। চোখ জুড়ানো রঙ গায়ের, হালকা গোলাপী। থুতনি সামান্য চৌকো, একটু যেন শক্ত, সৌন্দর্য নিখুঁত হবার পথে ছোটখাট হলেও একটা বাধা। কমনীয় চেহারা, কিন্তু কোমলতার চেয়ে কাঠিন্যই যেন বেশি। মেয়েটা হয়তো বিশ্ব সুন্দরী হতে পারবে না, কিন্তু একবার তাকালে চোখ ফেরানোও সম্ভব নয়।

চারজনের একটা গ্রুপ ফটোর মধ্যে সে-ও একজন। দ্বিতীয় মহিলাটি বিখ্যাত এক পপ গায়কের স্ত্রী, তীক্ষ্ণ চেহারা, ঠিক মেয়েলি নয়। তার পাশে কিশোর-সুলভ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমেরিকান এক অভিনেতা, লোকটা অভিনয়ের জন্যে যতটা না তারচেয়ে মেয়ে-পটানোর জন্যে বেশি নাম কিনেছে। সাধারণত এ-ধরনের লোকদের সাথে চলাফেরা বা ওঠাবসা করে না ব্যারনেস লিনা। তবে তার পাশে দাঁড়ানো লোকটা অভিজাত এবং সুপুরুষ, ব্যারনেস লিনার কাঁধে হাত দিয়ে আছে। ক্ষমতা আর কর্তৃত্ব ফুটে আছে লোকটার চেহারায়। ক্যাপশন না দেখেই তাকে চিনতে পারল রানা–বৃহত্তম জার্মান অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান। ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, একটা ফ্যাশন-শো উদ্বোধন হতে যাচ্ছে, প্রধান অতিথি ব্যারনেস লিনা।

চেয়ারম্যানের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পাঁজরের ভেতর চিনচিনে একটা অনুভূতি হলো রানার। ঘৃণা নাকি ঈর্ষা, ঠিক জানে না। ম্যাগাজিনটা র‍্যাকে রেখে দিয়ে হন হন করে হোটেলে ফিরে এল ও।

স্যুইটে ফিরে শাওয়ার সারল রানা, আবার হুইস্কি নিয়ে খোলা জানালার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসল। সোহেল কিডন্যাপ হবার পর থেকে মদ খাবার পরিমাণ বেড়ে গেছে ওর। গুরুতর সন্দেহে ভুগতে থাকলে বা নিঃসঙ্গতা দূর করা না গেলে এর মাত্রা দিনে দিনে বাড়তেই থাকবে। এখন থেকেই ওর সাবধান হওয়া

উচিত। গ্লাসটা হাতে নিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা, আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ব্রাসেলসে ফেরার পর থেকে ন্যাটোর অফিসার্স ক্লাবের জিমনেশিয়ামে রোজই যাচ্ছে রানা। শরীরটাকে আগের মতই একহারা আর শক্ত রাখতে পারছে সে, তলপেট হয়ে উঠেছে গ্রেহাউন্ডের মত। শুধু শ্রী হারিয়েছে মুখটা। ঘৃণাও মানুষের চেহারা বদলে দিতে পারে।

আয়নার দিকে পিছন ফিরতেই ফোন বেজে উঠল।

'রানা,' রিসিভারে বলল ও, বাথরুম থেকে বেরিয়ে এখনও কাপড় পরেনি, ডান হাতে হুইস্কির গ্লাস।

'প্লীজ হোল্ড অন, মেজর রানা। ইন্টারন্যাশনাল কল।'

যান্ত্রিক শব্দজট ভেসে এল কানে। অনবরত ক্লিক ক্লিকের সাথে অন্যান্য অপারেটরদের আধা ইংরেজি আধা ফরাসী কথা অস্পষ্টভাবে শোনা গেল।

তারপর হঠাৎ করে তার কণ্ঠস্বর। সেই প্রলম্বিত সুর। এতই অস্পষ্ট, যেন বিশাল হলঘরে ফিসফিস করছে কেউ।

'রানা, তুমি?'

'লিনা?' বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে সময় নিচ্ছে রানা, রিসিভার থেকে প্রতিধ্বনিত হয়ে কানে ফিরে এল নিজের কণ্ঠস্বর। লিনা আবার কথা বলার আগে ক্লিক করে আওয়াজ হলো একটা, তারমানে যোগাযোগটা এখন রেডিও টেলিফোন লিঙ্কের মাধ্যমে চালু হলো।

'তোমার সাথে আমাকে দেখা করতে হবে, রানা। এভাবে দিন কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি আমার কাছে আসবে, রানা, প্লীজ?'

'কোথায় তুমি?'

'লে নিউফ পোইজোঁ।' শব্দগুলো একেবারেই অস্পষ্ট আর ভাঙাচোরা, আবার শুনতে চাইল রানা।

'লে নিউফ পোইজোঁ-দি নাইন ফিশ,' পুনরাবৃত্তি করল লিনা। 'আসবে, রানা, আসবে আমার কাছে?'

'তুমি কাঁদছ?' জিজ্ঞেস করল রানা। শব্দজট তুঙ্গে উঠল, হাজার হাজার যান্ত্রিক আওয়াজ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। রানার মনে হলো, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হতাশায় চিৎকার করে উঠল সে, 'কাঁদছ নাকি?'

'হ্যাঁ,' নিঃশ্বাসের আওয়াজ, উত্তরটা ওর কল্পনাও হতে পারে।

'কেন?'

'তুমি বোঝো না কেন? কারণ আমার জীবনে সুখ নেই। কারণ আমি ভয়ে মরে যাচ্ছি। এই কষ্ট কেন তুমি দেবে আমাকে, কী করেছি আমি, কেন তুমি দূরে সরে থাকছ! আসবে, রানা? আসবে আমার কাছে? প্লীজ, উইল ইউ কাম?'

'আসব,' বলল রানা। 'কিভাবে যাব বলে দাও।'

'লা পিয়েরে বেনিতে ফোন করে জেমের সাথে কথা বলো, সেই সব ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি এসো, রানা। যত তাড়াতাড়ি পারো।'

'হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, কিন্তু জায়গাটা কোথায়?'

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে থাকল রানা, কিন্তু শব্দজট ছাড়া কিছুই শোনা

গেল না।

'লিনা? লিনা?' গলা ফাটিয়েও কোন লাভ হলো না, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আঙুলের ডগা দিয়ে ক্রেডলে চাপ দিল রানা।

'লে নিউফ পোইর্জো,' বিড়বিড় করে বলল ও, আঙুলটা তুলে নিল। 'অপারেটর,' একটু দম নিয়ে শুরু করল, 'ফ্রান্সের রঁবুইলের এই নম্বরটা দিন আমাকে, প্লীজ–।' অপেক্ষা করার সময়টুকু দ্রুত চিন্তার মধ্যে কেটে গেল।

যেন ঠিক এই ঘটনার জন্যেই অপেক্ষা করছিল ও, অবচেতন ভাবে। মনে হলো একমাত্র এটাই ঘটার ছিল–চাকা শুধু ঘুরতে পারে, দু'পাশের কোন দিকে গড়াতে পারে না।

খলিফার সামনে কোন বিকল্প ছিল না। ইতি টানার জন্যে এই ডাক। অবাক হয়েছে রানা শুধু একটা কারণে, ডাকটা আরও আগে আসেনি ভেবে। আরও কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। লন্ডন বা ইউরোপের কোন শহরে ওকে মারতে চাইছে না খলিফা। সে-ধরনের একটা প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল রঁবুইলেতে, কিন্তু সফল হয়নি। সতর্ক হয়ে গেছে খলিফা, রঁবুইলের ঘটনার পর তার জানা হয়ে গেছে শিকার দুর্বল নয়, পাল্টা আঘাত হানার শক্তি আর বুদ্ধি রাখে সে।

রানার কয়েকটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কোথায় আর কখন, এই দুই প্রশ্নের উত্তর খলিফার কাছ থেকে আসছে। বাকি থাকল–কিভাবে। সেটা জায়গামত পৌঁছে ঠিক করতে পারবে রানা।

ঝানু অভিনেত্রী। সামান্য একটু শব্দ করেছে, রানা যাতে শুধু চিনতে পারে ওটা কান্না।

'ব্যারনেস অটারম্যানের রেসিডেন্স থেকে বলছি।'

'জেম?'

'স্পিকিং, স্যার।'

'মেজর রানা।'

'গুড ইভনিং, মেজর। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। ব্যারনেসের সাথে আগেই কথা হয়েছে আমার। লে নিউফ পোইর্জোতে আপনার যাবার ব্যবস্থা করতে বলেছেন তিনি। ব্যবস্থা হয়েছে, স্যার।'

'জায়গাটা কোথায়, জেম?'

'লে নিউফ পোইর্জো–ইল সুলে ভঁৎ-এ ব্যারনেসের হলিডে আইল্যান্ড, স্যার। ইউ.টি.এ. ফ্লাইট ধরে তাহিতির পাপেটি-ফাআ (FAAA)-তে পৌঁছুতে হবে, ওখানে ব্যারনেসের পাইলট অপেক্ষা করবে আপনার জন্যে। ওখান থেকে আরও একশো মাইল দূরে লে নিউফ পোইর্জো, দুর্ভাগ্য যে এয়ারস্ট্রিপ খুব ছোট বলে লিয়ার ল্যান্ড করতে পারে না, আরও ছোট প্লেন ব্যবহার করতে হয়।'

'ব্যারনেস কখন পৌঁছুবেন লে নিউফ পোইর্জোতে?'

'তিনি তো সাত দিন হলো চলে গেছেন, স্যার।' তারপরই ইউ.টি.আই. ফ্লাইট সম্পর্কে বিশদ বলতে শুরু করল জেম। 'ইউ.টি.আই. টিকেট কাউন্টারে আপনার জন্যে টিকেট থাকবে, স্যার–নন-স্মোকিং একটা সীট বুক করেছি,

জানালার ধারে।'

'সব তোমার মনে থাকে। ধন্যবাদ, জেম।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, অনুভব করল সমস্ত ক্লান্তিবোধ দূর হয়ে গেছে। কোত্থেকে যেন বিপুল শক্তি এসে ভর করল শরীরে। এ শক্তি কি ট্রেনিং পাওয়া একজন সৈনিকের প্রাণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা থেকে আসছে, নাকি সিদ্ধান্তহীনতা আর অজানা ভীতির অবসান ঘটার আশা থেকে?

দু'জনের উদ্দেশ্যই এক। বলা কঠিন কে জিতবে কে হারবে। তবে বেশি দেরি নেই, অচিরেই সব জানা যাবে।

গ্লাসে নতুন করে হুইস্কি ভরে বাথরুমে ঢুকল রানা। শরীরের তাপ কমাবার জন্যে আবার একবার গোসল করা দরকার।

সাত

তাহিতি-ফাআ-য় ল্যান্ড করল ডিসি টেন। একটু গরম আবহাওয়া, ফুলের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। রানওয়ে থেকে সাগর আর শহর দেখা যায়; নিতম্বিনী নধর যুবতীদের বোটে, সৈকতে, বা ফুটপাথে যেখানেই দেখা গেল মনে হলো অফুরন্ত আনন্দ পুলকে সারাক্ষণ নাচছে। চারদিকে ভাল করে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে লাগেজ হোল্ডের দিকে এগোল রানা।

কাস্টমস চেকিঙের পর আরেক দিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ও, এই সময় অস্বাভাবিক এক ঘটনা ঘটল। গেটের পাশে দু'জন সশস্ত্র কাস্টমস অফিসার দাঁড়িয়ে রয়েছে, দূর থেকে রানাকে দেখে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কি যেন আলাপ করল তারা। তারপর দু'জনেই রানার পথ আগলে দাঁড়াল।

'গুড আফটারনুন, স্যার,' বলল একজন, অমায়িক হাসছে, কিন্তু হাসিটুকু চোখ ছোঁয়নি। 'আমাদের সাথে এদিকে একটু আসবেন, প্লীজ?' রানাকে পথ দেখিয়ে পর্দা ঘেরা একটা অফিস ঘরে নিয়ে আসা হলো।

'দয়া করে আপনার ব্যাগগুলো খুলুন, স্যার।' হ্যান্ডব্যাগ আর ব্রীফকেস, দুটোই তন্নতন্ন করে খুঁজল ওরা, গোপন পকেট আছে কিনা তা-ও পরীক্ষা করল একজন।

'আপনাদের প্রশংসা করতে হয়,' বলল রানা, ওদের মতই হাসছে ও, কিন্তু কণ্ঠস্বর টান টান আর নিচু।

'অনিয়মিত চেক, স্যার,' সিনিয়র লোকটা বলল ওকে। 'দশ হাজার লোকের মধ্যে আপনি আনলাকি একজন। এবার, স্যার, আশা করি দেহ-তল্লাশিতে আপত্তি করবেন না?'

'দেহ-তল্লাশি করবেন?' চটে গেল রানা, কিন্তু কি মনে করে তর্ক করল না, কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত দুটো মাথার ওপর তুলল। 'করুন।'

জানা গেল, ফ্রান্সের মত এখানেও লিনা অটারম্যান একজন মহীয়সী নারী।

এক গুচ্ছ দ্বীপের মালিক সে, তার অঙ্গুলি হেলনে ভাল-মন্দ অনেক কিছুই ঘটতে পারে। নবাগত একজন বিদেশী অস্ত্র বহন করছে কিনা সেটা জানতে চাওয়া তার জন্যে স্বাভাবিক।

এ-ধরনের দেহ-তল্লাশির অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি রানার। একজন ওর পিঠ, পাঁজর, বুক, আর পেট পরীক্ষা করল। অপরজন পেট থেকে শরীরের নিচের অংশ–উরুসন্ধি, হাঁটুর পিছনটা, নিতম্বের খাঁজ, পায়ের পাতা, কিছুই বাদ দিল না।

ব্রাসেলসের হিলটনে কোবরাটা রেখে এসেছে রানা, আগেই আন্দাজ করছিল এ-ধরনের একটা পদক্ষেপ নিতে পারে খলিফা।

'সন্তুষ্ট?' জিজ্ঞেস করল ও।

'সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ, স্যার। হ্যাভ এ লাভলি স্টে অন আওয়ার আইল্যান্ড।'

মেইন কনকোর্সে লিনার ব্যক্তিগত পাইলট অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে, করমর্দনের জন্যে শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এল সে। 'আমি তো ভাবলাম এই ফ্লাইটে আপনি বোধহয় আসেননি, স্যার!'

'কাস্টমসে একটু দেরি হয়ে গেল,' ব্যাখ্যা করল রানা।

'এখুনি আমাদের রওনা হতে হয়, মানে লে নিউফ পোইজোঁতে যদি অন্ধকারে ল্যান্ড করতে না চাই। একেবারে যা তা অবস্থা স্ট্রিপের।'

সার্ভিস এরিয়ার কাছাকাছি পার্ক করা রয়েছে লিয়ার জেট, সেটার পাশে নরম্যান ব্রিটেন ট্রাই-আইল্যান্ডারকে ছোট আর কুৎসিত দেখাল। প্লেনটার বৈশিষ্ট্য হলো অল্প জায়গায় ওঠা নামা করতে পারে।

এরই মধ্যে অনেকগুলো কাঠের বাক্স আর প্যাকেট তোলা হয়েছে প্লেনে, টয়লেট রোলস থেকে শুরু করে ভিউভ ক্লিকোৎ শ্যাম্পেন, কিছুই বাদ পড়েনি। সবগুলো বাক্স আর প্যাকেট একটা জালের ভেতর আটকানো।

ডান দিকের সীটে বসল রানা। স্টার্ট দিয়ে টাওয়ারের অনুমতি নিল পাইলট, তারপর রানাকে বলল, 'এক ঘন্টার পথ, স্যার। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

অস্তগামী সূর্য ওদের পিছনে, পশ্চিম দিক থেকে পৌঁছুল ওরা। নীল মখমলের মত সাগরে লে নিউফ পোইজোঁ যেন পান্না বসানো অমূল্য নেকলেস।

নয়টা দ্বীপ একটা বৃত্ত রচনা করেছে, মাঝখানে আটকে থাকা লেগুনের পানি এত স্বচ্ছ যে কোরালের প্রতিটি শাখা স্রোতের সাথে কিভাবে মোচড় খাচ্ছে পরিষ্কার দেখা যায়, যেন পানির ওপর রয়েছে।

'ব্যারন পঁচাত্তর সালে দ্বীপগুলো কেনার সময়,' বলল পাইলট, 'ওগুলোর একটা পলিনেশিয়ান নাম ছিল। পুরানো এক রাজার কাছ থেকে একজন মিশনারী উপহার পেয়েছিল, তার বিধবা স্ত্রীর কাছ থেকে কিনে নেন ব্যারন। তিনি পলিনেশিয়ান নামটা উচ্চারণ করতে পারতেন না, তাই বদলে ফেলেন।' শ্রদ্ধাভরে হাসল পাইলট।

সাতটা দ্বীপ স্রেফ বালির বিস্তৃতি, এখানে সেখানে সার সার পাম গাছ। বাকি দুটো আকারে বড়, জমাট বাঁধা নিরেট লাভায় মোড়া, নিস্তেজ রোদে চকচক

করছে।

নিচের দিকে নামতে শুরু করল প্লেন। জানালা দিয়ে একটা বাড়ি দেখতে পেল রানা, পাম গাছের পাতা দিয়ে ঢাকা ছাদ। বাড়িটার চারপাশে ফুলবহুল বাগানের আড়ালে অন্যান্য আরও কয়েকটা ছোট বাংলো দেখা গেল। পরমুহূর্তে লেগুনের ওপর চলে এল প্লেন, লম্বা জেটির দু'পাশে অনেকগুলো ছোট ছোট জলযান রয়েছে। জেটিটা সুরক্ষিত জল-সীমা পর্যন্ত লম্বা। নগ্ন মাস্তুল সহ সাধারণ বোট রয়েছে একটা, পাশেই বড় একটা পাওয়ার স্কুনার-ওটা বোধহয় পাপেটি থেকে ভারী জিনিস-পত্র আনার কাজে ব্যবহার করা হয়-যেমন, ডিজেল। স্কিইং, ডাইভিং, আর ফিশিং-এর জন্যে রয়েছে বেশ কয়েকটা পাওয়ার বোট। ওগুলোর একটাকে লেগুনের মাঝখানে দেখা গেল, তীরবেগে ছুটছে আর পিছনে রেখে যাচ্ছে অস্ট্রিচ পাখির পালকের মত তুষার ধবল দু'সারি পানির উত্থান, আরও পিছনে স্কির ওপর খুদে একটা মনুষ্য আকৃতি আকাশের দিকে মুখ তুলে ওদের উদ্দেশে অভ্যর্থনাসূচক হাত নাড়ল। মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, লিনা হতে পারে-কিন্তু হঠাৎ বাঁক নিল ট্রাই-আইল্যান্ডার, চোখের সামনে হরেক রকম লাল আর গোলাপী মেঘমালা ও দিগন্তছোঁয়া সূর্য ছাড়া আর কিছু থাকল না।

রানওয়েটা ছোট আর সরু, সৈকত আর পাহাড়ের মাঝখানে সমতল জমি থেকে পাম গাছের সারি কেটে তৈরি করা হয়েছে। স্ট্রিপের মেঝে বানানো হয়েছে কোরালের টুকরো দিয়ে। এক ঝাঁক পাম গাছের দিকে নামল ওরা, দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ধেয়ে আসা বাতাসের তীব্রগতি প্রতি মুহূর্ত ঝাঁকি দিয়ে গেল প্লেনটাকে। পাম গাছগুলোকে পিছনে রেখে রানওয়ে স্পর্শ করল চাকা।

স্ট্রিপের কিনারায় ইলেকট্রিক গলফ কার্ট নিয়ে অপেক্ষা করছিল একটা পলিনেশিয়ান যুবতী, পাম গাছের ছায়া আর রোদ পড়েছে তার গায়ে। পরনে একপ্রস্থ কাপড়, বগলের নিচ থেকে উরুর মাঝামাঝি পর্যন্ত ঢাকা। পা খালি, কিন্তু মাথায় পরেছে তাজা ফুলের তৈরি মুকুট-এদিকের সব মেয়েই পরে।

সরু মেঠো পথ, আঁকাবাঁকা, দু'পাশে বাগান। পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা বাগান কিনা বলতে পারবে না রানা, তবে বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিশেষ একটা স্থান পেয়ে যেতে পারে। প্রতিটি বাঁকের পর আলাদা আলাদা ফুল বা গাছ, বেশির ভাগই দুর্লভ প্রজাতির। প্রতিটি বাঁকেই অপেক্ষা করছে বিস্ময় আর চমক।

বারান্দার নিচে সাদা বালি নিয়ে রানার বাংলো সৈকতের বেশ খানিক ওপরে, বারান্দা থেকে অবাধ দৃষ্টি চলে দিগন্তরেখায় বিলীন সাগর-সীমা পর্যন্ত, চারপাশে এমনভাবে গাছপালা সাজানো হয়েছে, মনে হয় গোটা দ্বীপে এটাই বুঝি একমাত্র বাড়ি। বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে বেপরোয়া বেগে গাড়ি চালিয়ে এল মেয়েটা, ব্রেক কষে লাফ দিয়ে নিচে নামল, তারপর নিরীহ খুকীর মত সাদরে হাত ধরে নামাল রানাকে।

হাত না ছেড়েই বাংলোর ভেতর নিয়ে এল ওকে। এক এক করে এয়ারকন্ডিশন, সুইচবোর্ড, ভিডিও স্ক্রীন, বাথরুম, ইত্যাদি দেখাল সে। ছোট ছোট ফরাসী শব্দ উচ্চারণ করে কথা বলল রানার সাথে, যেন সম-বয়েসী ভাই অনেক দিন পর বাড়ি ফিরেছে। রানার হাবভাব লক্ষ করে হেসে কুটি কুটি হলো বারবার।

বার আর কিচেনে যা কিছু থাকা দরকার সব আছে, লাইব্রেরীতে রয়েছে সবগুলো সাম্প্রতিক বেস্টসেলার–শুধু ম্যাগাজিন আর দৈনিক পত্রিকাগুলো দিন কয়েকের পুরানো। ভিডিও ক্যাসেট পাওয়া গেল গোটা বিশেক, প্রতিটি ছবিতে অস্কার বিজয়ীরা অভিনয় করেছে।

'রবিনসন ক্রুসোর নাম শুনেছ? তার একবার এখানে আসা উচিত ছিল।' রানাকে হাসতে দেখে মেয়েটাও খিলখিল করে হেসে উঠল।

দু'ঘণ্টা পর আবার রানাকে নিতে এল সে। ইতিমধ্যে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামিয়েছে রানা, খানিক বিশ্রাম নিয়ে কাপড় পাল্টেছে। হালকা সুতী ট্রপিকাল স্যুট পরেছে ও, বুক খোলা শার্ট, পায়ে স্যান্ডেল।

আবার ওর হাত ধরল মেয়েটা। রানা বুঝল, এই অভ্যেসটাকে কেউ যদি অবাধ লাইসেন্স বলে মনে করে মেয়েটা আহত হবে, হতভম্ব হয়ে পড়বে বেচারি। সরু আর লম্বা একটা পথ ধরে ওকে নিয়ে চলল সে, শুধু দু'পাশের ঝোপ-ঝাড়গুলো আলোকিত। ঝোপের ভেতর এমনভাবে লুকানো আছে আলোর ব্যবস্থা, টিউব বা বালব নজরে আসে না। সাগরের কলকল ছলছল শব্দে ভরাট হয়ে আছে রাত, আর একেবারে কানের পাশে পাম গাছের পাতার সাথে বাতাসের খসখস খুনসুটি।

বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা, প্লেন থেকে এটাকে দেখেছিল রানা। মৃদু সুর-ঝংকার আর হাসির আওয়াজ কানে এল, তবে আলোর মধ্যে রানা এসে দাঁড়াতে হাসির শব্দ থেমে গেল, পাঁচ-সাতজন মানুষ চোখে প্রত্যাশা নিয়ে ঘাড় ফেরাল ওর দিকে।

রানার ঠিক জানা ছিল না কি আশা করবে সে, কিন্তু আর যাই হোক এ-ধরনের আনন্দমুখর সামাজিক সমাবেশ আশা করেনি ও। রোদে পোড়া সুঠামদেহী নারী-পুরুষ রুচিসম্মত মূল্যবান কাপড় পরে আছে, বরফ আর ফলের রস ভরা লম্বা গ্লাস হাতে, গ্লাসগুলো ঘেমে ঝাপসা হয়ে গেছে।

'রানা!' দল ভেঙে বেরিয়ে এল ব্যারনেস লিনা, নিতম্বে ঢেউ তুলে যেন উড়ে চলে এল রানার সামনে।

ঝলমলে, নরম সোনালি একটা ড্রেস পরেছে সে, গলার কাছে সরু সোনালি চেইন দিয়ে আটকানো, কিন্তু কাঁধ থেকে গোটা পিঠ একেবারে নিতম্বের এক ইঞ্চি ওপর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নগ্ন। দৃশ্যটা শ্বাসরুদ্ধকর, কারণ তার শরীর গোলাপ পাপড়ির মত, আর পরিমিত রোদ পোহানো চামড়ার রঙ চাকভাঙা নতুন মধুর মত। ঘন কালো চুল মুচড়ে কব্জি সমান মোটা রশি পাকানো হয়েছে, তারপর মাথার মাঝখানে স্তূপ করা হয়েছে সযত্নে। প্রসাধন ব্যবহার করেছে সে, হালকা ছায়া পড়েছে যেন, ফলে চোখ জোড়া চিকন, সবুজ, আর রহস্যময় লাগছে।

'রানা,' আবার বলল লিনা অটারম্যান, পায়ের পাতায় ভর দিয়ে আলতোভাবে চুমো খেলো ঠোঁটে, প্রজাপতি পাখনা ছোঁয়াল যেন। অস্পষ্টভাবে পারফিউমের গন্ধ পেল রানা, মন মাতানো, মিষ্টি।

বোধশক্তি লোপ না পেলেও টলে গেল রানার। লিনা সম্পর্কে কিছুই তার অজানা নেই, অথচ তাকে দেখে টান পড়েনি পেশীতে।

লিনা সম্পূর্ণ শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন, এবং সপ্রতিভ। সদ্য ফোটা ফুলের মত তাজা। নিদারুণ হতাশা বা ভীতিকর নিঃসঙ্গতা, এই মুহূর্তে কিছুই তাকে স্পর্শ করেনি। এই মেয়ে কেঁদেছে বা কাঁদতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না।

মাথাটা একপাশে কাত করার জন্যে এক পা পিছিয়ে গেল লিনা, দ্রুত চোখ বুলিয়ে দেখে নিল রানাকে, মৃদু হাসল। 'ওহ্, শেরি, আগের চেয়ে কত ভাল দেখাচ্ছে তোমাকে। শেষবার যেদিন দেখলাম, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে আমাকে!'

এতক্ষণে উপলব্ধি করল রানা, শান্ত সপ্রতিভ ভাবটুকু পুরোটাই কৃত্রিম, হালকা ছায়া থাকায় চোখ ভরা বিষাদ সহজে নজরে পড়ছিল না। ঠোঁটের দুই কোণও টান টান হয়ে আছে।

'আর তোমাকেও যে এত সুন্দর দেখেছি, আমার মনে পড়ে না।'

কথাটা সত্যি, কাজেই কোন সংকোচ ছাড়াই বলতে পারা গেল। শুনে হেসে উঠল লিনা, ক্ষণস্থায়ী কোমল একটু আনন্দ উচ্ছ্বাস।

'আগে কখনও কথাটা বলোনি,' মনে করিয়ে দিল লিনা, কিন্তু এখনও তার আচরণ মৃদু হলেও ভঙ্গুর। তার স্নেহ আর বন্ধুত্বের ভাব আরেক সময়ের কথা মনে করিয়ে দিলেও, এখন আর কোন গুরুত্ব নেই ওগুলোর। 'সত্যি আমি কৃতজ্ঞ।'

আপন করে কাছে টানল লিনা, পাঁজর আর বগলের মাঝখানে রানার একটা হাত আটকাল, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল জোট বাঁধা অতিথিদের দিকে, যেন একবার যখন পেয়েছে তখন এই অমূল্য সম্পদ আর সে হাতছাড়া করতে রাজি নয়।

তিনজন পুরুষ আর তাদের স্ত্রীরা রয়েছে দলটায়। একজন মার্কিন ডেমোক্র্যাট সিনেটর, বেশ ভাল রাজনৈতিক প্রভাব আছে। তার মাথায় প্রচুর চুল, সব সাদা। চোখ জোড়া পাকা লিচুর মত। পাশে বসা স্ত্রীর বয়স তার চেয়ে অন্তত ত্রিশ বছর কম হবে, খুবই সুন্দরী। লোকটা রানার দিকে তাকাল–ঠিক সিংহ যেভাবে হরিণের দিকে তাকায়। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চাপ দিয়ে এক সেকেন্ড অতিরিক্ত ধরে থাকল সে রানার হাত।

একজন অস্ট্রেলিয়ান রয়েছে, বিশাল কাঁধ, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। তার চোখের চারপাশে স্থায়ীভাবে কুঁচকে আছে মোটা চামড়া, গায়ের রঙ জন্ডিস রোগীর মত হলদেটে। দৃষ্টি দেখে মনে হবে অনেক দূরে তাকিয়ে আছে। দেখেই চিনেছে রানা, সারা দুনিয়ায় জানামতে যত ইউরেনিয়াম আছে তার সিকি ভাগের মালিক সে, আর আছে অসংখ্য ক্যাটল স্টেশন, সবগুলো এক করলে আকারে ব্রিটিশ আইলস-এর দ্বিগুণ হবে। স্ত্রীটি স্বামীর মতই রোদে পোড়া তামাটে, দু'জনে সমান জোর দিয়ে করমর্দন করল।

তৃতীয়জন স্প্যানিয়ার্ড, পৃথিবীবিখ্যাত একটা শেরি-র সাথে তার পরিবারের নাম জড়িয়ে আছে। চশমা পরা অধ্যাপকের চেহারা, রোগা-পাতলা, ভঙ্গুর। কোথায় যেন পড়েছে রানা, এই লোকের সেলারে পাঁচশো মিলিয়ন ডলারের শেরি আর কনিয়্যাক মজুদ থাকে, অঙ্কটা নাকি তাদের পরিবারের মোট বিনিয়োগের ক্ষুদ্র একটা ভগ্নাংশ মাত্র। সুন্দরী বউ, তবে মোটা আরেকটু কম হলে রানা বোধহয় নিজের অজান্তেই আরও দু'একবার তার দিকে তাকাত।

পরিচয় এবং কুশল বিনিময়ের পর দলটা আজকের মাছ ধরা নিয়ে আলোচনা শুরু করল। অস্ট্রেলিয়ান লোকটা সকালে প্রকাণ্ড একটা মারলিন তুলেছে বোটে, হাজার পাউন্ডের বেশি তার ওজন, মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত পনেরো ফিট লম্বা। বর্ণনা শুনে সবাই, বিশেষ করে মেয়েরা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

আলোচনায় যোগ দিলেও খুব কম কথা বলল রানা, তবে চোরা চোখে সারাক্ষণ লক্ষ রাখল লিনার ওপর। টেনশনে ভুগছে মেয়েটা, বুঝতে পারছে ওর দিকে একটা চোখ আছে রানার। সব কথা আর কারও জানা নেই, কাজেই ওদের চোখে তার মানসিক উত্তেজনা ধরা পড়ছে না। প্রয়োজনের সময় সহজভাবেই হাসছে সে, রানার দিকেও দু'একবার তাকাল, প্রতিবার হাসিমুখে–শুধু চোখের তারায় ম্লান ছায়া।

অবশেষে হাততালি দিল সে। 'এসো সবাই, মাটি খুঁড়ে গুপ্তভোজ বের করি।' দু'হাতের ভাঁজে সিনেটর আর অস্ট্রেলিয়ান লোকটাকে বন্দী করল সে, সবাইকে নিয়ে নেমে এল সৈকতে। ওদের তিনজনের পিছনে রানার ঘাড়ে চাপল সিনেটরের স্ত্রী, সে ওর বাহুর সাথে বুক ঘষল, তারপর আঁকড়ে ধরে প্রায় ঝুলে পড়ার সময় ঠোঁটের ওপর হালকাভাবে জিভ বুলিয়ে দিল দু'বার।

লম্বা একটা বালির স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন পলিনেশিয়ান ভৃত্য, লিনার সঙ্কেত পেয়ে কোদাল নিয়ে স্তূপটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। বালির নিচ থেকে বেরুল সীউইড আর কলাপাতার মোটা স্তর, ওগুলোর ভেতর থেকে সাদাটে ধোঁয়া উঠতে লাগল। পরের স্তরে রয়েছে ফালি করা কাঠ আর পাম গাছের শুকনো ডাল, শেষ স্তরে আরেক প্রস্থ সীউইড় আর জ্বলন্ত কয়লা।

মুরগী, মাছ, আর খাসির মাংসের সাথে মিশে থাকা ব্রেড-ফ্রুট, কলা, আর মশলার গন্ধ উঠে এল নাকে, উল্লাসে হাততালি দিল সবাই।

'কার ভাগ্যে কে জানে, সমস্ত আয়োজন সফল হয়েছে,' ঘোষণা করল ব্যারনেস লিনা। 'খাবারের ভেতর একটু যদি বাতাস ঢুকত, পুড়ে কয়লা হয়ে যেত সব।'

শুরু হলো ভোজ, হাসি-আনন্দে মুখর সবাই, দামী শ্যাম্পেন আর হুইস্কি গ্লাসের পর গ্লাস চালান হয়ে যাচ্ছে চামড়া ঢাকা খাদে। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত রানা শুধু একবার গ্লাস ধরেছে, তাও সবটুকু হুইস্কি শেষ করেনি। শান্তভাবে অপেক্ষা করছে ও, আলোচনায় যোগ দিচ্ছে না। বার কয়েক কটাক্ষ হানলেও, সিনেটরের বউকে হতাশ করল ও, কোন রকম উৎসাহ দিল না।

আঘাতটা আসবে, জানে রানা। কখন, কোন দিক থেকে আসবে জানে না। আভাস আর লক্ষণের খোঁজে রয়েছে ও। এখানে নয়, জানে, লোকজনের সামনে কিছু ঘটবে না। আঘাতটা যখন আসবে, খলিফার আর সব কাজের মত সেটাও হবে দ্রুতগতি এবং মোক্ষম। হঠাৎ নিজের অহম বোধ উপলব্ধি করে বিস্মিত হলো রানা–নিজেকে নিয়ে অহঙ্কার না থাকলে এভাবে কেউ শত্রুর ফাঁদে নিরস্ত্র অবস্থায় পা দেয়? এটা শুধু বধ্যভূমি নয়, শত্রুর নির্বাচিত নিজস্ব বধ্যভূমি। ও জানে, আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় প্রথমে আঘাত হানা, সুযোগ পাওয়া গেলে আজ রাতেই। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই নিরাপদ, উপলব্ধি করল ও, এবং ঠিক তখনই দেখল

পাম গাছের নিচে ফেলা টেবিলের ওদিক থেকে ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে লিনা অটারম্যান, সামনে সুস্বাদু খাদ্যবস্তুর বিপুল সমারোহ। উত্তরে রানাও মৃদু হাসল, ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে সাড়া দিল লিনা।

নারী-পুরুষ সবাই কথা বলছে, বিড়বিড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করল ব্যারনেস, বিশেষভাবে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে আলো থেকে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

পঞ্চাশ পর্যন্ত গুনল রানা, তারপর পিছু নিল।

সৈকতে অপেক্ষা করছিল সে। চাঁদের আলোয় তার নগ্ন পিঠ আলোকিত হয়ে আছে, দূর-থেকে দেখতে পেল রানা। সৈকতের কিনারায় দাঁড়িয়ে লেগুনের পানির দিকে তাকিয়ে আছে ব্যারনেস। পিছনে পায়ের আওয়াজ পেল, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না। তার কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট শোনাল।

'তুমি আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি, রানা।'

'আমি খুশি হয়েছি তুমি আসতে বলায়।'

ব্যারনেসের গলার পিছনে আস্তে করে হাত রাখল রানা, খুলির নিচে চুলগুলো আঙুলের ডগায় সিল্কের মত লাগল। এখুনি ইচ্ছে করলে অ্যাকসিসটা খুঁজে নিতে পারে রানা। খুলির গোড়ায় ওটা একটা হালকা হাড়, ফাঁসির রশিতে কাউকে ঝুলিয়ে দেয়ার সময় জল্লাদ আশা করে মট্ করে ভেঙে যাবে ওটা। আঙুলের চাপ দিয়ে কাজটা করতে পারে রানা, ফাঁসের মতই দ্রুত হবে।

'ওরা থাকায় সত্যি আমি দুঃখিত,' বলল ব্যারনেস। 'তবে ওদের আমি বিদায় করে দিচ্ছি–হোক একটু দৃষ্টিকটু।' হাতটা নিজের কাঁধে তুলল সে, রানার হাত আস্তে করে ঘাড় থেকে নামাল। ছাড়ল না, আঙুলগুলো সমান করে নিজের গালে চেপে ধরল তালুটা। 'কাল খুব সকালে চলে যাবে ওরা, পল বার্না ওদের পাপেটেতি পৌঁছে দিয়ে আসবে। তারপর...তারপর গোটা লে নিউফ পোইন্তো আমাদের একার হয়ে যাবে–শুধু তোমার আর আমার–' হাসি নাকি কান্না চাপল লিনা ঠিক বোঝা গেল না, গলার আওয়াজ খসখসে, অস্ফুট শোনাল। '–অবশ্য ত্রিশ-বত্রিশ জন চাকর-বাকর থাকবে।'

তারমানে, আন্দাজ করে নিল রানা, সম্ভবত একটা দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণ হারাতে হবে ওকে। সাক্ষী থাকবে শুধু বেতনভুক বিশ্বস্ত কর্মচারীরা।

'এবার আমাদের ফিরতে হবে। দুর্ভাগ্য, আমার অতিথিরা সবাই প্রভাবশালী, বেশিক্ষণ ওদের এড়িয়ে থাকতে পারি না–কিন্তু রাত পোহাবে। রাতটা আমার জন্যে খুব দীর্ঘ হবে, রানা–তবে পোহাবে।' রানার বাহু-বন্ধনের ভেতর ঘুরল লিনা, আকস্মিক উন্মাদনার সাথে চুমো খেলো, দাঁতের সাথে পিষে গেল রানার ঠোঁট। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল লিনা, রানার কানের কাছে ফিসফিস করল, 'যা ঘটার তা তো ঘটবেই, রানা–কিন্তু ভুলো না মনের গহনে পরস্পরের জন্যে অমূল্য কিছু অনুভূতি ছিল আমাদের। সারা জীবনে এত মূল্যবান কিছু জোটেনি আমার কপালে।' মনে হলো ফুঁপিয়ে উঠল সে, কিন্তু আওয়াজটা এত তাড়াতাড়ি চাপা দিতে পারল যে সন্দেহ হলো শোনার ভুল। 'সেটা ওরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।'

পরমুহূর্তে প্রায় বিদ্যুৎবেগে রানার নাগালের বাইরে চলে গেল লিনা, সৈকত

ধরে আলোকিত সরু পথের দিকে ছুটছে। ধীর পায়ে তাকে অনুসরণ করল রানা, চিন্তায় নুয়ে আছে মাথাটা। লিনার শেষ কথাগুলো বিমূঢ় করে তুলেছে ওকে, ঠিক কি বোঝাতে চাইল ধরতে পারছে না। হঠাৎ ধারণা হলো, ঠিক এটাই চায় লিনা–ওকে বিমূঢ় আর দ্বিধাগ্রস্ত করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। শব্দটা ঠিক শোনেনি রানা, অনুভূতি দিয়ে টের পেল–পিছনে কিসের একটা নড়াচড়া। চোখের পলকে পাঁই করে আধ পাক ঘুরে গেল ও, কোমর বাঁকা করে ঝাঁপ দেয়ার ভঙ্গি করল।

লোকটা ওর দশ কদম পিছনে, বিড়ালের মত নিঃশব্দে এগিয়ে এল। পথের পাশে ঝোপের ডাল দুলছে দেখে রানা বুঝতে পারল ওখানে গা ঢাকা দিয়ে ছিল সে।

'গুড ইভনিং, মেজর রানা।'

ডাইভ দিতে যাচ্ছিল রানা, গলার আওয়াজ চিনতে পেরে সামলে নিল নিজেকে। ধীরে ধীরে সিধে হলো ও, যদিও হাত দুটো শরীরের দু'পাশে বাঁকা হয়ে থাকল। 'রিকো।' তারমানে নেকড়েগুলো ওদের কাছাকাছিই ছিল, মাত্র কয়েক ফিট দূরে–পাহারা দিচ্ছিল বিবি সাহেবাকে।

'আমি কি আপনাকে চমকে দিলাম?' দেহরক্ষীর মুখ দেখতে না পেলেও তার কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ একটু ব্যঙ্গ রয়েছে টের পেল রানা। সন্দেহ যদিও একটু থেকেও থাকে, এখন তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। রোমান্টিক কোন মুহূর্তে শুধু খলিফারই দরকার হতে পারে বডি গার্ড।

নিঃসন্দেহ হলো রানা, কাল সূর্য ডোবার আগে হয় সে, নাহয় লিনা অটারম্যান, দু'জনের একজন মারা যাবে।

আট

বাংলোয় ফেরার আগে আশপাশের ঝোপ আর গাছগুলো পরীক্ষা করল রানা, সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না। ঘরে ফিরে দেখল, বিছানাটা তৈরি করা হয়েছে, পরিষ্কার করা হয়েছে শেভিং গিয়্যার, টুকিটাকি জিনিসগুলো সুন্দর ভাবে গুছিয়ে রাখা হয়েছে টেবিলে। ছেড়ে যাওয়া কাপড়গুলো পাওয়া গেল না, সম্ভবত ধোয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নতুন কিছু শার্ট আর ট্রাউজার পেল রানা, সদ্য ইস্ত্রি করা। কাজেই জোর করে বলা যায় না, ওর অন্যান্য জিনিসে হাত দেয়া হয়নি। ধরে নিতে হবে বেশ ভালভাবেই সার্চ করা হয়েছে গোটা বাংলো।

দরজা-জানালার তালাগুলো যথেষ্ট মজবুত নয়, সম্ভবত অনেক দিন ব্যবহার না করায় মরচে ধরে গেছে। ব্যবহার করার দরকার পড়েনি, কারণ দ্বীপে চোর-ডাকাত বা সাপ-বিছে আছে বলে শোনা যায়নি–এখনকার কথা অবশ্য আলাদা। কাজেই চেয়ার টেবিলগুলো দরজার সামনে মেঝেতে এমনভাবে সাজাল রানা, ঘরে কেউ ঢুকলে অন্ধকারে যাতে ধাক্কা খেতে হয়। বিছানাটা খানিক এলোমেলো করল ও, চাদর ঢাকা বালিশগুলো এমনভাবে সাজাল দেখে মনে হবে কেউ ঘুমাচ্ছে।

একটা কম্বল নিয়ে প্রাইভেট লাউঞ্জে চলে এল ও, সোফায় শোবে।

অতিথিরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবার আগে আক্রমণ আসবে বলে মনে হয় না, তবে সাবধানের মার নেই।

ভাল ঘুম হলো না। একবার ঘুম ভাঙল পাম গাছের মরা ডাল খসে পড়ার শব্দে। আরেক বার মুখে চাঁদের আলো পড়ায়। ঠিক ভোরের আগে আবার ঘুম পেল ওর, অর্থহীন আর উদ্ভট স্বপ্ন দেখল, চোখ মেলার পর আতঙ্কে বিকৃত লিনার মুখ ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারল না।

সূর্য তখনও ওঠেনি, সৈকতে চলে এল রানা। রীফ ছাড়িয়ে এক মাইল পর্যন্ত সাঁতার কাটল, স্রোতের সাথে লড়াই করে ফিরে এল তীরে। সম্পূর্ণ সতর্ক আর প্রস্তুত মনে হলো নিজেকে ওর। কোন্ দিক থেকে কি আসবে আসুক, সে-ও তৈরি।

বিদায়ী অতিথিদের জন্যে ফেয়ারওয়েল ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাতের জোয়ারে সৈকতের বালি মসৃণ হয়ে উঠেছে, রঙিন ছাতার নিচে বসে লরেন্ত পেরিয়ার শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হলো, নিউজিল্যান্ড থেকে এসেছে হট-হাউস স্ট্রবেরি। ব্যারনেস লিনার পরনে ছোট্ট সবুজ প্যান্ট, সুগঠিত পা আর হাঁটু সহ প্রায় সবটুকু উরু দেখা গেল, উর্ধ্বাঙ্গে ম্যাচ করা টিউব আকৃতির বক্ষ-বন্ধনী–তবে তলপেট, কাঁধ আর পিঠ উদোম। সযত্নলালিত একজন অ্যাথলেটের শরীর, মহান কোন শিল্পীর অবদান।

আজ একটু যেন বেশি হাসাহাসি করছে লিনা, এবং কয়েকবার সময়ের আগেই হেসে ফেলল, যেন আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল হাসতে হবে। রানার দিকে যতবার তাকাল, প্রতিবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল চেহারা। তার হাবভাব দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক, কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিতে পেরে উল্লাস বোধ করছে সে, এখন শুধু কাজটা করার জন্যে পুলকের সাথে অপেক্ষা করছে।

কাঠের চাকা লাগানো গাড়ি করে এয়ারপোর্টে এল ওরা। গরু না থাকায় ওটাকে গরুর গাড়ি বলা যাবে না, গরুর বদলে ছোট একটা এঞ্জিন চালাচ্ছে ওটাকে। সিনেটর লোকটা প্রচুর শ্যাম্পেন খেয়ে মহা ফূর্তিতে আছে, বিদায়ের মুহূর্তে আদর করে আলিঙ্গন করার চেষ্টা করল, কিন্তু কৌশলে তাকে ফাঁকি দিয়ে সরে দাঁড়াল লিনা অটারম্যান, পিঠে ধাক্কা দিয়ে অন্যান্য আরোহীদের সাথে তুলে দিল ট্রাই-আইল্যান্ডারে।

প্লেনটা আকাশে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত সেদিকে তাকিয়ে থাকল লিনা, তারপর ফিরল রানার দিকে। 'কাল রাতে ভাল ঘুমাতে পারিনি আমি,' কথাটা বলে চুমো খেলো সে।

'আমিও,' মুখে বলল রানা, মনে মনে বলল, 'বাজি ধরে বলতে পারি, একই কারণে।'

'বিশেষ একটা প্রোগ্রাম করেছি,' বলল লিনা। 'শুধু তোমার আর আমার জন্যে। এসো, এসো–আমি আর এক মিনিটও দেরি করতে রাজি নই।'

জেটির মাথায় লিনার পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা ক্রীশ-ক্রাফট ফিশারম্যান নিয়ে অপেক্ষা করছিল হেড বোটম্যান। অদ্ভুত সুন্দর একটা বোট, রঙে কোথাও এক

বিন্দু ময়লা নেই, স্টেনলেস স্টীলের ফিটিংস পালিশ করে ঝকঝকে আয়না করে তোলা হয়েছে।

ব্যারনেসকে দেখে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল বোটম্যান। 'সব ট্যাংক ভর্তি, মাই ব্যারনেস। স্কুবা বটল চার্জ করা হয়েছে, লাইট রডগুলোও টোপ সহ তৈরি। ওয়াটার-স্কি পাবেন মেইন র‍্যাকে। শেফ নিজে এসে আইস বক্স চেক করে গেছে।'

কিন্তু তার গাল ভরা হাসি মিলিয়ে গেল যখন শুনল ব্যারনেস একাই বোট নিয়ে রওনা হবে।

'কি, আমার উপর তোমার বিশ্বাস নেই?' হেসে উঠল লিনা।

'না-না, তা কেন, মাই ব্যারনেস…' অপ্রতিভ বোধ করল বোটম্যান।' রশিগুলো নিজের হাতে খুলল সে, জেটি আর বোটের মাঝখানে ফাঁকটা বড় হতে শুরু করল, শেষবারের মত চেঁচিয়ে কিছু উপদেশ দিল ব্যারনেসকে।

'ভেবো না, বহাল তবিয়তে ফিরে আসব,' রানার দিকে না তাকিয়ে জেটিতে দাঁড়ানো বোটম্যানকে বলল লিনা, সকৌতুকে হাসছে। তারপর দুটো ডিজেল এঞ্জিনই চালু করল সে, ধীরে ধীরে প্রটল খুলল। প্লেনের মত ছুটল ক্রীশ-ক্রাফট, পানির গা ছুঁলো কি ছুঁলো না। বাঁক নিয়ে চ্যানেল মার্কারগুলোর মাঝখানে ঢুকল বোট, রীফের ভেতর দিয়ে প্যাসেজ তৈরি করে এগোবে। তারপরই খোলা প্যাসিফিক।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'রীফের পিছনে আশ্চর্য একটা জিনিস আছে। একশো ফিট পানির নিচে পুরানো একটা জাপানী এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার। চুয়াল্লিশ সালে আমেরিকানরা ডুবিয়ে দিয়েছিল। স্কুবা ডাইভিঙের জন্যে ভারি সুন্দর স্পট। প্রথমে আমরা ওখানে যাব…'

কিভাবে? আন্দাজ করার চেষ্টা করল রানা। হয়তো একটা স্কুবা বটলে খানিকটা কার্বন মনোঅক্সাইড গ্যাস ভরা আছে। ডিজেল জেনারেটরের এগজস্টে একটা হোস লাগিয়ে সহজেই কাজটা করা যায়—একটা চারকোল ফিল্টারের ভেতর দিয়ে এগজস্ট গ্যাসকে আসতে দিলে অব্যবহৃত হাইড্রোকার্বনের স্বাদ আর গন্ধ দূর হয়ে যাবে, বাকি কার্বন মনোঅক্সাইড গ্যাস যেটা থেকে যাবে তার অস্তিত্ব ফাঁস হবে না। প্রথমে এই গ্যাস ত্রিশ অ্যাটমোসফেয়ার প্রেশার দিয়ে ভরতে হবে বোতলে, তারপর অপারেটিং প্রেশার একশো দশ অ্যাটমোসফেয়ারের সাহায্যে ক্লিয়ার অক্সিজেন ভরতে হবে। কিছু টের পাবে না ভিকটিম, ঘুমিয়ে পড়বে সে। তারপর মুখ থেকে মাউথপীস খসে পড়ার পর বাকি গ্যাস আপনা থেকেই বেরিয়ে যাবে বোতল থেকে, কোন প্রমাণই থাকবে না।

'তারপর আমরা ইল দে উইসিউ যাব। আমার স্বামী মিডো অটারম্যান কড়া নির্দেশ দিয়েছিল, দ্বীপবাসীরা কেউ ডিম চুরি করতে পারবে না—তার নির্দেশ এখনও বহাল আছে, সবাই মেনেও চলে—ফলে সাউদার্ন প্যাসিফিকের সবচেয়ে বড় পাখির কলোনি পেয়ে গেছি আমরা। টার্ন, নডি, ফ্রিগেট—কত রকমের যে পাখি।'

সম্ভবত একটা স্পিয়ার গান। সরাসরি, অব্যর্থ, এবং নিশ্চিত। অল্প রেঞ্জে, এই

ফিট দুয়েক দূর থেকে, এমনকি পানির তলাতে থাকলেও স্পিয়ার অ্যারো মানুষের ধড় ভেদ করে যাবে–শোল্ডার ব্লেডের মাঝখান দিয়ে ঢুকে বেরুবে বুকের পাঁজর ভেঙে।

'–পরে আমরা ওয়াটার-স্কির জন্যে তৈরি হব...'

স্কি নিয়ে পানিতে থাকবে রানা, অপেক্ষা করবে কখন টান পড়ে লাইনে, এই সময় শক্তিশালী জোড়া ইঞ্জিন নিয়ে যদি ওর দিকে তেড়ে আসে বোট, কি করার থাকবে ওর? শীলবডি যদি বা ওকে থেঁতলাতে না-ও পারে, ছুরি দিয়ে রুটি কাটার মত নিখুঁতভাবে ফালি করবে জোড়া স্ক্রু, প্রতি মিনিটে পাঁচশো বার ঘুরবে ওগুলো।

এ-সব আন্দাজ করতে করতে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল রানা, বুঝল আসলে কি করবে খলিফা সেটা জানার কোন উপায় নেই। জানবে, কিন্তু তখন হয়তো অনেক দেরি হয়ে গেছে। ক্রীশ-ক্রাফটের লম্বা ফ্লাইং ব্রিজে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। প্রধান দ্বীপটা এরই মধ্যে অনেক নিচু হয়ে গেছে, তারমানে অনেক দূর চলে এসেছে ওরা। বিনকিউলার না থাকলে কেউ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।

পাশে দাঁড়িয়ে চুল থেকে একটা রিবন খুলল লিনা, কালো স্কার্ফটা ঢিল করে দিল একটু, তার মাথার পিছনে পতাকার মত উড়তে লাগল সেটা। 'এসো, সারা জীবন ধরে এই করি আমরা,' তীব্র বাতাস আর কর্কশ এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তার গলা।

'মায়াবতী রমণীর মুঠোয় বন্দী ক্রীতদাস,' পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিল রানা, পরমুহূর্তে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল খুন করার কঠিন ট্রেনিং দেয়া হয়েছে খলিফাকে, তার হাসি আর সৌন্দর্য দেখে মুহূর্তের জন্যেও অসতর্ক হওয়া চলবে না। কোন অবস্থাতেই খলিফাকে প্রথম আঘাত হানার সুযোগ দেবে না ও।

আবার ঘাড় ফিরিয়ে তীরের দিকে তাকাল রানা। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে ব্যাপারটা ঘটতে পারে, ভাবল ও। এমনভাবে নড়ল, যেন কিনারা দিয়ে নিচে উঁকি দিতে যাচ্ছে। লিনার দৃষ্টি সীমার ভেতরই থাকল, কিন্তু সরে এল একটু পিছনে। বাধ্য হয়ে ওর দিকে শরীরটা একটু ঘোরাতে হলো লিনাকে, এখনও হাসছে সে।

'ঠিক এ-ধরনের স্রোতেই অ্যামবারজ্যাক পাওয়া যায় চ্যানেলে। শেফকে কথা দিয়েছি, তার জন্যে জ্যান্ত একজোড়া মাছ সাথে করে নিয়ে যাব,' ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলল ব্যারনেস লিনা। 'যাবে না, শেরি, নিচে গিয়ে রডগুলো রেডি করবে না? টোপগুলো পাবে তুমি ফরওয়ার্ড স্টারবোর্ড লকারে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে।'

'বাঁক নিয়ে চ্যানেলে ঢোকার সময় স্পীড একেবারে কমিয়ে দেব, ঠিক তখন লাইন ফেলবে তুমি, কেমন?'

'জো হুকুম।' তারপর কিছু না ভেবেই বলে বসল রানা, 'কিন্তু তার আগে চুমো খাও আমাকে।'

পরিবেশনের ভঙ্গিতে রানার ঠোঁটের সামনে মুখ তুলে ধরল ব্যারনেস লিনা, আর রানা ভাবল কেন বললাম আমি কথাটা? লিনার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার

জন্যে নয়। সম্ভবত অভয় দেয়ার জন্যে, বুঝতে দিতে চায় না, সে তাকে খুন করার আগে ও-ই তাকে খুন করতে যাচ্ছে। অথচ তবু দু'জোড়া ঠোঁট এক হতে গভীর একটা বেদনা অনুভব করল রানা, এই ক'দিন যেটাকে মাথাচাড়া দিতে দেয়নি। ওর মুখের নিচে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হলো ব্যারনেসের মুখ–ভেজা ভেজা, উষ্ণ, কোমল–রানার মনে হলো এখনই বোধহয় ভেঙে যাবে বুকটা। নিমেষের জন্যে একটা সন্দেহ দেখা দিল, কাজটা করার আগে নিজেই না মারা যায়।

লিনার কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়াল রানা, তার ঘাড় স্পর্শ করল। লিনার শরীর ওর শরীরে বাধা পেয়ে সমতল হলো। খুলির নিচে জায়গামত পৌঁছুল রানার আঙুল। দুটো মুখ এক হয়ে আছে। এক সেকেন্ড পেরোল। আরেক সেকেন্ড কাটল। তারপরই নরমভাবে পিছিয়ে এসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল লিনা। 'আরে, কি করতে চাও তুমি?' উত্তেজিত, অস্ফুট কণ্ঠস্বর। একটু একটু হাঁপাচ্ছে। 'তোমার আদরে নেশা হয়ে যাক আমার, আর রীফে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো হয়ে যাক বোট?'

খালি হাতে কাজটা করতে পারেনি রানা। না, এভাবে পারবে না ও। ঝট করে সারতে হবে, চোখের পলকে। যত দেরি করবে ও, ততই ওর জন্যে ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে। মনে দ্বিধা এসে গেছে, জীবনে এই বোধহয় প্রথম।

'কি হলো, যাও।' ঠাট্টাচ্ছলে রানার বুকে মৃদু ঘুসি মারল লিনা। 'এ-সবের জন্যে অনেক সময় পাব আমরা–প্রতিটি মুহূর্ত তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করব...'

দুর্বল মনে হলো নিজেকে, খালি হাতে পারেনি, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা। ইস্পাতের মই বেয়ে ককপিটে নামার সময় চমকে উঠল ও, অকস্মাৎ ধরা পড়েছে ব্যাপারটা। দীর্ঘ চুম্বনের সময়টাতে লিনার ডান হাতটা আদর করার ছলে ওর ঠিক চিবুকের নিচে গলা আঁকড়ে ছিল। ওর হাত লিনার খুলির নিচে চাপ দিতে শুরু করলেই লিনা এক ঝটকায় ওর ল্যারিংস ভেঙে দিতে পারত।

ককপিটে নেমে এল রানা, আরেকটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। লিনার অপর হাতটা ওর গায়ের সাথে সেঁটে ছিল, পাঁজরের নিচে মৃদু চাপড় দিয়ে আদর করছিল। ওই হাতটা বিদ্যুদ্বেগে ওপর আর ভেতর দিকে আঘাত করতে পারত, সাথে সাথে ছিঁড়ে যেত পেটের ভেতর ডায়াফ্রাম। তারমানে সারাক্ষণ তৈরি ছিল খলিফা, ছিল ওর চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক। ওর আলিঙ্গনের ভেতর ছিল সে, প্রতিরক্ষা ব্যূহের ভেতর ঢুকে পড়েছিল, অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে–। মৃত্যুর কতটা কাছাকাছি চলে গিয়েছিল উপলব্ধি করে শিউরে উঠল রানা।

পরেরবার ইতস্তত করা চলবে না।

কাজ করছে রানা, সেই সাথে দ্রুত মাথা ঘামাচ্ছে। সীট লকারের ঢাকনি তুলল ও। ভেতরের ট্রে-তে ফিশিং গিয়ার রয়েছে। তামা আর ইস্পাতের সুইভেল,বিভিন্ন আকারের পঞ্চাশটা। সব ধরনের সিঙ্কার রয়েছে, পানিতে বা ডলায় ব্যবহারযোগ্য। প্লাস্টিক, পালক, আর উজ্জ্বল ধাতুর তৈরি ফাতনা রয়েছে প্রচুর। আছে দৈত্যাকার বিল ফিশের জন্যে হুক, আর আছে আলাদা কমপার্টমেন্টের সাইড ট্রে-তে একটা বেইট নাইফ।

পঞ্চাশ ডলারের নিনজা ছুরি, চৌকো ঘর আঁকা বহুরঙা হাতল। সাত ইঞ্চি

লম্বা ইস্পাতের ব্লেড, বাঁটের কাছে তিন ইঞ্চি চওড়া, ক্রমশ সরু হতে হতে সুঁচ হয়ে গেছে ডগাটা। এটা নির্দয় লোকের অস্ত্র। বিজ্ঞাপনে বলা হয় এই ছুরি দিয়ে আপনি ওক গাছের শুকনো কাণ্ডও টুকরো করতে পারবেন। মাখনের ভেতর যেমন অনায়াসে ছুরি ঢোকে, এটাও তেমনি মানুষের মাংসে ঢুকে হাড় ভেদ করে যাবে অনায়াসে।

হাতলটা বাগিয়ে ধরে কোপ মারল রানা, তারপর স্যাঁৎ করে ওপর দিকে তুলল, বাতাসে হিস করে উঠল ফলা। চিরে গিয়ে সূক্ষ্ম একটা রেখা ফুটল আঙুলের ডগায়, ব্যস্তভাবে ধার পরীক্ষা করতে যাওয়ার খেসারত।

ক্যানভাস স্নীকার খুলে ফেলল ও, ডেকে যাতে রাবার সোল কোন শব্দ না করে। পরনে এখন শুধু গেঞ্জি আর বক্সার-টাইপ সুইমিং ট্রাঙ্কস।

খালি পায়ে মইয়ের তিনটে ধাপ টপকে থামল রানা, ধীরে ধীরে ফ্লাইং ব্রিজের লেভেলের ওপর চোখ তুলল।

ক্রীশ-ক্রাফটের কন্ট্রোল সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিনা অটারম্যান, বিরাট বোটটাকে চ্যানেলের মুখে নিয়ে আসছে সে, গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে সামনে।

স্কার্ফ খুলে ফেলেছে লিনা, চুল উড়ছে বাতাসে। তার উদোম পিছনটা রানার দিকে ফেরানো—গভীর একটা খাদের ভেতর শিরদাঁড়া, খাদের দু'পাশে উঁচু হয়ে আছে মসৃণ শক্ত পেশী।

প্যান্টের একটা পায়া সামান্য একটু উঁচু হয়ে থাকায় আধখানা চাঁদের মত বেরিয়ে আছে সাদা সুডৌল নিতম্বের নিচের অংশ। নৃত্যপটিয়সীর মত সুঠাম পা সম্পূর্ণ অনাবৃত, পাতার ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে সে, বো-র ওপর দিয়ে সামনেটা দেখার চেষ্টা করছে।

ব্রিজ থেকে চলে গিয়েছিল রানা বারো সেকেন্ডও হয়নি, এরই মধ্যে সম্পূর্ণ অসতর্ক হয়ে উঠেছে ব্যারনেস লিনা।

একই ভুল রানা দ্বিতীয়বার করল না। ক্ষিপ্র একটা ঝাঁকির সাথে ধাপ থেকে ব্রিজে উঠে এল ও, কোন শব্দ যদি হয়েও থাকে, এঞ্জিনের গর্জনে তা চাপা পড়ে গেছে।

সুযোগ থাকলে হাড় এড়িয়ে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়, কারণ হাড়ে লেগে ছুরির ডগা দিকভ্রান্ত হতে পারে।

লক্ষ্যস্থল ঠিক করল রানা, পিঠটা যেখানে সবচেয়ে সরু—কিডনির লেভেলে, পাঁজরের খাঁচার ভেতর গহ্বরটাকে আড়াল করার জন্যে ওখানে কোন হাড় নেই। সম্ভাব্য সবটুকু শক্তি দিয়ে ঘ্যাঁচ করে এক ধাক্কায় ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে ছুরি, একেবারে হাতলের কিনারা পর্যন্ত, তা নাহলে ভেতরে ঢোকার পরও একপাশে সরে যেতে পারে ফলা।

তাই করল রানা, সর্ব শক্তি দিয়ে চালাল ছুরিটা।

ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার জন্যে ছুরি চালিয়ে বসার পর, উপলব্ধি করল রানা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে প্রতিপক্ষ। ক্রীশ-ক্রাফটের আয়নার মত ঝকঝকে কন্ট্রোল প্যানেলে পরিষ্কার ফুটে আছে রানার প্রতিচ্ছবি। ও

ব্রিজে ওঠার পর থেকেই ওর দিকে একইভাবে তাকিয়ে আছে লিনা।

কন্ট্রোল প্যানেলে লিনার মুখ সবটুকু নয়, শুধু তার বিস্ফারিত চোখ জোড়া দেখতে পেল রানা। ছুরির ফলা মাংসের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছে তখন। মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল রানার। লিনার নড়ে ওঠা দেখতেই পেল না।

হাত সহ ডান পাশ বেয়ে নেমে এল তীব্র ব্যথাটা, অসাড় একটা অনুভূতির সাথে চোখে অন্ধকার দেখল রানা। ব্যথার উৎসে ওর কলার বোন যেখানে বাহু ছুঁয়েছে তার পাশের গর্তটা। একই সময়ে ওর ডানহাতের কনুইয়ের নিচে কিসের যেন একটা প্রচণ্ড বাড়ি পড়ল, দিক বদলাল ছুরির ফলা, লিনার নিতম্ব থেকে এক ইঞ্চি দূর দিয়ে চলে গেল সেটা।

লিনার সামনে কন্ট্রোল প্যানেল, ছুঁচাল ফলার ডগা কয়েকটা নব আর ডায়াল চুরমার করে দিল। রানার অসাড় আঙুল হাতলটা ধরে রাখতে পারল না, লাফ দিয়ে মুঠো থেকে বেরিয়ে এসে টং করে স্টীল হ্যান্ড-রেইলে ধাক্কা খেলো, ব্রিজের কিনারা ঘেঁষে ফিরতি পথে ছিটকে পড়ল সেটা, রানার পিছনে ককপিটের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওর দিকে না ফিরেই আঘাত করেছে লিনা, কন্ট্রোল প্যানেলে ওর প্রতিচ্ছবি দেখে কাঁধের প্রেশার পয়েন্টে লক্ষ্যস্থির করেছিল।

ব্যথায় পঙ্গু হয়ে গেছে রানা, অপর হাতটা ব্যথার উৎস খামচে ধরতে চাইল। কিন্তু না, বাঁচার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করল বাঁ হাতটাকে–আড়াল করার ভঙ্গিতে ঘাড়ের পাশে উঠে এল সেটা।

আবার পিছন দিকে আঘাত করল ব্যারনেস, সাদা হাত আলোর একটা প্রবাহের মত ঝলসে উঠল চোখের সামনে, ঘাড়ের কাছে তোলা বাঁ হাতের কব্জির একটু নিচে লাগল, মনে হলো গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে ক্রিকেটের ব্যাট চালিয়েছে।

যেখানে লক্ষ্যস্থির করা হয়েছিল, ঘাড়ে, লাগলে সাথে সাথে মারা যেত রানা। পরিবর্তে অপর হাতটাও অবশ হয়ে গেল, এখন অনায়াসে ঘুরে গিয়ে ওর দিকে ফিরছে লিনা–রানার মত সে-ও আসুরিক শক্তির অধিকারিণী, সমান ক্ষিপ্র, ভারসাম্য রক্ষায় কেউ কারও চেয়ে কম নয়।

রানা জানে, লিনার কাছাকাছি থাকতে হবে ওকে–ভার, আকার, আর শক্তি দিয়ে পরাস্ত করতে হবে শত্রুকে। কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত অবশ ডান হাতের আঙুল বাঁকা করে লিনার মুখ খামচে ধরতে গেল ও, ইতিমধ্যে ঘুরে গেছে লিনা। অনায়াসে হাতটাকে বাধা দিল সে, কয়েক সেকেন্ড হাতাহাতি হলো, তারপর ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। তার বুকের কাছ থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে নিয়েছে রানা।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।

হাড়ের মত সাদা হয়ে গেছে লিনার মুখ; দাঁতের সাথে সেঁটে আছে ঠোঁট, নাকের ফুটো কাঁপছে। মেয়ে বা মানুষ বলে মনে হলো না, যেন হিংস্র একটা বাঘিনী। আবারও সে প্রথম আঘাত হানল। লম্বা চুল রানার মুখের সামনে ঘুরপাক খেলো, চাবুকের মত বাড়ি মারল চোখে। রানার নাক, কানের নিচে, চোয়ালে,

কপালের পাশে অবিরাম ঘুসি চালাল সে, হাতের কিনারা দিয়ে ঘাড় লক্ষ্য করে কোপ মারল–মেরেই প্রতিবার লাফ দিয়ে সরে গেল, পরমুহূর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল, বার বার ঝাঁকি খেলো উন্মুক্ত স্তন জোড়া।

বিস্ময়ের সাথে উপলব্ধি করল রানা, একাই পেটাচ্ছে লিনা। এ পর্যন্ত শুধু ঘুসিগুলো ঠেকাতে পেরেছে ও, কখনও হাত তুলে থামিয়েছে, কখনও শক্ত কাঁধটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে। কিন্তু খালি পায়ের লাথিগুলো প্রত্যেকটা ওর উরু আর পেটে লেগেছে, ভাঁজ করা হাঁটুর গুঁতো একটাও লক্ষ্যচ্যুত হয়নি, বারবার প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে পেলভিসের হাড়ে চিড় ধরার কথা।

ধীরে ধীরে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে, একটু একটু করে দুর্বল হয়ে পড়ছে রানা। ভাগ্য, উপস্থিত বুদ্ধি, আর বাঁচার সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে এতক্ষণ বাধা দিয়েছে ও, এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে নির্ঘাত ওকে ঘাতক ট্রাকের মত চাপা দেবে লিনা। একটা মুহূর্ত স্থির থাকছে না সে, হাত আর পা–সমানে চালাচ্ছে দুটো, ভারসাম্য ফিরে পাবার কোন সুযোগই দেবে না রানাকে।

এখন পর্যন্ত রানা তাকে আঘাত করতে পারেনি, কনুই আর আঙুল দিয়ে দু'একবার চেষ্টা করলেও স্পর্শ করা সম্ভব হয়নি। গায়ে জোর থাকলে কি হবে, জোর খাটাবার অস্ত্র হাত দুটো এখনও প্রায় অসাড় হয়ে আছে। একটা অস্ত্র দরকার ওর, একটু দম ফেলার ফুরসত দরকার। পিছনে ককপিটে পড়েছে ছুরিটা, বারবার সেটার কথা ভাবছে রানা।

আবার হামলা করল লিনা, পিছিয়ে এসে তাকে সামনে বাড়তে দিল রানা। কোমরে ব্রিজ রেইল ঠেকল। একটা ঘুসি আসছিল, গলার নরম অংশে লক্ষ্যস্থির করা হয়েছে–হাতের কিনারায় লেগে আরেক দিকে সরে গেল, থেঁতলে গেল নাকটা। চোখ থেকে হড়হড় করে পানি বেরিয়ে এল, সেই সাথে রক্ত। ঠোঁটের ভেতর দিকে দাঁত বসে গিয়ে কেটে গেছে, গলার ভেতর উষ্ণ, নোনা স্বাদ পেল রানা। নাকে ঘুসি খেয়ে, ঘুসির ধাক্কার সাথেই, পিছন দিকে হেলে পড়ল ও, কোমরে ঠেকে থাকা রেইলটা পিছন দিকে ডিগবাজি খেতে সাহায্য করল ওকে। শূন্যে মাত্র একবার ডিগবাজি খেলো ও, পরমুহূর্তে ককপিটের ডেকে দু'পা দিয়ে পড়ল, ব্রিজ থেকে দশ ফিট নিচে। চোখ পিট পিট করে পানি সরাল ও, রক্ত চলাচল চালু করার জন্যে ঝাঁকাতে লাগল হাত দুটো। তারপর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে দেখতে পেল ছুরিটা। ককপিট থেকে ছিটকে স্টার্নের একটা নর্দমায় পড়েছে ওটা। সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা।

ওকে ডাইভ দিতে দেখে বিস্মিত হলো লিনা, ওর নগ্ন ঘাড়ে মরণ আঘাত হানার প্রস্তুতি শেষ করেছিল মাত্র। লম্বা দুটো লাফ দিয়ে মইয়ের মাথায় পৌঁছে গেল সে, নিচে ঝাঁপ দেয়ার জন্যে টান পড়ল পেশীতে, ঠিক তখন তার দশ ফিট নিচে কুৎসিত নিনজা ছুরির নাগাল পাবার চেষ্টা করছে রানা।

অতটা ওপর থেকে খালি পায়ে রানার পিঠের ওপর পড়ল লিনা, সামনের দিকে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো রানা, বাল্কহেডের সাথে ধাক্কা খেয়ে খুলিটা যেন গুঁড়িয়ে গেল ওর। চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে এল, অনুভূতি হারিয়ে ফেলছে। আর কোন আশা নেই জানে রানা, তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে সবটুকু শক্তি এক করে গড়ান

দিল একটা, ভাঁজ করে বুকের ওপর তুলল হাঁটু জোড়া। লিনা যে মরণ আঘাত হানতে চাইছে, টের পেয়ে গেছে ও।

পরবর্তী লাথিটা হাঁটুর নিচে লম্বা হাড়ে লাগল, তার আগেই নর্দমায় হাত চলে গেছে ওর। হাতটা অবশ বলেই ছুরির হাতল অসম্ভব মোটা আর কর্কশ ঠেকল আঙুলে, খপ্ করে সেটা মুঠোর মধ্যে নিয়েই ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত ভাঁজ খুলে ডেকের ওপর লম্বা হয়ে গেল শরীরটা। জোড়া পা এক করে বিদ্যুৎবেগে লাথি চালিয়েছে রানা। লক্ষ্যস্থির করে মারেনি, বেপরোয়া অন্ধের মত মেরেছে।

এই প্রথম একটা আঘাত করতে পারল রানা। আঘাতটা লাগল ঠিক যখন আবার ওর দিকে লাফ দিয়ে বসেছে লিনা। তার পাঁজরের নিচে পেটে লাগল জোড়া পা। ওখানে তার মাংস যদি নরম হত, বোটে রানার প্রতিপক্ষ কেউ থাকত না। কিন্তু সমতল শক্ত পেশী ধাক্কাটা সামলে নিল। তবে পিছন দিকে ছিটকে পড়ল ব্যারনেস, হুস করে বেরিয়ে এল ফুসফুসের বাতাস, অসহ্য ব্যথায় ভাঁজ হয়ে গেল শরীরটা।

রানা বুঝল, এই ওর শেষ সুযোগ। কিন্তু শরীরটা কাতর হয়ে পড়েছে, চোখের সামনে থেকে অন্ধকার দূর হয়নি এখনও, কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথা তোলার শক্তিও যেন অবশিষ্ট নেই। মুখের ভেতর রক্ত, চোখের কোণ গড়িয়ে আবার পানি নামছে।

কিভাবে সম্ভব হলো বলতে পারবে না রানা, সম্ভবত প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির কল্যাণে, দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারল ও, হাতে ছুরি। ফলাটা ডান উরুর পিছনে আড়াল করে রেখেছে, ব্যবহার করার আগ পর্যন্ত সংরক্ষিত অবস্থায় রাখতে চায়। বাঁ হাতটাকে ঢালের মত তুলল সামনে, তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে এগোল। জানে, খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে কাজটা। বেশিক্ষণ দম পাবে না ও। এটাই হবে ওর শেষ চেষ্টা।

কিন্তু লিনার হাতেও একটা অস্ত্র চলে এল। যন্ত্রণায় বিকৃত চেহারা নিয়েও ঝড়ের বেগে নড়ে উঠল ব্যারনেস, কেবিনে ঢোকার মুখে একটা র‍্যাকে ক্লিপ দিয়ে আটকানো বোট হুক ছিল, খুলে হাতে নিল সেটা। অ্যাশ কাঠের আট ফিট লম্বা ভারী লগি, কুৎসিতদর্শন মাথাটা তামার পাত দিয়ে মোড়া। শূন্যে তুলে রানার মাথার দিকে নামিয়ে আনল লিনা সেটা, খুব দ্রুত নয়। ওকে শুধু দূরে ঠেকিয়ে রাখতে চাইছে সে আপাতত, এই সুযোগে বাতাস ভরে নিচ্ছে খালি ফুসফুসে।

দ্রুত শক্তি ফিরে পাচ্ছে লিনা, রানার চেয়ে অনেক দ্রুত। তার চোখে নতুন করে ঠাণ্ডা খুনের আলো জ্বলে উঠতে দেখল রানা। আবার লড়াই বেধে গেলে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না জানে ও, সমস্ত ঝুঁকি আর শক্তি নিয়ে শেষ চেষ্টা এখুনি করতে হবে ওকে।

ছুরিটা ছুঁড়ল রানা, লিনার মাথা লক্ষ্য করে। নিক্ষেপযোগ্য অস্ত্র হিসেবে তৈরি করা হয়নি নিনজাটাকে, নির্দিষ্ট পথে না থেকে ডিগবাজি খেয়ে ছুটল সেটা, বোঝাই গেল লিনার মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তবে আত্মরক্ষার জন্যে বোট হুক সহ হাত দুটো মাথার ওপর তুলে সরে যাবার চেষ্টা করল লিনা। মুহূর্তের জন্যে তার মনোযোগ অন্য দিকে সরে গেল, আর সেটাই দরকার ছিল রানার।

ছুরি ছোঁড়ার পর শরীরের ঝাঁকিটা কাজে লাগাল রানা, স্যাঁৎ করে বোট-হুকের তলায় চলে এল ও, কাঁধ দিয়ে আঘাত করল লিনাকে, তার হাত দুটো যখন মাথার ওপর তোলা।

দু'জনেই কেবিন বাল্কহেডের ওপর ছিটকে গিয়ে পড়ল, মরিয়া হয়ে মুঠোর ভেতর লিনার কিছু একটা ধরতে চেষ্টা করল রানা। মখমলের মত পিচ্ছিল এক গোছা চুল পেয়ে ভেতরে আঙুল ঢোকাল ও।

আহত পশুর মত বেপরোয়া শক্তিতে ধস্তাধস্তি শুরু করল লিনা। শরীরের সমস্ত জোর দিয়েও তাকে নিচে চেপে রাখা অসম্ভব বলে মনে হলো। এলোপাতাড়ি ঘুসি খেলো রানা, থেঁতলে গেল সারা মুখ, নখের আঁচড়ে ছিঁড়ে গেল গলার চামড়া। তবু মাথাটা লিনাকে তুলতে দিল না ও, হাতে পেঁচানো চুলের গোছা ছাড়ল না। শুধু শরীরের ভার চাপিয়ে তাকে এই প্রথম কোণঠাসা করে ফেলেছে রানা।

বুকের নিচে লিনাকে সিধে করল ও, দুটো শরীরের মাঝখানে একটা হাত ঢুকিয়ে রেখেছে। অপর হাতটা এখনও চুলের গোছা ধরে আছে, অদ্ভুতভাবে বেঁকে আছে মাথাটা, সাদা গলা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং অরক্ষিত। থেমে থেমে নিঃশ্বাস ফেলছে লিনা, ঠোঁটের কোণে ফেনা। কাঠের লগিটাও জোড়া লেগে থাকা দুটো শরীরের মাঝখানে আড়াআড়িভাবে আটকে আছে।

তার এই মৃত্যু চাক্ষুষ করা রানার জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্যে সবচেয়ে ভীতিকর।

দু'জনের কেউই কথা বলছে না, ফোঁস ফাঁস শব্দের সাথে নিঃশ্বাস ফেলছে শুধু, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে চোখে খুনের নেশা আর ঘৃণা নিয়ে। ইতিমধ্যে গোটা শরীর লিনার ওপর তুলে ফেলেছে রানা, হঠাৎ একটু উঁচু হয়ে বোট-হুকটাকে সামান্য সরাল ও, বুক থেকে গলায় নেমে গেল সেটা। মাথা সহ গলাটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলেও দেরি করে ফেলল লিনা, এটা সে আশা করেনি। বাঁ হাতে এখনও লিনার চুল ধরে আছে রানা, দু'জোড়া চোখের মাঝখানে ছয় ইঞ্চি ব্যবধান, ওর নাক আর মুখ থেকে রক্তের ফোঁটা চিবুক গড়িয়ে লিনার গলায় আর স্তনে পড়ছে।

লিনার চুল ধরা হাতটা ব্যবহার করল রানা, কনুই দিয়ে বোট-হুকের গায়ে চাপ দিতে লাগল। ধীরে ধীরে গলায় চেপে বসল সেটা।

হেরে যাচ্ছে বুঝতে পারলেও হাল ছাড়ল না ব্যারনেস। কিন্তু যতই সে ধস্তাধস্তি করল ততই ক্ষয় হতে লাগল শক্তি। বোট-হুকের ওপর আরও বেশি চাপ দিতে পারল রানা। লিনার মুখে আটকা পড়ছে রক্ত, প্রথমে লাল তারপর কালচে হয়ে গেল চামড়া। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শরীরটা আবার একটু নাড়ল রানা, জানে একটু ঢিল দিলেই মোচড় খেয়ে বেরিয়ে যাবে লিনা তলা থেকে। রানার এই নড়াচড়ার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারল ব্যারনেস। বোট-হুকটা আর যদি এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ গলার ভেতর দেবে যায়, চিরকালের জন্যে নিঃশ্বাস ফেলা বন্ধ হয়ে যাবে তার। রানার চোখে তাকাল লিনা, সেখানেও দেখতে পেল নিজের

মৃত্যু।

এই প্রথম কথা বলল সে। শুধু ঠোঁট নড়ল, আওয়াজ যেটা বেরুল তার-কোন অর্থ রানার কানে ধরা পড়ল না। তারপর আবার শব্দগুলো উচ্চারণ করল সে, রানার মনে হলো ভুল শুনছে ও। 'ওরা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল।'

প্রবল একটা ঝাঁকির সাথে ঝামেলা শেষ করতে যাচ্ছে রানা। কানে এল, 'কিন্তু আমি ওদের কথা বিশ্বাস করিনি,' অস্ফুট ধ্বনি, কোন রকমে শোনা গেল। 'সরি ইউ।'

তারপরই বাধা দেয়ার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল লিনার, তার শরীর সম্পূর্ণ নেতিয়ে পড়ল। অবশেষে মৃত্যুকে চরম নিয়তি বলে মেনে নিয়েছে সে। তার সেই মায়াভরা চোখ থেকে নিভে গেল সবুজ আলো, একেবারে শেষ মুহূর্তে তার বদলে এমন গাঢ় বিষণ্নতা ফুটল যেন গোটা দুনিয়া তার সাথে বেঈমানী করেছে, কেউ তার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি।

রানাকে এখন কেউ বাধা দিচ্ছে না, শেষ একটা ধাক্কার সাথে বোট-হুকটা গলায় আরেকটু দাবিয়ে দিলেই কাজ ফুরোয়। কিন্তু পারল না ও। একটা গড়ান দিয়ে ডেকে নামল, বোট-হুকটা তুলে ছুঁড়ে দিল ককপিটের দিকে। বাল্কহেডে গিয়ে বাড়ি খেলো সেটা। লিনার দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে ক্রল করে এগোল রানা, জানে এখনও বেঁচে আছে লিনা, গোক্ষুরের মতই বিপজ্জনক–অথচ কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। রেইলের নিচে পৌঁছে সিধে হলো ও। ধীরে ধীরে ঘুরল লিনার দিকে।

থরথর করে কাঁপছে রানা, খটাখট বাড়ি খাচ্ছে দু'সারি দাঁত। রেইল ধরে টলতে লাগল। ঝাপসা চোখে দেখল, ক্রল করে এগোচ্ছে লিনা। প্রতিবার এক ইঞ্চি এগোতে পারছে সে। তার একটা হাত গলায়, তাকিয়ে আছে ওর দিকেই।

লিনার নগ্ন ধড় রানার রক্তে পিচ্ছিল হয়ে আছে। আগের চেয়ে বড় দেখাল মুখটা, ফুলে গেছে। মাথার বিশৃঙ্খল চুলে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে মুখ। ককপিটের মাঝখানে যেন একটা জটাবুড়ি হামাগুড়ি দিচ্ছে। বোট-হুকের দাগ লাল আর কালচে হয়ে ফুটে আছে গলার ওপর, নিঃশ্বাসের সাথে স্তন জোড়া উঁচু আর নিচু হচ্ছে ঘন ঘন।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা, কথা বলার শক্তি নেই, দু'জনেই ক্লান্তির শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে।

মাথা ঝাঁকি দিল লিনা, যেন গোটা ব্যাপারটা অস্বীকার করার চেষ্টা করল। তারপর মুখ খোলার জন্যে হাঁ করল সে। জিভ আর ঠোঁট নড়ল, আওয়াজ বেরুল না। মুখের ভেতর পুরে ঠোঁট চুষল সে, গলায় আবার একটা হাত রেখে ব্যথাটা যেন কমাবার চেষ্টা করল।

আবার মুখ খুলল সে, এবার একটা মাত্র শব্দ বেরুল। 'কেন?'

পুরো ত্রিশ সেকেন্ড জবাব দিতে পারল না রানা, ওর নিজের গলাও বুজে গেছে। ও জানে, দায়িত্ব পালন করতে পারেনি, কিন্তু সেজন্যে নিজের ওপর কোন রাগ নেই। দ্বিতীয় বার চেষ্টা করার পর গলায় স্বর ফুটল, কর্কশ আর ভারী। 'তোমাকে খুন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

আবার মাথা ঝাঁকাল লিনা, চেহারা দেখে মনে হলো পরবর্তী প্রশ্ন কি করবে

ভাবছে। কিন্তু আবার সেই একটাই শব্দ বেরুল মুখ থেকে। 'কেন—?'

এই কেন-র কোন উত্তর দিতে পারল না রানা।

তারপর কতটা সময় বয়ে গেল ওরা বলতে পারবে না। রানার দিকে তাকি থাকতে থাকতে লিনার দু'চোখ ভরে উঠল পানিতে। চোখ উপচে শিশিরের স্বচ্ছ ফোঁটাগুলো গড়াতে শুরু করল। চিবুক থেকে ঝরে পড়ল ডেকের ওপ আবার সে ক্রল করে এগোবার চেষ্টা করল, কিন্তু ফোঁপাতে শুরু করায় জোর না গায়ে। ডেকের ওপর মুখ থুবড়ে নেতিয়ে পড়ল সে। চাইছে, কিন্তু রানাও পাচ্ছে না তার দিকে এগোয়। পেশীগুলোকে নিজের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনতে অনেকগুলো সেকেন্ড লেগে গেল, হাড়হীন কাঠামো নিয়ে একটা বস্তা যেন পড়ল ডেকের ওপর, লিনার পাশে স্থির হয়ে গেল রানা। স্থির হয়ে গেছে লিনা যাক তাহলে সফল হওয়া গেছে ভেবে খুশি হবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু ত বদলে আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে। হঠাৎ কোত্থেকে যেন শক্তি ফিরে এল, ব্যস্ত হা বাড়িয়ে লিনার মাথাটা তুলে নিল কোলের ওপর।

মৃদু ঝাঁকি দিল রানা, লিনার মাথা ওর কোলের ওপর অবলম্বনহীন নারকেলে মত দোল খেলো। এতক্ষণে কথাগুলো আবার স্মরণ হলো ওর।

'ওরা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল।'

তারপর, 'কিন্তু আমি ওদের কথা বিশ্বাস করিনি।'

সবশেষে, 'তুমি নও।'

কথাগুলো মনে পড়ল, সেই সাথে নিজের ব্যর্থতার কারণও আবিষ্কার করল রানা। অর্থ না বুঝলেও, কথাগুলো লিনা বলেছিল বলেই তাকে খুন করতে পারেনি ও। খুন করার দৃঢ় সিদ্ধান্তে চিড় ধরেছিল।

লিনাকে বুকের সাথে শক্ত করে চেপে রেখেছে রানা, অসাড় শরীরটা নড়ে উঠল একটু। ঘাড়টা এখনও নড়বড় করছে, যেন কোন হাড় নেই। মনে হলো বিড়বিড় করে ওর নাম উচ্চারণ করল লিনা। শব্দটা বাস্তবে ফিরিয়ে আনল ওকে। বিরাট ক্রীশ-ক্রাফট এখনও সগর্জনে ছুটে চলেছে। খোলা সাগরে আগেই বেরিয়ে এসেছে ওরা।

আস্তে করে শরীরটা ডেকে নামিয়ে রাখল রানা, টলতে টলতে মই বেয়ে উঠল। প্রথমবার রানা ছুরি চালাবার পর থেকে লিনার হাল ছেড়ে দেয়া পর্যন্ত গোটা ব্যাপারটা দুই মিনিটও স্থায়ী হয়নি।

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে এসে রানা দেখল, ক্রীশ-ক্রাফট অটোমেটিক পাইলটে চলছে। তারমানে বোট নিয়ন্ত্রণ করার ভান করছিল লিনা, আসলে ও আক্রমণের অপেক্ষায় তৈরি হয়ে ছিল।

গোটা ব্যাপারটার অর্থ এখনও পরিষ্কার নয়। রানা শুধু বুঝল, হিসেবে কোথাও একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে ওর। অটোমেটিক স্টিয়ারিঙের সুইচ অফ করে দুটো থ্রটলই বন্ধ করে দিল ও, ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে এল এঞ্জিনের আওয়াজ। গতি স্থির হবার পর বাতাস আর স্রোতের মধ্যে পড়ে ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল বোট।

স্টার্নের ওপর দিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা। দিগন্তরেখার কাছে

দ্বীপটা মোটা একটা রেখার মত লাগল। আবার টলতে টলতে মই বেয়ে নেমে এল ও।

মাথা তুলেছে লিনা, আধশোয়া অবস্থায় উঁচু হয়ে রয়েছে ডেকে। কিন্তু রানাকে দেখেই কুঁকড়ে গেল, এবং এই প্রথমবার তার চোখে আতঙ্ক বাসা বাঁধতে দেখল রানা।

'ভয় পেয়ো না,' বলল রানা, নিজের কানেই কর্কশ শোনাল। লিনা ওকে ভয় পাচ্ছে দেখে নিজের ওপর ঘৃণা বোধ করল ও। চায় না লিনা আর কখনও ভয় পাক ওকে।

পাশে বসে লিনাকে দু'হাতের ওপর তুলে নিল রানা, ওর হাত আর বুকের ওপর আড়ষ্ট হয়ে থাকল ব্যারনেস-এখন কি ঘটবে জানা নেই তার। তৃতীয়বারের চেষ্টায় লিনাকে বুকে নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারল রানা। 'ভয় পেয়ো না,' আবার বলল কথাটা, তাকে নিয়ে ক্রীশ-ক্রাফটের সেলুনে ঢুকল। ওর নিজের শরীরও দুমড়েমুচড়ে কাহিল হয়ে পড়েছে, যেন কোন একটা হাড়ও আগের মত শক্ত নেই। লিনাকে এত যত্নের সাথে আর আলতোভাবে বয়ে নিয়ে এল যে ধীরে ধীরে তার পেশীতে ঢিল পড়ল, ওর শরীরের সাথে মোমের মত গলে গেল সে।

লেদারের প্যাড লাগানো বেঞ্চে তাকে শুইয়ে দিল রানা। সিধে হতে যাবে, একহাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ল লিনা, সরতে দেবে না।

'ছুরিটা আমিই ওখানে রেখেছিলাম,' খসখসে গলায় বলল লিনা। 'পরীক্ষা করার জন্যে।'

'মেডিকেল চেস্টটা খুলতে দাও,' নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল রানা।

'না।' মাথা নাড়ল লিনা, অমনি চোখ কুঁচকে মুখ বিকৃত করল গলায় ব্যথা পেয়ে। 'কোথাও যেয়ো না, রানা। থাকো আমার সাথে, প্লীজ। কি রকম হচ্ছে আমার বুঝতে পারছি না। ছুরিটা নিয়ে ডেকে তুমি উঠে এলে, তোমাকে আমি খুন করব-বুঝতে পারছ কি বলছি? প্রায় ঘটে গিয়েছিল ব্যাপারটা, ওহ্ গড! কি হয়েছে আমাদের, রানা? আমরা এমন করছি কেন? দু'জনেই কি পাগল হয়ে গেছি?'

মরিয়া হয়ে রানাকে জড়িয়ে রাখল লিনা, ডেকে হাঁটু গেড়ে তার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'বোধহয় তাই। গোটা ব্যাপারটা আমার কাছেও দুর্বোধ্য, নিজেকেও বুঝতে পারছি না।'

'কেন, রানা-কেন ছুরিটা নিতে গেলে তুমি? প্লীজ, বলো আমাকে। মিথ্যে বোলো না, সত্যি কথা বলো। আমাকে জানতে হবে কেন।'

'কারণ সোহেলকে তুমি নির্যাতন করেছ, কারণ...'

বাধা দিয়ে কিছু বলতে গিয়েও পারল না লিনা, তার গলা বুজে এল।

আরেকটু ব্যাখ্যা করল রানা, 'কারণ আমি যখন জানলাম তুমিই খলিফা তখন তোমাকে খুন না করে আমার কোন উপায় ছিল না...'

মনে হলো প্রাণপণ চেষ্টা করে শক্তি সঞ্চয় করছে লিনা, যেন কি একটা জরুরী কথা তাকে বলতে হবে। গলায় আওয়াজ ফুটল, কিন্তু অস্পষ্ট। 'কিন্তু করলে না কেন, রানা? মেরেই তো ফেলেছিলে, শেষ মুহূর্তে বাঁচালে কেন?'

'কারণ...,' কারণটা হঠাৎ করেই উপলব্ধি করল রানা, '-কারণ আমি

তোমাকে ভালবাসি। আর কিছু কোন ব্যাপার নয়।'

ঢুকরে উঠল লিনা, ত্রিশ সেকেন্ড ঘনঘন হাঁপাল। তারপর জিজ্ঞেস করল সে, 'এখনও তুমি মনে করো আমি খলিফা?'

'জানি না। না জানার এই মুহূর্তে কিছু এসেও যায় না। শুধু জানি তোমাকে আমি ভালবাসি।'

'কেন এমন হলো, রানা?' বিড়বিড় করে উঠল লিনা। 'ঈশ্বর, এমন হলো কেন!'

'তুমি খলিফা, লিনা?'

'কিন্তু রানা, তুমি আমাকে খুন করতে যাচ্ছিলে! ছুরিটা তো সেই পরীক্ষাই ছিল। খলিফা তো তুমি!'

নয়

ব্যারনেসের কাছ থেকে দিক নির্দেশনা পেয়ে কোরাল রীফের ভেতর সরু একটা প্যাসেজ ধরে ক্রীশ-ক্রাফট চালাল রানা, রীফটা ঘিরে আছে ইল দ্য উইসিউ-কে। পাখিদের পাখা ঝাপটানোর আওয়াজে কান পাতা দায় হলো, ঝাঁক বেঁধে মেঘের মত ওদের মাথার ওপর আকাশ ঢেকে দিল ওগুলো। দ্বীপটার যেদিকে টানা বাতাস লাগছে তার উল্টো দিকে পাঁচ ফ্যাদম গভীরতায় নোঙর ফেলল রানা, তারপর ভি.এইচ.এফ. রেডিওর সাহায্যে প্রধান দ্বীপটার সাথে যোগাযোগ করল, কথা বলল হেড বোটম্যানের সাথে। 'ব্যারনেস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাতটা তিনি বোটে কাটাবেন,' ব্যাখ্যা করল ও। 'দুশ্চিন্তা কোরো না।'

সেলুনে নেমে এল রানা, ইতিমধ্যে নিজের চেষ্টায় উঠে বসার মত সুস্থতা ফিরে এসেছে ব্যারনেস লিনার। লকার থেকে টাওয়েলিং ট্র্যাক স্যুট বের করে পরেছে সে, কুৎসিত দাগটা ঢাকার জন্য গলায় একটা তোয়ালে জড়িয়েছে। লকার খুলে মেডিসিন বক্স বের করল রানা, আপত্তি সত্ত্বেও দুটো ক্যাপসুল আর দুটো ট্যাবলেট গিলতে করতে হলো লিনাকে। তারপর তার গলা থেকে তোয়ালে নামাল রানা, আঙুলের ডগা দিয়ে অ্যান্টি-সেপটিক মলম মাখিয়ে দিল কালচে দাগের ওপর।

'এখন আর জ্বালা করছে না, আরাম লাগছে,' অস্ফুটে বলল লিনা, চিঁচিঁ করে আওয়াজ বেরুল। একটা শব্দও পরিষ্কার উচ্চারণ করতে পারছে না সে, ভেঙে গেছে গলা।

'এবার দেখি পেটের কি অবস্থা।' প্যাড লাগানো বেঞ্চে ধীরে ধীরে লিনাকে শুইয়ে দিল রানা, টাওয়েলিং স্যুটের চেইন খুলল কোমর পর্যন্ত। ওর জোড়া পায়ের লাথিটা লিনার শুধু পেটে নয়, বুকেও লেগেছিল—স্তনের ঠিক নিচ থেকে নাভি পর্যন্ত লম্বা লালচে দাগ ফুটে আছে, ফুলে আছে মাংস। চামড়ায় মলমের প্রলেপ পড়তেই চোখ বুজল ব্যারনেস, আরাম পেয়ে অস্ফুট উ-আহ করতে লাগল। রানার কাজ

শেষ হতে ধীরে ধীরে দাঁড়াল সে, একটু কুঁজো হয়ে পনেরো মিনিটের জন্যে বাথরুমে ঢুকল। এই ফাঁকে নিজের ক্ষতগুলোর যত্ন নিল রানা। মুখ ধুয়ে, চুলে চিরুনি চালিয়ে বেরিয়ে এল লিনা, দেখল তার জন্যে গ্লাসে হুইস্কি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা। বেঞ্চের ওপর পাশাপাশি বসল ওরা।

'তুমি, রানা?' হঠাৎ উদ্বেগে অধীর দেখাল লিনাকে। 'তোমার কি অবস্থা?'

'মাত্র একটা কথা বলার আছে আমার। আগাম নোটিস দিয়ে খেপবে, যাতে পালিয়ে বাঁচার একটা সুযোগ পাই। ওরেব্বাপরে বাপ!'

হঠাৎ হাসতে গিয়ে গলায় ব্যথা পেল লিনা, রানাকে ধরে ঝুলে পড়ল, বার কয়েক কাশল খক খক করে।

লিনা শান্ত হতে নরম গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'কথা হবে কখন? হওয়া দরকার, তাই না?'

'হ্যাঁ, জানি, কিন্তু এখন নয়, রানা। আরও কিছুক্ষণ আমাকে ধরে থাকো।' এবং আজ যেন নতুন করে উপলব্ধি করল রানা প্রিয় নারীদেহ শরীরের সাথে সেঁটে থাকলে ব্যথা-বেদনা কোথায় যেন হারিয়ে যায়। ওর গলায় নাক ঘষল লিনা, আর লিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'বললে,' কিছুক্ষণ পর মুখ খুলল লিনা, 'আমাকে তুমি ভালবাস।' প্রশ্নের সুরে কথাটা বলা হলো, নতুন করে আশ্বস্ত হতে চাইছে, যা প্রতিটি প্রেমিক-প্রেমিকারই হতে চাওয়া একান্ত উচিত।

'হ্যাঁ, ভালবাসি তোমাকে। প্রথম থেকেই ব্যাপারটা জানতাম, কিন্তু যখন বুঝলাম তুমি খলিফা, মনের অনেক গভীরে মাটি চাপা দিয়েছিলাম ওটাকে–কিন্তু ছিল।'

'আমি খুশি,' সাদামাঠা স্বীকারোক্তি লিনার। 'কারণ তুমি দেখেছ আমিও তোমাকে ভালবাসি। ধরে নিয়েছিলাম, ও জিনিস কখনও আমার জীবনে আসবে না। নিজেকেই দোষ দিতাম, আমি ভালবাসতে জানি না। তারপর তোমাকে দেখলাম, রানা।' থেমে গেল সে, যেন তোমাকে দেখলাম আর তোমাকে ভালবাসলাম সমার্থক। 'কিন্তু তারপরই ওরা আমাকে বলল তুমি নাকি আমাকে খুন করবে। বলল, তুমি খলিফা। ইস্, মনে হচ্ছিল আমি মারা যাব। তোমাকে পেলাম কিন্তু হারাতে হবে। নিয়তির এই নিষ্ঠুরতা আমার সহ্য হচ্ছিল না, রানা। ব্যাপারটা যে মিথ্যে সেটা প্রমাণ করার একটা সুযোগ তোমাকে না দিয়ে আমার উপায় ছিল না।'

'কথা বোলো না,' লিনাকে কোলের আরও ভেতরে টেনে নিয়ে প্রায় শুইয়ে দিল রানা। 'আমার গলা ভাঙেনি, কাজেই প্রথমে আমি বলি–কি জানি, কিভাবে জানলাম তুমি খলিফা।'

'এমন মারই মেরেছ, গালে একটা চুমো খাওয়ার জায়গা পর্যন্ত রাখোনি?'

ঝুঁকে লিনার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল রানা, কিন্তু হাসল না। 'সোহেল কিডন্যাপ হওয়ার আগের সব ঘটনা তুমি জানো। সব আমি তোমাকে বলেছিলাম, কিছুই বাদ দিইনি, একটা মিথ্যে কথা বলিনি, একবারও...,' শুরু করল রানা, সোহেলকে কিভাবে উদ্ধার করা হলো তার বিশদ বর্ণনা দিল। 'তখন আমার মানসিক অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, যে যা বলে সব বিশ্বাস করতে রাজি, সোহেলকে উদ্ধার করার

জন্যে যে-কোন কাজ করতে পারি।' বলল ড. এডওয়ার্ড ওয়ার্নারকে নিজের অজান্তেই খুন করার প্ল্যান করে ও। লারাগের পোড়োবাড়ির ঠিকানা কিভাবে পেল তা-ও বলল। 'কে যে টেলিফোনে খবরটা দিয়েছিল আজও জানা যায়নি। তারপর ওরা আমাকে জানাল, তুমি খলিফা।'

'কে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল লিনা।

'সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট।'

'ওয়ার্নার?'

'হ্যাঁ, তিনি আর কার্ল রবসন।'

'কি বলল ওরা?'

'তুমি তখন খুব ছোট, বাবা তোমাকে প্যারিসে নিয়ে আসেন। তখনই নাকি তোমার মেধার কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তারপর বাবা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন। বাবার বন্ধুরা তোমাকে নিয়ে গেল। তোমার প্রতিভা দেখে কারা যেন তোমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করল। একজন লোককে কাকা বানিয়ে পাঠাল তারা...'

'দশ বছর ধরে বিশ্বাস করেছি সত্যি সে আমার কাকা ছিল...,' অনেক কষ্টে নিজেকে থামাল লিনা, তারপর নিস্তেজ, বিষণ্ণ গলায় আবার বলল, 'বাবা মারা যাবার পর জানলাম সে-ই একমাত্র আমার আপনজন...'

'তোমাকে ওডেসায় পাঠানোর জন্যে নির্বাচিত করা হলো...'

আড়ষ্ট হয়ে গেল লিনা। 'তুমি,...তুমি ওডেসার ব্যাপারটাও জানো, রানা?'

'ওখানে তোমাকে ট্রেনিং দেয়া হয়–অনেক বিষয়ে।'

'হ্যাঁ।'

'যেমন, খালি হাতে কিভাবে একজন মানুষকে খুন করতে হয়।'

'রানা, চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে খুন করতে পারতাম বলে বিশ্বাস করি না। অন্তত আমার অবচেতন মন থেকে প্রবল একটা বাধা নিশ্চয় আসত। ঘটেছেও ঠিক তাই। আমার যা ট্রেনিং, তোমার বাঁচার কথা ছিল না। বেঈমানী করেছ বলে ঘৃণা হয়েছিল, কিন্তু ভালবাসার অস্তিত্ব ছিল...'

'আবার তুমি কথা বলছ!'

'তারপর যখন জানলাম, তুমি আমাকে খুন করতে যাচ্ছ, প্রায় স্বস্তির মত লাগল ব্যাপারটা। মৃত্যুকে মেনে নিতে তখন আর খারাপ লাগল না, কারণ ভালবাসা পেয়ে আবার হারানোর ব্যথা...'

'চুপ করবে?'

'মুখে একটা কিছু দাও–না, ঠোঁটে।'

লিনাকে চুমো খেয়ে আবার শুরু করল রানা, 'ওডেস্যায় ট্রেনিং নিলে তুমি। রাশিয়ার হয়ে কাজ করার জন্যে তৈরি করা হলো তোমাকে। সব সত্যি, তাই না?'

'সব।' আরও একটু জোরে রানার পিঠ জড়িয়ে ধরল লিনা। 'তোমাকে আর কখনও মিথ্যে কথা বলব না, রানা।'

'তারপর ওরা তোমাকে প্যারিসে পাঠাল?' জিজ্ঞেস করল রানা, উত্তরে মাথা ঝাঁকাল লিনা। 'এসেই প্যারিসকে তুমি জয় করে নিলে। কোন পুরুষের সাধ্য ছিল

না তোমাকে এড়িয়ে যায়...'

কোন মন্তব্য বা প্রতিবাদ করল না লিনা, তবে চোখ থেকে চোখ সরাল না।

'আর তারা সবাই সুদর্শন, শক্তিশালী, ক্ষমতাবান পুরুষ ছিল। সংখ্যায় অনেক, কতজন কেউ বলতে পারে না। তাদের সবার কাছ থেকে রাশিয়ার জন্যে তথ্য সংগ্রহ করতে তুমি...'

'বেচারা,' ফিসফিস করে বলল লিনা। 'এ-সব কথা ভেবে নিজেকে তুমি কষ্ট দিয়েছ?'

'তোমার ওপর ঘৃণা আরও বেড়ে যায় আমার।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারি। কিন্তু তোমার অশান্তি দূর করার জন্যে কিছুই বলার নেই আমার–শুধু এইটা বাদে। তোমার সাথে পরিচয় হবার আগে কাউকে আমি ভালবাসিনি।'

কথা রাখছে লিনা। এখন থেকে আর সে মিথ্যে বলবে না, ছলনার আশ্রয় নেবে না। রানা নিশ্চিতভাবে জানে।

'তারপর ওরা তোমাকে নির্দেশ দিল ব্যারন অটারম্যানের বিশ্বাস অর্জন করো, তার শিল্প সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নাও...'

'না;' নিচু গলায় কথাটা বলে মাথা নাড়ল লিনা। 'সিদ্ধান্তটা আমার ছিল। আমার জীবনে সেই একমাত্র পুরুষ ছিল যাকে আমি...,' মাথার পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে হুইস্কির গ্লাসটা বেঞ্চ থেকে তুলল সে, এক চুমুক খেয়ে গলা ভেজাল, '...যে আমাকে জাদু করেছিল। এরকম মানুষ কোথাও আমি দেখিনি। তার গায়ের জোর সম্পর্কে বললে তুমি বিশ্বাস করবে না। আর ছিল ক্ষমতা–টাকার ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, যোগাযোগের ক্ষমতা, প্ল্যানিঙের ক্ষমতা। ওহ্ রানা, মস্ত একটা আগ্নেয়গিরি মনে হত তাকে আমার।'

'ইতিমধ্যে একই ধরনের কাজ করে তুমি বোধহয় একঘেয়েমিতে ভুগছিলে...'

'বিভিন্ন লোকের স্বার্থে প্রেমের অভিনয় করা, তারপর সবাইকে ফাঁকি দেয়া, কি যে কঠিন কাজ...' এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসল লিনা, যেন নিজেকে ব্যঙ্গ করল।

'অটারম্যানের বিশ্বাস অর্জন করলে তুমি। অসুস্থ ছিল সে, যোগ্য একজন কাউকে হয়তো মনে মনে খুঁজছিল, তোমাকে পেয়ে হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে গেল। সে তোমাকে বিশ্বাস করায় তার ব্যবসার গোপন তথ্য জানার সুযোগ হলো তোমার, সব তুমি রাশিয়ায় পাচার করতে লাগলে। ওদের কাছে তোমার দাম একশো গুণ বেড়ে গেল।'

কথা বলছে ওরা, আর ওদিকে ধীরে ধীরে রঙ বদলে ফুরিয়ে যাচ্ছে দিনের মেয়াদ, পোর্টহোলের বাইরে গোলাপ রাঙা মেঘ একটু একটু করে ফ্যাকাসে হয়ে এল। কেবিনের ভেতর ম্লান হতে থাকল আলো, এক সময় শুধু ব্যারনেস লিনার মুখটা কোমল আলো হয়ে ফুটে থাকল রানার চোখের নিচে। সুরটা অভিযোগের নয়, মৃদুকণ্ঠে বলে চলেছে রানা। লিনা শুধু মাঝে মধ্যে দু'একবার প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল, অথবা আঙুল দিয়ে জোরে হঠাৎ দু'একবার চেপে ধরল রানার বাহু। কখনও চোখ বুজল সে, তিক্ত ঘটনাগুলো স্মরণ করতে চায় না।

তারপর এক সময় রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'ওহ্ গড! সব সত্যি!'

রানা বলল, অটারম্যানের স্ত্রী হিসেবে কিভাবে লিনা বিপুল প্রভাব আর ক্ষমতার অংশীদার হলো। ব্যারনের শক্তি যত কমল ততই বাড়ল তার প্রতিপত্তি। ক্ষমতা কি জিনিস, উপলব্ধি করল ব্যারনেস। আরও ক্ষমতার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠল সে। এমন একটা পর্যায় আসল, অনেক ব্যাপারে ব্যারনের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে শুরু করল সে। 'যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ত্র বিক্রি। তুমি ব্যাপারটা পছন্দ করোনি।'

'হ্যাঁ। আমরা তর্ক করেছি।' মৃদু হাসল লিনা, কিন্তু হাসির কারণটা ব্যাখ্যা করল না–যেন এটা তার ব্যক্তিগত সেই সব স্মৃতির একটা, যা কাউকে বলা যায় না।

তারপর রানা বলল, বিপুল ক্ষমতা হাতে পেয়ে ব্যক্তিগত উচ্চাশা চরিতার্থের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল ব্যারনেস। মহৎ বা অমর হওয়ার সাধ জাগল তার মনে। কে.জি.বি. বুঝতে পারল, ব্যারনেসের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে তারা। হুমকি দিল, চাপ সৃষ্টি করল, কিন্তু ততদিনে ব্যারনেস তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। অটারম্যানের মোসাড কানেকশন আবিষ্কার করে ফেলেছে সে, স্বামীর সাথে তাল মিলিয়ে ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স মোসাডের সাথে সহযোগিতা করছে–অর্থাৎ কে.জি.বি-কে ঠেকাবার জন্যে তার হাতে একটা অস্ত্র চলে এসেছে।

'অবিশ্বাস্য, রানা!' ফিসফিস করে বলল লিনা। 'আসল ঘটনার এত কাছাকাছি, প্রায় সত্যি বলা যায়।' চিবুক নেড়ে রানাকে আবার শুরু করার ইঙ্গিত দিল সে।

'কে.জি.বি. হুমকি দিল তোমার পরিচয় ব্যারনকে তারা জানিয়ে দেবে। তোমার কোন উপায় ছিল না, ব্যারনকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিলে তুমি। প্ল্যানটা সুন্দর ছিল, ব্যারন নিহত হলো, কেউ তোমাকে সন্দেহ করল না–অটারম্যান গ্রুপ অভ ইন্ডাস্ট্রির একমাত্র মালিক বনে গেলে তুমি। মুক্তিপণের টাকাও নিলে, সে টাকা জমা পড়ল সুইটজারল্যান্ডের একটা গোপন অ্যাকাউন্টে…'

'হায় ঈশ্বর!'

'সত্যি নয়?' নিশ্চিত হতে চাইল রানা।

'ভীতিকর, রানা! থামলে কেন, বলো।'

'স্বামীকে হত্যা করার প্ল্যানটা নিখুঁতভাবে সফল হলো, সেই সাথে নতুন একটা সম্ভাবনাময় জগৎ তোমার সামনে উন্মোচিত হয়ে গেল। ঠিক এই সময় সত্যিকার খলিফা হয়ে উঠলে তুমি। অটারম্যানকে খুন করার পর জিরো-সেভেন-জিরো হাইজ্যাক করার প্ল্যান করলে তুমি, নাকি মাঝখানে আরও অপারেশন চালিয়েছ, আমার জানা নেই। ভিয়েনায় ওপেক মন্ত্রীদের ওপর হামলা চলে, কাজটা তোমার বলেই অনেকের ধারণা। রোমে রেড ব্রিগেড পাইকারীভাবে খুন করল বাসভর্তি একদল স্কুলের ছেলেমেয়েকে, সম্ভবত ওখানেও তোমার হাত ছিল। তবে জিরো-সেভেন-জিরো হাইজ্যাক করার সময়ই প্রথম খলিফা নামটা ব্যবহার করলে তুমি। এই অপারেশনও সফল হতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাদ সাধল একজন কমান্ডো।' নিজের প্রতি ইঙ্গিত করল রানা। 'এই ঘটনার পরই আমার ওপর চোখ

পড়ল তোমার।'

রানার কোল থেকে মাথা তুলে রিডিং লাইটের সুইচ অন করল লিনা। সোনালি আলোয় ভরে উঠল কেবিন। রানার মুখে চোখ রেখে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সে।

'ইতিমধ্যে তুমি জেনে ফেলেছ, খলিফার পিছনে লোক লেগেছে। মোসাড, ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স ছাড়াও তথ্য পাবার ব্যক্তিগত উৎসে ছিল তোমার। তুমি জানতে পারলে, লোকটা হলো ড. এডওয়ার্ড ওয়ার্নার। তিনিই যে শিকারী, সেটা আমার কাছ থেকে নিশ্চিত ভাবে জানতে পারো তুমি। তাকে খুন করার জন্যে আমাকে তোমার আদর্শ লোক বলে মনে হলো। স্পেশাল ট্রেনিং আছে আমার, সন্দেহ না জাগিয়ে তার কাছাকাছি যেতে পারব। কিন্তু আমাকে দিয়ে কাজটা করাতে হলে শক্তিশালী একটা লিভার দরকার হবে।'

'না!' বিড়বিড় করল লিনা, রানার মুখ থেকে চোখ সরাতে পারল না।

'খাপে খাপে মিলে যায়,' বলল রানা। 'পুরোটাই।' এবার লিনার মুখে কোন কথা নেই।

'সোহেলের আঙুল পাবার পর...'

'আমি অসুস্থবোধ করছি...'

'দুঃখিত।' হুইস্কির গ্লাসটা বেঞ্চ থেকে তুলে লিনার মুখের সামনে ধরল রানা। এক চুমুক হুইস্কি খেয়ে রানার কোল থেকে মাথা তুলল লিনা, আহত গলায় হাত রেখে চোখ বুজে বসে থাকল কয়েক সেকেন্ড।

'এখন ভাল?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। বলো।'

'সবই মিলে যায়, শুধু অজ্ঞাতনামার টেলিফোন কলটা বাদে। সোহেল কোথায় আছে আমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হলো। তবে ব্যাপারটা কো-ইন্সিডেন্স হতে পারে, খলিফার হিসেবের মধ্যে ছিল না।'

'কিন্তু প্রমাণ, রানা?' প্রতিবাদ করল লিনা। 'প্রমাণ কোথায়? সবই তো আন্দাজ। আমি খলিফা তার প্রমাণ কি?'

'প্রমাণ আছে বৈকি,' শান্তভাবে বলল রানা। 'সাইরাস কারচিভাল, লারাগের হাইড-আউটে যে আটকে রেখেছিল সোহেলকে, ওখান থেকে দুটো ফোন করে সে। দুটো ফোনই করা হয়েছিল রঁবুইলে, তোমার নম্বরে।'

নির্বাক তাকিয়ে থাকল লিনা।

'কারচিভাল তার বস্ খলিফাকে রিপোর্ট করছিল,' বলে উত্তরের অপেক্ষায় বসে থাকল রানা। কিন্তু কোন উত্তর আসছে না দেখে আবার শুরু করল। খলিফাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয় ও, সম্ভাব্য জায়গাও ঠিক করে ফেলে, কিন্তু তার আগেই ব্যারনেস ওকে নিজের আস্তানা, এখানে ডেকে পাঠায়। ওটা ছিল মৃত্যুকে বরণ করে নেয়ার আমন্ত্রণ। ইতিমধ্যে ব্যারনেস জেনে ফেলেছে, তার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে ওর কাছে।

'বলে যাও।'

'আমি এলাম। তোমার নির্দেশে কাস্টমস অফিসাররা আমাকে সার্চ করল...'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লিনা।

'কাল রাতে তুমি তোমার লোকদের দিয়ে আমার কামরা সার্চ করিয়েছ। বুঝলাম, আজ তুমি খুন করতে চাও। জানতাম, বাঁচতে হলে প্রথম আঘাত আমাকে হানতে হবে। হানলামও তাই...'

'হ্যাঁ।' গলায় হার্ত বুলাল লিনা। 'তুমিই প্রথমে।'

উঠে গিয়ে বাল্কহেডের পিছন থেকে গ্লাস ভরে নিয়ে এল রানা। ফিরে এসে দেখল লিনার চোখ আধবোজা হয়ে আছে, একটু একটু টলছে সে। দু'ঢোক হুইস্কি খাওয়াল তাকে, তারপর গ্লাস রেখে দিয়ে দু'হাতের ওপর তুলে নিল শরীরটা। রানার বুকের সাথে লেপটে থাকল ব্যারনেস। তাকে নিয়ে মাস্টার কেবিনে ঢুকল রানা, শুইয়ে দিল বাঙ্কে। নিচের লকারে বালিশ আর চাদর পাওয়া গেল, একই চাদরের তলায় লিনার পাশে লম্বা হলো রানা। কুঁকড়ে ওর দিকে পিছলে এল লিনা, ওর শরীরের ভাঁজে ঢুকে পড়ল। রানার বুকে লিনার পিঠ, ওর শক্ত উরুতে তার গোল নিতম্ব, ওর ভাঁজ করা কনুইয়ের ওপর তার মাথা। রানার অপর হাতটা তার পাঁজরের ওপর দিয়ে বুকের ওপর স্থির হয়ে থাকল। এই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। তারপর রানা যখন চোখ মেলে পাশ ফিরল, অস্ফুট গোঙানির মত শব্দ করলেও লিনার ঘুম ভাঙল না। আবার ঘুমিয়ে পড়ল রানা। দ্বিতীয়বার চোখ মেলে দেখল, লিনা নেই। এত জোরে চমকে উঠল, নিজেই অবাক হয়ে গেল। পলকের মধ্যে কত রকম সন্দেহ খেলে গেল মনে, তারপর বাথরুম থেকে পানির আওয়াজ পেয়ে ঢিল পড়ল পেশীতে। একটু পর বাথরুম থেকে ফিরল লিনা, টাওয়েলিং ট্র্যাক স্যুট খুলে ফেলেছে, বাহুর ভেতর তার নগ্ন শরীর অরক্ষিত অমূল্য সম্পদ বলে মনে হলো রানার।

আবার ওদের ঘুম ভাঙল একসাথে, পোর্টহোল থেকে তখন রোদ ঢুকছে কেবিনের মেঝেতে।

'মাই গড, নির্ঘাত দুপুর হয়ে গেছে।' বিছানায় উঠে বসল ব্যারনেস, মাথা ঝাঁকিয়ে চকচকে কালো চুল উদোম পিঠে ছড়িয়ে দিল।

কিন্তু রানা উঠে বসতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল।

'কোথায় লাগল, শেরি?'

'নিশ্চয়ই আমি ট্রাকের নিচে চাপা পড়েছিলাম।' কাতরাতে লাগল রানা। শুকাতে শুরু করায় ক্ষতগুলোয় টান ধরেছে. ছেঁড়া পেশী আর ছড়ে যাওয়া চামড়া সামান্য নড়াচড়াতেই প্রতিবাদ করে উঠল।

'দু'জনের জন্যে একটাই মাত্র চিকিৎসা আছে,' রানাকে জানাল ব্যারনেস। 'সেটাকে আমরা তিন পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি।'

রানাকে বাঙ্ক থেকে নামতে সযত্নে সাহায্য করল সে, ও যেন থুড়থুড়ে একটা বুড়ো। আরও বেশি আদর আর সহানুভূতি আদায়ের জন্যে গোঙানির মাত্রা বাড়িয়ে দিল রানা, 'ওরে দুষ্টু,' বলে হেসে উঠল লিনা। একটু বেসুরো শোনালেও, এখন সে হাসতে পারছে।

ক্রীশ-ক্রাফটের ডাইভিং প্ল্যাটফর্ম থেকে শান্তভাবে পানিতে নামল ওরা, পরস্পরকে ছুঁয়ে থেকে সাঁতার কাটল কিছুক্ষণ।

'কাজ হচ্ছে,' স্বীকার করল রানা, উষ্ণ লোনা পানিতে আরাম পেল খেঁতলানো শরীরটা।

পাশাপাশি থেকে সাঁতার কাটল ওরা, দু'জনেই বিবস্ত্র–প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত, একেবারে সেই রীফ পর্যন্ত পিছিয়ে এল। হাঁপরের মত হাঁপাচ্ছে ওরা।

'এখন ভাল?' চোখ থেকে চুল সরিয়ে জিজ্ঞেস করল ব্যারনেস।

'আগের চেয়ে।'

'চলো একদমে ফিরে যাই।'

একসাথে ক্রীশ-ক্রাফটে ফিরল ওরা, হাঁপাতে হাঁপাতে ককপিটে উঠল, পানি আর হাসি ছড়াচ্ছে চারদিকে। কিন্তু কু-উদ্দেশ্য নিয়ে রানা হাত বাড়াতে, বাতাসের মত মোলায়েম একটু আদর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল লিনা।

'চিকিৎসার প্রথম পর্যায় শেষ হলো।'

কোমরে শুধু একটা অ্যাপ্রন জড়িয়ে গ্যালিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ব্যারনেস, অ্যাপ্রনে তার পেটের লম্বা দাগটা ঢাকা পড়ল।

'নতুন অভিজ্ঞতা!' বিস্ময় প্রকাশ করল রানা। 'অ্যাপ্রন যে কোন পুরুষকে প্ররোচিত করতে পারে জানা ছিল না।'

'তোমার না কফি বানাবার কথা?' কৃত্রিম ঝাঁঝের সাথে মনে করিয়ে দিল লিনা। কিন্তু রানা নড়ছে না বা চোখ ফেরাচ্ছে না দেখে নিতম্ব দিয়ে ধাক্কা দিল সে।

মোটা, ফোলা, আর সোনালি ওমলেটের দিক থেকে চোখ তুলে লিনার বুকের দিকে তাকাল রানা। খেতে শুরু করে মন্তব্য করল, 'অদ্ভুত মিল আছে।'

'হাভাতে,' জবাব দিল ব্যারনেস, হঠাৎ লালচে হয়ে ওঠা চেহারাটা লুকাতে চেষ্টা করল না।

প্রচুর খেলো ওরা, ঝলমলে নতুন সকাল কাল রাতের সমস্ত উদ্বেগ, উত্তেজনা, আর দ্বন্দ্ব মন থেকে মুছে নিয়ে সুপদ মেজাজ দান করেছে ওদেরকে। আকাশে পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘ যেন ভেড়ার পাল, মন্থরগতিতে চরছে, আর ফাঁকগুলোর ভেতর আকাশ অদ্ভুত সুন্দর উজ্জ্বল নীল। কেউই ওরা এই খোশ মেজাজ হারাতে চায় না, অর্থহীন আর অপ্রাসঙ্গিক প্রলাপ বকে চলেছে, সীগালদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারছে রুটির টুকরো, প্রশংসা করছে আবহাওয়ার–যেন পিকনিকে বেরিয়েছে দুটো বাচ্চা।

তারপর লিনা দাঁড়াল, হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে লক্ষ করল ওর নিতম্বের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে রানা। চোখে রাগ নিয়ে হেঁটে এল ব্যারনেস, ধপ্ করে বসে পড়ল রানার কোলে। 'দেখো এবার!' তারপর রানার একটা হাতের কব্জি ধরল, পালস্ দেখার ভান করছে। 'রোগীর অবস্থা আগের চেয়ে ভাল,' ঘোষণা করল সে। 'তৃতীয় পর্যায়ের চিকিৎসা বোধহয় শুরু করা যেতে পারে।'

'সেটা কি?'

'রানা, মাই লাভ, কোন ভয় নেই তোমার,' অভয় দিল ব্যারনেস, রানার কোলের ওপর নিতম্ব ঘষল সে। 'যদি ভুলেও গিয়ে থাকো, আবার সব তোমাকে আমি শিখিয়ে নেব।'

'তুমি নদীর মত ডাগর একটা মেয়ে,' ঢোক গিলে বলল রানা।

গরম রোদে মিলিত হলো ওরা, নরম বালি আর ফেনা ওদের বিছানা হলো, টানা বাতাস অদৃশ্য আঙুলের মত সোহাগের স্পর্শ দিয়ে গেল শরীরে।

ব্যাপারটা শুরু হলো খুনসুটি আর হাসাহাসি দিয়ে। নতুন করে পরস্পরকে আবিষ্কারের আনন্দে আঁতকে ওঠার মত শব্দ করল ওরা, বিড়বিড় করে আমন্ত্রণ জানাল, উৎসাহ দিল, তারপর হঠাৎ করে বদলে গেল পরিস্থিতি। আবেগের প্রচণ্ড ঝড়ে সমস্ত দ্বিধা, ঘৃণা, সন্দেহ, আর নোংরামি ভেসে গেল।

'ভালবাসি, আমি তোমাকে. ভালবাসি,' তুমুল ঝড়কে ছাপিয়ে উঠল ব্যারনেসের চিৎকার, যেন এর আগে যা সে করতে বাধ্য হয়েছে সব অস্বীকার করতে চায়। 'জীবনে এই প্রথম, এবং শুধু তোমাকে।' রানার মনে হলো লিনার আত্মার গভীর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা কান্নারই একটা অংশ তার এই চিৎকার।

ঝড়ের কবলে পড়ে যেখানে ওরা গিয়ে পড়েছিল সেখান থেকে আবার ফিরে আসতে অনেক সময় লাগল ওদের, এক সময় আবার ওরা আলাদা দুটো অস্তিত্ব লাভ করল। এবং দু'জনেই উপলব্ধি করল, জীবনে আর কখনোই ওরা সম্পূর্ণভাবে আলাদা হতে পারবে না। আজকের এই মিলন ওদেরকে শুধু দৈহিক বন্ধনেই জড়ায়নি।

দশ

স্টার্নের কিনারা থেকে পানিতে অ্যাভন এস ডিঙ্গি নামাল রানা, তীরে পৌঁছে পাম গাছের সাথে বেঁধে রাখল সেটা।

দ্বীপের ভেতর দিকে হাঁটা ধরল ওরা, পরস্পরের হাত ধরে আছে, পথ করে নিল সামুদ্রিক পাখিদের তৈরি বাসাগুলোর মাঝখান দিয়ে। ছয় কি সাত প্রজাতির পাখি বিশ একর দ্বীপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ডিম পাড়ছে–কোনটা ম্লান নীল, হাঁসের ডিমের মত বড়; কোনটার গায়ে রঙচঙে ফোঁটা, লিচুর দানার মত আকার। গোটা দ্বীপ পাখা ঝাপটানো আর তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজে মুখর।

প্রতিটি প্রজাতির জুলজিক্যাল নাম জানা আছে ব্যারনেসের, কার কি অভ্যেস বা দৌড় সব তার নখদর্পণে। সহিষ্ণু কান পেতে তার কথা শুনে গেল রানা, বুঝতে অসুবিধে হলো না এই আলাপচারিতার সুযোগে লিনা আসলে ওর দায়ের করা অভিযোগের উত্তর তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

দ্বীপের শেষ প্রান্তে নিঃসঙ্গ একটা বিশাল টাকামাকা গাছ রয়েছে, সবুজ পাতা সহ বিশাল ডালগুলো ছায়া ফেলেছে সাদা বালিতে। ইতিমধ্যে তেতে উঠেছে রোদ, যেন গরম পানিতে ভেজানো উলেন কম্বল হয়ে জড়িয়ে রেখেছে ওদেরকে।

কৃতজ্ঞ চিত্তে টাকামাকার ছায়ায় আশ্রয় নিল ওরা, পাশাপাশি বসে চোখ মেলে

দিল লেগুনের শান্ত স্থির পানিতে। প্রধান দ্বীপটা অনেক, প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। এত দূর থেকে বাড়ি বা জেটি কিছুই দেখা গেল না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের তাজা আর নির্দোষ পৃথিবীর প্রথম পুরুষ আর প্রথম নারী বলে মনে হলো নিজেদেরকে রানার।

জেগে জেগে স্বপ্ন দেখায় বাধা দিল ব্যারনেস, তার একটা কথায় ধপ্ করে কঠিন বাস্তবে ফিরে এল ও।

'কে আমাকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছিল, রানা?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।

'কিভাবে দেয়া হয় নির্দেশটা?' আবার জিজ্ঞেস করল ব্যারনেস। 'নিজের সম্পর্কে বলার আগে এসব আমার জানতে হবে।'

'কেউ না,' বলল রানা।

'কেউ না? ওয়ার্নারকে খুন করার নির্দেশ সহ একটা চিরকুট পেয়েছিলে তুমি, সে ধরনের চিরকুট পাওনি?'

'না।'

'ওয়ার্নার, বা কার্ল রবসনের কাছ থেকে? তারা তোমাকে কাজটা করার অনুরোধ করেনি–বা পরামর্শ দেয়নি?'

'ড. ওয়ার্নার বিশেষভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন কাজটা করতে। তোমাকে স্পর্শ করা চলবে না–যতক্ষণ না তুমি হাতেনাতে ধরা পড়ো।'

'ব্যাপারটা তাহলে তোমার নিজের সিদ্ধান্ত ছিল?'

'ওটা আমার দায়িত্ব ছিল।'

'বন্ধুর ওপর নির্যাতনের প্রতিশোধ?'

'হ্যাঁ, সেটা একটা কারণ ছিল,' বলল রানা। 'কিন্তু তার আগে অন্য কারণও তৈরি হয়েছিল। জিরো-সেভেন-জিরো হাইজ্যাক করার পর রক্তপাত ঘটে, যারা দায়ী তাদেরকে শাস্তি দেয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করেছিলাম আমি। পরে আরও কারণ যোগ হয়–ব্যারন অটারম্যান হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ। তাছাড়া, খলিফা অশুভ একটা শক্তি, শ্বেতাঙ্গ ছাড়া বাকি সবাইকে ধ্বংস করে দুনিয়াকে নিজেদের জন্যে স্বর্গ বানাতে চায়, একজন অশ্বেতাঙ্গ হিসেবে আমার দায়িত্ব তাকে খতম করা।'

'খলিফা আমাদের সম্পর্কে জানে। নিজেদের আমরা যতটা বুঝি, আমাদেরকে তারচেয়ে ভাল ভাবে বোঝে সে। আমি কাওয়ার্ড নই, রানা, কিন্তু এখন আমি সত্যি ভয় পাচ্ছি।'

'তার ব্যবসার মূলধনই তো ভয়,' বলল রানা, লক্ষ করল একটু কাছ ঘেঁষে এল লিনা–শারীরিক সংস্পর্শের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তার নগ্ন কাঁধে একটা হাত রাখল ও, ওর গায়ের ওপর হালকাভাবে ঢলে পড়ল ব্যারনেস।

'কাল রাতে তুমি যা বলেছ সব সত্যি, শুধু অনুমান আর কল্পনাগুলো মিথ্যে। বাবার মৃত্যু, তারপর এর-তার বাড়িতে নিঃসঙ্গ সময় কাটানো–চাদরের তলায় মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার ইতিহাস। পোল্যান্ড ফিরলাম, ওখান থেকে আমাকে ওডেসায় নিয়ে যাওয়া হলো–সবই সত্যি, এবং তিক্ত অভিজ্ঞতা। ওডেসা কলেজে

কিভাবে ট্রেনিং দেয়া হয় তুমি জানো না,' শিউরে উঠল ব্যারনেস। 'একদিন তোমাকে ওডেসার গল্প শোনাব।'

'আমার আগ্রহ নেই।'

'বলতে না হলে বেঁচে যাই। প্যারিসে আসার পর কি ঘটল শুনবে?'

'শুধু যেটুকু প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ, রানা, পুরুষমানুষ ছিল। পুরুষদের মুগ্ধ করার ট্রেনিংই তো দেয়া হয়েছিল আমাকে। হ্যাঁ, ওদের সাথে মিশেছি বৈকি...,' থেমে গিয়ে দু'হাতে রানার গাল ধরল ব্যারনেস, নিজের দিকে ফেরাল মুখটা যাতে ওর চোখ দেখতে পায়। 'তাতে কি আমাদের সম্পর্ক বদলে যাবে, রানা?'

'আমি তোমাকে ভালবাসি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা।

চাতুর্য বা ছলনার সন্ধানে অনেকক্ষণ রানার চোখে তাকিয়ে থাকল ব্যারনেস, কিন্তু কিছুই না পেয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ। ব্যাপারটা তাই। মনের কথাই বলেছ।' স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে রানার কাঁধে মাথা ঠেকাল সে; মৃদু কণ্ঠে কথা বলে গেল, যেন গুনগুন করছে।

'কিন্তু ওদের কাউকে আমি পছন্দ করতাম না, রানা। সেজন্যেই আমি মিডো অটারম্যানকে বেছে নেই। অনেক পুরুষের সাথে মিশছি, কিন্তু কারও কাছ থেকে না কিছু পাচ্ছি, না কাউকে কিছু দিতে পারছি–তারচেয়ে একজন লোককে যদি বেছে নিতে পারি, নিজের ওপর শ্রদ্ধা ফিরে আসবে।' মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল ব্যারনেস। 'অটারম্যানকে বেছে নিলাম, কে.জি.বি. আমাকে সমর্থন করল। কাজটা ভারী জটিল ছিল। প্রথমে আমাকে তার শ্রদ্ধা অর্জন করতে হয়েছে। অটারম্যান আগে কখনও কোন মেয়েকে শ্রদ্ধা করেনি। ধীরে ধীরে আমি প্রমাণ করলাম, সম্ভাব্য যে-কোন কাজে পুরুষের মতই যোগ্য আমি, আমাকে দিয়ে সব কাজ করাতে পারে সে, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক। তার শ্রদ্ধা অর্জনের পর বাকি সব পানির মত সহজ হয়ে গেল।

'নিয়তি কাকে যে কিভাবে নিয়ে খেলে। প্রথম আবিষ্কার করলাম, লোকটাকে আমি পছন্দ করি। তারপর দেখলাম, তার প্রতি আমারও শ্রদ্ধা জন্মাচ্ছে। কুৎসিতদর্শন একটা ষাঁড়, গায়ে হারকিউলিসের মত জোর, আর ব্যক্তিত্বের শক্তি ছিল কসমিক পাওয়ারের সমান। তার এই শক্তি, প্রভাব, আর ক্ষমতাকে আমি পুজো করতে শুরু করি।' মুখ তুলে রানার চোয়ালে আঙুল বুলাল ব্যারনেস, তারপর মাথাটা আরও একটু তুলে ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল। 'না, রানা, তার প্রতি আমার ভালবাসা জন্মায়নি। তোমার আগে কাউকে আমি ভালবাসিনি। অটারম্যানকে আমার জাদুকর বলে মনে হত, ভয় মেশানো শ্রদ্ধা ছিল তার প্রতি। বর্বর আদিবাসী যেমন বজ্রপাত আর বিদ্যুৎচমকের দিকে সভয়ে তাকিয়ে ভাবে ঈশ্বরের লীলা, আমিও ঠিক তেমনি অটারম্যানের দিকে তাকিয়ে ভাবতাম লোকটার ক্ষমতার কি কোন শেষ-সীমা নেই? সে আমার অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে–একজন বাবা, একজন শিক্ষক, একজন গুরুর মত, প্রায় একজন ঈশ্বরের মত–কিন্তু কখনোই একজন প্রেমিকের মত নয়।

'অটারম্যান শক্তিশালী ছিল, কিন্তু তার শক্তি সে ক্ষয় করতে জানত

না-এরকম একটা মানুষ কাউকে ভালবাসবে কিভাবে!' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে রানার দিকে তাকাল ব্যারনেস। 'কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ কি, রানা? নাকি ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারলাম না?'

'না,' আশ্বস্ত করল রানা, 'ভালই বলতে পেরেছ।'

'শারীরিকভাবে সে আমাকে টানত না-তার গন্ধ বা গা ভরা রোম। বিশাল ভুঁড়ি ছিল, লোহার মত শক্ত-,' মুহূর্তের জন্যে শিউরে উঠল ব্যারনেস। '-তবে এসব অগ্রাহ্য করার ট্রেনিং নেয়া ছিল আমার। কিন্তু সে আমাকে আলাদা একটা জগৎ দেখবার সুযোগ করে দেয়। সেটা ক্ষমতা আর টাকার জগৎ। স্বীকার করছি, রানা এই দুটো জিনিস পছন্দ করি আমি। অটারম্যান আমাকে শেখাল, কিভাবে টাকা থেকে ফায়দা লুটতে হয়। শেখাল, বিলাসিতা কাকে বলে। সুন্দর জিনিস কিভাবে অর্জন করতে হয়, কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, কিভাবে অন্য সবার চেয়ে সুন্দর আর ভালভাবে বাঁচতে হয়। প্রায়ই সে আমাকে হাসতে হাসতে বলত, 'আমার প্রিয় কমিউনিস্ট লেডি!'

'হ্যাঁ, রানা, আমি নই, সে-ই আমাকে বোকা বানায়। আমি কে, প্রথম থেকেই জানত সে। জানত, ওডেসায় ট্রেনিং দেয়া হয়েছে আমাকে। আমাকে সে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিল। অবশ্যই ভালবাসত-অন্তত এ-কথা বলা যায়, সে তার মত করে ভালবাসত। কিন্তু জেনেশুনেই তার সাম্রাজ্যের ভেতরে আমাকে ঢুকতে দিয়েছিল সে, চেয়েছিল আমার আদর্শ আর রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় ফাটল ধরাবে। শুধু তখনই জানতে পারলাম, মস্কোয় পাঠানো আমার প্রতিটি তথ্যের ওপর চোখ বুলিয়েছে অটারম্যান, নিজে সেন্সর করেছে। অটারম্যান মোসাড ছিল, তা-ও তুমি জানো। জানো, সে ইহুদি ছিল। এবং আমাকে সে ভাবতে শেখাল আমিও একজন ইহুদি।

'ভয় পেয়ো না, রানা,' রানাকে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি বলল ব্যারনেস। 'আমি খ্রিস্টান নই, মুসলমান নই, তেমনি ইহুদিও-কোন ধর্মের ওপর আমার অবিশ্বাস নেই, অর্থাৎ মেনে চলার মত বিশ্বাস কোন ধর্মের ওপরই নেই আমার। অবশ্যই এখনকার কথা আলাদা।

'ভালবাসা মানুষকে বদলে দেয়। আমার জীবনে এ জিনিস এই প্রথম এসেছে। নরম কাদার মত হয়ে গেছি। পছন্দমত যে-কোন আদলে আমাকে তুমি গড়ে নিতে পারো।

'অটারম্যান যত দিন বেঁচে ছিল, তার শিক্ষা আমি ভুলিনি-একজন ইহুদি হয়েই তার সাথে ছিলাম। ইউনিভার্সাল কমিউনিজমের গুরুতর গলদগুলো আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সে, পরিচয় করিয়ে দেয় গণতন্ত্র আর পশ্চিমা জগতের ক্যাপিটালিস্টিক সিস্টেমের সাথে। আর তারপর ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স মোসাডের একজন এজেন্ট বানাল আমাকে...' আবার থামল ব্যারনেস, ঘন ঘন মাথা নাড়ল।

'তার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে আছি, রানা। কি করে তাকে আমি ধ্বংস করার কথা ভাবতে পারি! আমি তাকে কিডন্যাপ করব কি করে হয়! শেষ দিকে, যখন তার আয়ু ফুরিয়ে আসছে, লোকটা ভারী দুর্বল হয়ে পড়েছিল-প্রচণ্ড ব্যথা

হত, চাইত সারাক্ষণ আমি তার পাশে থাকি। তখন, রানা, বলতে পারো প্রায় ভালবেসে ফেলেছিলাম–মা যেমন তার সন্তানকে ভালবাসে। বেচারা এমন নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল আমার ওপর, দেখে মায়া হত–সে বলত, শুধু আমার স্পর্শ পেলে তবু কিছুটা ব্যথা কমে তার।

'তার সেই লোমে ঢাকা পেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত বুলাতাম, অনুভব করতাম কুৎসিত জিনিসটা তার ভেতর প্রতিদিনই একটু একটু করে বড় হচ্ছে। কাটাছেঁড়া করতে রাজি করানো যায়নি। ওদেরকে সে দু'চোখে দেখতে পারত না, বলত, "ব্যাটারা সব কসাই"।'

না তাকিয়েও, শুধু ব্যারনেসের ধরা গলা শুনে রানা বুঝতে পারল, তার চোখ পানিতে ভরে উঠেছে। আরও দৃঢ়ভাবে তাকে আলিঙ্গন করল ও, অপেক্ষা করে থাকল কখন নিজেকে সামলে নেবে।

'নিশ্চয় ওই সময়টাতেই তার সাথে যোগাযোগ করেছিল খলিফা। এখন স্মরণ করতে গিয়ে মনে পড়ছে, তখন হঠাৎ করে দুশ্চিন্তায় ভুগতে শুরু করে অটারম্যান। ব্যাপারটা আমার বোধগম্য হয়নি। ইন্টারন্যাশনাল টেরোরিজম সম্পর্কে কথা বলত, এত রেগে যেত যে ভয় পেয়ে যেতাম আমি। শত্রু তখন বোধহয় খলিফা নামটা ব্যবহার করেনি। বেঁচে থাকলে অটারম্যান আমাকে যোগাযোগের ব্যাপারটা জানাত, আমি জানি। কিন্তু সে সুযোগ খলিফা তাকে দেয়নি।'

মুখ দেখার জন্যে রানার আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে চোখ তুলল ব্যারনেস।

'তোমাকে বুঝতে হবে, শেরি, এসব আমি ইদানীং জেনেছি–গত কয়েক হপ্তায়। বিচ্ছিন্নভাবে জেনেছি, এখন জোড়া লাগাচ্ছি–তবে ঘটেছিল ঠিক এরকমই। একটা প্রস্তাব নিয়ে অটারম্যানের সাথে যোগাযোগ করে খলিফা। সহজ একটা প্রস্তাব–খলিফার পার্টনার হতে পারে অটারম্যান। খলিফার যুদ্ধ-খাতে অটারম্যানকে মোটা অঙ্কের চাঁদা দিতে হবে, আর তার প্রভাব, প্রতিপত্তি, যোগাযোগ, এবং তথ্য সংগ্রহের উৎস ব্যবহার করতে হবে খলিফার স্বার্থে। বদলে খলিফার স্বপ্ন নতুন জগৎটাকে গড়ার কাজে পরামর্শ দিতে পারবে অটারম্যান, জগৎটার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে খলিফার পাশাপাশি তার নামও স্থান পাবে।

'হিসেবে ভুল করেছিল খলিফা, সম্ভবত এখন পর্যন্ত এটাই তার একমাত্র ভুল। অটারম্যান তাকে প্রত্যাখ্যান করে। সাথে সাথে বিপদটা দেখতে পেল খলিফা। অটারম্যানকে কনভিন্স করানোর জন্যে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিল সে। কারণ ছদ্মনাম, গোপন পরিচয় ইত্যাদি ছেলেমানুষি ব্যাপার সহ্য করার লোক অটারম্যান ছিল না। কাজেই অটারম্যানের সামনে সশরীরে আসতে হয়েছিল তাকে। কিন্তু আলোচনায় কোন ফল হলো না, ফিরে গেল খলিফা। এরপর অটারম্যানকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে না দিয়ে তার কোন উপায় ছিল না।

'তাকে টরচার করা হয় গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্যে, আমার ধারণা। সম্ভবত মোসাড সম্পর্কে সব কথা জানতে চায় খলিফা। স্বামীকে ফেরত পাবার জন্যে মুক্তিপণের টাকা নিয়ে একাই গেলাম আমি, আর কারও ওপর আমার বিশ্বাস ছিল না। এক ঢিলে দুটো পাখি মারল খলিফা–অটারম্যানকে সরাল, যুদ্ধ খাতের জন্যে

পঁচিশ মিলিয়ন ডলারও হাতিয়ে নিল।'

'এ-সব তুমি জানলে কিভাবে? আরও আগে যদি জানাতে আমাকে–,' তিক্ত কণ্ঠে শুরু করল রানা।

'আমাদের যখন প্রথম দেখা হলো, এ-সব কিছুই আমি জানতাম না, শেরি–কসম! কিভাবে জানলাম বলব, কিন্তু প্লীজ, তাড়া দিয়ো না। যে ভাবে ঘটেছে সেইভাবে বলতে দাও আমাকে।'

'আমি দুঃখিত,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা।

'মুক্তিপণের টাকা দিতে গিয়ে প্রথম আমি খলিফা নামটা শুনলাম। আগেই তোমাকে জানিয়েছি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এবার তাহলে তোমার প্রসঙ্গে আসা যাক। জিরো-সেভেন-জিরো হাইজ্যাক হওয়ার পর প্রথম শুনলাম নামটা। এই দেখো, রিয়্যাকশনটা স্মরণ করে আবার আমার গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।' রানার চোখের সামনে একটা হাত তুলল ব্যারনেস, রানা দেখল লোমকূপের গোড়া থেকে সূক্ষ্ম সূঁচের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ওগুলো। 'আচ্ছা, কেউ তোমাকে বলেছে, মাসুদ রানা নামটার মধ্যে ইস্পাত, ড্রাগস, বীর্য, আর রতিশক্তি ঠাসা আছে? ভাবলাম, এমন সুন্দর যার নাম, লোকটা না জানি কেমন!'

'তারমানে বলতে চাইছ দেখার আগেই তুমি আমার প্রেমে…?'

'ঠিক প্রেমে পড়িনি, তবে প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করেছিলাম। তারপর তোমার পেশা আর গুণেরও পরিচয় পেলাম। তখনই চিন্তাটা এল মাথায়–খলিফাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো। তোমার সম্পর্কে আরও খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলাম। এমনকি একটা কম্পিউটার প্রিন্ট-আউট-ও যোগাড় করে ফেলি।' থামল ব্যারনেস, চোখের তারায় দুষ্টামির ঝিলিক খেলে গেল। 'তোমার বান্ধবীর সংখ্যা আর তাদের স্ট্যাটাস সত্যি আমাকে মুগ্ধ করেছিল…'

'এ-প্রসঙ্গ থাক…'

'আমি তোমার প্রশংসা করছি, শেরি–এরকম না হলে রুচি! তবে এখন থেকে তোমাকে মনে রাখতে হবে, কে তোমার প্রেমে পড়েছে, আর কাকে তুমি ভালবেসেছ।'

হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল রানা। 'যা হবার হয়েছে, আর হবে না। এ-প্রসঙ্গে আর একটাও কথা নয়–রাজি?'

'রাজি।' হি হি করে হেসে উঠল ব্যারনেস। 'বকবক করে ব্যথা এনে ফেলেছি গলায়। খিদেও পেয়েছে ভীষণ…'

আবার ওরা হাত ধরাধরি করে দ্বীপের আরেক প্রান্তে চলে এল, ডিঙ্গিতে চড়ে ফিরে এল ক্রীশ-ক্রাফটে। শেফ দুনিয়ার উপাদেয় খাবার দিয়ে ভরে দিয়েছে রেফ্রিজারেটর, নিজের হাতে ভিউভ ক্লিকোৎ শ্যাম্পেনের একটা বোতল খুলল ব্যারনেস।

'তোমার রুচি ভীষণ খরুচে,' মন্তব্য করল রানা। 'আমার যা বেতন তাতে

তোমাকে পুষতে পারব কিনা সন্দেহ হয়।'

'দু'জন মিলে তোমার বসকে বেতন বাড়াবার জন্যে চাপ দেব,' চোখে কৌতুকের ঝিলিক নিয়ে বলল ব্যারনেস, বস্‌ বলতে নিজেকেই বোঝাল সে। 'আর তাকে আমি যতটুকু চিনি, গোটা কতক ব্যবসাই হয়তো সে তোমাকে লিখে দেবে।' রানা তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কিছু বলতে যাচ্ছে লক্ষ করে ওকে বাধা দিল সে, 'জানি, জানি–বসের কাছ থেকে তুমি হয়তো কিছুই নিতে চাইবে না। সেক্ষেত্রে প্রতি মাসে আমার কাছ থেকে ধার করতে হবে তোমার–রাতে শোধ দিয়ো।' অলিখিত চুক্তির মত খাবার সময়টা ভুলেও কেউ ওরা খলিফার নাম উচ্চারণ করল না।

অবশেষে আবার ওরা পাশাপাশি বসল, বাল্কহেডে হেলান দিল রানা, ওর কাঁধে মাথা ঠেকাল ব্যারনেস। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজে দু'টান দিল, তারপর রানার ঠোঁটে গুঁজে দিল সেটা।

'আরেকটা ব্যাপার তোমাকে বুঝতে হবে, রানা। আমি মোসাডের একজন, কিন্তু ওদের আমি নিয়ন্ত্রণ করি না। ওরা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অটারম্যানের ব্যাপারটাও তাই ছিল। দু'জনেই আমরা অত্যন্ত মূল্যবান এজেন্ট ছিলাম, আমি এখনও আছি, কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমার নেই, ওদের সমস্ত গোপন তথ্য জানার সুযোগ আমি পাই না।

'তুমি একটা ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কের প্রধান হিসেবে মোসাড সম্পর্কে অনেক কথা জানো, রানা। কিন্তু আমার চেয়ে বেশি জানো না। আর সব ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির মত মোসাডের কাজও স্বদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মোসাডের কাজের ধারা রোমহর্ষক, ওদের নীতির কোন বালাই নেই। মধ্যপ্রাচ্যে গোলমাল বাধিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজনে ওরা খোদ শয়তানের সাথেও হাত মেলাবে। এমন কোন কুকর্ম নেই যা ওদের দ্বারা সম্ভব নয়...'

'অথচ ওদের সাথে আছ তুমি–কেন, লিনা?'

'কে.জি.বি-র খপ্পর থেকে বেরিয়ে আজও আমি বেঁচে আছি, কারণটা বুঝতে পারছ না, রানা? মস্কো আমার গায়ে হাত দেয়ার সাহস পাচ্ছে না; কেন? কারণ মোসাড ভয়ঙ্কর, ওদেরকে কে.জি.বি-ও ভয় করে। যেদিন থেকে আমি কমিউনিস্ট থাকলাম না সেদিন থেকে আমাকে ইহুদি সাজতে হলো, বুঝতে পারছ না?'

'তারমানে কি তুমি বলতে চাইছ, আরও শক্তিশালী কোন এজেন্সি যদি তোমাকে প্রোটেকশন দেয়, মোসাড থেকে বেরিয়ে আসবে তুমি?'

মুখ হাঁড়ি করল লিনা। 'এ-ধরনের প্রশ্ন যা করার করেছ, আর কখনও করবে না।'

একটু থতমত খেয়ে গেল রানা। 'কি হলো বুঝলাম না।'

'তোমাকে ভালবাসার পর আমার নিজের কোন ইচ্ছে বা সিদ্ধান্ত থাকতে পারে কি, বিশেষ করে এ-ধরনের গুরুতর বিষয়ে? তুমি যা চাইবে তাই হবে, শেরি। প্রশ্ন চাই না, তোমার নির্দেশ চাই।'

'কৃতার্থ বোধ করছি,' সন্তুষ্টচিত্তে বলল রানা।

'আমি নিশ্চিতভাবে জানতাম, খলিফার পরিচয় সম্পর্কে মোসাডে রিপোর্ট করে

অটারম্যান, তার প্রস্তাব সম্পর্কেও বিস্তারিত জানায় ওদেরকে। সন্দেহ করি, খলিফার সাথে সহযোগিতা করার জন্যে অটারম্যানকে হুকুম করে মোসাড।'

'কেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'সঠিক জানি না–তবে দুটো কারণ আন্দাজ করতে পারি। খলিফা নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি যার সাহায্য মোসাডের জন্যে মূল্যবান। আমার মনে হয়েছে, ইসরায়েলের প্রতি একটু সহানুভূতি আছে খলিফার। লোকটা ইহুদি কিনা আমার জানা নেই, তবে হলে আশ্চর্য হব না। আগেই বলেছি, প্রয়োজনে শয়তানের সাথেও বন্ধুত্ব করতে পারে মোসাড, তাদের নীতির কোন বালাই নেই। তারা খলিফার সাথে হাত মেলাবার জন্যে হুকুম করল অটারম্যানকে···কিন্তু···'

'কিন্তু?'

'কিন্তু অটারম্যানের মত একজন মানুষকে দিয়ে তার আদর্শের বিরুদ্ধে কেউ কিছু করিয়ে নিতে পারে না। সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া ছিল সে। তাকে তুমি পুঁজিপতি বলতে পারো, ইহুদি বলে নিন্দা করতে পারো, ক্ষমতালিপ্সু বলতে পারো, কিন্তু আমি তো জানি অন্তরে লোকটা ছিল একজন গ্রেট হিউম্যানিস্ট। তখনকার তার সেই দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের কারণ আজ আমি বুঝতে পারি। মোসাডের নির্দেশ সে মেনে নিতে পারছিল না। খলিফাকে ধ্বংস করার চিন্তা পেয়ে বসেছিল তাকে। এ-ধরনের একটা অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করা তার দায়িত্ব বলে মনে করেছিল সে···'

গ্লাস সহ হাতটা লিনার মুখের সামনে ধরল রানা, শ্যাম্পেনে মৃদু একটা চুমুক দিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল ব্যারনেস। তারপর আবার শুরু করল, 'খলিফা যেভাবে হোক জেনে যায়, আমি একজন বিপজ্জনক মিত্র পেয়েছি। রবুঁইলের সেই রাতে সে তোমাকে খুন করার জন্যে অ্যামবুশ পাতল···'

'ওরা তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল, লিনা,' বাধা দিয়ে বলল রানা।

'কারা, রানা? কারা আমাকে খুন করতে চেয়েছিল?'

'কে.জি.বি.। ওরা তোমার কথা ভোলেনি।'

'ভোলেনি, হ্যাঁ।' মাথা একদিকে একটু কাত করে চোখ ছোট করে চিন্তামগ্ন হলো ব্যারনেস। 'কথাটা আমিও ভেবেছি, আগেও দু'বার আমার ওপর হামলা করা হয়েছিল। কিন্তু রবুঁইলে রোডে ওটা কে.জি.বি-র অ্যামবুশ ছিল না, রানা।'

'ঠিক আছে, তাহলে খলিফাই–কিন্তু তোমাকে, আমাকে নয়।'

'হয়তো, তবে তা-ও আমি মনে করি না। আমার মন বলে, টার্গেট করা হয়েছিল তোমাকেই।'

'মেনে নিতে হয় আমাকে,' বলল রানা। 'তোমাকে বলা হয়নি–সেদিন প্যারিস থেকে আমাকে অনুসরণ করা হয়েছিল।' সিট্রেনের কথাটা বিশদ ব্যাখ্যা করল ও। 'ওরা জানত, মাসেরাতিতে আমি একা আছি।'

'তাহলে আর কোন সন্দেহ থাকল না–খলিফারই কীর্তি ছিল ওটা, এবং টার্গেট ছিলে তুমি।'

'কিংবা মোসাড,' বিড়বিড় করে বলল রানা, সেই সাথে ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল ব্যারনেসের চোখ জোড়া। 'তাদের সেরা স্টার এজেন্টের পাশে মোসাড

একজন ইসরায়েল বিরোধীকে দেখতে চাইবে না। খলিফা যদি ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, মোসাড চাইবে না তুমি খলিফাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমার সাহায্য পাও।'

'রানা, এখানে পানি খুব গভীর...'

'আর ঝাঁক ঝাঁক হাঙরও ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'রঁবুইলে রোডের ঘটনাটা আপাতত বাদ দাও,' বলল ব্যারনেস। 'আমি যে গল্প তোমাকে শোনাতে চাইছি, তাতে ওটা জটিলতা সৃষ্টি করছে।'

'বেশ,' রাজি হলো রানা। 'দরকার হলে আবার ফেরা যাবে।'

'পরবর্তী গুরুতর তৎপরতা ছিল সোহেলকে কিডন্যাপ করা,' বলল ব্যারনেস, সেই সাথে বদলে গিয়ে পাথুরে হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'খলিফা যে-ই হোক, তোমার সম্পর্কে বিস্তারিত সমস্ত খবর তার জানা ছিল,' বলে চলল ব্যারনেস। 'বন্ধু সোহেলকে বাঁচানোর জন্যে তুমি অন্যায় অপরাধ করার কথাও ভাবতে পারো, তা সে জানত।

'ইতিমধ্যে নিজের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছি আমি, তোমাকে ভালবাসি—উপহারটা তারই স্বীকৃতি ছিল।' ঠিক উপহার ছিল না ওটা, ছিল ডকুমেন্টস। মিডো শীলের দুই পার্সেন্ট শেয়ার রানার নামে লিখে দিয়েছিল ব্যারনেস। 'ওটাই ছিল আমার জীবনে কাউকে দেয়া প্রথম লাভ গিফট,' কিশোরী মেয়ের মত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল ব্যারনেস। 'সেদিন থেকে তোমার সুখ তোমার দুঃখ আমার সুখ আমার দুঃখ হয়ে গেল। সোহেল আমার কেউ না, তাকে আমি চোখের দেখাও দেখিনি, কিন্তু তার জন্যে দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হয়ে পড়লাম আমি। অসুস্থ হবার আরও একটা কারণ ছিল, সে কিডন্যাপ হওয়ায় নিজেকে আমার দায়ী মনে হচ্ছিল। খলিফার পিছনে লাগার জন্যে তোমাকে আমি রাজি করিয়েছি, আর সেজন্যেই তো বন্ধুকে হারাতে বসেছ তুমি।'

নিজের অজান্তেই নিচু হয়ে এল রানার মাথা; মনে পড়ে গেছে ব্যারনেসকে দায়ী বলে ভেবেছিল ও।

'হ্যাঁ,' রানার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল লিনা, 'কঠিন একটা আঘাত পাই আমি। তুমি ভাবতে পারলে কিভাবে এ-ধরনের কাজ আমার দ্বারা হতে পারে! সোহেলকে ফিরিয়ে আনার জন্যে নরকে পর্যন্ত যেতে রাজি ছিলাম আমি, কিন্তু চারদিকে শুধু অন্ধকার দেখতে লাগলাম, কিছুই করার ছিল না আমার। ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স বলল, তারা কিছু জানে না। আর মোসাডে আমার কন্ট্রোল রহস্যময় আচরণ শুরু করল, কোথাও তাকে পাওয়াই গেল না। কেন যেন আমার মনে হয়েছিল, কিডন্যাপিঙের সাথে মোসাডের সম্পর্ক থাকতে পারে, তারা যদি সরাসরি জড়িত না-ও হয়, ব্যাপারটা সম্পর্কে আর সবার চেয়ে বেশি জানে তারা।'

'তোমাকে আমি আগেই বলেছি, খলিফার পরিচয় মোসাডকে জানিয়ে দিয়েছিল অটারম্যান। ভাবলাম, তাহলে মোসাড নিশ্চয়ই এমন কিছু জানে যা সোহেলকে উদ্ধারে তোমার সাহায্যে লাগবে। কিন্তু প্যারিসে বসে তথ্য সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। বাধ্য হয়ে ইসরায়েলে যেতে হলো আমাকে, উদ্দেশ্য আমার কন্ট্রোলের সাথে সামনাসামনি কথা বলব...'

'তুমি ইসরায়েলে গিয়েছিলে!'

'যেতে হয়েছিল, আর কোন উপায় ছিল না–তোমাকে সাহায্য করার জন্যে আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। আমি জানতাম, মোসাড আমাকে সাহায্য করতে চাইবে না। আমি খালি হাতে যাইনি, সাথে অস্ত্র ছিল। সোহেলকে ফিরে পেতে ওরা সাহায্য না করলে কি করতে হবে জানা ছিল আমার...'

'তুমি–তুমি মোসাড থেকে পদত্যাগ করার হুমকি দিয়েছিলে?'

'দেব না? তা না হলে ওরা সাহায্য করতে রাজি হবে না জানতাম...'

'আমার জন্যে তুমি এতটা...'

'ধ্যেৎ, তুমি বুঝবে না। আমি ভালবাসি, আর ভালবাসার জন্যে মানুষ কি না করতে পারে!'

'আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

উত্তর না দিয়ে আবার প্রসঙ্গে ফিরে এল ব্যারনেস, 'সব কিছু আমি প্যারিসে রেখে গিয়েছিলাম। প্রয়োজনে অদৃশ্য হবার পরীক্ষিত একটা কৌশল আছে আমার। শীয়ারে করে রোমে নিয়ে গেল আমাকে পল বার্না, ওখান থেকে তোমাকে আমি ফোন করলাম। কিন্তু কি করতে যাচ্ছি তোমাকে বলার উপায় ছিল না। তারপর আমি পরিচয় বদলে একটা কমার্শিয়াল ফ্লাইটে চড়ে তেল আবিবে চলে গেলাম।

'ইসরায়েলে আমার কাজটা ছিল কঠিন, যতটা ভেবেছিলাম তারচেয়ে অনেক কঠিন। আমার সাথে দেখা করতে পাঁচ দিন সময় নিল কন্ট্রোল। তার সাথে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, অনেক দিনের। না, হয়তো বন্ধুত্বের সম্পর্ক নয়, তবে পরস্পরকে আমরা অনেক বছর ধরে চিনি। মোসাডের একজন ডেপুটি ডিরেক্টর সে। এরকম একজন গুরুত্বপূর্ণ কন্ট্রোলারের অধীনে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে ওরা আমাকে, এ-থেকেই বোঝা যায় ওদের কাছে কতটা মূল্যবান আমি। অথচ তবু পাঁচ দিন বসিয়ে রেখে দেখা করতে দেয়া হলো আমাকে। দেখলাম, কন্ট্রোল ঝিম মেরে আছে, ঠাণ্ডা। বলল, তারা কোন সাহায্য করতে পারবে না। কারণ, তারা নাকি কিছু জানে না।

'আমি যখন সত্যি মরিয়া হয়ে কিছু চাই, আমার তখনকার চেহারা তুমি দেখোনি, রানা। ইসরায়েলের মাটিতে বসে মোসাডের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম আমি। আহ্, কি একখানা যুদ্ধ! মোসাডের এমন অনেক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জানি আমি, যা প্রকাশ হয়ে পড়লে ইসরায়েলের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো হাইড্রোজেন বোমার মত বিস্ফোরিত হবে–যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স। হুমকি দিয়ে বললাম, সোজা নিউ ইয়র্কে গিয়ে প্রেস কনফারেন্স ডাকব। আমার কন্ট্রোল আরও নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বলল, কারও ব্যক্তিগত অনুভূতির চেয়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এরপর আমি শেষ অস্ত্রটা ছাড়লাম, অসম্ভব কিছু কাজ দেয়া হয়েছে আমাকে, সেগুলোয় হাত দিয়েছি, কিন্তু ওগুলো চিরকাল অসম্ভবই থেকে যাবে। একটু গরম হলো কন্ট্রোল।

'কিন্তু এ-সবের পিছনে সময় নষ্ট হচ্ছিল–দিনের পর দিন পেরিয়ে গেল, আর আমি ছটফট করতে লাগলাম। ধর্মে আমার বিশ্বাস নেই, রানা, কিন্তু জানো

সোহেলকে যাতে তুমি উদ্ধার করতে পারো তার জন্যে অনেক প্রার্থনা করেছি আমি। প্রতিটি মুহূর্ত চেয়েছি এই বিপদের সময় তোমার পাশে থাকি। মনে হত শুধু যদি একবার অন্তত তোমার গলা শুনতে পেতাম। কিন্তু তেল আবিব থেকে ফোন করা সম্ভব ছিল না, আমার কাভার ফাঁস হয়ে যেত। কি দুঃসহ সময় যে কাটছিল ওখানে...।

'অবশেষে মোসাড আমাকে দু'একটা তথ্য দিতে রাজি হলো। প্রথমে কন্ট্রোল স্বীকারই করল না যে তারা খলিফার নাম শুনেছে। কিন্তু আমি একটা ঝুঁকি নিয়ে মিথ্যে কথা বললাম তাকে। বললাম, অটারম্যান আমাকে বলে গেছে খলিফার পরিচয় মোসাডকে জানানো হয়েছে। এবার একটু নরম হলো সে। হ্যাঁ, স্বীকার গেল-খলিফা সম্পর্কে তারা জানে, কিন্তু তার পরিচয় জানে না। কিন্তু আমার হাতুড়ি থেমে নেই, জেদ ধরলাম প্রতিদিন কন্ট্রোলকে আমার সাথে দেখা করতে হবে। এক সময় রেগে গেল সে, ভয় দেখাল ইসরায়েল থেকে বের করে দেয়া হবে আমাকে। তবে যত বার দেখা হলো, প্রতিবার এক-আধটা তথ্য তার কাছ থেকে বের করতে পারলাম আমি।

'শেষে পরাজয় মানল সে, বলল হ্যাঁ, খলিফাকে তারা চেনে, কিন্তু সে খুব বিপজ্জনক, সাংঘাতিক ক্ষমতাবান...ঈশ্বর চাইলে আরও ক্ষমতা আসতে যাচ্ছে তার হাতে, এককভাবে দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে সে, এবং লোকটা ইসরায়েলের একজন বন্ধু। অন্তত মোসাড তাই বিশ্বাস করে।

'আমি জোঁকের মত তাকে ধরে ঝুলে থাকলাম। এরপর সে জানাল, খলিফার কাছাকাছি একজন এজেন্টকে পাঠিয়েছে তারা। এজেন্ট লোকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু খলিফা তার পরিচয় জেনে ফেললে স্রেফ মারা পড়বে সে। এই পরিস্থিতিতে মোসাড যদি আমাকে কোন তথ্য দেয়, তথ্যটা কোত্থেকে ফাঁস হলো জানতে চেষ্টা করবে খলিফা, এবং স্বভাবতই মোসাডের সেই এজেন্টের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে। অর্থাৎ মোসাড নিজের এজেন্টকে রক্ষার জন্যে এ-ধরনের কোন ঝুঁকি নেবে না।

'আবার আমি তাকে হুমকি দিলাম। এবার সে এজেন্টের কোড নেম জানাল আমাকে। তার সাথে যদি কখনও আমি যোগাযোগ করি, কোড নেমটা ব্যবহার করব, তাহলে দু'জনেরই নিরাপত্তা অটুট থাকবে। কোড নেমটা হলো-ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার।'

'ব্যস, এইটুকু মাত্র?' হতাশ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, আমার কন্ট্রোল আরও দুটো নাম জানাল-সান্ত্বনা হিসেবে। বলল, এদের কাছ থেকে দূরে এবং সাবধানে থাকতে হবে। এই নামের লোক দু'জন নাকি খলিফার এত কাছাকাছি, আসলে এদেরকেই খলিফা বলা যেতে পারে। নামগুলো বলার আগে আবার সে স্মরণ করিয়ে দিল, দিচ্ছে শুধু আমার প্রোটেকশনের কথা ভেবে।'

'নামগুলো....

'তোমার নাম,' নরম গলায় বলল ব্যারনেস। 'রানা।'

বিরক্তিসূচক শব্দ করে রানা বলল 'স্রেফ ধোঁকা দিয়েছে তোমাকে। আমি

কেন সোহেলকে কিডন্যাপ করতে যাব? আর, ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার-ছদ্মনাম জানা না জানা সমান কথা। দ্বিতীয় নামটা বলছ না যে?'

'সে তোমার আরেকজন বন্ধু...ভিনসেন্ট গগল।'

'হোয়াট! গগল? কি বলছ তুমি, লিনা!'

শ্রাগ করল ব্যারনেস। 'আমি না, আমার কন্ট্রোল বলেছে। বিশেষ করে গগলের কথা বলেছে সে। সে বলেছে, খলিফা আর গগল প্রায় সমার্থক।'

'স্রেফ বোকা বানিয়েছে তোমাকে ওরা,' বলল রানা।

'এবার আমার বলার পালা–দুঃখিত।'

চিন্তার লাগাম টেনে ধরল রানা, হঠাৎ খেয়াল হলো ভালভাবে বিবেচনা না করেই তথ্যগুলো বাতিল করে দিচ্ছে ও। উঠে দাঁড়িয়ে ক্রীশ-ক্রাফটের ডেকে পায়ে ঝাঁকুনি তুলে পায়চারি করতে শুরু করল, কপালে চিন্তার রেখা। 'ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার, ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার,' বার কয়েক উচ্চারণ করে ব্যারনেসের দিকে তাকাল। 'আগে কখনও নামটা শুনেছ তুমি?'

মাথা নাড়ল ব্যারনেস। 'না।'

'তোমাকে জানাবার পর?'

আবার, 'না।'

স্মৃতির মাঠ চষে ফেলল রানা, কিন্তু নামটা আগে কখনও কোথাও শুনেছে বলে মনে পড়ল না। 'ঠিক আছে।' এই মুহূর্তে নামটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে ধরে নিল ও। 'এবার এসো আমার প্রসঙ্গে। কন্ট্রোলের মুখে শোনার পর কি মনে হলো তোমার?'

'প্রথমে অর্থহীন মনে হলো, শুধু প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম। প্রশ্নটা আমার মনেও আসে–মাসুদ রানা কেন সোহেলকে কিডন্যাপ করতে যাবে!'

'শুধু আমার নামটাই বলল তোমাকে, আর কিছু না?'

'একবার নয়, দু'বার–কন্ট্রোল আমাকে তোমার সম্পর্কে দু'বার সাবধান করে দেয়,' বলল ব্যারনেস।

'দু'বার?' পায়চারি থামিয়ে ব্যারনেসের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'দ্বিতীয়বার কখন?'

'সোহেলকে উদ্ধার করা হয়েছে এই খবর পাবার পর। সেই মুহূর্তে প্যারিসে ফিরতে চেয়েছিলাম আমি, তোমার পাশে থাকতে হবে আমাকে। খবরটা শোনার দু'ঘণ্টা পর বেন-গারিয়ন এয়ারপোর্টে পৌঁছে একটা ফ্লাইট ধরতে পারি আমি। আমার হৃৎপিণ্ড গান গাইছিল, রানা। সোহেল সুস্থ আর নিরাপদ, অ্যান্ড আই ওয়াজ ইন লাভ। দেরি নেই, আবার তোমার সাথে থাকব আমি। প্লেনে উঠতে যাচ্ছি, সিকিউরিটি চেকিং চলছে, একজন মহিলা পুলিস ডেকে নিয়ে গেল আমাকে–সিকিউরিটি অফিসে। আমার কন্ট্রোল ওখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমাকে ধরার জন্যে তেল আবিব থেকে নিজেই ছুটে এসেছে সে, চেহারা দেখে মনে হলো সাংঘাতিক উদ্বেগের মধ্যে আছে। বলল, ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের কাছ থেকে জরুরী একটা মেসেজ পেয়েছে সে। মেসেজটা নাকি হুবহু এই রকম: মেজর মাসুদ রানা এই মুহূর্তে অবশ্যই খলিফা কর্তৃক অনুপ্রাণিত।

কন্ট্রোল আমাকে বলল, রানা তোমাকে প্রথম সুযোগেই খুন করবে। তার মুখের ওপর হাসলাম আমি। কিন্তু তাকে সাংঘাতিক সিরিয়াস দেখাল, বলল, "মাই ডিয়ার ব্যারনেস, ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার প্রথম শ্রেণীর একজন এজেন্ট। তার ওয়ার্নিং তোমাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে।" এক কথা বারবার বলল সে।

'তবু আমার বিশ্বাস হয়নি, রানা। অসম্ভব একটা ব্যাপার। আমি তোমাকে ভালবাসি, জানি তুমিও আমাকে ভালবাস–যদিও হয়তো তুমি নিজেও সেটা ভাল করে উপলব্ধি করোনি। স্রেফ পাগলামি মনে হচ্ছিল। কিন্তু প্লেনে চড়ার পর চিন্তা করার অবসর পেলাম আমি। আমার কন্ট্রোল এর আগে কখনও ভুল করেনি। রানা, আমার তখনকার মানসিক অবস্থা তুমি কল্পনা করতে পারো? আমার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে আমি চাইছি তোমার কাছে পৌঁছুতে, অথচ ভূতের মত ভয় লাগছে তোমাকে। আমাকে তুমি খুন করে ফেলবে সে ভয় নয়। ওটা আমার কাছে কোন গুরুত্ব পায়নি; ভয় হচ্ছিল সত্যি না তুমি খলিফা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করো। এই চিন্তাটাই আমাকে আতঙ্কিত করে তোলে। বুঝতে পারছ তো, তোমার আগে কাউকে আমি ভালবাসিনি।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ব্যারনেস; দ্বিধা, সংশয়, আর ব্যথার কথা মনে পড়ে গেছে। তারপর সে মাথা নাড়ল, ঘন কালো চুল ঢেউ তুলল কাঁধে।

'প্যারিসে পৌঁছে আমার প্রথম কাজ ছিল সোহেল আর তুমি কেমন আছ খবর নেয়া। তারপর জানতে চেষ্টা করব, ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের ওয়ার্নিঙে কতটা শাঁস আছে। খবর পেলাম, মশিয়ে গগলের বাড়িতে আছ তোমরা। কিন্তু কতটা নিরাপদ না জেনে তোমার সাথে একা হওয়ার কোন ঝুঁকি আমি নিতে পারছিলাম না। যতবার তুমি আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে আমি এড়িয়ে গেলাম–আর প্রতিবার এড়িয়ে যাবার সময় মনে হতে লাগল আমার ছোট একটা করে অংশ মরে যাচ্ছে।'

রানার দিকে ঝুঁকে ওর একটা হাত তুলে নিল ব্যারনেস, আঙুলগুলো খুলল, মাথা নিচু করে চুমো খেলো তালুতে, তারপর হাতটা তুলে নিজের গালে চেপে রাখল।

'কয়েক হাজার বার নিজেকে বুঝিয়েছি, এ অভিযোগ সত্যি নয়। দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার ঝোঁক চেপেছে, বেরিয়ে পড়ি, যাই তোমার কাছে। ওহ্ রানা, এক সময় অসহ্য হয়ে উঠল ব্যাপারটা। সিদ্ধান্ত নিলাম ওরলিতে তোমার সাথে দেখা করব, কারণ সত্যটা আমাকে জানতেই হবে। তোমার মনে আছে, সেদিন আমার সাথে নেকড়েগুলো ছিল, ওদেরকে বলা ছিল বিপদ হতে পারে। তবে বলিনি, বিপদটা তোমার দিক থেকে আসতে পারে।

'ওরলির প্রাইভেট লাউঞ্জে তুমি পা রাখতেই আমি বুঝতে পারলাম, কথাটা সত্যি। ব্যাপারটা অনুভব করতে পারছিলাম, মৃত্যুর গন্ধ ছড়াচ্ছিলে তুমি, তোমাকে ঘিরে ছিল অস্বাভাবিক উজ্জ্বল একটা প্রভা। শুধু ভীতিকর নয়, আমার জীবনের সবচেয়ে ঘৃণ্য মুহূর্ত ছিল সেটা। তোমাকে অন্য এক লোক বলে মনে হচ্ছিল, সম্পূর্ণ অচেনা। তোমাকে চুমো খেয়ে বিদায় জানালাম, কারণ বুঝতে পারছিলাম, জীবনে আর আমাদের দেখা হবে না। এমনকি এই চিন্তাটাও আমার মাথায় খেলে

যায় যে তুমি আমাকে খুন করার আগে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে আমিই তো প্রথম আঘাত···,' কথাটা শেষ করল না ব্যারনেস। '···তোমাকে আমি খলিফা বা খলিফার অংশ বলে মনে করছিলাম, বুঝতেই পারছ, তাই সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হচ্ছিল। স্বীকার করছি, রানা, চিন্তাটা মাথায় এসেছিল। আমাকে খুন করার আগে তুমি মারা যাও–কিন্তু ওটা শুধুই একটা সাময়িক চিন্তা ছিল মাত্র। সেটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমি আমার কাজে ফিরে গেলাম। কাজ, ব্যবসা, চিরকালই টনিক হিসেবে উপকার করেছে আমার। কাজের ভেতর ডুবে যেতে পারলে প্রায় সব কিছু ভুলে যেতে পারি আমি। কিন্তু এবার তা হলো না। কথাটা বারবার বলছি, কারণ কথাটায় এত বেশি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে ঘন ঘন না বলে পারা যায় না–তোমার আগে আমার জীবনে ভালবাসা আসেনি, রানা, এবং সেই ভালবাসাকে অস্বীকার করার সাধ্য আমার ছিল না।

'কাজে মন বসল না। আবার আমি নিজেকে বোঝাতে লাগলাম, ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার ভুল তথ্য দিয়েছে। তুমি আমাকে খুন করার ষড়যন্ত্র করতে পারো না।

'এখানে এলাম, শুধু তোমার কাছে হুট করে চলে যাবার ঝোঁকটা কমাবার জন্যে। কিন্তু না, তাতেও কাজ হলো না। অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল। এখানে কাজ নেই, চিন্তা করার জন্যে অঢেল সময় পেলাম হাতে। প্রতিটি মুহূর্ত নির্যাতন করলাম নিজেকে। উদ্ভট সব চিন্তা-ভাবনা পেয়ে বসল আমাকে। বুঝলাম, গোটা ব্যাপারটার একটা সমাপ্তি হওয়া দরকার। কোন না কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে। তারপর হঠাৎ করেই উপায়টা দেখতে পেলাম।

'তোমাকে আমি এখানে ডেকে আনব, সুযোগ দেব আমাকে খুন করার।' হেসে উঠল ব্যারনেস, 'এ-ধরনের পাগলামি জীবনে এটাই প্রথম আমার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পাগলামিটা করার সুবুদ্ধি দিয়েছিলেন তিনি আমাকে।'

'হ্যাঁ, একটুর জন্যে বেঁচে গেছি আমরা,' স্বীকার করল রানা।

'রানা, তুমি আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করোনি কেন আমি খলিফা কিনা?' প্রশ্ন করল ব্যারনেস।

'যে কারণে তুমি আমাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করোনি আমি তোমাকে খুন করার প্ল্যান করছি কিনা।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো ব্যারনেস। 'খলিফার পাতা জালে দু'জনেই আমরা আটকা পড়েছিলাম। আমার আর শুধু একটা প্রশ্ন আছে, রানা, শেরি। আমি যদি সত্যি খলিফা হতাম, তোমার বিশ্বাস হয় আমি এতই বোকা যে যাদেরকে দিয়ে সোহেলকে কিডন্যাপ করিয়েছি তাদের একজনকে রবুইলের টেলিফোন নম্বর দেব, যাতে সে আমার সাথে খোশ-গল্প করার জন্যে যখন খুশি ডায়াল করতে পারে?'

থতমত খেয়ে গেল রানা। 'আমি ভেবেছিলাম–,' শুরু করল ও, তারপর থেমে গেল। '–না, ভাবিনি। মাথার ঠিক ছিল না, লিনা। কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। সত্যিই তো, তুমি খলিফা হলে এরকম একটা সূত্র কেন কাউকে দিতে যাবে! তবে মহা ধুরন্ধর ক্রিমিনালরাও এ-ধরনের স্থূল ভুল করে, তার রেকর্ড আছে।'

'ওডেসা থেকে ট্রেনিং পাওয়া ক্রিমিনালরা করে না, রানা।' তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা থেকে সরে এল ব্যারনেস। 'সে যাক, আমার তরফের গল্প তুমি শুনলে।

হয়তো কিছু বাদ দিয়ে গেছি, তুমি প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারো।'

আবার ওরা প্রথম থেকে গল্পটা নিয়ে আলোচনা শুরু করল। প্রতিটি ঘটনা বারবার বিশ্লেষণ করল, প্রতিটি সম্ভাবনা নিয়ে বিনিময় হলো মতামত। অবশেষে রানা মন্তব্য করল, 'একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না–প্রতিপক্ষের কোয়ালিটি।' পশ্চিম আকাশে তখন ঢলে পড়েছে সূর্য, ব্যাঙের ছাতা আকৃতির বিশাল মেঘ গায়ে গোলাপী রঙ মেখে স্থির হয়ে আছে শূন্যে। 'রহস্যের ভেতর রহস্য আছে, লিনা। আমাকে দিয়ে ড. ওয়ার্নারকে খুন করাবার জন্যেই যে শুধু সোহেলকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল তা নয়। চেষ্টা করা হয়েছিল আমি যাতে তোমাকেও খুন করি। অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল খলিফা। আমি যদি সফল হতাম, তাহলে আরও একটা পাখি মারা পড়ত, তাই না? চিরকালের জন্যে খলিফার জালে আটকা পড়তাম আমি।'

'এখান থেকে আমরা এখন কোথায় যাব, রানা?' জিজ্ঞেস করল ব্যারনেস, কৌশলে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারটুকু তুলে দিল সে রানার হাতে।

'বাড়ি ফিরলে কেমন হয়, এখুনি?' পরামর্শ দিল রানা। 'অবশ্য যদি না তুমি আরও এক রাত বাইরে কাটাতে চাও।'

এগারো

রানা আবিষ্কার করল ওর সমস্ত জিনিস-পত্র চুপিসারে বাংলো থেকে সরিয়ে দ্বীপের উত্তর প্রান্তে ব্যারনেসের প্রাসাদতুল্য বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। টয়লেটে ব্যবহার যোগ্য প্রতিটি জিনিস আয়না মোড়া মাস্টার বাথরুমে সাজানো পেল ও। পাশের বাথরুমটাই ব্যারনেসের।

রানার জন্যে ড্রেসিংরুমও আলাদা, এখানে ওর সবগুলো কাপড় নতুন করে ধোয়া আর ইস্ত্রি করা অবস্থায় পাওয়া গেল। হ্যাঙ্গার ঝোলাবার জন্যে ফাঁকা জায়গাটা ধরে দু'বার হাঁটল রানা, হিসেব কষে বের করল, তিনশো স্যুট অনায়াসে রাখা যাবে। বিশেষভাবে তৈরি, বোতাম টিপে খোলা বা বন্ধ করা যায়, পালিশ করা কাঠের শেলফ আর র‍্যাক রয়েছে–শেলফগুলোয় তিনশো শার্ট আর তিনশো ট্রাউজার, এবং র‍্যাকে তিনশো জোড়া জুতো রাখা যাবে। যদিও সবগুলো খালি।

রানার হালকা রঙের সুতী স্যুটটাকে বিশাল সাহারায় নিঃসঙ্গ উটের মত লাগল।

ওর স্যুইটের সিটিংরুমটা তিন প্রস্থে ভাগ করা, একটার চেয়ে অপরটার মেঝে ছয় ফিট করে উঁচু। বাঁশের তৈরি ফার্নিচার, দুর্লভ প্রজাতির পাতা-গাছ, ফুলগাছ, বিভিন্ন জাতের কোরাল, আর অ্যাকুয়ারিয়াম দিয়ে সাজানো। তিনটে ভাগকে পরস্পরের কাছ থেকে আড়াল করেছে কাপড়ের কোন পর্দা নয়, লতানো গাছের পাতা।

সোনালি বরণ এক পলিনেশিয়ান যুবতী, কিশোরীই বলা চলে, দু'হাতে ধরে

একটা ট্রে নিয়ে এল রানার সামনে। ট্রেতে চারটে গ্লাস, ঠাণ্ডায় ঘেমে গেছে কাঁচ। সবগুলোতেই বিভিন্ন ফলের রস, তবে রানার নাকে রাম-এর গন্ধও ঢুকল। মনে হলো বেশ কড়াই হবে, তাই বলল, 'হুইস্কি হলে ভাল হত।'

হতাশার ম্লান ছায়া পড়ল মেয়েটার মুখে। 'আমি নিজের হাতে তৈরি করেছিলাম, স্যার!'

'তাহলে তো দেখতে হয়...,' রানা চুমুক দিচ্ছে, ওর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। মাত্র এক প্রস্থ কাপড়ে বুক আর কোমর ঢাকা তার, কাপড়ের ভেতর থেকে উঁচু হয়ে আছে যৌবন, কিন্তু সেদিকে তাকাবার কোন আগ্রহ হলো না রানার। 'বাহ্, ভারি সুন্দর, দারুণ স্বাদ হয়েছে!'

শিশুর মত আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সোনালি বরণ মেয়েটা। 'আমি আছি, ডাকলেই আমাকে পাবেন,' বলে লতানো গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ব্যারনেস লিনা এল শিফনের এত পাতলা একটা পোশাক পরে, মনে হলো সবুজ সামুদ্রিক কুয়াশা তার চারপাশে টগবগ করে ফুটছে, যদিও আলো পড়লে মাখন যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তেমনি উজ্জ্বল দেখাল হাত আর মুখ সহ অনাবৃত অংশগুলো। রানার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে চেখে দেখল সে।

'গুড,' মন্তব্য করল ব্যারনেস, ফিরিয়ে দিল গ্লাসটা। কিন্তু কিশোরী মেয়েটা পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে ট্রে ধরতে মাথা নেড়ে তাকে বিদায় করে দিল সে।

রানাকে বাহু বন্ধনে জড়িয়ে নিয়ে সিটিংরূমের এদিক সেদিক ঘুরতে লাগল ব্যারনেস, দুর্লভ প্রজাতির গাছ আর মাছের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল রানার। বলল, 'এদিকটা আমি তৈরি করেছি অটারম্যান মারা যাবার পর।' রানা উপলব্ধি করল, লিনা ওকে জানাতে চায় এই স্যুইটের সাথে অন্য কোন পুরুষমানুষের স্মৃতি জড়িয়ে নেই। জানানোটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে লিনা, এটা ভেবে কৌতুক বোধ করল রানা।

বারো জন চাকর এল ডিনার নিয়ে। টেবিল সাজিয়ে অপেক্ষা করার ভঙ্গিতে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল তারা, কিন্তু ব্যারনেস তাদেরকে হাত নেড়ে বিদায় করে দিল। সবাই চলে যাবার পর রানাকে জিজ্ঞেস করল সে, 'নিজে খেতে পারবে, নাকি হাতে তুলে খাওয়াতে হবে?'

হেসে ফেলল রানা। 'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

কিন্তু ব্যারনেস হাসল না। 'ছোটবেলায় আমার কোন পুতুল ছিল না, রানা।' ডিশ থেকে এটা-সেটা অনেক খাবার নিজের হাতে রানার প্লেটে তুলে দিল সে। 'এটা লে নিউফ পোইজোঁর একটা স্পেশালিটি, দুনিয়ার আর কোথাও পাবে না,' বলল সে, ধূমায়িত ক্রীয়োল সস থেকে ছোট ছোট আনাজের টুকরো তুলল রানার প্লেটে, গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে বহু কষ্টে উদ্ধার করা হয়েছে। নারকেল দুধের সর আর বিভিন্ন জাতের ঝাঁঝাল মশলা দিয়ে তৈরি সস।

ডিনারের পর লম্বা নখ দিয়ে বরফ-ঠাণ্ডা অস্ট্রেলিয়ান আঙুরের খোসা ছাড়াল ব্যারনেস, একটা একটা করে পুরে দিল রানার মুখে।

'তুমি দেখছি আমাকে নষ্ট করে ফেলবে,' হাসতে লাগল রানা।

'এর মধ্যে তোমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র আছে, মশিয়ে। আমি তোমাকে জড়পদার্থ বানাতে চাই। মানে, অন্তত কয়েকটা ব্যাপারে তোমাকে আমি অক্ষম দেখতে পেলে খুশি হই। চাই তুমি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ো আমার ওপর। তাহলে আর কোনদিন তোমাকে আমি হারাব না।' রানার চেহারায় কৃত্রিম আতঙ্ক ফুটে উঠছে লক্ষ করে হি হি করে হাসল ব্যারনেস। 'না, আসলে চাই না–উদ্ভট খেয়াল আর কি! হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে কারণে জড়পদার্থ বানিয়েছি, সেটাই উবে গেছে, তোমাকে আর ভালবাসতে পারছি না। উঁহু, তুমি যেমন আছ তেমনি থাকবে, আসলে এখনকার এই মানুষটাকেই ভালবেসেছি।' রানার মুখে শেষ আঙুরটা গুঁজে দিল সে।

বৃত্তাকার পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে ডাইনিং রুম থেকে পঞ্চাশ ফিট নিচে সৈকতে নেমে এল ওরা, শেষ ধাপে জুতো খুলে মসৃণ, ভেজা ভেজা কংক্রিটের মত শক্ত বালিতে খালি পায়ে হাঁটল। ক'দিন আগে পূর্ণিমা ছিল, আজও বেশ বড়সড় আকার নিয়ে উদয় হয়েছে চাঁদ, হলদেটে আলো দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত।

পরস্পরের গা ছুঁয়ে হাঁটছে ওরা।

'খলিফাকে বুঝতে দিতে হবে তার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে,' হঠাৎ করে বলল রানা, অনুভব করল সামান্য একটু শিউরে উঠল ব্যারনেস।

'অন্তত আজ রাতটা তার কথা আমরা ভুলে থাকতে পারি, রানা।'

'উচিত নয়। এক মুহূর্তের জন্যেও উচিত হবে না।'

'না, তা ঠিক। কিন্তু কিভাবে তাকে বিশ্বাস করাবে?' জিজ্ঞেস করল, ব্যারনেস।

'তোমাকে মরতে হবে–,' রানা অনুভব করল, আড়ষ্ট হয়ে গেল ব্যারনেস। 'অন্তত সবাই জানবে তুমি মরে গেছ। দেখে মনে হবে আমি তোমাকে খুন করেছি।'

'প্ল্যানটা বলো।'

'তুমি বলেছ, প্রয়োজনে অদৃশ্য হবার সেট করা একটা কায়দা আছে তোমার।'

'হ্যাঁ, আছে।'

'এখান থেকে অদৃশ্য হবার দরকার হলে কি করবে তুমি?' জানতে চাইল রানা।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ব্যারনেস। 'পল বার্না আমাকে বোরা-বোরা নিয়ে যাবে, ওখানে আমার বন্ধুরা আছে। বিশ্বস্ত। দ্বীপের নিজস্ব এয়ারলাইন ফ্লাইটে করে আরেক পাসপোর্ট নিয়ে তাহিতি-ফাআ চলে যাব। সেই একই পাসপোর্ট দেখিয়ে কোন শিডিউলড এয়ারলাইন ফ্লাইট ধরে ক্যালিফোর্নিয়া বা নিউজিল্যান্ড চলে যেতে পারি আমি।'

'তোমার একাধিক কাগজ-পত্র আছে?'

'কেন, থাকবে না কেন!' এত অবাক হলো ব্যারনেস, রানার মনে হলো এবার না জিজ্ঞেস করে বসে, 'সবারই কি থাকে না?'

'গুড,'–বলল রানা। 'এখানে একটা দুর্ঘটনা সাজাতে হবে আমাদের। স্কুবা

ডাইভিং অ্যাক্সিডেন্ট হলেই চলবে, গভীর পানিতে হাঙর হামলা করেছিল, লাশ পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু এ-সবের অর্থ কি, রানা?'

'মরা মানুষকে খুন করার জন্যে কেউ লোক পাঠায় না,' বলল রানা।

'ও, হ্যাঁ, তাই তো!'

'তাহলে এই ঠিক হলো। খলিফা সমস্যার একটা বিহিত আমরা না করা পর্যন্ত অফিশিয়ালি তুমি মরে থাকবে,' ব্যারনেসকে বলল রানা, অনেকটা যেন হুকুমের সুরে। 'খলিফার ইচ্ছায় তোমাকে আমি খুন করায় তার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান একটা সম্পদ হয়ে উঠব আমি। তার কাছে আমার যোগ্যতা প্রমাণ হয়ে যাবে, আমাকে দিয়ে আরও বড় কাজ করাবার কথা ভাবতে পারে সে। আবার একবার তার কাছাকাছি যাবার সুযোগ পেয়ে যাব আমি। অন্তত উদ্ভট কিছু সন্দেহ যাচাই করার সুযোগ আমি পাবই।'

'আমার মৃত্যুটা খুব বেশি বিশ্বাস্য করার চেষ্টা কোরো না, শেরি, মাই লাভ। তাহিতি পুলিস আমার সাংঘাতিক ভক্ত,' বিড়বিড় করে বলল ব্যারনেস লিনা। 'টৌয়ারুরু-র গিলোটিনে তুমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করো তা আমি চাই না।'

ব্যারনেসের আগে ঘুম ভাঙল রানার, কনুইয়ের ওপর উঁচু হয়ে তার অনাবৃত কাঁধ আর মুখের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে থাকল ও। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যতই দেখল, আনন্দদায়ক ফল্গুধারায় আপ্লুত হয়ে উঠল সারা শরীর। নারীসুলভ সৌন্দর্য আর অভিজাত ব্যক্তিত্বের এমন সংমিশ্রণ আগে আর কোন মেয়ের মধ্যে লক্ষ করেনি রানা। ঘুমন্ত ব্যারনেসের চওড়া চোয়ালেও দৃঢ় মানসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট, কিন্তু বন্ধ চোখ আর ঠোঁটের চারপাশে কোমল ভাবের মোলায়েম প্রলেপ লেগে রয়েছে। চামড়া এত মসৃণ আর লালিত্যে ভরপুর যে কয়েক ইঞ্চি দূর থেকে লোমকূপের গোড়া দেখা যায় না। রানা গোগ্রাসে গিলছে, কিভাবে যেন টের পেয়ে গেল ব্যারনেস, চোখে ঘুম নিয়ে পাতা খুলল সে। এই প্রথম লক্ষ করল রানা, লিনার চোখ কেবল সবুজ নয়, সবুজের সাথে ক্ষীণ সোনালি আর বেগুনী আভা লেগে আছে। বার কয়েক চোখ পিট পিট করল ব্যারনেস, রানাকে তার ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা, হাত দুটো মাথার পিছনে নিয়ে গিয়ে পরম পুলকে পিঠ বাঁকা করল যেন অলস একটা অজগর আড়মোড়া ভাঙছে। সাটিনের চাদরটা পিছলে তার কোমরের কাছে নেমে গেল। আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিটা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশি সময় ধরে রাখল সে, ইচ্ছে করে দেখতে দিল শরীরটা, কাঙালের মত তাকিয়ে থাকল রানার চোখ।

'চোখ মেলে তোমাকে পাশে না পেলে দিনটাই আমার মাটি হয়ে যায়,' বলে হাত দুটো রানার দিকে সবটুকু বাড়িয়ে দিল ব্যারনেস, রানার ঘাড়ের চারপাশে ভাঁজ করল, এখনও পিঠ একটু উঁচু করে আছে। 'এসো ভান করি এই সুখ যেন চিরস্থায়ী হয়,' ফিসফিস করে বলল সে, দু'জোড়া ঠোঁট ছুঁই ছুঁই করছে, তার নিঃশ্বাস আর শরীরে মেয়ে-মেয়ে গন্ধের সাথে মিশে আছে গোলাপের মৃদু সুবাস। ধীরে ধীরে খুলে গেল তার ঠোঁট, মুখের ভেতর রানার জিভ টেনে নিল সে, চাহিদা

পুরোপুরি মিটছে না বলে নাক-মুখ দিয়ে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। এত তাড়াতাড়ি উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা, এত শক্ত আর পাশবিক যে, আবার গুঙিয়ে উঠল ব্যারনেস, শরীরের সমস্ত আড়ষ্ট ভাব দূর হয়ে গিয়ে ঢিল পড়ল পেশীতে, যেন আগুনের খুব কাছাকাছি ধরায় গলে যাচ্ছে মোমের পুতুল। কাঁপতে কাঁপতে বন্ধ হয়ে গেল তার চোখের পাতা, ভাঁজ খুলে বিছানায় লম্বা হলো হাঁটু আর পা। 'রানা, মাই লাভ! শেরি, মাই লাভ!' যেন তীব্র জ্বরের মধ্যে প্রলাপ বকে চলেছে ব্যারনেস।

তারপর পাশাপাশি বহুক্ষণ নিথর হয়ে পড়ে থাকল ওরা, দু'জনেই চিৎ হয়ে রয়েছে। শুধু দু'জনের একটা করে আঙুল পরস্পরকে আঁকড়ে আছে, একটু আগে ওদের শরীর যেভাবে পরস্পরকে আঁকড়ে ছিল।

'যেতে যখন হবেই, যাব,' ফিসফিস করে বলল ব্যারনেস, 'কিন্তু এখন নয়, এখনই নয়।'

রানা কোন কথা বলল না।

'এসো দর কষি। আমাকে তুমি তিন দিন সময় দাও। শুধু তিনটে দিন, আজকের মত এভাবে সুখী হবার জন্যে; আমার জন্যে প্রথমবার ছিল ব্যাপারটা, এ জিনিসের সাথে আগে কখনও পরিচয় হয়নি—জানি না হয়তো এটাই শেষবার...'

প্রতিবাদ করার জন্যে মাথা তুলতে গেল রানা, কিন্তু ওর আঙুলে চাপ দিয়ে চুপ থাকতে অনুরোধ করল ব্যারনেস। '—এটাই হয়তো শেষবার,' আবার বলল সে। 'তাই প্রাণভরে উপভোগ করতে দাও আমাকে। এই তিনদিন আমরা খলিফার নামটা পর্যন্ত মুখে আনব না। এটা যদি দান করো আমাকে, তোমার যে-কোন আদেশ আমি বিনাশর্তে পালন করব। দেবে, রানা? বলো তুমি রাজি।'

'বেশ তো, নাহয় আরও তিন দিন মহাসুখে থাকলাম আমরা, আপত্তি কিসের!'

'তাহলে বলো, স্পষ্ট করে বলো, তুমি আমাকে ভালবাস। কথাটা খুব বেশি বার তোমার মুখে শুনেছি বলে মনে পড়ে না।'

ওই তিন দিন প্রায়ই কথাটা ব্যারনেসের কানে কানে বলার সুযোগ পেল রানা। যতবারই শুনল ব্যারনেস, অপার আনন্দে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেলো সে, যেন উচ্চারণটা কানে ঢুকলেই তার দম আটকে আসে। তখন ওরা পরস্পরকে না ছুঁয়ে পারে না।

এই তিনটে দিন অমর স্মৃতি হয়ে থাকবে ওদের জীবনে। নিঃসঙ্গ চাঁদের হলদেটে আলো গায়ে মেখে লেগুনের শান্ত স্বচ্ছ পানিতে গভীর রাতে সাঁতার কাটল ওরা, নির্জন দুপুরে দোলনায় পাশাপাশি বসে গাছের ছায়ার নিচে বাতাস খেলো, সূর্য ওঠার আগে ছোট একটা দ্বীপের উন্মুক্ত সৈকতে হাত ধরাধরি করে হাঁটল—বিবস্ত্র, সব সময় বিবস্ত্র। পালা করে নয়টা দ্বীপেই সময় কাটাল ওরা। কলোনিতে মিলিত হতে দেখল পাখিদের, দেখল কিভাবে ডিম পাড়ে। 'আমাকে একটা বাচ্চা দেবে তুমি,' হুকুমের সুরে রানাকে বলল ব্যারনেস। খোলা সাগরে বেরিয়ে এসে একটা রাত কাটাল ওরা, ভেলার ওপর, তারাজ্বলা গোটা আকাশ চোখের ভেতর নিয়ে ভালবাসার গান গাইল ব্যারনেস—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছারখার হয়ে

যাবার পরও ওদের নাকি বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, ধূলিকণার ভেতর বা অগ্নিকণার সাথে ওদের শরীর আর আত্মার অংশবিশেষ অবশিষ্ট থেকে যাবে অনন্তকাল। তারপর আবার যখন নতুন বিশ্ব তৈরি হবে, তেত্রিশ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব পেরিয়ে খুঁজতে এসে প্রথম পুরুষ রানা বিশাল এক পদ্মফুলের ভেতর দেখতে পাবে প্রথম নারী লিনাকে। দু'জনেই একযোগে বলে উঠবে, 'এত দিন কোথায় ছিলে?' তারপর আবার মৃত্যু, এবং পুনর্জন্ম, এভাবেই চলতে থাকবে–অবিনাশী অস্তিত্ব, পরমায়ু, অনন্ত ভবিষ্যৎ, অমর প্রেম। কী সুন্দর গান, মুগ্ধ হয়ে শুনল রানা, এবং বিশ্বাস করতে প্ররোচিত হলো।

চারদিনের দিন সকালে ঘুম থেকে জেগে রানা দেখল, লিনা নেই। রাজ্যহারা সম্রাটের মত লাগল নিজেকে, অসহায় এবং দিক্‌ভ্রান্ত। ব্যারনেস ফিরে আসতে তাকে প্রথমে চিনতেই পারল না ও।

তারপর খেয়াল হলো, চুল প্রায় সবই কেটে ফেলেছে ব্যারনেস, খুলি কামড়ে কালো গোলাপের মত যেটুকু আছে সেটুকু না থাকলে ন্যাড়া মনে হত। এভাবে চুল কাটায় লম্বা ব্যারনেসকে আরও লম্বা দেখাচ্ছে। দীর্ঘ গলা যেন ফুলের ডাঁটা, হাঁসের মত একটু বাঁকানো। রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে ক্ষীণ একটু হাসল ব্যারনেস, মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ভাবলাম চেহারা একটু বদলানো দরকার। নতুন পরিচয় নিয়ে যাচ্ছি যখন। আবার গজাবে, আগের মত যদি লম্বাই পছন্দ করো তুমি।'

ব্রেকফাস্টে বসে নিজের প্ল্যান ব্যাখ্যা করল ব্যারনেস। তার সেক্রেটারি মোটা একটা এনভেলাপ রেখে গেছে প্লেটের পাশে, কাগজ-পত্র দেখতে দেখতে কথা বলল সে। 'মারিয়া পিনু নামটা ব্যবহার করব,' এনভেলাপ থেকে প্লেনের একাধিক টিকেট বের করল সে। '–ঠিক করেছি, জেরুজালেম যাব। ওখানে আমার একটা বাড়ি আছে। আমার নামে নয়, তাছাড়া মোসাড ছাড়া ওটার কথা আর কেউ জানে বলেও মনে করি না। আমার জন্যে ভাল একটা সেন্টার হতে পারে, আমার মোসাড কন্ট্রোলের কাছাকাছি। ওখান থেকে যতটা সম্ভব তোমাকে আমি সাহায্য করার চেষ্টা করব। এমন কিছু তথ্য হয়তো দিতে পারব, খলিফাকে খুঁজে বের করতে সাহায্য হবে তোমার–।'

লাল রঙের ইসরায়েলি ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টটা এনভেলাপে ভরে রাখল ব্যারনেস। টাইপ করা একটা কাগজ বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'এটায় মোসাডের টেলিফোন নম্বর থাকল. আমাকে মেসেজ পাঠাতে পারবে–মারিয়া পিনু নামটা ব্যবহার কোরো।'

নম্বরটা মুখস্থ করে নিল রানা, ওর কাছ থেকে নিয়ে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলল ব্যারনেস।

'আমার যাবার ব্যাপারটা একটু বদলেছে,' বলল ব্যারনেস। 'ক্রীশ-ক্রাফট নিয়ে বোরা-বোরা যাব আমরা। মাত্র একশো মাইল। আগেই রেডিওতে খবর পাঠাব। রাতের অন্ধকারে সৈকত থেকে বেশ খানিক দূরে বন্ধুরা অপেক্ষা করবে আমার জন্যে।'

কোরালের মাঝখানে সরু প্যাসেজ, সাবধানে এগোল ক্রীশ-ক্রাফট, সব আলো নিভিয়ে রাখা হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের মৃদু আলোয় পথ দেখে বোট চালাচ্ছে

ব্যারনেসের বোটম্যান, এদিকের জলপথ হাতের তালুর মতই পরিচিত তার।

'আমি চাই পিয়েত্রো আমাকে জ্যান্ত চলে যেতে দেখুক,' রানার গায়ে হেলান দিয়ে ফিসফিস করে বলল ব্যারনেস, শেষ ক'টা মুহূর্ত থেকে যতটুকু পারে আদায় করে নিতে চাইছে। 'আমি চাই না আমাকে তুমি মেরে ফেলেছ ধরে নিয়ে স্থানীয় লোকজন খেপে উঠুক। পিয়েত্রো মুখ বন্ধ রাখবে,' রানাকে আশ্বাস দিল সে। 'তবে তুমি হুকুম করলে মুখ খুলবে।'

'ভাবতে দেখছি কিছুই বাকি রাখোনি।'

'মশিয়ে, এইমাত্র আবিষ্কার করেছি তোমাকে,' আনন্দঘন সুরে বলল ব্যারনেস। 'এখুনি তোমাকে হারাতে আমি রাজি নই। এমন কি তাহিতির পুলিস প্রধানের সাথেও কথা বলব বলে ঠিক করেছি। তিনি আমার পুরানো বন্ধু। লে নিউফ পোইন্তোতে ফিরে এসে আমার সেক্রেটারিকে দিয়ে রেডিও মেসেজ পাঠাবে তুমি...'

শান্তভাবে বলে চলল ব্যারনেস, আয়োজন করা ব্যবস্থাপনার প্রতিটি খুঁটিনাটির দিকে নজর দেয়া হয়েছে। কোথাও কোন ফাঁক দেখল না রানা। অন্ধকার সাগর থেকে ভৌতিক কণ্ঠস্বরের মত একটা হাঁক-ডাকের আওয়াজ পাওয়া গেল, চোখ খোলা রেখে রানার ঠোঁটে চুমো খেলো ব্যারনেস। ক্রীশ-ক্রাফটের গতি কমিয়ে দিল পিয়েত্রো, তারপর এক সময় থামাল। দূরে একটা দ্বীপের কালো কাঠামো ফুটে আছে তারাজ্বলা আকাশের গায়ে। ক্রীশ-ক্রাফটের পাশে ধাক্কা খেলো একটা ভেলা। রানার বাহুবন্ধনের ভেতর দ্রুত ঘুরে গেল ব্যারনেস লিনা, দুটো মুখ এক হলো।

'প্লীজ বী কেয়ারফুল, রানা,' শুধু এই একটা কথা বলে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হলো ব্যারনেস, মই বেয়ে নেমে গেল ভেলায়। পিয়েত্রো হাত বাড়িয়ে একমাত্র হ্যান্ডব্যাগটা ধরিয়ে দিল তাকে। সাথে সাথে রওনা হলো ভেলা। হারিয়ে গেল অন্ধকারে। চ্যানেলে ঢোকার জন্যে ফিরতি পথ ধরল ক্রীশ-ক্রাফট, স্টার্নে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে থাকল রানা। পাঁজরের নিচে শূন্য একটা অনুভূতি, যেন ওর নিজেরই একটা অংশ হারিয়ে গেছে। ব্যারনেসের স্মৃতি দিয়ে সেই শূন্যতা ভরাট করার চেষ্টা করল রানা। ক্ষীণ কৌতুকের হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

'তোমার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর,' আজ সকালে আলোচনায় বসে হঠাৎ প্রসঙ্গটা মনে পড়ে গিয়েছিল রানার, 'শেয়ার মার্কেটে কি প্রতিক্রিয়া হবে ভেবে দেখেছ? মিডো আর অটারম্যানের স্টক ঝপ্ করে নেমে যাবে।'

'জানি।' সহাস্যে বলেছিল ব্যারনেস। 'খবর ছড়াবার পর প্রথম হপ্তায় প্রতিটি শেয়ারের দাম একশো ফ্রাঙ্ক করে কমে যাবে।'

'তোমার চিন্তা হচ্ছে না?'

'হচ্ছে না।' হঠাৎ ব্যারনেসের চোখে দুষ্টামির ঝিলিক খেলে গেল। 'একটু আগে জুরিখে টেলেক্স পাঠিয়ে শেয়ার কেনার অর্ডার দিয়েছি। আবার যখন স্টক তুঙ্গে উঠে আসবে, আশা করছি একশো মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক লাভ করব আমি। এত দৌড়-ঝাঁপ, তোমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকা, এ-সবের জন্যে ক্ষতিপূরণ নেব না?'

ঘটনাটা মনে পড়তে হাসল বটে রানা, কিন্তু বুকের ভেতর শূন্য ভাবটা থেকেই গেল।

বারো

ট্রাই-আইল্যান্ডারে করে তাহিতিয়ান পুলিসকে সে নিউফ পোইন্ট্রোতে নিয়ে এল পল বার্না, তারপর দু'দিন ধরে চলল জবানবন্দী আর বিবৃতি দেয়ার পালা। দ্বীপবাসীদের প্রায় সবাই একটা করে বিবৃতি দিতে চায়, এ-ধরনের উত্তেজনাকর ঘটনা এদিকের দ্বীপগুলোয় বড় একটা ঘটে না। তাছাড়া, সবাই ওরা ব্যারনেস মিডো অটারম্যানকে ভালবাসত, তাদের কাছে সে ছিল মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর মত, প্রায় দেবীর সমতুল্য। কেঁদে বুক ভাসাল সবাই তারা।

পিয়েত্রো তার ভূমিকায় একটু বেশি অভিনয় করে ফেলল। 'ডেড হোয়াইট' হাঙরের বিশদ বর্ণনা পর্যন্ত দিয়ে ফেলল সে, ব্যারনেসকে যখন ওগুলো আক্রমণ করে সে নাকি একেবারে কাছ থেকে নিজের চোখে দেখেছে।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় ব্যারনেসের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে সৈকতে একটা ভোজের আয়োজন করা হলো। দ্বীপবাসিনী যুবতী মেয়েরা শোক-গাথা গাইতে গাইতে পানিতে ভাসাল তাজা ফুলের মালা, গানের সুরের সাথে একযোগে আগুপিছু দুলতে লাগল তাদের প্রায় নগ্ন শরীর।

পরদিন সকালে পুলিসের সাথে তাহিতি-ফাআ এল রানা। সবার অলক্ষ্যে ওর আশপাশে থাকল পুলিস বাহিনীর কয়েকজন সাদা পোশাক পরা সদস্য, পথ দেখিয়ে ওকে নিয়ে আসা হলো শহরের পুলিস হেডকোয়ার্টারে। পুলিস প্রধানের সাথে ওর সাক্ষাৎকারটা সৌজন্যমূলক এবং সংক্ষিপ্ত হলো, বোঝাই যায় ওর আগে এখান থেকে হয়ে গেছে ব্যারনেস লিনা। চোখ টিপে ইঙ্গিত প্রধান বা সবজান্তার হাসি যদি বিনিময় না-ও হয়ে থাকে, পুলিস প্রধানের বন্ধুত্বপূর্ণ করমর্দন থেকে প্রকৃত পরিস্থিতির আঁচ পাওয়া যায়। 'মহীয়সী ব্যারনেসের যে-কোন বন্ধু আমাদেরও বন্ধু।' ভদ্রলোক প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করলেন, তারপর এয়ারপোর্টে ফিরে যাবার জন্যে অফিসের একটা গাড়ি দিলেন রানাকে।

ইউ.টি.এ. ফ্লাইট ধরে ক্যালিফোর্নিয়া চলে এল রানা। সাথে সাথে এয়ারপোর্ট থেকে না বেরিয়ে টয়লেটে ঢুকে দাড়ি কামিয়ে শার্ট বদলাল ও, তারপর ফার্স্ট ক্লাস প্যান অ্যাম লাউঞ্জে বসে এক কাপ কফি খেলো। টেবিল থেকে ওয়াল স্ট্রীট জার্নালটা তুলে নিয়ে দেখল, কালকের। ব্যারনেস মিডো অটারম্যানের মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়েছে তৃতীয় পৃষ্ঠায়, পুরো এক কলাম জুড়ে। এই প্রথম উপলব্ধি করল রানা, মিডো স্টীল আর অটারম্যান গ্রুপ অভ ইন্ডাস্ট্রি মার্কিন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কি গভীরভাবে জড়িত। ব্যবসার বিভিন্ন শাখার একটা তালিকা দেয়া হয়েছে, তারপর ছাপা হয়েছে ব্যারন অটারম্যানের সাফল্য আর উত্থানের চমকপ্রদ ইতিহাস, সবশেষে ব্যারনেস লিনার ভূয়সী প্রশংসা আর গুণকীর্তন। মৃত্যুর বিবরণ

দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, ঘনিষ্ঠ এক বন্ধুর সাথে স্কুবা ডাইভিং-এ গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েন ব্যারনেস। বন্ধুর পরিচয়, মেজর মাসুদ রানা।

ওর নামটা উল্লেখ করায় খুশি হলো রানা। যেখানেই থাকুক, রিপোর্টটা পড়বে খলিফা, এবং যা তাকে ভাবতে চাওয়ানো হচ্ছে তাই সে ভাববে। এবার কিছু একটা ঘটবে বলে ধারণা করল রানা। কি ঘটবে ঠিক জানা নেই, কিন্তু অনুভব করছে চুম্বক ওকে লোহার টুকরোর মত টানছে।

বড়সড় একটা আর্মচেয়ারে লম্বা হয়ে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নেয়া গেল। বলে রাখা ছিল, একজন হোস্টেস ঘুম ভাঙিয়ে জানাল, প্যান অ্যামের পোলার ফ্লাইট ছাড়ার সময় হয়েছে।

লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে প্রথমেই গগলের বাড়ি, ফিলবিস ইয়ার্ডে টেলিফোন করল রানা। ওর গলা পেয়ে পাখির মত আনন্দে কিচিরমিচির শুরু করে দিল ডোরা, গগলের প্রাইভেট সেক্রেটারি তথা সঙ্গিনী। 'তোমার বন্ধু তো স্পেনে, ভাই–তবে আশা করছি কাল লাঞ্চের আগে ফিরে আসবে। ছত্রিশটা গর্ত নিয়ে সান ইস্তাবানে গলফ কোর্স তৈরি হচ্ছে ওর, সেটা তদারক করতে গেছে–,' গগলের কোম্পানী স্প্যানিস উপকূলে বিশাল এক ট্যুরিস্ট হোটেলস কমপ্লেক্সের মালিক, '–তা সে যখনই আসুক, আমি তো আছি; তুমি আমার কাছে সরাসরি চলে এসো–আজ রাতেই। সে নেই, কাজেই অন্যায় সুযোগ নেয়ার এমন সুযোগ জীবনে আর পাব না আমরা!' ঠাট্টা করল ডোরা, জানে গগলের এই বন্ধুটি কিছু ক্ষেত্রে ঋষিতুল্য চরিত্রের অধিকারী। রানার কাছেও প্রমাণ আছে, গগলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থাকার ব্রত পালন করছে ডোরা। 'আর আমাকে যদি মনে না ধরে, বিকল্প হিসেবে আমার দুই বান্ধবী আর বোন তো আছেই...'

রাজি হয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রানা, তারপর রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায় ফোন করল। ঢাকা থেকে রাহাত খান একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন ওর জন্যে। ওর ছুটির মেয়াদ আরও বাড়ানো হয়েছে, অফিস থেকে আশা করা হয়েছে ছুটিটা জাপান, ক্যানাডা বা ল্যাটিন আমেরিকায় কাটাবে রানা। এসব কথার মধ্যে কি যেন একটা ইঙ্গিত আছে, কিন্তু তা নিয়ে এই মুহূর্তে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন দেখল না রানা। সোহেলের খবর পাওয়া গেল, ভাল আছে সে, মধ্যপ্রাচ্যে কাজ শুরু করেছে আবার। সোহানা লন্ডনে এসেছিল, কিন্তু রানার সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে আবার ফিরে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। বলে গেছে, রানা কেমন থাকে না থাকে খবরটা যেন তাকে পৌঁছে দেয়া হয়। রূপা লন্ডনেই আছে, দু'চারটে কথাও হলো তার সাথে রানার মনে হলো, ওর সাহায্যে লাগতে পারে ভেবে বসই বোধহয় ঢাকা থেকে পাঠিয়েছে রূপাকে। রানাকে একটা টেলিফোন নম্বর দিল সে।

এয়ারপোর্টের অ্যাভিস ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ফাইন্যানশিয়াল টাইমস-এর ভাঁজ খুলল রানা, একটা গাড়ি চেয়ে অপেক্ষা করছে ও। আজকের পত্রিকা, ব্যারনেস লিনা সম্পর্কে ফলো-আপ খবর বেশ বড় করে ছাপা হয়েছে। যা মনে করা গিয়েছিল, লন্ডন আর ইউরোপিয়ান শকে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। শেয়ারের পতন ব্যারনেসের হিসেবকে ছাড়িয়ে অনেক বেশি নেমে গেছে। দুর্ঘটনাটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবার উল্লেখ করা হয়েছে ওর নাম। দুটো

ব্যাপারই আনন্দ বয়ে আনল রানার জন্যে। অনেক সস্তায় শেয়ার কিনতে পারছে ব্যারনেসের লোকজন, তারমানে একশো মিলিয়ন নয়, দেড়শো মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক লাভ হবে তার। আর ওর নামটা প্রচার হচ্ছে দেখে সন্তুষ্ট বোধ করল।

আজ ট্যাক্সি নয়, ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে ফিলবিস ইয়ার্ডে পৌঁছুল রানা, কিন্তু আগের মতই ঘোড়া নিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে রানাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে ডোরা। 'খুব খুশি হবে গগল,' রানাকে বলল সে। 'আশা করছি আজ সন্ধ্যায় তার ফোন পাব। তোমার কিছু হয়েছে নাকি, একটু যেন গম্ভীর?' রানার হাত ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে এল সে।

প্রশ্নটা হেসে উড়িয়ে দিল রানা। 'তোমার অন্যায় সুযোগ নেয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে একটু ভয় পেয়ে গেছি–অনভিজ্ঞ কিনা!'

দুম করে রানার পিঠে একটা ঘুসি মেরে বসল ডোরা। 'অনভিজ্ঞ, না? ডুবে ডুবে জল খাও, ভেবেছ আমি কিছু জানি না!' গেস্টরুমের দরজার কাছে ওকে পৌঁছে দিয়ে রান্নাবান্নার তদারকিতে ফিরে গেল সে, যাবার সময় বলে গেল, 'তোমার একটা মেসেজ আছে, কিন্তু তার আগে হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নাও।'

গেস্টরুমে ঢুকে বিছানার পাশের টেবিলে এনভেলাপটা পেল রানা। বেন গারিয়ং এয়ারপোর্ট, তেল আবিব থেকে পাঠানো হয়েছে। ভেতরের কাগজে একটা মাত্র শব্দ টাইপ করা। সাঙ্কেতিক শব্দ, অর্থটা শুধু রানা আর ব্যারনেস বুঝবে। রানা জানল, নিরাপদে আর নির্ঝঞ্ঝাটে গন্তব্যে পৌঁচেছে লিনা। গরম পানি ভরা বাথটাবে লম্বা হয়ে তার কথা ভাবতে লাগল ও। আবার কবে দেখা হবে কে জানে! আর কোন দিন দেখা হবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে!

ডোরা যেমন বলেছিল, রানাকে দেখে ভারি খুশি হলো ভিনসেন্ট গগল। স্পেনে ক'দিন থাকায় তার গায়ের চামড়া খানিক পুড়েছে, তবে আগের চেয়ে বেশ একটু মুটিয়েছে সে। এভাবে যদি ওজন বাড়তে থাকে, সমস্যায় পড়বে গগল। সাফল্যের এই এক বিড়ম্বনা, ভাল খাবার আর দামী ওয়াইন এড়িয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

লাঞ্চে বসে চোরা চোখে বন্ধুকে লক্ষ করল রানা। দু'জন প্রায় সমান লম্বা, তবে চওড়ায় গগল টেক্কা দেবে, বয়সেও সে রানার চেয়ে দু'পাঁচ বছরের বড়। রীতিমত হাসিখুশি দেখাল তাকে, কোন রকম উদ্বেগ আছে বলে মনে হলো না।

ব্যারনেস লিনার কন্ট্রোল তিনজনের নাম বলেছিল। ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার। ভিনসেন্ট গগল। মাসুদ রানা। বিশেষ করে ভিনসেন্ট গগল, সে নাকি খলিফার এত কাছাকাছি অবস্থান করে যে তাকে খলিফা মনে করা ভুল হবে না, খলিফা আর গগল নাম দুটো প্রায় সমার্থক।

কিন্তু কিভাবে! গগল সম্পর্কে যতটুকু জানে রানা, ইহুদি বা ইসরায়েলের প্রতি তার কোন সহানুভূতি নেই। অথচ খলিফার আছে। গগল বরং মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের প্রতি সহানুভূতিশীল, রানার জানামতে ওদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে সে। সেই গগল সৌদী বাদশার নাতি প্রিন্স হাশেম আবদেল হাক্কাসকে কেন খুন করতে যাবে? কেন সে বেঈমানী করবে রানার সাথে, সোহেলকে কিডন্যাপ করার কি দরকার ছিল তার? ড. ওয়ার্নারকে খুন করতে চাওয়ার

পিছনেই বা কি কারণ তার থাকতে পারে?

সব প্রশ্নের উত্তর মেলে যদি ধরে নেয়া যায় গগল খলিফা।

ক্ষমতা মানুষকে উন্মাদ করে ফেলে, জানা আছে রানার।

'ডোবার মুখে শুনলাম জঙ্গলে নাকি শেয়ালের উপদ্রব খুব বেড়েছে,' লাঞ্চ শেষ হওয়ার পর লাইব্রেরীতে বসে ধূমপান করছিল ওরা, মৃদু কণ্ঠে কথাটা বলল রানা। 'চাষীরা নাকি অভিযোগ করে গেছে, এভাবে চলতে থাকলে একটা মুরগীও নাকি বাঁচানো যাবে না।'

'তাই?' বলল গগল, হঠাৎ উৎসাহী হয়ে উঠল সে। 'তাহলে তো ওদিকে একবার ঢুঁ মেরে আসতে হয়। চলো, যাবে নাকি?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'আপত্তি নেই, যেতে পারি।'

রানাকে নিয়ে গানরুমে চলে এল গগল, র‍্যাক থেকে একটা শটগান নামাল, মুঠো ভর্তি কারট্রিজ ফেলল পকেটে।

এস্টেটের কোথাও কোথাও কাঁটাতারের বেড়া আছে, কোথাও আবার সীমানা একেবারেই চিহ্নিত করা হয়নি। তবে এর আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, চিনতে ভুল হয় না গগলের। নদীর কিনার ঘেঁষে পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, রাস্তা যেখানে সরু সেখানে পিছিয়ে আসছে একজন, এক লাইনে হাঁটছে। রানার আচরণে কোন রকম আড়ষ্ট ভাব নেই, তবে খেয়াল রাখল গগল যাতে তার পিছনে থাকার সুযোগ না পায়। গগলের হাতে শটগান, অর্থাৎ শেয়াল সে-ই মারবে, কাজেই তাকে সামনে থাকতে দেয়ার একটা অজুহাত রয়েছে। অবশ্য এ-ব্যাপারে ওদের মধ্যে কোন কথা হলো না।

একটা খরস্রোতা নালাকে পিছনে রেখে বাঁক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ওরা। স্পেন ভ্রমণ সফল হয়েছে, সেই আনন্দে বক বক করে চলেছে গগল। সাগর তীরে আরও একটা হোটেল কমপ্লেক্স কেনার সমস্ত ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে এসেছে সে। তার আগের হোটেলের ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর কাজও চলছে, বছর শেষ হবার আগেই পাঁচশো রুম তৈরি করা হবে।

'কেনাকাটার এখনই সময়, রানা,' পরামর্শ দেয়ার সুরে রানাকে বলল সে। 'শিল্পপতিরা এতদিনে মোটা লাভের মুখ দেখবে বলে আশা করা যায়।'

'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'সম্ভবত তেলের দাম কমে যাওয়ায় ভাগ্য খুলে যাচ্ছে তোমাদের।'

'এ আর কি কমেছে,' কাঁধের ওপর দিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল গগল। 'আগামী ছ'মাসে আরও পাঁচ পার্সেন্ট কমবে বলে ধরে নিতে পারো। এতদিনে পথে এসেছে আরবরা।' অপরিশোধিত তেলের দাম আরও কমে গেলে কারা কিভাবে উপকৃত হবে তার একটা বিশদ ব্যাখ্যা দিল সে নাটকীয় মুনাফা ঘরে তুলবে হাতে গোনা কয়েকটা বড় কোম্পানী, তাদের একটা তালিকা দিল। 'তোমার যদি অলস কিছু টাকা থেকে থাকে, রানা, এই কোম্পানীগুলোর শেয়ার কিনে ফেলো–এখনই সময়।' আরও অনেক কথা বলল সে, সবই টাকা প্রসঙ্গে। বলল, 'টাকাই তো ক্ষমতা।'

জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে এসে মাঠ পেরোচ্ছে ওরা, এখনও টাকার গল্প শেষ

হয়নি গগলের। রোমান ধ্বংসাবশেষের দিকে হাঁটছে ওরা। আরবদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু হলো, 'ওদের সাথে অনেক বছর তো কাটালাম–মানুষ নামের অযোগ্য, বুঝলে! স্রেফ বর্বর! ভব্যতা শেখেনি, শিক্ষা-দীক্ষা নেই, হারেম ভর্তি মেয়েলোক থাকা সত্ত্বেও সুদর্শন কিশোর দেখলে নোলা দিয়ে পানি ঝরে, গায়ে দুর্গন্ধ, মুখে ইসলাম, অন্তরে ঘৃণা–এক কথায় অসহ্য!' শটগানটা এক হাত থেকে আরেক হাতে নিল গগল, ভাঁজ করে কারট্রিজ ভরল। 'অথচ দুনিয়ার অর্থনীতি ওদের হাতের মুঠোয়, সব কিছু ওরা নিয়ন্ত্রণ করছে। এভাবে চলতে থাকলে সভ্যতা ধ্বংস হতে বেশি দিন লাগবে না। যত যাই বলা হোক, সভ্য আসলে পশ্চিমা দুনিয়ার মানুষরাই, শাসন করার ক্ষমতা তাদের হাতেই থাকা উচিত...' হঠাৎ থেমে গেল গগল, উপলব্ধি করল, বেশি কথা বলে ফেলেছে সে।

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। এ কে কথা বলছে তার সাথে? এই গগলকে তো সে চেনে না।

'কি, ঠাণ্ডা?'

'উঁহু, বদহজম,' বলল রানা।

নিচু পাঁচিল টপকে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে গগল, চোখ তুললেই রোমান ক্যাম্পের পেরিমিটার দেখা যাচ্ছে। তাকে অনুসরণ করল রানা। ধ্বংসাবশেষকে পাশ কাটিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠতে শুরু করল ওরা। যখন উঠে এল, গগল হাঁপাচ্ছে। কিনারায় একটা গাছ, তার ছায়ায় দাঁড়াল ওরা।

গাছের গায়ে শটগানটা ঠেস দিয়ে রাখল গগল, কোমরে দু'হাত রেখে তাকিয়ে আছে নিচের উপত্যকায়। চওড়া বুকটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে তার। গাছের গায়ে হেলান দিল রানা, হাত দুটো পকেটে নয়, কোটের ল্যাপেল ধরে আছে। দেখে মনে হচ্ছে পেশীতে কোন টান নেই, আসলে প্যাচানো স্প্রিঙের মত হয়ে আছে শরীরটা। ডান হাতের নাগালের মধ্যে রয়েছে শটগান।

আগেই লক্ষ করেছে রানা, নাম্বার ফোর শট লোড করেছে গগল, দশ কদম দূরের একজন লোককে মাঝখান থেকে দু'ভাগ করে দেবে।

কোটের সাইড পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করল গগল। 'ব্যাগনেস লিনার ব্যাপারটা সত্যি দুঃখজনক,' গম্ভীর সুরে বলল সে, কিন্তু রানার চোখের দিকে তাকাল না।

'হ্যাঁ,' ফিসফিস করে বলল রানা।

'তবু ভাল যে নোংরা ঝামেলা পাকায়নি। তোমাকে ওরা অনায়াসে ফাঁসাতে পারত।'

'তা পারত,' একমত হলো রানা।

'মিডোয় তোমার চাকরিটা কি...?' প্রশ্ন শেষ না করে অপেক্ষা করে থাকল গগল।

'জানি না। ব্রাসেলসে না ফিরলে কিছু বোঝা যাবে না।'

'মুখে কখনও উচ্চারণ করিনি, রানা, কিন্তু তুমি জানো কোন রকম সাহায্য দরকার হলে আমাকে তুমি সব সময় পাশে পাবে,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল গগল। 'পুঁজি, সুপারিশ, বড় কোন লাভজনক দায়িত্ব–কি দরকার আমাকে শুধু এক-

জানতে দিয়ো।'

'ধন্যবাদ, গগল,' শুকনো গলায় বলল রানা।

ডানহিল লাইটার জ্বেলে সিগারেটটা এতক্ষণে ধরাল গগল। লম্বা টান দিয়ে আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়ল।

রানা বলল, 'অটারম্যানের শেয়ার কেনা নেই তো হে? একেবারে তলায় নেমে গেছে দর।'

'আশ্চর্যই বলতে হবে,' মাথা নেড়ে হাসল গগল। 'ক'হপ্তা আগে সব শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছি, ফর গডস সেক। সান ইস্তাবানের জন্যে টাকার দরকার ছিল।'

'লাকি,' বিড়বিড় করে বলল রানা; কিন্তু আসলে তা নয়, জানে ও। একটু অবাক হলো, এত সহজে শেয়ার বিক্রির কথাটা স্বীকার করল কেন গগল? এক সেকেন্ড পর কারণটা মাথায় ঢুকল রানার-ব্যাপারটা গোপন রাখা সম্ভব নয়, কে শেয়ার বিক্রি করেছে অনায়াসে খোঁজ করে বের করা যাবে।

চোরা চোখে গগলের দিকে তাকিয়ে রানা ভাবল, গগল কি এত বড় একটা প্রতিভা যে এরকম জটিল একটা প্ল্যান করার যোগ্যতা রাখে? শ্বেতাঙ্গদের জন্যে আলাদা একটা স্বর্গ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখা কি তার পক্ষে সম্ভব? ওর ভেতর সত্যিই কি হিটলারের প্রেতাত্মা লুকিয়ে আছে? অশ্বেতাঙ্গ কোটি কোটি মানুষকে ইঁদুর-বিড়ালের মত মেরে ফেলার জন্যে যে বিপুল পাশবিক শক্তি দরকার তা কি তার আছে?

'কি ব্যাপার, রানা-অমন করে কি দেখছ?' সামান্য একটু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল গগল।

'ভাবছি, ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। তোমার সে যোগ্যতা আছে কিনা সন্দেহ হয়।'

'দুঃখিত, বন্ধু। বুঝলাম না। কি নিয়ে কথা বলছ?'

'খলিফা,' একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল রানা। চমকে স্থির হয়ে গেল গগল। পরমুহূর্তে তিরতির করে কেঁপে উঠল চোখের পাতা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে সে।

'দুঃখিত, বন্ধু-এবারও তোমার কথা বুঝলাম না।'

চমৎকার অভিনয়, মনে মনে প্রশংসা করল রানা। না, স্বীকার করতে হয়, গগলের মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে এতদিন যা ওর চোখে ধরা পড়েনি। অন্তত অভিনয়ে সে একটা জিনিয়াস।

হয়তো খলিফা হবার জন্যে আর যে-সব গুণ দরকার তা-ও গগলের মধ্যে আছে।

'তোমার একমাত্র ভুলটা ছিল, গগল, মিডো অটারম্যানকে নিজের নামটা জানতে দেয়া,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'আমার ধারণা, তুমি জানতে না অটারম্যান মোসাড এজেন্ট ছিল, তোমার নামটা সরাসরি ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্সের কমপিউটারে চলে যাবে। কারও সাধ্য নেই মেমরি রোল থেকে ওটা মুছে ফেলে। তুমি ফাঁস হয়ে গেছ, গগল।'

চট করে একবার শটগানের দিকে তাকাল গগল। রানার নিশ্চিত হবার জন্যে আর কি প্রমাণ দরকার!

'না, গগল। ওটা তোমার জন্যে নয়।' মাথা নাড়ল রানা। 'ওটা আমার কাজ। তোমার গায়ে চর্বি জমেছে, তাছাড়া ট্রেনিংও পাওনি। সেজন্যেই খুন করার কাজগুলো অন্য লোকদের দিয়ে করাতে হয় তোমাকে। অস্ত্রের দিকে এমনকি হাত বাড়ানোও উচিত হবে না তোমার।'

শটগান থেকে রানার মুখে উঠে এল গগলের দৃষ্টি। তার চেহারা এখনও বদলায়নি। 'ব্যাপার কি বলো তো, বদহজম হলে কেউ প্রলাপ বকে?'

'তোমার অন্তত জানার কথা, যে-কোন মানুষকে খুন করার ক্ষমতা আমার আছে। তোমার কিছু কাজ সে পর্যায়ে নিয়ে এসেছে আমাকে।'

'হেঁয়ালি চিরকাল অপছন্দ করি,' হেসে উঠে বলল গগল, যেন কিছুই হয়নি। 'কেন তুমি কাউকে খুন করতে যাবে, রানা?'

'গগল, আমাদের দু'জনকেই অপমান করছ তুমি। আমি জানি। কাজেই অস্বীকার করে কোন লাভ হবে না। নিজেদের মধ্যে বসে এর একটা সমাধান খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।' ফাঁদ, আপোষের টোপ ফেলে অপরাধ স্বীকার করাতে চাইছে রানা। গগলের চোখে সন্দেহের ছায়া দেখল ও, সে-ও ভাবছে এটা ফাঁদ কিনা। ঠোঁটের কোণ একটু বেঁকে গেল, সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করছে। 'কিন্তু প্লীজ, নিজের বিপদটাকে ছোট করে দেখো না, গগল,' আবার বলল রানা, পকেট থেকে কালো একজোড়া লেদার গ্লাভস বের করে পরল হাতে। সাধারণ একটা কাজ, কিন্তু কি যেন একটা ভয়ঙ্কর অর্থ আছে। গ্লাভস দুটোর দিকে পালা করে তাকাল গগল।

'কি করছ তুমি?' এই প্রথম একটু বেসুরো শোনাল গগলের গলা।

'এখনও শটগান ছুঁইনি,' বলল রানা, নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর। 'ওটায় শুধু তোমার হাতের ছাপ আছে।'

'গড, ভেবেছ আমাকে মেরে বাঁচতে পারবে তুমি?'

'কে জানবে? কাদা, ভরা বা উঁচু নিচু জায়গা দিয়ে যেতে হলে লোড করা শটগান রাখতে নেই সাথে, সবাই জানে। সবাই বলবেও তাই।'

'তোমার দ্বারা সম্ভব নয়–এরকম ঠাণ্ডা মাথায়, উঁহুঁ, অসম্ভব!' চেহারায় না হলেও, গগলের কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক।

'তুমি পারলে আমি কেন পারব না। প্রিন্স হাশেম আবদেল হাক্কাসকে কি তুমি রাগের মাথায় খুন করেছিলে?'

'আমি তোমার বন্ধু, সে তো স্রেফ একটা রক্তচোষা জোঁক ছিল–,' বলে ফেলে হতভম্ব হয়ে গেল গগল, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে, জানে এখন আর ভুলটা সংশোধন করার উপায় নেই।

গগলের ওপর চোখ রেখে শটগানের দিকে হাত বাড়াল রানা।

'থামো!' আর্তনাদ করে উঠল গগল। 'রানা, থামো!'

'কেন?' অস্বাভাবিক শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমাকে অন্তত সব কথা ব্যাখ্যা করতে দাও...'

'বেশ, কি বলার আছে শুনি।'

'একটু সময় দাও আমাকে, একটু ভাবতে দাও...ব্যাপারটা এত জটিল...'

'ঠিক আছে, গগল। এসো শুরু থেকে আরম্ভ করি–জিরো-সেভেন-জিরো হাইজ্যাক থেকে। কেন, বলো আমাকে।'

'অত্যন্ত জরুরী ছিল ওটা, রানা। কিন্তু তার আগে আমাদের স্বপ্নটা তোমাকে বুঝতে হবে। আমাদের যে প্ল্যান, সেটাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে সম্পদ হাতছাড়া করা চলে না।'

'স্বপ্ন, গগল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুনিয়াটাকে বাসযোগ্য করার স্বপ্ন, রানা। এমন একটা স্বর্গ গড়ার স্বপ্ন যেখানে শুধু মেধাবী, সুন্দর, আর সক্ষম মানুষ ঠাঁই পাবে।'

'শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্যে।'

'না-না, তা নয়। শ্বেতাঙ্গদেরও অনেকেই বাদ পড়বে–অকর্মা, অযোগ্য, পরনির্ভরশীল, চোর-ডাকাত, ঘুষখোর, ক্রিমিনাল, এরকম আরও অনেককে বাদ দেব আমরা।'

'আর কালোদের সবাইকে বাদ দেয়া হবে...'

'না না, তা নয়–তোমাকে ভুল বোঝানো হয়েছে! কালোদের মধ্যেও মেধা আছে, যোগ্য লোক আছে–তাদের একজনও বাদ পড়বে না...'

'সব মিলিয়ে মাত্র কয়েকজন, তাও যদি তোমার কথা সত্যি হয়। বাহ্, কি সুন্দর স্বপ্ন! স্বয়ং খোদার ভূমিকায় নেমে পড়েছ তাহলে! যারা বাদ পড়বে তারা যাবে কোথায়?'

'লোক সংখ্যার চাপে দুনিয়াটা আর বাসযোগ্য নেই, কথাটা তোমাকেও স্বীকার করতে হবে, রানা। এই পৃথিবী সুস্থ কোন মানুষের কাম্য হতে পারে না। যারা বাঁচব তারা ভালভাবে বাঁচব, এই চিন্তা কি অপরাধ, রানা?'

'মোটেও না। কিন্তু বাকিদের মেরে ফেলার চিন্তাটা?'

ক্ষীণ একটু নার্ভাস হাসি দেখা গেল গগলের ঠোঁটে। 'কে মেরে ফেলবে? ওদের মেরে ফেলার তো কোন দরকারই হচ্ছে না। তৃতীয় বিশ্বের কথা ধরো। ওরা তো নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে, দুর্নীতির বিস্তার ঘটিয়ে নিজেরাই ধ্বংস হতে চলেছে–আমরা হয়তো বড়জোর ধ্বংস হবার গতিটাকে বাড়িয়ে দেব। এর মধ্যে অপরাধ কোথায়, রানা? কেউ চেষ্টা না করলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে এটাই ঘটবে, আমরা শুধু একটু আগে ঘটাতে চাইছি।'

'শ্বেতাঙ্গ শ্রোতা-দর্শক থাকলে তুমুল হাততালি পেতে,' মন্তব্য করল রানা।

'আমরা একটা নির্দিষ্ট প্ল্যান ধরে কাজ করছি, রানা,' আবেগে কাঁপছে গগলের কণ্ঠস্বর। 'দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গে বলি। দেশটায় ব্রিটিশ পুঁজি রয়েছে চার বিলিয়ন পাউন্ড, আরও রয়েছে তিন বিলিয়ন ডলার মার্কিন পুঁজি। যে-সব দেশ সবচেয়ে বেশি সোনা আর ইউরেনিয়াম উৎপাদন করে, দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের অন্যতম। এ-ধরনের আরও দশ রকম খনিজ উৎপাদনে সেরা ওরা। মাই গড, রানা! দেশটার বর্তমান প্রশাসকরা আত্মহত্যার পথ ধরেছে। দেশটার শাসনভার আমাদের হাতে আসা দরকার, আমরা তাহলে যোগ্য একজনকে দিয়ে নতুন প্রশাসন চালু করতে পারব। তা না হলে কালোরা ক্ষমতা দখল করে নেবে, নয়তো কমিউনিস্টরা গ্যাঁট হয়ে বসে পড়বে। আমরা-কিভাবে তা হতে দিই, বলো?'

'সত্যিই তো, কিভাবে হতে দাও! তোমরা তাহলে বিকল্প সরকার ঠিক করে রেখেছিলে?'

'অবশ্যই,' দ্রুত, আবেগতাড়িত ভঙ্গিতে বলল গগল, দেখে নিল এখনও কোমরের কাছে শটগানটা ধরে আছে রানা। 'সব দিক ভেবেই প্ল্যান করা হয়েছিল। দু'বছর সময় কি আর এমনি লেগেছে?'

'ঠিক আছে, এবার প্রিন্স হাশেম আবদেল হাক্কাস প্রসঙ্গ।'

ব্যাকুল হয়ে রানাকে বোঝাতে চেষ্টা করল গগল, 'ওটা খুন ছিল না, রানা, ফর গডস সেক! ইট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি। ইট ওয়াজ এ ম্যাটার অভ সারভাইভাল। বখাটে বাচ্চাদের মত দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে পশ্চিমা সভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে ওরা। ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে, কোন যুক্তি শুনতে রাজি নয়। তেলের দাম বাড়িয়ে ডলার, পাউন্ড, আর মার্কের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ওরা। প্রতিদিন হুমকি দিচ্ছে আমেরিকা আর ইংল্যান্ডের ব্যাংক থেকে নিজেদের সব টাকা তুলে নেবে–অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের অর্থনীতি অচল করে দিতে চায় ওরা। কত দিন এই আতঙ্কের মধ্যে থাকতে পারে মানুষ? ওদের যাতে হুঁশ ফেরে তার ব্যবস্থা তাই করতেই হলো, এবং খুব সামান্যই ক্ষতি হলো ওদের। ধীরে ধীরে তেলের দাম এভাবে আমরা আরও কমাতে পারব–উনিশশো সত্তর সালের দরে ফিরে যেতে বাধ্য করব ওদের। এবং তেলের দাম কমে গেলে পশ্চিমা দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ফুলে-ফেঁপে উঠবে...'

'খুবই সুখের কথা,' বলল রানা। 'তোমাদের পরবর্তী টার্গেট, গগল? তৃতীয় বিশ্বের ধ্বংস কিভাবে তোমরা ত্বরান্বিত করতে চাও?'

'দাতা দেশগুলোর সরকার প্রধানের ওপর চাপ দেব আমরা,' কোন রকম দ্বিধা না করে বলে গেল গগল। 'তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে খাদ্য সাহায্য কমাতে হবে, তারপর এক সময় সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। কোন দেশ যদি আমাদের কথা না শোনে, খাদ্যবাহী জাহাজ মাঝ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেব আমরা। এরকম আরও অনেক প্ল্যান...'

'আচ্ছা, গগল, তোমাকে আমার অচেনা লাগছে কেন বলো তো?' তীক্ষ্ণ চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল রানা। 'তুমি তো এরকম ছিলে না কখনও। আরবদের সাথেই প্রথম তুমি ব্যবসা শুরু করো, ওদের জন্যে তোমার মনে দরদ ছিল। হঠাৎ একেবারে উল্টো সুর ধরলে যে?'

কি যেন বলতে গিয়ে মুখ খুলল গগল, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে, চেপে গেল।

'ঠিক আছে, বাদ দাও। কেউ যদি তার আদর্শ পাল্টায়, কার কি করার আছে। তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে কয়েকটা প্রশ্ন আছে আমার।'

'কি প্রশ্ন, রানা?' কেমন যেন ক্লান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল গগল।

'ড. এডওয়ার্ড ওয়ার্নার আর ব্যারনেস লিনাকে খুন করার প্ল্যান কেন করা হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল গগল, অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল নিঃশব্দে। 'না,' মৃদু কণ্ঠে বলল। 'ব্যাপারটা অন্য রকম।'

'এবং কেনই বা ব্যারন অটারম্যানকে খুন করার দরকার পড়ল?'

'তার ব্যাপারটার সাথে আমি জড়িত নই-হ্যাঁ, জানতাম ঘটেছে, কিন্তু আমার কোন ভূমিকা ছিল না। অন্তত খুনের সাথে সরাসরি আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। ওহ্ গড, ঠিক আছে, জানতাম লোকটা মারা যাবে, কিন্তু...' নিস্তেজ হয়ে একেবারে থেমে গেল গলার আওয়াজ, রানার দিকে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল গগল।

'আবার প্রথম থেকে শুরু করো, গগল। সবটুকু শোনা যাক-' প্রায় কোমল সুরে বলল রানা।

'না, রানা-সম্ভব নয়। কি ঘটতে পারে তুমি বুঝবে না। সব তোমাকে বললে...'

শটগানের সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা। নিস্তব্ধ পাহাড়ের ওপর ক্লিক শব্দটা অস্বাভাবিক জোরাল শোনাল। আঁতকে উঠল গগল, পিছিয়ে গেল এক পা। চোখ পিট পিট করছে সে, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'গড,' ফিসফিস করে বলল সে। 'তুমি সত্যি খুন করবে আমাকে!'

'ব্যারন অটারম্যান সম্পর্কে জানতে চাই আমি।'

'আরেকটা ধরাতে পারি, রানা-সিগারেট?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল গগল। 'আমি ব্যাখ্যা করার আগে তোমার জানতে হবে সিস্টেমটা কি।'

'জানাও।'

'আমাকে রিক্রুট করা হয়।'

'মিথ্যে কথা বোলো না, গগল,' বাধা দিল রানা। 'তুমিই খলিফা।'

'নো, গড। নো, রানা! সবটাই তুমি ভুল জানো,' চেঁচিয়ে বলল গগল। 'এটা একটা চেইন। খলিফার চেইনে আমি স্রেফ একটা লিঙ্ক। আমি খলিফা নই।'

'তাহলে খলিফার একটা অংশ তুমি।'

'না, তা-ও নয়। চেইনের শুধু একটা লিঙ্ক।'

শটগানের ব্যারেল এক চুল সরাল রানা, লক্ষ করে আরও একটু বিস্ফারিত হলো গগলের চোখ। 'বলো।'

'একজন লোক, অনেক দিন থেকে চিনি। আগেও তার সাথে কাজ হয়েছে আমার। বিরাট ধনী আর প্রভাবশালী, তার তুলনায় আমাকে চুনোপুঁটি বলতে পারো। ব্যাপারটা হঠাৎ করে বা রাতারাতি ঘটেনি। অনেক মাস, অনেক বছর ধরে কথা হয়েছে, বিতর্ক হয়েছে, অবশেষে মত পাল্টেছি আমি, তার আদর্শই ঠিক বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা শান্তিময়, সমৃদ্ধশালী একটা পৃথিবী দেখতে চাই। যেখানে যুদ্ধ থাকবে না, ক্ষমতার লড়াই থাকবে না, অভাব থাকবে না, অসুন্দর থাকবে না, অবিচার থাকবে না। সেই নতুন পৃথিবীতে শুধু যোগ্য, মেধাবী, আর সুন্দর মানুষদের ঠাঁই হবে। সেরকম একটা স্বর্গ গড়ে তুলতে চাইলে সবাইকেই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রথম কাজ, ধীরে ধীরে ক্ষমতা অর্জন করা। সেই সাথে...'

'তোমার রাজনৈতিক আর মানবিক আদর্শের কথা বাদ দিয়ে যাও, ইতিমধ্যে

আমি আন্দাজ পেয়ে গেছি,' বলল রানা।

'বেশ। এক পর্যায়ে এই লোক আমাকে বলল, পশ্চিমা জগতের রাজনীতিক আর শিল্পপতিদের নিয়ে একটা সমিতি গঠন করা হয়েছে, যারা স্বপ্নটাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছেন, আমি সমিতিতে যোগ দিতে চাই কিনা।'

'লোকটা কে, গগল?'

'রানা, এ প্রশ্ন কোরো না!'

'উত্তর না দিয়ে তোমার উপায় নেই, গগল।' পরস্পরের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওরা, এক সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল গগল।

'বেশ। লোকটা হলো...,' এমন এক লোকের নাম বলল গগল, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী মহলের সবাই তাকে এক ডাকে চেনে। মুক্তবিশ্বের বেশিরভাগ নিউক্লিয়ার ফুয়েল নিয়ন্ত্রণ করে লোকটা, সোনা কেনা-বেচায় তাকে ছাড়ানো প্রায় অসম্ভব, মূল্যবান পাথরের সবচেয়ে বড় স্টক রয়েছে তার।

'জিরো-সেভেন-জিরো অপারেশন সফল হলে তাকেই তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষমতায় বসাতে তোমরা?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল গগল।

'বলে যাও।'

'আমার মত তাকেও রিক্রুট করা হয়। কিন্তু তাকে কে রিক্রুট করেছিল আমার জানা নেই। সমিতিতে আমি যোগ দিলাম, এবার আমার দায়িত্ব হলো ভাল একজন সদস্য যোগাড় করা–সে কে হবে তা কেবল আমি একাই জানব। চেইনের নিরাপত্তা রক্ষার এটাই পদ্ধতি। প্রতিটি লিঙ্ক তার ওপর আর নিচের লিঙ্ককে শুধু চিনবে–যে তাকে রিক্রুট করেছে, এবং সে যাকে রিক্রুট করল।'

'খলিফা? খলিফা সম্পর্কে বলো।'

'কেউ জানে না কে সে।'

'কিন্তু সে জানে তুমি কে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই জানে।'

'তাহলে খলিফার কাছে মেসেজ পাঠাবার একটা উপায় তোমার থাকতে বাধ্য,' বলল রানা। 'ধরো, নতুন একজন সদস্যকে তুমি রিক্রুট করলে, খবরটা খলিফাকে জানাতে হবে তো? কিংবা তোমাকে কোন নির্দেশ দিতে চায় সে, যোগাযোগ সে করে দেবে কিভাবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিভাবে?'

'গড, রানা! এর মূল্য আমার জীবনের চেয়েও বেশি!'

'এ-প্রসঙ্গে পরে ফিরে আসব আমরা,' অধৈর্য হয়ে উঠে বলল রানা। 'ব্যারন অটারম্যান সম্পর্কে বলো।'

'ব্যাপারটা লেজে-গোবরে হয়ে যায়, কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। রিক্রুট করার জন্যে তাকে আমি নির্বাচন করি। মনে হচ্ছিল ঠিক তার মত একজন লোকই আমাদের দরকার। অনেক বছর ধরে তার সাথে পরিচয়, জানা ছিল প্রয়োজনে অসম্ভব কঠোর হতে পারে সে। কাজেই তাকে আমি প্রস্তাব দিলাম।

'প্রথমে খুব আগ্রহ দেখাল সে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিল, বিশেষ করে খলিফার কাজের পদ্ধতি। তার মত একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে সমিতির সদস্য করতে যাচ্ছি, এই আনন্দে বগল বাজাচ্ছিলাম। আমাকে আভাস দিল, সমিতির ফান্ডে পঁচিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার চাঁদা দেবে সে। কাজেই খবরটা আমি খলিফার কাছে পাঠালাম। বললাম, ব্যারন মিডো অটারম্যানকে রিক্রুট করতে যাচ্ছি–' নার্ভাস হয়ে থেমে গেল গগল, পাথরের ওপর সিগারেট ফেলে জুতোর তলা দিয়ে ঘষল।

'তারপর কি হলো?' তাগাদা দিল রানা।

'সাথে সাথে সাড়া পেলাম খলিফার। আমাকে হুকুম করা হলো, এই মুহূর্তে ব্যারন অটারম্যানের সাথে সমস্ত যোগাযোগ কেটে দিতে হবে। বুঝলাম, নির্ঘাত আমি বিপজ্জনক এক লোককে রিক্রুট করতে যাচ্ছিলাম। আজ তোমার মুখ থেকে শুনলাম, ব্যারন মোসাডের ছিল। আমি জানতাম না, কিন্তু খলিফা নিশ্চয়ই জানত।'

'তারপর তুমি কি করলে?'

'বুঝলাম অটারম্যান আগুনের গোলা, কাজেই ফেলে দিলাম হাত থেকে। চারদিন পর কিডন্যাপ করা হলো তাকে। তাতে আমার কোন ভূমিকা ছিল না, রানা। খোদার কসম, আল্লার কসম, যীশু আর মেরীর কসম। লোকটাকে আমি পছন্দ করতাম, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল...'

'শ্রদ্ধা তো তোমার গোটা মানবজাতির ওপরও ছিল–যাক সে কথা। কিন্তু কাজটা যে খলিফার, আর তুমিও যে দায়ী, এটা বুঝেছিলে কি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মাথা নত করল গগল। 'হ্যাঁ।'

'অটারম্যানকে টরচার করা হয় কেন? খলিফা সম্পর্কে তথ্য মোসাডকে সে বলে দিয়েছে কিনা জানার জন্যে, তাই না?'

'হ্যাঁ। মনে হয়। আমি জানি না।'

'অটারম্যান সম্পর্কে যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয়, ওরা তার মুখ খোলাতে পারেনি '

'পারার কথা নয়। ব্যারন মচকাবার লোক ছিল না। সম্ভবত ধৈর্য হারিয়ে টরচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় ওরা, আর তাতেই মারা যায় সে।' মুখ তুলে ডাঙায় তোলা মাছের মত বার কয়েক খাবি খেলো গগল, তারপর দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বলেই ফেলল, 'এই প্রথম খলিফা সম্পর্কে আমার ধারণায় একটু চিড় ধরল। এরপর ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে ক্লিনিকে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম...,' বলেই পরিষ্কার আঁতকে উঠল গগল।

স্থির পাথর হয়ে গেল রানা। ওর তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে আবার মাথা নত করল সে। 'ক্লিনিক, গগল?'

সাথে সাথে কিছু বলল না গগল, খানিক পর নিচু গলায় বলল, 'কয়েক বছর ধরে চলেছে এটা। প্রতি মাসে দু'দিনের জন্যে একটা ক্লিনিকে থাকতে হয় আমাদের। প্রথমবার অবশ্য পনেরো দিন থাকতে হয়েছিল।'

'কেন?'

'সম্মোহনের সাহায্যে খলিফার আদর্শ অবচেতন মনে গেঁথে দেয়া হয়...'

গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। বিস্মিত হবার কিছু নেই। গগল সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেছে। এক কথায় সমিতির সদস্যদের ব্রেন ওয়াশ করা হয়, তাদের যাতে নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধি বলে কিছু না থাকে। 'শুধু সম্মোহন, নাকি আরও কিছুর সাহায্য নেয়া হত? ইলেকট্রিক শক দেয়া হয়নি তোমাকে? কিছু কিছু মেডিসিন ব্যবহার করা হয়নি?'

প্রথমে একটা ঢোক গিলল গগল, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

ব্রেন ওয়াশ, কোন সন্দেহ নেই। বিরাট একটা স্বস্তি বোধ করল রানা, গগল আসলে সত্যি সত্যি বদলে যায়নি। কৃত্রিম একটা শক্তির সাহায্যে তার চিন্তা-ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, সেই শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া গেলে আবার আপন সত্তা ফিরে পাবে সে। কেউ তাকে এতদিন চ্যালেঞ্জ করেনি, তাই নিজের পরিবর্তনটা খেয়াল করেনি সে। এখন যখন খেয়াল করছে, ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে ফিরে আসবে এবার। তবে পুরোপুরি সারিয়ে তুলতে চিকিৎসা দরকার হবে তার।

'আচ্ছা, তুমি বুঝতে পারছ কি জঘন্য একটা ব্যাপারে জড়িয়েছ নিজেকে? মাথায় ঢোকে, গোটা ব্যাপারটা ঘৃণ্য?'

'শুরুতে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমিও তো চাই দুনিয়াটা সুন্দর হোক। তারপর দলে যোগ দেয়ার পর মনে হলো ঝড়ের বেগে ছুটছে ট্রেন, নামার কোন উপায় নেই।'

'বেশ। তারপর তুমি কি করলে? রবুইলে রোডে খুন করার চেষ্টা করলে আমাকে। জানতে পারি, আমার অপরাধ কি ছিল?'

'গুড গড, না!' বিহ্বল দেখাল গগলকে। 'তুমি আমার বন্ধু, গুড গড–!'

'ব্যারনেস লিনা স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাইছিল, আমি তাকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম, খলিফা ব্যাপারটা টের পেয়ে আমাকে সরাবার ব্যবস্থা করে...'

'এর আমি কিছুই জানি না, প্লীজ রানা, বিশ্বাস করো! খলিফা নিশ্চয়ই জানে তুমি আমার বন্ধু, সে যদি তোমাকে খুন করার প্ল্যান করে থাকে, আমাকে তো জানতে না দেয়ারই কথা।'

'বেশ, তাহলে বলো এরপর তোমার অপারেশন কি ছিল?'

'কোন অপারেশন ছিল না...'

'সাবধান, গগল,' কঠোর সুরে বলল রানা। 'মিথ্যে কথা বলবে না। প্রিন্স হাশেম আবদেল হাক্কাস খুন হবে, তুমি জানতে না?'

'জানতাম। হ্যাঁ, সব ব্যবস্থা আমাকেই করতে হয়। খলিফা আমাকে হুকুম করেছিল।'

'তারপর তুমি সোহেলকে কিডন্যাপ করাও, তার আঙুল কেটে...'

'না-না-না! তুমি জেনেশুনে কষ্ট দিচ্ছ আমাকে।' গলা ভেঙে গেছে গগলের, জবা ফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে চোখ জোড়া।

'আমি যাতে ড. ওয়ার্নারকে খুন করতে বাধ্য হই...'

'না, রানা, না!'

'তারপর তুমি চাইলে আমি যেন ব্যারনেস লিনাকেও খুন করি...'

'রানা, তুমি আমার শুধু বন্ধু নও, আমার নিজেরই অংশ–তোমার বা তোমার প্রিয় কারও ক্ষতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বাস করো, প্লীজ বিশ্বাস করো! সোহেলকে তুমি কি রকম ভালবাসো আমি জানি। সত্যি বলছি, ওর ব্যাপারটায় খলিফার হাত আছে আমি জানতাম না। জানলে আমি বাধা দিতাম, অবশ্যই বাধা দিতাম...'

রানার চেহারায় ভীতিকর নিষ্ঠুরতা ফুটে আছে। গগলের মনে হলো, এর কাছ থেকে ক্ষমা আশা করা বৃথা।

'সোহেলের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না, কথাটা প্রমাণ করার জন্যে তুমি যা বলবে তাই করব, রানা–যে-কোন ঝুঁকি নিতে আমি প্রস্তুত।'

মৃদু মাথা ঝাঁকাল রানা, যেন কি ঝুঁকি নিতে বলবে ভাবছে। দেখল, রক্ত নেমে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে গগলের চেহারা, ঠোঁট কাঁপছে। গগল যে মিথ্যে কথা বলছে না, বুঝতে পারল। একটাও কথা না বলে শটগানটা বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিল ও।

স্তম্ভিত হয়ে গেল গগল, হাত বাড়িয়ে শটগানটা ধরল বটে, কিন্তু হাত ফিরিয়ে নেয়ার কথা মনে থাকল না কিছুক্ষণ।

'তুমি মস্ত বিপদের মধ্যে আছ, গগল,' শান্তভাবে বলল রানা। জানে, এখন থেকে গগলের আন্তরিক সহযোগিতা দরকার হবে ওর, সেটা বন্দুকের মুখে আদায় করা সম্ভব নয়।

আবার একবার মাথা নত করল গগল। শটগানটা বুকের সামনে এনে ভাঁজ করল, কার্ট্রিজগুলো বের করে পকেটে ভরল।

'চলো ফিরি,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'পুরো এক বোতল হুইস্কি দরকার আমার।'

'আমার দরকার পুরো এক কেস,' রানার পিছু নিয়ে ভাঙা গলায় বলল গগল।

তেরো

গগলের স্টাডি, ফায়ারপ্লেসে গনগনে আগুন জ্বলছে। স্টাডির জানালা দরজা ষোড়শ শতাব্দীর, একটা জার্মান চার্চে ব্যবহার হত, স্প্যানিশ এক ডিলারের কাছ থেকে নিলামে কিনে সুইটজারল্যান্ড থেকে চোরা পথে আনিয়েছে গগল। জানালার বাইরে কাঁচমোড়া গোলাপ বাগিচা। স্টাডির দু'দিকের দেয়ালে বুক শেলফ, প্রতিটি বই সোনালি এনগ্রেভ করা। ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে গগল, লকলকে শিখার দিকে পিঠ। আঁচ পাবার জন্যে কাঁধ থেকে নিচের দিকে একটু নামিয়ে দিয়েছে জ্যাকেট, হাতে ক্রিস্টাল টাম্বলার, এখনও হুইস্কিতে ভরে আছে অর্ধেকটা। কামরার আরেক প্রান্তে একটা ভিক্টোরিয়ান আমলের আর্ম চেয়ারে বসে আছে রানা, পা দুটো কাশ্মীরী কার্পেটের ওপর লম্বা করা, হাত দুটো পকেটে ঢোকানো।

'খলিফার যুদ্ধ খাতে কত টাকা চাঁদা দিয়েছ?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা।

'ব্যারন অটারম্যান আর আমি তো আর এক সারিতে পড়ি না,' শান্তভাবে জবাব দিল গগল, 'পাঁচ মিলিয়ন স্টার্লিং দিতে বলা হয় আমাকে, ভাগ ভাগ করে পাঁচ বছরে দিয়েছি।'

'তারমানে খলিফা পুরানো পাপী।'

গগল কোন কথা বলল না।

'তারমানে আন্তর্জাতিক সীমারেখা ছাড়িয়ে সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে তার সমিতি। সব দেশেই তার প্রভাবশালী সদস্য আছে, প্রত্যেকে মোটা টাকা চাঁদা দিচ্ছে, স্রোতের মত চারদিক থেকে আসছে ইনকামেশন...'

মাথা ঝাঁকাল গগল। গাঢ় রঙের হুইস্কি খেলো আরও এক ঢোক।

'কোন্ দেশে ক'জন সদস্য, সংখ্যাটা জানো?'

মাথা নাড়ল গগল।

'প্রতি দেশে একজন বা দু'জন সদস্য আছে তা মনে করার কোন কারণ নেই। হয়তো শুধু ইংল্যান্ডেই আছে বিশজন। জার্মানীতে আরও বেশি থাকার কথা। আর আমেরিকাতে বোধহয় একশোর ওপর...'

'সম্ভব।'

'কাজেই অন্য একটা লিঙ্ককে দিয়ে সোহেলকে কিডন্যাপ করিয়ে থাকতে পারে...'

'তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে, রানা, এ-ব্যাপারটার সাথে আমি ছিলাম না।'

অসহিষ্ণু একটা ভঙ্গি করে গগলের প্রতিবাদ এড়িয়ে গেল রানা, আপনমনে কথা বলে উঠল, 'এমনও হতে পারে খলিফা হয়তো প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একটা কমিটি—একজন লোক না-ও হতে পারে।'

'আমার তা মনে হয় না—,' ইতস্তত করল গগল, '—প্রথম থেকেই খুব জোরাল একটা অনুভূতি হয়েছে আমার, সে একা একজন। কোন কমিটির পক্ষে এত দ্রুত আর দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়।'

চুপ করে তাকিয়ে থাকল রানা, গগলকে কথা বলার সুযোগ দিতে চায়।

'খলিফা সম্পর্কে মাত্র একজন লোকের সাথে আলাপ করার সুযোগ হয় আমার, যে আমাকে রিক্রুট করেছে। বুঝতেই পারছ, আস্থা না আসা পর্যন্ত পাঁচ মিলিয়ন স্টার্লিং দিতে রাজি হইনি আমি। খলিফার প্রভাব আর ক্ষমতা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা দেয়া হয় আমাকে। সে যে একা একজন মানুষ, তখনই আমি বুঝতে পারি। সমস্ত বিষয়ে সে একা সিদ্ধান্ত নেয়, তবে সকলের স্বার্থে।'

'কিন্তু সব সদস্য তার সিদ্ধান্তের কথা জানতে পারে না।'

'না। সবাইকে সব জানানো তো পাগলামি। সাফল্যের চাবিকাঠিই তো গোপনীয়তা।'

'জীবনে কখনও দেখোনি, যার পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে, তাকে তুমি এত টাকা দিয়ে বিশ্বাস করতে পারো? বিশ্বাস করতে পারো, পৃথিবীর মঙ্গল চায় সে?' রাগ চেপে রেখে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অবতারের মত তার একটা প্রভা আছে, রানা। তার জগৎত্রাতা ভূমিকায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। যে লোক আমাকে রিক্রুট করেছিল তার প্রতি আমার অগাধ

শ্রদ্ধা ছিল। খলিফার প্রীতি তার আস্থা দেখে আমিও...'
'এখন কি মনে হচ্ছে তোমার? এখনও কি তুমি তার প্রতি আস্থা রাখতে পারছ?'
টাম্বলারের অবশিষ্ট হুইস্কি দু'ঢোকে খেয়ে ফেলল গগল, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভেজা গোঁফ মুছল। নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে।
'উত্তর দাও, গগল।'
'আমি এখনও মনে করি আইডিয়াটা ভাল...' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল গগল। আমরা একটা বাতিলযোগ্য দুনিয়ায় বাস করছি। আরেক ছাঁচে ফেলে এটাকে নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব...'
'তোমার ব্রেন ওয়াশ করা হয়েছে। আসল কথাটাই তুমি বুঝতে পারছ না। পৃথিবীকে আরও অনেক ভাল করা যাবে, কিন্তু স্বর্গ বানানো যাবে না কখনও। কারণ সুন্দরের পাশাপাশি অসুন্দর কিছু থাকবেই, তা না হলে সুন্দরের কদর হবে না, সুন্দর মহিমা হারাবে। আরও একটা দিক আছে, গগল, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা পশ্চিমা দুনিয়াকে সভ্য বলছ, কিন্তু সভ্য তারা হলো কিভাবে ভেবে দেখেছ? ব্রিটেনের কথা ধরো, ওরা কলোনিগুলো থেকে ডাকাতি করে সম্পদ এনে নিজেদের উন্নতি করেছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের অত্যাচার আর শোষণের কথা তো ক্লাস ফোরের ছাত্রও জানে। আর আমেরিকা? রেড ইন্ডিয়ানদের মেরে সাফ করে দিল, দখল করে নিল দেশটা। এই মুহূর্তেই বা তার নীতিটা কি? কোথায় না অস্ত্র বিক্রি করছে সে? কার ওপর না নিজের মতবাদ আর নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিচ্ছে? ওদের কূটবুদ্ধি বেশি, ওরা নিষ্ঠুর আর বিবেকহীন, তাই ওদেরকে সভ্য বলবে তুমি? যাদের শোষণ করে আজ ওরা ধনী, তাদের পাইকারীভাবে খুন করা হবে, আর তুমি ওদের সহায়তা করবে?'
'কে বলল পাইকারীভাবে...'
'আমি বলছি, তুমি সুস্থ থাকলে তুমিও বলতে। খলিফা আরেকজন হিটলার, উন্মাদ, হিটলারের চেয়েও বড় স্বপ্ন নিয়ে কাজ করছে সে। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে, কিন্তু এখনই তাকে বাধা দেয়া না হলে মানুষের অনেক বড় ক্ষতি করে বসবে—আমি চাই তাকে বাধা দেয়ার কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করো।'
'তুমি বলতে চাইছ খলিফা অসৎ লোক? তার মহৎ কোন উদ্দেশ্য নেই?'
'আমি কেন বলব, তুমি নিজেই তো বলেছ অটারম্যান খুন হবার পর তার প্রতি বিশ্বাসে তোমার চিড় ধরে,' বলল রানা। 'তারপর সোহেলকে কিডন্যাপ করে সে। বলতে পারো, এর পিছনে কি মহৎ উদ্দেশ্য ছিল তার?'
'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে বলল গগল, 'তার এই দুটো কাজ অন্যায় হয়ে গেছে...'
'তারমানে খলিফা মানবজাতির মঙ্গলের জন্য নয়, নিজের স্বার্থে কাজ করছে, এটা বুঝতে পারছ?'
মাথা ঝাঁকাল গগল।
'এখন তাহলে বিশ্বাস হয় যে লোকটা একটা শয়তান?'
'কিন্তু পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করার একটা ব্যাপক পরিকল্পনা থাকা উচিত, এ আমি এখনও বিশ্বাস করি।'

'কিন্তু সে-ধরনের কোন পরিকল্পনা খলিফার নেই।'

'হয়তো নেই, তবে থাকলে ভাল হত...' থমথম করছে গগলের চেহারা।

'তুমি বলেছ, সোহেলের কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে জড়িত ছিলে না প্রমাণ করার জন্যে যে-কোন ঝুঁকি নিতে রাজি আছ। খলিফাকে বাধা দেয়ার কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করবে?'

রানার চোখে চোখ রেখে গগল বলল, 'ঠিক জানি না। তবে জানি, তুমি কিছু চাইলে সেটা না দিয়ে পারব না।'

'আমি তোমার সাহায্য চাইছি,' বলল রানা। 'কিন্তু তার আগে বুঝে দেখো–বিরাট ঝুঁকি নিতে হবে তোমাকে।'

'জানি। খলিফাকে আমি তোমার চেয়ে ভাল চিনি।'

যাক, ভাবল রানা, বেশি কাঠখড় পোড়াতে হয়নি, রাজি করানো গেছে।

'আমাকে দিয়ে কি করাতে চাও, রানা?'

'খলিফার সাথে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করবে তুমি–সামনাসামনি।'

'অসম্ভব!' সাথে সাথে ধারণাটা বাতিল করে দিল গগল।

'তুমিই না বললে তার কাছে মেসেজ পাঠাবার একটা উপায় আছে?'

'আছে, কিন্তু দেখা করার প্রস্তাবে খলিফা কখনোই রাজি হবে না।'

'আচ্ছা, গগল, বলো তো খলিফার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কি?'

'তার কোন দুর্বলতা নেই।'

'ভেবে দেখো–আছে,' বলল রানা।

'তুমিই বলো।'

'তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা, ব্যক্তিগত পরিচয়টা ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে আতঙ্কিত থাকে। এর সাথে তার নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। যখনই তার পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ার ঝুঁকি দেখা দেয়, তখনই সে মরিয়া হয়ে উঠে হাইজ্যাক, কিডন্যাপ, টরচার, আর মার্ডার শুরু করে।'

'এ তার দুর্বলতা নয়, শক্তি,' মন্তব্য করল গগল।

'মেসেজে বলো, তার পরিচয় ফাঁস হতে চলেছে,' পরামর্শ দিল রানা। 'বলো, কেউ একজন, তার এক শত্রু, সিকিউরিটি স্ক্রীন ভেদ করে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।'

প্রায় দশ সেকেন্ড চিন্তা করল গগল, পায়ে ব্যথা অনুভব করে এগিয়ে এসে একটা সোফায় বসল। 'হ্যাঁ, দ্রুত প্রতিক্রিয়া হবে তার। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি জেনে ফেলবে আমি মিথ্যে কথা বলছি। আমাকে সে শত্রু বলে চিনে ফেলবে, তারমানে ঝুঁকি নেব ঠিকই কিন্তু তোমার কোন কাজে আসব না।'

'কথাটা মিথ্যে নয়,' বলল রানা। 'খলিফার কাছাকাছি মোসাডের একজন এজেন্ট সত্যি আছে।'

'তুমি জানলে কিভাবে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল গগল।

'তা বলা যাবে না। তবে তথ্যটা নির্ভুল। এমনকি এজেন্টের কোড নেম-ও আমি জানি।'

'সেক্ষেত্রে–,' আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করল গগল, '–এরই মধ্যে সন্দেহ দেখ

দিয়েছে খলিফার মনে, আমার কথা সাথে সাথে বিশ্বাস করবে সে। তবে লাভ নেই। লোকটার শুধু নাম জানতে চাইবে সে, বলবে রুটিন চ্যানেলে নামটা আমাকে জানাও।'

'তুমি বলবে, তথ্যটা ভারী সেনসিটিভ, সামনাসামনি ছাড়া দেয়া সম্ভব নয়। বলবে, এর সাথে তোমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও জড়িত।'

'সে আমার ওপর চাপ দিতে থাকবে...'

'কিন্তু তুমিও যদি জেদ বজায় রাখো?'

'মনে হয় শেষ পর্যন্ত দেখা করতে রাজি হবে। তোমার কথা ঠিক, পরিচয় নিয়ে একটা আতঙ্কে ভোগে সে। কিন্তু, আমার সাথে দেখা করলে তার পরিচয় কিন্তু সেই ফাঁসই হয়ে গেল...'

'কাজেই চিন্তা করো, গগল–ভেবে বের করো কি করবে সে,' উৎসাহ দেয়ার সুরে বলল রানা।

বুঝতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগল গগলের, বদলে গেল তার চেহারা, এমনভাবে বেঁকে গেল ঠোঁট যেন ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করছে। 'গুড গড! বাধ্য হয়ে দেখা সে করবে, কিন্তু তারপর আমি আর বাঁচব না।'

'ঠিক তাই,' বলল রানা। 'তোমাকে সে দেখা দেবে, কিন্তু তার পরিচয় তুমি আর কাউকে জানাবার আগেই তোমাকে সে খুন করবে।'

'তাহলে?' একটু অসহায় দেখাল গগলকে।

'ওরা তোমার সর্বনাশ করেছে, গগল, সর্বনাশ করেছে!' দুঃখের সাথে মাথা নাড়ল রানা। 'আমার জন্যে এরচেয়ে বড় বড় ঝুঁকি নিয়েছ তুমি, এতটুকু ভয় পাওনি। আর আজ!'

'না, মানে, তুমিই তো বললে আমি মোটা হয়ে গেছি...,' আমতা আমতা করল গগল।

'খলিফাকে লোকটার নাম না জানানো পর্যন্ত তুমি নিরাপদ,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, কিন্তু তারপর?'

'তার আগে বা তার পরে, তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার, গগল। কথা দিচ্ছি, তোমার কোন বিপদ হবে না।'

'বেশ। কখন তার সাথে যোগাযোগ করতে বলো তুমি?'

'যোগাযোগ করো কিভাবে?'

'ব্যক্তিগত কলামে বিজ্ঞাপন ছাপি।'

'সোমবার সকালে ছাপতে দাও,' নির্দেশ দিল রানা।

রানাকে ধরে নিতে হলো, ওর ওপর কড়া নজর রাখছে খলিফা। ব্যারনেস লিনাকে ও খুন করার পর ওর ওপর খলিফার আকর্ষণ শতগুণ বেড়ে গেছে। কাজেই স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে ওকে।

সোমবার ভোরের ফ্লাইট ধরে ব্রাসেলস ফিরে এল ও, দুপুরের আগে মিডো হেডকোয়ার্টারে নিজের ডেস্কে দেখা গেল ওকে। এখানেও ওকে নিয়ে নানা ধরনের সমালোচনা চলছে, তার সাথে শুরু হয়েছে ক্ষমতা ভাগ-বাঁটোয়ারার তোড়জোড়।

মিডো স্টীল তার চীফ একজিকিউটিভকে হারিয়েছে, কাজেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ডিরেক্টররা মাথাচাড়া দিচ্ছে, প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কে কার চেয়ে বেশি ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। এই দ্বন্দ্ব থেকে কৌশলে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখল রানা। তবে গোটা ব্যাপারটার ওপর নজর রাখল, পরে যাতে ব্যারনেসকে রিপোর্ট করা যায়। এই পরিস্থিতিতে অনেক ডিরেক্টরের মুখোশ খসে পড়বে, পরে প্রয়োজনে তাদের বিদায় করে দেয়া সহজ হবে ব্যারনেসের পক্ষে।

সোম নয়, মঙ্গলবারের কাগজে ছাপা হলো গগলের বিজ্ঞাপন। ব্রাসেলসে বসে বিজ্ঞাপনটা পড়ল রানা– 'অনেক কথা ছিল, দেখা হওয়া দরকার।'

গগল রানাকে জানিয়েছে, সাড়া দিতে সাধারণত আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় নেয় খলিফা।

লিডেন হল স্ট্রীটে, নিজের অফিস বিল্ডিঙে প্রতিদিন অপেক্ষা করবে গগল, দুপুর থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত, এই সময়ের মধ্যেই আসবে ফোনটা। বুধবারে কোন ফোন এল না, তবে আসবে বলে আশাও করেনি গগল। বৃহস্পতিবারে অফিসের মেঝেতে পায়চারি শুরু করল সে।

বিকেল চারটের সময় বাজল টেলিফোন। একবার, তারপর আরেকবার। রিসিভার তুলল গগল, হাতটা কাঁপছে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। ভাবল, রানার কথাই ঠিক, আমি বদলে গেছি। 'গগল,' বলল সে।

অপরপ্রান্তের এই কণ্ঠস্বর তার চেনা। যতবার শুনেছে গগল, বুকের ভেতরটায় কাঁপ ধরে গেছে। যেন কোন রোবট কথা বলেছে। 'আলডগেট আর লিডেনহল স্ট্রীটের মাঝখানে।' তারপরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কর্মচারীদের কারও চোখে ধরা না দিয়ে পিছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল গগল, খোলা গ্যারেজে রোলস রয়েসটা রয়েছে, সেদিক না তাকিয়ে ফুটপাথ ধরে ছুটল সে। দুটো রাস্তার মাঝখানে একটাই ফোন বুদ, কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই শুনতে পেল বেল বাজছে। বুদের ভেতর ঢুকে রিসিভার তুলল সে। 'গগল।'

'আলডগেট টিউব স্টেশন, হাই স্ট্রীট এন্ট্রান্স।'

বুদ থেকে বেরিয়ে আবার হন হন করে এগোল গগল, বাঁক নিতেই দেখা গেল হাই স্ট্রীটের মুখে আরেকটা বুদ। এবারও ভেতরে ঢোকার আগেই বেলের আওয়াজ পেল সে। রিসিভার তুলে রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'গগল।'

যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, 'ইয়েস?'

'একটা মেসেজ আছে।'

'ইয়েস।'

'খলিফার বিপদ।'

'ইয়েস।'

'একটা বিদেশী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি তার কাছাকাছি একজন এজেন্টকে পাঠিয়েছে, এত কাছে যে যে-কোন মুহূর্তে তার পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

'তথ্যের উৎস বলুন।'

'আমার বন্ধু। মেজর মাসুদ রানা।' গগলকে নির্দেশ দিয়েছে রানা, যতটা

সম্ভব সত্যি কথা বলতে হবে।

'কোন্ দেশের ইন্টেলিজেন্স বলুন।'

'নেগেটিভ। তথ্যটা ভয়ঙ্কর। খলিফা ব্যক্তিগতভাবে মেসেজটা রিসিভ করলেন কিনা সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে আমাকে।'

'শত্রু এজেন্টের নাম আর পজিশন বলুন।'

'নেগেটিভ। সেই একই কারণ।'

রোলেক্স হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল গগল। পনেরো সেকেন্ড হলো কথা বলছে ওরা। জানে, যোগাযোগ ত্রিশ সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হবে না।

অপরপ্রান্তে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শব্দ করছে না।

'আমি শুধু খলিফাকে তথ্যটা দেব, আমাকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে একা তিনিই পেলেন। আমি তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছি।'

'তা সম্ভব নয়।'

'তাহলে খলিফা সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে থাকবেন,' গম্ভীর গলায় বলল গগল।

'আই রিপিট, শত্রু এজেন্টের নাম আর পজিশন বলুন।'

পঁচিশ সেকেন্ড পেরিয়ে যাচ্ছে। 'আমি আবার বলছি, নেগেটিভ। যে-ভাবেই হোক তাঁর সাথে আমার সামনাসামনি দেখা করার ব্যবস্থা করুন।' গগলের জুলফি থেকে ঘামের ধারা গড়াচ্ছে।

'আপনার সাথে যোগাযোগ করা হবে,' যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর জানাল, তারপরই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ।

চোদ্দ

পুরো হপ্তা টেলিফোনের কাছাকাছি থাকল রানা। তাহিতিতে যাবার আগে অনেক কাজ ফেলে রেখে গিয়েছিল, নতুন আরও কিছু জমেছে, সেগুলো সারতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। দুটো চুক্তিপত্র চূড়ান্ত করার জন্যে অসলো আর ফ্রাঙ্কফুর্ট যেতে হলো, সকালে গিয়ে সন্ধ্যার মধ্যে ফিরে আসতে পারল। প্রতিদিন সন্ধ্যাটা ন্যাটো অফিসার্স ক্লাব জিমনেশিয়ামে শরীর-চর্চায় কাটে, ওখান থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়ে আন্ডারগ্রাউন্ড পিস্তল রেঞ্জে, টার্গেট প্র্যাকটিস করে রাত বারোটা পর্যন্ত। নাইন এম.এম. কোবরা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠল দুটো হাত আর দশটা আঙুল।

গগল বিজ্ঞাপন ছেপেছে মঙ্গলবারে, আজ রোববার। পাঁচ দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ গগলের কোন ফোন পাচ্ছে না রানা।

রোজকার মত আজও খবরের কাগজ নিয়ে বসল রানা। হিলটনের রুম সার্ভিসকে দিয়ে দেশী-বিদেশী যত কাগজ পাওয়া যায় সব আনাবার ব্যবস্থা করেছে ও। শুধু হেডিংগুলোর ওপর চোখ বুলায়, কৌতূহল হলে কোন খবরের সবটুকু পড়ে। খলিফা নতুন কোন তৎপরতা চালাচ্ছে কিনা ইঙ্গিত পেতে চায় ও।

প্রচণ্ড খরায় আবার মানুষ মরতে শুরু করেছে ইথিওপিয়ায়। জাতিসংঘ থেকে খাদ্য সাহায্যের আবেদন জানানো সত্ত্বেও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি।

ভারত মহাসাগরে কানাডার একটা জাহাজে আগুন ধরে গেছে, শ্রীলংকার জন্যে গম নিয়ে যাচ্ছিল জাহাজটা।

আন্তর্জাতিক জাহাজ মালিক সমিতি কোন আলোচনা বা আগাম নোটিশ না দিয়েই জাহাজ ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতীয় পার্লামেন্টের একটা রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভাড়া বাড়ানোর ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে বছরে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি খরচ করতে হবে।

আজ আঠারো দিন থাইল্যাণ্ডের সমস্ত শিল্প-কারখানায় ধর্মঘট চলছে, উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ। টেরোরিস্টদের হামলায় পঁচাত্তরটা মিল-কারখানার ব্যাপক ক্ষতি।

শিখ সন্ত্রাসবাদীরা পঁচিশজন হিন্দুকে অর্থাৎ দুই পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছে।

তেলের দাম কমে যাওয়ায় আয় কমে গেছে; ফলে সৌদী আরব, কুয়েত, আবুধাবী, ওমান, আর কাতার সরকার ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করবে বলে জানা গেছে, ধারণা করা হচ্ছে দেশগুলোয় বিদেশী শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে।

ইটালীতে তুমুল উত্তেজনা। চীনা বংশোদ্ভূত দু'জন বিলিওনিয়ার ব্যবসায়ীকে কিডন্যাপ করার পর নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার আগে সন্ত্রাসবাদীরা মুক্তিপণ হিসেবে চল্লিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আদায় করে। সন্দেহ করা হচ্ছে কিডন্যাপাররা রেড ড্রাগন নামে কুখ্যাত টেরোরিস্ট গ্রুপের সদস্য।

বার্মার খাল-বিল-নদী-নালায় অজ্ঞাত রোগে সব মাছ মরে যাচ্ছে। মাছের গায়ে বীভৎস ঘা দেখা দেয় ভাইরাস আক্রমণের ফলে।

নিউ ইয়র্কের চীনা পল্লীতে অগ্নিকাণ্ড—নিহত চল্লিশ, আহত শতাধিক।

জাতিসংঘের একটা রিপোর্টে প্রকাশ, তৃতীয় বিশ্বে প্রায় হঠাৎ করে মাদকদ্রব্য, বিশেষ করে হেরোইন ব্যবহারের মাত্রা বেড়ে গেছে। আশঙ্কা প্রকাশ করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, এখনই কার্যকরী কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে এই দশকের শেষের দিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর যুবসম্প্রদায় এবং যুবশক্তি ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে যাবে।

অরিগন, যুক্তরাষ্ট্র—একটা রিসার্চ সেন্টার থেকে জীবাণু যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য রাসায়নিক পদার্থ চুরি গেছে। চুরি যাওয়া রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় কমপক্ষে তিন লাখ মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব। পাঁচ লাখ মানুষ পঙ্গু বা অন্ধ হয়ে যেতে পারে, দীর্ঘকালীন অসুস্থতায় ভুগতে পারে আরও বিশ লাখ মানুষ।

অসহায় বোধ করল রানা, আর পড়তে পারল না। প্রতিটি খবরের ভেতর খলিফার ভূত দেখতে পাচ্ছে ও। কাগজগুলো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠতে যাবে, হঠাৎ ছোট্ট একটা খবরের ওপর চোখ পড়ল। সাথে সাথে কৌতূহল ঝিক্ করে উঠল চোখে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ড. এডওয়ার্ড ওয়ার্নারকে তাঁর বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ করেছেন। ড. ওয়ার্নারের দায়িত্ব হবে ইসরায়েল কর্তৃক দখলীকৃত আরব ভূমি উদ্ধারে নতুন প্রচেষ্টা চালানো। ভদ্রলোকের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে, ড. ওয়ার্নার প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বন্ধু, এবং সিনিয়র ও প্রিয় উপদেষ্টাদের একজন, যাকে দলমত নির্বিশেষে সবাই পছন্দ করে, এবং এ-ধরনের জটিল কাজে একমাত্র যোগ্য লোক তিনি।

ড. ওয়ার্নারের ক্ষমতা ও প্রভাব, যোগাযোগ ও জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। মনে মনে তাঁর প্রশংসা করল রানা, গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে কখনোই তিনি দ্বিধা করেন না।

সকাল মাত্র শুরু, সারাটা দিন কাটে কিভাবে! গগল যোগাযোগ করতে পারে, কাজেই বাইরে যাবার উপায় নেই। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল রানা, র‍্যাক থেকে প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট নামিয়ে খুলল। শহরের সবচেয়ে বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কসমেটিক সেকশন থেকে কাল কিছু টুকিটাকি জিনিস-পত্র কিনেছে ও।

উইগটা মানুষের চুল দিয়ে তৈরি, নাইলন নয়, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি আর গোঁফটাও তাই। নতুন পোলারয়েড ক্যামেরা দিয়ে ডোরার তোলা একটা ফটো সামনে নিয়ে আয়নার দিকে মুখ করে বসল রানা। উইগ, দাড়ি, গোঁফ, তিনটেই কাঁচি দিয়ে কেটে-ছেঁটে সাইজ করে নিতে হলো, তারপর পরল রানা। ফটোর দিকে বারবার তাকাল ও, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসছে ভিনসেন্ট গগল আর মাসুদ রানা, দুই বন্ধু। দু'জনের চুলের রঙ দু'রকম; কৃত্রিম উইগ, দাড়ি, আর গোঁফের সাথে মেলে না। কাজেই ওগুলো রঙ করতে বসল রানা। রানার চেয়ে আধ কি এক ইঞ্চি বেশি লম্বা হবে গগল, তবে সেটা কারও চোখে পড়বে বলে মনে হয় না। ওদেরকে খলিফা বা তার ঘনিষ্ঠ সাঙ্গপাঙ্গরা চামড়ার চোখে কাছাকাছি থেকে দেখেছে কিনা সন্দেহ আছে রানার।

বিকেল হয়ে এল, তবু চেহারা বদলের কাজে সন্তুষ্ট হতে পারল না রানা। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে পোশাক। গগল যে কখন কি পরবে আগে থেকে বলা কঠিন। গগলের পঞ্চাশ ধরনের ছড়ি আছে, তার মধ্যে তিনটে ছড়ির যে-কোন একটা প্রায়ই ব্যবহার করে সে-ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে সে-ধরনের তিনটে ছড়ি কিনে এনেছে রানা। কিন্তু এই তিনটের একটাও যদি গগল সেদিন ব্যবহার না করে? দূরে কোথাও যেতে হলে, তিন ধরনের পোশাক থেকে একটা বেছে নেয় গগল, রানাও সেগুলো রেডিমেড কিনেছে, কিন্তু গগল যদি অন্য কিছু পরে? অবশ্য এ-সব ব্যাপারে ডোরার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে ও, গগলের মনে কোন রকম সন্দেহ সৃষ্টি না করে যতটা পারে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে সে।

দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।

রুম সার্ভিসকে দিয়ে কামরায় লাঞ্চ আনাল রানা। নাকে মুখে গুঁজে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। সবগুলো পোশাক আবার একবার করে পরল, আয়নার সামনে গগলের হাবভাব নকল করে হাঁটাহাঁটি করল কিছুক্ষণ, হাতে এক-একবার এক-একটা ছড়ি। সবশেষে কোবরা প্যারাবেলাম পিস্তলটা ব্রীফকেস থেকে বের

করল ও।

খানিক চিন্তা করে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নিল রানা, পিস্তলটা নিয়ে যাবে না। প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটা ইংল্যান্ডে ঘটবে। বৃহস্পতিবারে গগলের সাথে যে যোগাযোগটা হয়েছিল, বোঝাই যায় লন্ডন থেকে করা হয়েছিল সেটা। সাথে বিপজ্জনক একটা অস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশ কাস্টমসকে বোকা বানাবার ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। অস্ত্র রাখার দায়ে ওকে যদি থামানো হয়, ব্যাপারটা রটে যাবে। সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যাবে খলিফা। দরকার কি, ইংল্যান্ডে পৌঁছে শার্ক কমান্ড থেকে একটা অস্ত্র যোগাড় করে নিতে পারবে ও। প্রয়োজনটা ব্যাখ্যা করে বললে ঠিকই একটা ব্যবস্থা করে দেবে কার্ল রবসন।

ঠোঁটের কোণে জ্বলন্ত চুরুট ঝুলতে থাকা রবসনের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার। অনেক দিন হলো তার 'বস্' ডাকটা শোনা হয় না। সহকারীও যে নিজ গুণে বন্ধুর সম-পর্যায়ে উঠে আসতে পারে, তার একটা দৃষ্টান্ত রবসন।

হোটেলের রিসেপশনে নেমে এল রানা, সেলফ ডিপোজিট বক্সে জমা রাখল পিস্তলটা। কামরায় ফিরে এসে পায়চারি শুরু করল, এই দীর্ঘ অপেক্ষা অস্থির করে তুলেছে ওকে।

সন্ধ্যার দিকে ঘরের আলো জ্বেলে একটা অ্যাডভেঞ্চার থ্রিলার নিয়ে বসল। উইলবার স্মিথের উপাদেয় গল্প, ছুট করে দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেল। ফোনের রিসিভার তুলে ওমলেট আর কফির অর্ডার দিল রানা। রিসিভার নামিয়ে রেখেছে দশ সেকেন্ডও হয়নি, বেল বাজল। সম্ভবত কিচেন থেকে জানতে চাইবে ডিনারের জন্যে স্পেশাল কিছু ওর দরকার হবে কিনা।

'ইয়েস, হোয়াট ইট ইজ?' বিরক্তি চেপে জিজ্ঞেস করল রানা।

'রানা?'

'গগল?'

'দেখা করতে রাজি হয়েছে সে।'

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হলো, শান্ত থাকার চেষ্টা করল রানা। 'কখন? কোথায়?'

'জানি না। কাল আমাকে প্লেনে করে ওরলিতে যেতে হবে। এয়ারপোর্টে পৌঁছে নির্দেশ পাব।'

নিজের নিরাপত্তার দিকে কড়া নজর রেখে সাক্ষাতের আয়োজন করছে খলিফা। এ-ধরনের কিছু ঘটবে, আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল রানার। ব্যস্তভাবে ওরলি এয়ারপোর্টের লে-আউট কল্পনা করার চেষ্টা করল ও। সবার চোখের আড়ালে কোথাও গগলের সাথে দেখা হওয়া চাই ওর, তা না হলে ভূমিকা বদলের সুযোগ পাওয়া যাবে না। লাউঞ্জে সম্ভব নয়, সম্ভব নয় ওয়াশরূমে। বাকি রইল আর মাত্র একটা জায়গা। 'তুমি ওখানে পৌঁছুবে কখন?'

'আমার ফ্লাইট সকালের দিকে, পৌঁছুব সোয়া এগারোটায়।'

'তোমার আগে পৌঁছুব আমি,' গগলকে বলল রানা, সাবেনা ফ্লাইটের টাইমটেবল মুখস্থ হয়ে আছে ওর, আর মিডোর সিনিয়র একজিকিউটিভদের ভি.আই.পি. কার্ড থাকায় যে-কোন ফ্লাইটে সীট পাওয়া কোন সমস্যাই নয়। 'মন

দিয়ে শোনো, কিংবা লিখে নাও–ওরলি সাউথ টার্মিনালের পাঁচতলায় এয়ার হোটেল, চেনো? তোমার নামে ওখানে আমি একটা কামরা ভাড়া করব। সোজা রিসেপশনে গিয়ে কামরার চাবি চাইবে তুমি। লাউঞ্জেই অপেক্ষা করব আমি, দেখব কেউ তোমাকে ফলো করছে কিনা। আমাকে চেনো না। বুঝতে পারছ সব, গগল?'

'পারছি।'

'তাহলে কাল দেখা হবে।'

আবার পায়চারি শুরু করল রানা। বোঝা যাচ্ছে, খলিফা ইংল্যান্ডে দেখা করবে না। প্যারিসও সম্ভবত মধ্যবর্তী একটা স্টেশন মাত্র, গন্তব্য নয়। সাবজেক্টকে এভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা ঘোরাবার অনেক কারণের মধ্যে একটা, সে যাতে সাথে কোন অস্ত্র নিয়ে যেতে না পারে। তাহলে সাক্ষাতের পর খুন করা সহজ হবে।

পোশাক, ভাঁজ করা ছুরি, কসমেটিক সামগ্রী, সব একটা ব্যাগে গুছিয়ে নিল রানা। অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে।

ওরলি সাউথ এয়ার হোটেলের লবিতে বারোটা পাঁচে দেখা গেল গগলকে, কৃতজ্ঞ রানা মনে মনে ধন্যবাদ জানাল ডোব্রাকে। নীল ডাবল ব্রেস্টেড ব্লেজার, সাদা শার্ট, আর ক্রিকেট-ক্লাব টাই পরেছে গগল, পায়ে গ্রে রঙের উলেন মোজা আর কালো ইংলিশ জুতো, হাতে তৈরি। ট্রেঞ্চ কোটের নিচে রানাও একটা ডাবল ব্রেস্টেড পরেছে, পায়ের জুতো জোড়াও কালো।

লবির চারদিকে একবার চোখ বুলাল গগল, রানাকে দেখেও দেখল না। হাবভাবে কর্তৃত্বের ভাব নিয়ে ডেস্কের সামনে দাঁড়াল সে। 'আমার নাম ভিনসেন্ট গগল, একটা রুম রিজার্ভ করা আছে–চাবিটা।'

তাড়াতাড়ি খাতা চেক করে মাথা ঝাঁকাল ক্লার্ক, গগলকে একটা ফর্ম আর চাবি দিল।

'চারশো দশ,' নম্বরটা ভারী গলায় পড়ল গগল, রানা যাতে শুনতে পায়।

মুখের সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরে প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, গগল লবিতে আসার পর অল্প দু'একজন ভেতরে ঢুকেছে, একজনকেও খলিফার চর বলে মনে হলো না। অবশ্য প্যারিস যদি মধ্যবর্তী স্টেশন হয়ে থাকে, গগলের ওপর নজর রাখার জন্যে এখানে খলিফা লোক পাঠাবে বলে মনে হয় না।

গগল এলিভেটরের দিকে এগোল, পেছনে ছোট একটা ব্যাগ নিয়ে পোর্টার। এলিভেটরের সামনে আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাগজ রেখে রানাও ধীর পায়ে এগোল সেদিকে, সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত।

এলিভেটরে পাশাপাশি দাঁড়াল ওরা, কেউ কারও দিকে তাকাল না। পাঁচতলায় পোর্টারকে নিয়ে নেমে গেল গগল, রানা আরও তিনতলা পর্যন্ত উঠে বেরিয়ে এল করিডরে, খানিক হাঁটাহাঁটি করে আবার ফিরে এল আগের জায়গায়, আরেকটা এলিভেটরে চড়ে নামল পাঁচতলায়।

চারশো দশ নম্বর কামরার দরজা ভিড়িয়ে রেখেছিল গগল, চাপ দিতেই খুলে

গেল। ভেতরে ঢুকে এক পাশে সরে দাঁড়াল রানা, সাথে সাথে তালা লাগিয়ে দিল গগল।

'কোন সমস্যা হয়নি তো?'

সহাস্যে মাথা নাড়ল গগল। 'ড্রিঙ্ক চলবে? ডিউটি ফ্রি শপ থেকে একটা বোতল এনেছি।'

গ্লাসের সন্ধানে বাথরুমে ঢুকল গগল, এই ফাঁকে কামরাটা চেক করে নিল রানা। ডাবল বেড, টি ভি আর রেডিও, ছোট একটা টেবিল, দু'খানা চেয়ার, একটা ওয়ারড্রোব। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না।

দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল গগল, রানার হাতে ধরিয়ে দিল একটা। একবার মাত্র চুমুক দিয়ে গ্লাসটা রেখে দিল রানা। 'খলিফার নির্দেশ কিভাবে পাবে আন্দাজ করতে পারো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'প্যাব মানে, পেয়ে গেছি!' চেয়ারের পিঠে ঝোলানো ব্লেজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে লম্বা একটা এনভেলাপ বের করল গগল। 'এয়ার ফ্রান্সের ইনফরমেশন ডেস্কে আমার জন্যে রাখা ছিল।'

চেয়ারে বসে এনভেলাপটা খুলল রানা। তিনটে আইটেম পেল ভেতরে। একটা ফার্স্ট ক্লাস এয়ার ফ্রান্স এয়ারলাইন টিকেট, শোফার চালিত একটা লিমুসিন-এর ভাউচার, আর একটা হোটেল রিজার্ভেশন ভাউচার। প্লেনের টিকেট যে-কোন এয়ার ফ্রান্স এজেন্সি বা কাউন্টার থেকে কেনা সম্ভব, লিমুসিন আর হোটেল বুকিং-ও পরিচয় গোপন রেখে করা যায়। না, সূত্র হিসেবে এ-সব কাগজের কোন গুরুত্ব নেই।

প্লেনের টিকেটের ভাঁজ খুলল রানা, গন্তব্যটা দেখতে চায়। পরমুহূর্তে শিরশির করে উঠল শরীর, চামড়ার নিচে যেন বিষাক্ত পোকা ঢুকে গেছে, কিলবিল করছে মন্থরবেগে। লিমুসিন আর হোটেল ভাউচার চেক করার সময় লক্ষ করল, ওর হাত কাঁপছে।

সন্দেহ আর অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণমুখ কাঁটা আবার ওকে খোঁচাতে শুরু করেছে। অসুস্থবোধ করল রানা।

'কি হলো, রানা?'

'কিছু না,' সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল রানা। প্লেনের টিকেটটা ওরলি থেকে বেন গারিয়ঁ, ইসরায়েলে নিয়ে যাবে ওকে। ভাড়াটে গাড়ির ভাউচার ওকে সেখান থেকে নিয়ে যাবে জেরুজালেম, আর শেষ ভাউচারটা প্রাচীন ও পবিত্র নগরীর একটা হোটেলের। কিং ডেভিড হোটেল। 'জেরুজালেম,' বিড়বিড় করে উঠল ও। 'খলিফা তোমার সাথে জেরুজালেমে দেখা করবে।' আর, রানা জানে, এই মুহূর্তে একজনই আছে জেরুজালেমে। যাকে বোরা-বোরাতে শেষবার আলিঙ্গন করেছিল রানা, যার কথা মুহূর্তের জন্যে ভুলে থাকাও ওর জন্যে কষ্টকর।

খলিফা জেরুজালেমে। ব্যারনেস লিনা অটারম্যানও জেরুজালেমে।

সত্যিই কি ওকে বোকা বানানো হচ্ছে? বারবার? নাকি এটা খলিফারই একটা কূট-কৌশল? তাহলে কি সবকিছু অভিনয়?

'রানা, মাই ফ্রেন্ড?' উদ্বেগে অস্থির হয়ে কাছে সরে এল গগল।

মৃদু হাসল রানা, 'শোনো, তোমার বদলে আমি যাচ্ছি।'

'কি!' আকাশ থেকে পড়ল গগল। 'কোথায়? জেরুজালেমে?'

'আমরা জায়গা বদল করছি, গগল, মানে ভূমিকা বদল করছি।'

তীব্র প্রতিবাদের সাথে মাথা নাড়ল গগল। 'পাগল নাকি! খলিফা তোমাকে বটি কাবাব বানাবে। তাছাড়া, ইসরায়েলে তুমি ঢুকতেই পারবে না। তোমার পাসপোর্টে লেখা আছে...'

প্রতিবাদ কানে না তুলে কাজ শুরু করল রানা। একবার শুধু বলল, 'সাথে আমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট।' ব্রীফকেস খুলে কাপড়, উইগ, দাড়ি, আর গোঁফ বের করল ও, সব নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। খানিক পর সেখান থেকে ডাকল গগলকে, 'শুনে যাও।'

বাথরুমে ঢুকে হতভম্ব হয়ে গেল গগল। 'মাই গড! আরেকজন আমি!'

'কাজ হবে কিনা বলো,' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হবে,' রায় দিল গগল। 'কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে আজ আমি ব্লেজার আর গ্রে মোজা পরব?'

'জানতে হয়,' হাসল রানা। 'এবার এসো কাগজ-পত্রগুলো ঠিকঠাক করা যাক।'

যে যার কাগজ-পত্র বিছানার ওপর আলাদাভাবে রাখল ওরা।

পাসপোর্টের ফটোগ্রাফ নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। তবে রানার পাসপোর্ট গগলের কাছে থাকবে, ফলে তার চেহারা একটু বদল করতে হবে।

করুণ স্বরে গগল বলল, 'আমার এত সাধের দাড়িটা কেটে ফেলতে বলছ!'

'আবার গজাবে, চিন্তা কোরো না,' রানা অন্যমনস্ক, গগলের পাসপোর্ট দেখে অন্য একটা কাগজে সই নকল করার চেষ্টা করছে ও। দু'মিনিটের মধ্যে আয়ত্তে এনে ফেলল।

'এই ছদ্মবেশ নিয়ে তুমি আমাকে পথে বসাতে পারো,' আশঙ্কা প্রকাশ করল গগল। 'আমার ব্যাংকে গিয়ে সব টাকা তুলে নেবে, তারপর বাড়ি গিয়ে বিছানায় উঠবে ডোরার সাথে...'

'আরে, দারুণ আইডিয়া তো!' চিন্তামগ্ন হবার ভান করল রানা।

'আরে ভাই, দোহাই লাগে, এ-ধরনের ব্যাপার নিয়ে জোক কোরো না!'

এরপর ওরা ক্রেডিট কার্ড, ক্লাব মেম্বারশিপ কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ অন্যান্য কার্ড বদলাবদলি করল। সই নকল করার ব্যাপারে রানার দ্বিগুণ সময় নিল গগল।

'সবচেয়ে ভাল হয় তুমি যদি ব্রাসেলসে গিয়ে দিনকতক একটা হোটেলে লুকিয়ে থাকো,' বলল রানা। 'কারও সাথে যোগাযোগ করবে না, বাইরে কোথাও বেরুবে না।'

'জানতাম এ-ধরনের হুকুমই করবে তুমি...,' মুখ হাঁড়ি করল গগল। 'এখুনি বেরিয়ে পড়ো,' তাগাদা দিল রানা। 'তার আগে এটা পরো...' ট্রেঞ্চ কোটটা দেখিয়ে দিল ও। 'তারপর, এসো টাই বদল করি।'

বিদায়ের সময় রানার হাত ধরে একটু চাপ দিল গগল। 'তুমি বিশ্বাস করেছ

তো, সোহেলের ওই ব্যাপারে আমি জড়িত ছিলাম না, রানা?'

'করেছি, গগল।' গগলের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল রানা। 'সাবধানে থেকো।'

'যুদ্ধে যাচ্ছ তুমি, সাবধান তোমাকে থাকতে হবে,' মনে করিয়ে দিল গগল।

'থাকব,' কথা দিল রানা। গগল বেরিয়ে যেতে দরজা বন্ধ করে দিল ও। সাথে সাথে জেরুজালেমের চিন্তা ফিরে এল মাথায়। ওখানে ব্যারনেস লিনা আছে। ওখানে খলিফা আছে।

দু'জন আসলে একজন কিনা রানা জানে? অন্তরের অন্তস্তলে ডুব দিয়ে দেখল—আসলে জানে।

শুধু নামটা 'লড' থেকে বদলে 'বেন গারিয়ঁ' হয়েছে, অ্যারাইভালস হল সহ এয়ারপোর্টের কিছুই বদলায়নি। এর আগেও এই পথে জেরুজালেমে ঢুকেছে ও, আজকের মতই অন্য দেশের পাসপোর্ট আর অন্য পরিচয়ে। দুনিয়া চষে বেড়ানো ওর কাজ, বৈশিষ্ট্যগুলো দৃষ্টি এড়ায় না—বেন গারিয়ঁর মত যথেষ্ট সংখ্যক লাগেজ ট্রলি আর কোথাও দেখেনি ও, ফলে জিনিসপত্র নিয়ে আরোহীদের হিমশিম খেতে হয় না।

বিশ কি বাইশ বছরের এক ইসরায়েলি যুবক কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যারাইভাল হলে, দু'হাতে ধরা বুকের কাছে একটা স্লেট, তাতে সাদা চক দিয়ে লেখা, 'মি. ভিনসেন্ট গগল।'

অদ্ভুত একটা ক্যাপ পরে আছে ছোকরা ড্রাইভার—নেভী ব্লু, মাঝখানটা কালো চামড়ার, মিনারের মত ক্রমশ সরু হয়ে আধ হাত উঠে গেছে খাড়া। ইউনিফর্মের এই একটাই অংশ পরেছে সে, গায়ের শার্টটা সাদা পপলিনের, পায়ে কালো স্যান্ডেল। বেশ ভালই ইংরেজি বলতে পারে, মার্কিন ঘেঁষা উচ্চারণ। সপ্রতিভ আচরণ দেখে মনে হতে পারে রানাকে যেন কত যুগ ধরে চেনে সে। ইসরায়েলি যুবকদের অনেক ঈর্ষণীয় গুণের কথা জানা আছে রানার। অনুকরণীয় দেশপ্রেম রয়েছে ওদের মধ্যে, যে-কোন কাজের যোগ্য করে নিজেদেরকে গড়ে তোলে। একজন কেমিস্ট, তারও বন্দুক চালনার ট্রেনিং নেয়া আছে। কেরানির জানা আছে কিভাবে ফার্স্ট এইড দিতে হয়। আজ এই ছেলেটাকে ড্রাইভার হিসেবে দেখা যাচ্ছে, কালই হয়তো দেখা যাবে কন্ট্রোল সামনে নিয়ে বসে আছে একটা সেঞ্চুরিয়ান ট্যাংকের ভেতর। গোটা মধ্যপ্রাচ্য এবং প্রায় অর্ধেক দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে টিকে আছে ওরা, শুধু ভাগ্য আর বাইরের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে নয়।

'সালোম, সালোম,' রানাকে অভ্যর্থনা জানাল সে। 'এই একটাই লাগেজ আপনার?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে আমার পছন্দ হয়ে গেল।' সবিনয়ে রানাকে সরে যেতে বলে ট্রলিটা নিজেই ঠেলতে শুরু করল ছোকরা। 'আসুন।' অ্যারাইভাল হল থেকে বেরিয়ে লিমুসিনের দিকে এগোল ওরা। 'পবিত্র নগরী, আমাদের এই

জেরুজালেম…,' বক বক করে চলেছে অল্প বয়েসী ড্রাইভার।

. গাড়িটা দেখে মুগ্ধ হলো রানা। টু হানড্রেড ফরটি ডি মার্সিডিজ বেঞ্জ, প্রায় আনকোরা নতুন, ঝকঝক করছে। শুধু বুটে কে যেন একজোড়া বিস্ফারিত চোখ এঁকে রেখেছে।

এয়ারপোর্টের গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতেই একটা গন্ধ পেল রানা। ইসরায়েলের এই গন্ধ ওর পরিচিত। যে জাতি নিজের ভাগ্য বদলাতে চেষ্টা করে না, আল্লা তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, পবিত্র কোরানের এই বাণী থেকে মুসলমানরা যতটা না তারচেয়ে অনেক বেশি শিক্ষা গ্রহণ করেছে খ্রিস্টান আর ইহুদিরা, প্রসঙ্গক্রমেই কথাটা মনে হলো রানার। ইসরায়েলের প্রায় প্রতিটি ফুটপাথের পাশে কিছু খালি জায়গা রাখা হয়েছে, সেখানে ফলের চাষ হয়। এখন কমলা পাকার সময়, বাতাসে তারই সুবাস। .

কিন্তু ভাল লাগার অনুভূতিটা কেন যেন মিইয়ে এল, অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল রানা–মনে হলো কি যেন দেখেও দেখতে পাচ্ছে না, গুরুত্বপূর্ণ কি একটা অবহেলা করছে।

নতুন ডাবল-ওয়ে রোডে উঠে এল মার্সিডিজ, মনের আনন্দে কথা বলে চলেছে ড্রাইভার, মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করতে পারছে না রানা। রাস্তাটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, দু'পাশে পাইন বন, সামনে আরও অনেকটা দূরে জেরুজালেম।

ওরলিতে, হোটেলে বসে, একটা তালিকা তৈরি করেছিল রানা, সেটা ছিঁড়ে ফেলায় নিজেকে এখন তিরস্কার করল ও। কি কি লেখা ছিল মনে পড়ে কিনা দেখছে।

পক্ষে ছিল বারোটা যুক্তি। তৃতীয়টা মনে পড়ছে:

'ব্যারনেস আমাকে ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের কথা জানিয়েছে। সে খলিফা হলে জানাত কি?'

বিপক্ষে তৃতীয় যুক্তিটা সাথে সাথে মনে পড়ল:

'ব্যারনেস লিনা যদি খলিফা হয়, তাহলে ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের কোন অস্তিত্বই নেই। কোন অজ্ঞাত কারণে ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের অস্তিত্ব মিছিমিছি আবিষ্কার করা হয়েছে।'

এই ব্যাপারটাই, এই ক্যাকটাস ফুলের ব্যাপারটাই ওর অস্বস্তি বোধ করার কারণ।

আরও একটা কারণ, ড্রাইভার। ছোকরা মুহূর্তের জন্যেও থামছে না। কেন?

শুধু যে বক বক করে চলেছে তাই নয়, খানিক পরপরই ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাচ্ছে, গাল ভরা হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করছে, 'তাই না, ঠিক বলিনি?'

ভাল করে না শুনেই দু'এক বার হুঁ-হাঁ করল রানা, তারপর শুধু মাথা ঝাঁকাল। কমলার গন্ধ ওকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলবে কেন? কারণ কমলার গন্ধ ফুলের গন্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়? ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার? ধ্যেৎ, কষ্ট কল্পনা মনে হচ্ছে।

'ব্যারনেস যদি খলিফা না হয়, তাহলে…' তাহলে কি?

'তাহলে ঠিক আছে, তাই না, কোন অসুবিধে নেই–?' আবার বিরক্ত করছে

ড্রাইভার।

'দুঃখিত, শুনতে পাইনি···কি বলছিলে?'

'বলছিলাম, আমার শাশুড়িকে একটা প্যাকেট দিয়ে আসতে হবে,' আবার ব্যাখ্যা করল ড্রাইভার। 'আমার বউ পইপই করে বলে দিয়েছে কিনা।'

'ফেরার পথে দিয়ো।'

'আজ রাতে আর ফিরছি কই,' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে বিজয়ীর হাসি হাসল ছোকরা। 'এই অজুহাত দেখিয়েই তো অফিস থেকে ছুটি আদায় করেছি। আমার শাশুড়ি, বুঝলেন, অসুস্থ। এই তো কাছেই, পথে পড়বে বাড়িটা। যাব আর আসব, মিনিট দুয়েকের ব্যাপার। জিনিসটা পাবার আশায় বসে আছে বুড়ি···'

'ঠিক আছে,' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা, ছোকরার মধ্যে খারাপ কিছুই নেই অথচ ওর ঠিক পছন্দ হচ্ছে না তাকে। দুশ্চিন্তার কারণটা মন থেকে হারিয়ে গেল। ফাঁকিবাজ সব জায়গাতেই আছে।

'এখানে আমরা বাঁক নেব,' বলে আকাশ ছোঁয়া সার সার অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের দিকে গাড়ি ঘোরাল ছোকরা। ইসরায়েল সরকার মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে নাগরিকদের বাসস্থান সমস্যার সমাধান করতে, এ তারই ফলশ্রুতি। কয়েক মাইল জুড়ে শত শত ভবন, প্রতিটি ছয়তলা। সন্ধ্যার এই সময় রাস্তা-ঘাট প্রায় ফাঁকা।

সবগুলো ভবন আর রাস্তা একই রকম দেখতে, তবে বোঝা গেল এলাকাটা ভাল করে চেনা আছে ড্রাইভারের। তার আচরণে কোন জড়তা নেই। দিয়াশলাই বাক্সের মত দেখতে একটা হলুদ বহুতল ভবনের সামনে গাড়ি থামাল সে। 'দু'মিনিট,' প্রতিশ্রুতি দিয়ে নেমে পড়ল, ছুটে চলে গেল পিছন দিকে। ব্যস্ত হাতে বুট খুলল সে, হিঁচড়ে কি যেন একটা সরাল, মৃদু একটা ঝাঁকি খেলো মার্সিডিজ, পরমুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল বুট। আবার রানার দৃষ্টি সীমার মধ্যে চলে এল সে, হাতে ব্রাউন রঙের একটা প্যাকেট।

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল সে, অদ্ভুতদর্শন ক্যাপটা ঠেলে দিল মাথার পিছনে, দাঁত দেখিয়ে বলল, 'এই গেলাম আর এলাম।' দরজার দিকে ছুটে গেল সে।

বললেও, ছোকরা ফিরতে দেরি করতে পারে, ভাবল রানা। এই মুহূর্তের অটুট নিস্তব্ধতাটুকু অমূল্য মনে হলো। চোখ বুজে গভীর মনোযোগ আনার চেষ্টা করল ও।

'ব্যারনেস লিনা যদি খলিফা না হয়, তাহলে–' এঞ্জিন ঠাণ্ডা হচ্ছে, তার শব্দ পাচ্ছে রানা। নাকি ড্যাশবোর্ড ঘড়ির আওয়াজ? আওয়াজটা ভুলে থাকার চেষ্টা করল ও।

'–তাহলে, তাহলে ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের অস্তিত্ব আছে!' হ্যাঁ, এই তো, এতক্ষণে ব্যাপারটা ধরা পড়ল। ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার আছে, আর সে যদি থাকে তাহলে খলিফার একেবারে কাছাকাছি আছে, এত কাছাকাছি যে ভিনসেন্ট গগল যে তার পরিচয় ফাঁস করে দিতে আসছে, এ-ও তার অজানা থাকার কথা নয়।

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার, সেই সাথে অনুভূতিটা আবার ফিরে এল–চামড়ার নিচে পোকা চরছে। ওর বিশ্বাস ছিল, খলিফার সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত গগল নিরাপদ। প্রাণঘাতী একটা ভুল ছিল ওটা।

'ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার অবশ্যই খলিফার কাছে পৌঁছুতে বাধা দেবে গগলকে!' হায় হায়, এমন সহজ একটা অঙ্ক ওর মাথায় আগে ঢোকেনি! ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার মোসাড, আর রানা বসে আছে জেরুজালেমে–মোসাডের উঠানে, গগল সেজে।

খোদা! রানা উপলব্ধি করল, তাজা বোমার ওপর বসে রয়েছে সে। ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার সম্ভবত নিজে সব আয়োজন করেছে। ব্যারনেস লিনা যদি খলিফা না হয়, তাহলে ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের পাতা মরণ ফাঁদে আটকা পড়তে যাচ্ছে ও।

শালার ঘড়িটা এখনও টিক টিক করে যাচ্ছে। কোমল, একঘেয়ে শব্দে বাড়ি মারছে নার্ভে।

'আমি ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের শহরে রয়েছি, তার গাড়িতে...'

টিক টিক! ওহ্ গড! ড্যাশবোর্ড থেকে আসছে না! ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা। আসছে ওর পিছন থেকে। বুট থেকে। ড্রাইভার খুলেছিল ওটা, কি যেন নাড়াচাড়া করেছিল। সেটা থেকেই আসছে আওয়াজটা, টিক টিক টিক টিক...

খপ্ করে ধরে হাতল ঘোরাল রানা, একই সাথে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল দরজার গায়ে, অপর হাতে চলে এসেছে ব্রীফকেসের হ্যান্ডেল।

বুট আর ব্যাকসীটের মাঝখানে ধাতব পার্টিশন থাকার কথা, নির্ঘাত সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বোমা আর সীটের মাঝখানে সম্ভবত মোটা চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। সেজন্যেই বোধহয় কানে এত বাজছে আওয়াজটা।

মার্সিডিজ থেকে বেরিয়ে হোঁচট খেতে খেতে ছুটল রানা। জিনিসটা সম্ভবত প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, ডিটোনেটরে টাইমার লাগানো আছে। কতক্ষণ পর বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইবে ওরা? ত্রিশ সেকেন্ড? না, আরও বেশি–ড্রাইভারকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে দিতে হবে। ছোকরা বলল, দু'মিনিট, দু'বার বলেছে কথাটা...

ফুটপাথে উঠে লাফ দিয়ে মাটিতে নামল রানা, ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে যতটা সম্ভব দূরে পালাচ্ছে। মিনিট দুয়েকই হয়েছে সরে গেছে ড্রাইভার...

দশ কদম সামনে নিচু একটা পাঁচিল, ঘেরের মধ্যে ফুলবাগান করার জন্যে তৈরি করা হয়েছিল। হাঁটু সমান উঁচু, দুটো করে ইঁট পাশাপাশি রেখে গাঁথা হয়েছে, ঘেরের মধ্যে মাটির ঢেলা আলগা হয়ে আছে। ডাইভ দিয়ে পাঁচিলটা পেরোল রানা, আলগা মাটির ওপর কাঁধ আর কনুই দিয়ে পড়ল, দুটো গড়ান দিয়ে ধাক্কা খেলো দ্বিতীয় পাঁচিলের গায়ে।

ওর মাথার ওপর একতলা অ্যাপার্টমেন্টের বড় বড় জানালা, মাটিতে পাঁজর ঠেকিয়ে ওগুলোর দিকে তাকাল রানা, কাঁচের ওপর মার্সিডিজের ঝকঝকে প্রতিবিম্ব দেখতে পেল।

দু'হাতের তালু দিয়ে কান ঢাকল রানা, মার্সিডিজ মাত্র পঞ্চাশ ফিট দূরে। বুকের দু'পাশে কনুই, মুখ যতটা সম্ভব খোলা, বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলাবার জন্যে তৈরি হলো রানা।

স্লো-মোশন ছবিতে যেভাবে ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলে গোলাপ, মার্সিডিজটা

ঠিক সেভাবে ধীরে ধীরে খুলে গেল। চকচকে মেটাল ফাঁক হলো, দুমড়েমুচড়ে কুঁকড়ে গেল অদ্ভুত দর্শন পাপড়ির মত, ভেতর থেকে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এল লাল-জিভ আগুন। তারপরই দৃশ্যটা হারিয়ে গেল, চুর চুর হয়ে খসে পড়ল সব ক'টা জানালার কাঁচ। সেই সাথে বিস্ফোরণের ধাক্কা থেঁতলে দিয়ে গেল রানাকে।

মনে হলো কোন দৈত্য ওর পাঁজরে পা রেখে চাপ দিয়েছে, সমস্ত বাতাস হুস করে বেরিয়ে গেল ফুসফুস থেকে। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে ঘাড় থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল খুলি। রানার ধারণা হলো, কিছুক্ষণ হুঁশ ছিল না তার। অনুভব করল কাঁচের টুকরো, প্লাস্টার, টুকরো কাঠ বৃষ্টির মত পড়ছে গায়ে, বড় আর ভারী কি যেন একটা শিরদাঁড়ার ওপর আঘাত করল, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ও।

পিঠে একটা হাত রেখে দাঁড়াল ও। চারদিকে কিছুই নড়ছে না, অথচ মনে হলো তুমুল ঝড় বইছে। টলমল করতে করতে সিধে হলো, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে ভরে নিচ্ছে ফুসফুস। জানে পুলিস চলে আসার আগেই সরে যাওয়া দরকার, কিন্তু পা নড়ছে না। হঠাৎ উপলব্ধি করল ওর দৌড়াতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু চেষ্টা করলে শুধু বোধহয় হাঁটতে পারবে। বিস্ফোরণের ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি শরীরটা, এই মুহূর্তে একে দিয়ে কঠিন কাজ করানো সম্ভব নয়।

ধীরে ধীরে ফুটপাথে উঠে এল রানা। রাস্তা এখনও ফাঁকা, তবে আশপাশ থেকে শোরগোল আর কান্নার আওয়াজ আসছে। মোড়ে পৌঁছে সরু একটা গলির ভেতর ঢুকল, সেটা থেকে বেরিয়ে এল মেইন রোডে। শোরগোলের আওয়াজটা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল। বাসের জন্যে লাইন দিয়েছে মানুষ, তাদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

জাফা রোডে নেমে পড়ল রানা। বাস স্টপেজের উল্টো দিকে একটা কফি শপ দেখে ভেতরে ঢুকল, এক কিনারায় বসে কাটলেট আর কফি চাইল।

পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আধঘণ্টা চিন্তা করল রানা। ইতিমধ্যে একবার টয়লেট থেকে ঘুরে এসেছে—চেহারায় কোন দাগ নেই। পরচুলা, দাড়ি, আর গোঁফও ঠিকঠাক আছে।

'ব্যারনেস লিনা যদি খলিফা না হয়ে থাকে...,' এভাবে চিন্তা করার ফলেই শেষ মুহূর্তে বিপদটা দেখতে পেয়েছিল, নতুন একটা জীবন পেয়ে গেছে।

'ব্যারনেস লিনা খলিফা নয়!' এখন নিশ্চিতভাবে জানে রানা। নিজের পরিচয় ফাঁস হতে যাচ্ছে এই ভয়ে ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার গগলকে বাধা দিয়েছে, সে যাতে খলিফার কাছে পৌঁছুতে না পারে। তারমানে ব্যারনেস ওকে সত্যি কথাই বলেছে। বিপুল স্বস্তি, প্রায় পুলকের মত, সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। প্রথম যে চিন্তাটা মাথায় এল, এখুনি লিনার দেয়া মোসাডের নাম্বারে ফোন করবে ও, কথা বলবে তার সাথে। তারপর বিপদটা টের পেল। ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার মোসাড। এই মুহূর্তে লিনার কাছাকাছি যাওয়া মস্ত বোকামি হবে।

তাহলে কি করবে সে এখন? উত্তরটা খুঁজতে হলো না, তৈরি হয়েই ছিল মনের ভেতর। যা করার জন্যে এসেছে, তাই করবে ও। খলিফার সাথে দেখা করবে, আর দেখা করতে হলে তার পথ ধরেই সামনে বাড়তে হবে ওকে।

কফি শপ থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড় পর্যন্ত হেঁটে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে এল রানা। 'কিং ডেভিড হোটেল,' ড্রাইভারকে বলল ও, হেলান দিল সীটে।

নিজেকে অভয় দিল রানা, এখন অন্তত জানা আছে ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার বাস্তব চরিত্র। পরবর্তী ফাঁদে অন্ধের মত পা দেবে না সে।

পনেরো

চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে চারদিকে চোখ বুলাল রানা, এই কামরাটাই রিজার্ভ করা হয়েছে ওর জন্যে। হোটেলের পিছন দিকে কামরাটা, রাস্তার ওপারে আকাশ ছোঁয়া একটা বিল্ডিং, মাত্র পনেরো গজ দূরে। দুটো জানালার যে-কোনটা দিয়ে আসতে পারে স্নাইপারের বুলেট।

'কিন্তু আমি তো একটা স্যুইট চেয়েছিলাম,' সাথে উঠে আসা রিসেপশন ক্লার্ককে ধমকের সুরে বলল রানা।

'দুঃখিত, স্যার,' সবিনয়ে বলল লোকটা। 'তাহলে নিশ্চয়ই ভুল হয়ে গেছে।'

চারদিকে আরেকবার তাকাল রানা, ভারী ফার্নিচারগুলোর আড়ালে অন্তত দশ-বারোটা জায়গা রয়েছে যেখানে ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার বিস্ফোরক পদার্থ রেখে গিয়ে থাকতে পারে, মার্সিডিজের পর বিকল্প হিসেবে। সাপের খাঁচায় রাত কাটাতে রাজি আছে রানা, ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের তৈরি পরিবেশের চেয়ে সেটা অনেক নিরাপদ।

পিছিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল ও, তিরস্কার ভরা দৃষ্টিতে তাকাল ক্লার্কের দিকে। শশব্যস্ত হয়ে এলিভেটরের দিকে ছুটল বেচারা, ফিরে এল পাঁচ মিনিটের মাথায়, গাল ভরা হাসি নিয়ে। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা, জিনিসটা ভারী বিপজ্জনক—এই গালভরা হাসি।

'আমাদের সেরা স্যুইটের একটা, স্যার, এই মাত্র খালি হওয়ায় আপনাকে দেয়া গেল—আসুন, প্লীজ।'

একশো বারো নম্বর স্যুইট। জানালা দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত উপত্যকা দেখা যায়, ওল্ড সিটির গায়ে জাফা গেটটাও পরিষ্কার নজরে আসে। শহরের মাঝখানে মাথা তুলে আছে লাস্ট সাপার চার্চ।

হোটেলের বাগানে ফুল ফুটে আছে, লনগুলো সবুজ ঘাসে মোড়া, সুইমিং পুলের কিনারায় ছুটোছুটি করে খেলছে শিশুরা।

খোলা একটা টেরেস রয়েছে স্যুইটের সাথে, একা হতেই শাটার বন্ধ করে দিল রানা, ওদিক দিয়ে খুব সহজেই লোক পাঠাতে পারে ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার। এরপর প্রাইভেট ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল রানা।

বাগানের পাশেই ফ্রেঞ্চ কনসুলেট। দুর্গ আকৃতির একটা বাড়ি। বাড়ির পাশে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। স্যুইটের নিরাপত্তা নিয়ে আবার চিন্তা করল রানা।

পাশের স্যুইট থেকে অনায়াসে একজন লোক ওর ঝুল-বারান্দায় চলে আসতে

পারবে, শুধু যদি আটতলার জানালার কার্নিসে পা রাখার সাহস থাকে। কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর সিদ্ধান্ত নিল ঝুল-বারান্দার শাটার বন্ধ করবে না। সবদিক বন্ধ একটা জায়গায় নিজেকে আটকে রাখলে হিতে বিপরীতও ঘটতে পারে।

পর্দা টেনে দিল রানা, তারপর রুম সার্ভিসকে ফোনে ডেকে হুইস্কি আর সোডার অর্ডার দিল। দরকার, খুব ধকল গেছে সারাটা দিন।

টাই আর শার্ট খুলল রানা; তারপর পরচুলা, গোঁফ আর দাড়ি। বাথরুমে ঢুকে সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে মুখ ধুলো। তোয়ালে দিয়ে পানি মুছছে, টোকা পড়ল দরজায়।

রুম সার্ভিস? কিন্তু এত তাড়াতাড়ি? ব্যস্ত হাতে উইগটা মাথায় চাপিয়ে লাউঞ্জে বেরিয়ে এল রানা, কানে চাবির আওয়াজ পেল না, অথচ হাতল ঘুরে যাচ্ছে, পরমুহূর্তে দড়াম করে খুলে গেল কবাট। ঝট্ করে তোয়ালেটা মুখে তুলে ফেলেছে রানা, ভান করল এখনও মুখ মোছা শেষ হয়নি—গোঁফ দাড়ি নেই সেটা গোপন করা সম্ভব হলো কোন রকমে।

'ভেতরে এসো,' তোয়ালের ভেতর থেকে ভোঁতা আওয়াজ বেরুল।

'মশিয়ে গগল?'

দোর-গোড়ার সামনে স্থির পাথর হয়ে গেল রানা, গলার আওয়াজটা যেন পিষে দিল হৃৎপিণ্ডকে, মাঝপথে থামিয়ে দিল নিশ্বাস।

পুরুষের বুক খোলা শার্ট পরেছে সে, বুকের দু'পাশে ঢাকনি সহ দুটো পকেট। কোমর আর উরুতে আঁটসাঁট হয়ে আছে খাকি কমব্যাট ট্রাউজার, পায়ে নরম সোলের ক্যানভাস বুট। 'মশিয়ে গগল,' পিছনে দ্রুত বন্ধ করে দিল দরজা, তার তালুতে সরু আর লম্বা একটা ইস্পাতের টুকরো দেখল রানা, ওটা দিয়েই তালা খুলেছে সে। 'চোখ থেকে তোয়ালে সরান, এদিকে তাকান—আমি ব্যারনেস মিডো অটারম্যান। আপনি মারাত্মক বিপদে আছেন, আমি আপনাকে সাবধান করতে এসেছি…' সদ্য কাটা কোঁকড়া কালো চুলের মাঝখানে তার মুখ তাজা ফুলের মত কোমল আর স্নিগ্ধ। 'এই মুহূর্তে ইসরায়েল ত্যাগ করতে হবে আপনাকে। কাছাকাছি একটা এয়ারফিল্ডে আমার লীয়ার জেট আছে…' তার বিশাল সবুজাভ চোখে দুশ্চিন্তা আর অস্থিরতা।

কথা বলার জন্যে তোয়ালে একটু নামাল রানা। 'এ-সব কথা কেন বলছেন আমাকে,' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল ও। 'আপনার কথা আমি বিশ্বাসই বা করব কেন?'

রানা দেখল, এক নিমেষে রাগে লালচে হয়ে উঠল ব্যারনেসের চেহারা।

'আপনি বোকার মত এমন জিনিসে নাক গলাচ্ছেন, হুঁশ ফেরার পর দেখবেন ওটা আর নেই।'

'আমাকে সাবধান করে আপনার কি লাভ, ব্যারনেস অটারম্যান?'

'কারণ…,' ইতস্তত করল ব্যারনেস, তারপর বলল, '…কারণ আপনি রানার বন্ধু। শুধু এই একটা কারণে আমি চাই না আপনি খুন হয়ে যান।'

হাত থেকে তোয়ালে ছেড়ে দিল রানা, ঝটকা দিয়ে মাথা থেকে ফেলে দিল

পরচুলা।

'নো! ইমপসিবল! ওহ্ গড, ইয়েস, ইট'স ট্রু!' দু'সেকেন্ডে কয়েকবার ব্যারনেসের চেহারা বদলে যেতে দেখল রানা–প্রথমে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তারপর অবিশ্বাসের ছায়া পড়ল, সবশেষে আনন্দে বিকৃত হয়ে উঠল। মনে হলো বিস্ময়ের ধাক্কায় পঙ্গু হয়ে গেছে সে, রানার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গি করেও স্থির হয়ে থাকল, সেই শ্রুতিমধুর প্রলম্বিত সুরে বিড়বিড় করে চলেছে। 'রানা, মাই লাভ...ওহ্ গড, ইট'স ট্রু!'

'দাঁড়িয়ে থেকে শুধু মাই লাভ মাই লাভ করলে হবে?' রানা থামতেই ঝাঁপ দেয়ার ভঙ্গিটা গতি পেল, ওর বুকে ধাক্কা খেল ব্যারনেস। রানা অনুভব করল পেলব দুটো বাহু ওর ঘাড় জড়িয়ে ধরে সাপের মত প্যাঁচ কষছে।

'প্ল্যানটা কি, পিষে মেরে ফেলবে?' দম নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে রানার।

পিছিয়ে এল ব্যারনেস, কিন্তু দু'হাত দিয়ে ধরে রাখল রানার কাঁধ। 'রানা, ডার্লিং–বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছি'। হোটেলের ওপর নজর রাখছে ওরা, আর সুইচবোর্ডের মেয়েগুলো মোসাড। তা না হলে ফোন করলেও পারতাম...'

'কি জানো সব বলো,' নির্দেশ দিল রানা।

'ঠিক আছে, কিন্তু ধরো আমাকে, শেরি। যতক্ষণ একসাথে আছি একটা সেকেন্ডও নষ্ট করতে চাই না।'

বাথরূমে লুকাল ব্যারনেস, রূম সার্ভিস হুইস্কি আর সোডা দিয়ে চলে গেল। বেরিয়ে এসে সোফায় রানার গায়ে হেলান দিয়ে বসল আবার ব্যারনেস।

'ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার...?'

'কন্ট্রোলকে রিপোর্ট করেছে, খলিফার সাথে দেখা করতে চেয়েছে গগল, এবং তার পরিচয় ফাঁস করে দিতে যাচ্ছে। কাল পর্যন্ত এইটুকু জানতাম আমি। তবে আন্দাজ করে নিতে অসুবিধে হয়নি। ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের প্রথম রিপোর্টে তোমার বদলে গগলের নাম রয়েছে দেখে প্রথমে আমি অবাক হয়ে যাই। তারপর আমার মনে পড়ে, আমার কন্ট্রোল গগলের নামটাও বলেছিল, ভাবলাম গগলই তাহলে খলিফার সমার্থক নাম, কিন্তু দু'জন একই লোক নয়। তারপর ভাবলাম, কিন্তু গগল আসছে কেন, আসার কথা তো তোমার! ধরে নিলাম, গগলের সাথে তোমার একটা সমঝোতা হয়েছে, ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের কথা তাকে তুমি জানিয়েছ...রানা, মাই লাভ, আমরা তো বিছানায় শুয়েও কথা বলতে পারি, তাই না?' ফিসফিস করে বলল ব্যারনেস। 'কতদিন তোমাকে আমি কাছে পাই না...'

তার ত্বক নিরাবরণ গরম সাটিনের মত। তার গাল রানার কানের সাথে সেঁটে থাকল। তার সমতল মসৃণ তলপেটে ভারী আর শক্ত একটা উরু তুলে দিল রানা।

'গগলের দেখা করার অনুরোধ অন্য একটা চ্যানেলে খলিফার কাছে পৌঁছায়, মেসেজটা পৌঁছুতে বাধা দেবে সে উপায় ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের ছিল না...'

'তার পরিচয় কি? জানতে পেরেছ কে সে?'

'না।' মাথা নাড়ল ব্যারনেস। 'এখনও জানতে পারিনি।' রানার পেটে আঙুল দিয়ে রেখা আঁকছে সে।

'এমন করলে চিন্তা করতে পারছি না,' প্রতিবাদ করল রানা।

'দুঃখিত।' হাতটা রানার গালে তুলে আনল ব্যারনেস। 'তবে সাক্ষাৎকারের আয়োজন করার দায়িত্ব খলিফা ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারকেই দিল। কি আয়োজন করা হয়েছে আমি জানতাম না। তারপর আজ সন্ধ্যায় ইমিগ্রেশন তালিকায় ভিনসেন্ট গগল নামটা দেখলাম। দেখামাত্র বুঝতে পারলাম কি ঘটতে চলেছে। সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা ইসরায়েলে করা হয়েছে, কারণ এখানে গগলকে খুন করা ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের জন্যে পানির মত সহজ। গগল কোথায় উঠবে জানতে তিন ঘণ্টা সময় লেগে গেল আমার।'

এখন ওরা দু'জনেই চুপচাপ, রানার ঘাড়ে নামিয়ে মুখটা চেপে ধরল ব্যারনেস, পরম সুখে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। 'ওহ্, গড, রানা! তুমি দূরে থাকলে আমার কি যে কষ্ট হয়!'

'শোনো, ডার্লিং। আর কি জানো সব বলো আমাকে।' নরম আঙুলে তার চিবুক ধরে উঁচু করল রানা চোখ দেখার জন্যে, তার চোখে দৃষ্টি ফিরে এল। 'তুমি কি জানতে গগলকে খুন করার চেষ্টা করা হবে?'

'না-কিন্তু সঙ্গত কারণেই মোসাড সে চেষ্টা করতে পারে, ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের পরিচয় তারা গোপন রাখতে চাইবে।'

'আর কি জানো?'

'কিছু না।'

'খলিফা আর গগলের দেখা করার ব্যবস্থা আদৌ করা হয়েছে কিনা জানো?'

'না,' স্বীকার করল ব্যারনেস। 'জানি না।'

'খলিফার পরিচয় সম্পর্কেও এখনও কিছু জানতে পারোনি?'

'না।'

আবার ওরা চুপ করে গেল। কনুইয়ে ভর দিয়ে রানার বুকের ওপর উঁচু হয়ে আছে ব্যারনেস, ওর মুখ লক্ষ করছে।

রানা বলল, 'খলিফার নির্দেশ অমান্য করার ঝুঁকি ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার নেবে না, সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়েছে তাকে। খলিফা জড়িত, কাজেই কোন ছল-চাতুরির আশ্রয় নিতেও সাহস করবে না।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ব্যারনেস।

'তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতে হয়, এই মুহূর্তে কাছে কোথাও রয়েছে খলিফা, খুব কাছাকাছি কোথাও।'

'হ্যাঁ,' আবার মাথা ঝাঁকাল ব্যারনেস, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

'তারমানে গগলের বদলে আমাকে যেতে হবে তার কাছে।'

'না, রানা, না। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।'

'একবার এরইমধ্যে চেষ্টা করা হয়েছে-,' মার্সিডিজের ঘটনাটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা, ওর শিরদাঁড়ার ওপর ক্ষতটায় নরম আঙুল ছোঁয়াল ব্যারনেস।

'রানা, ওরা তোমাকে খলিফার কাছে পৌছুতে দেবে না।'

'না দিয়ে উপায় নেই ওদের,' বলল রানা। 'খলিফা নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভারি উদ্বিগ্ন, গগলের কাছ থেকে তথ্য পাবার জন্যে অস্থির হয়ে আছে সে।'

'ওরা তোমাকে তার আগেই যদি খুন করতে পারে? তাই করবে, রানা, ওদের তুমি চেনো না!'

'চেষ্টা করবে, হয়তো,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সাক্ষাৎকারের একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা আছে, তার বেশি দেরি নেই। আরেকবার খুনের আয়োজন করার মত সময় নেই ওদের হাতে। তাছাড়া, এখন আমি জানি, আমার ওপর হামলা হতে পারে। সব দিক ভেবেই বলছি, আমার এগোনো উচিত।'

'ওহ্ রানা...,' ব্যারনেসের ঠোঁটে আঙুল চেপে ধরল রানা।

'এসো ধরি, মোসাড জানে আমি ভিনসেন্ট গগল নই, এবং আমার আসল কাজ ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের পরিচয় ফাঁস করে দেয়াও নয়, তাহলে? মোসাডের ওরা এই পরিস্থিতিতে কি ভাববে?'

কয়েক সেকেন্ড বিবেচনা করল ব্যারনেস। 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'ওরা যদি জানে গগলের জায়গায় মাসুদ রানা এসেছে,' আবার প্রশ্ন করল রানা, 'তাহলে কি ঘটে দেখার কৌতূহলে মোসাড কি সাক্ষাৎকারটা অনুষ্ঠিত হতে দেবে?'

'তোমাকে ওরা কোন্ দৃষ্টিতে দেখবে তার ওপর নির্ভর করে। ওদের শত্রু তালিকায় বাংলাদেশ আছে, আলাদাভাবে তুমিও আছ। আবার ওরা তোমাকে শার্ক কমান্ডের কমান্ডার হিসেবেও দেখতে পারে।'

'রেজাল্ট?'

'রানা হিসেবে দেখলে পরিচয় জানার সাথে সাথে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেবে। অন্য দৃষ্টিতে দেখলে খলিফার সাথে দেখা হয়তো করতে দেবে, কিন্তু তারপর বাঁচতে দেবে না। কিন্তু তুমি কি চাইছ তোমার কথা জানিয়ে মোসাডে রিপোর্ট করি আমি?'

'তাতে যদি আমার সুবিধে হয়, করবে না?'

'সুবিধে? ওদেরকে রিপোর্ট করা আর তোমার ডেথ ওয়ারেন্টে সই করা, একই ব্যাপার–রানা, তুমি না আমার লক্ষ্মী সোনা!'

'কিংবা হয়তো সেটাই হবে আমার রক্ষাকবচ।'

রানাকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকি দিল ব্যারনেস। 'রক্ষাকবচ হয় কি করে!'

'ঠিক জানি না,' বলল রানা। 'তবে একটা জিনিস বুঝি, আমি খলিফার সামনে দাঁড়াতে পারলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তার সামনে একবার পৌঁছুতে পারাই আমার...'

'ভাবছ খলিফাকে তুমি জিম্মি করবে? তারপর তাকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে ইসরায়েল থেকে?'

'কি ঘটবে জানি না, লিনা। অনেক কিছুই ঘটতে পারে। খলিফার সাথে আমার দেখা হলে নিজের নিরাপত্তা আমি মোসাডের কাছ থেকে অবশ্যই আদায় করে নিতে পারব।'

'ওহ্ গড, এখন আমি আরও ভয় পাচ্ছি!' চেঁচিয়ে উঠল ব্যারনেস। 'রানা, রানা তুমি আক্রোশে অন্ধ হয়ে গেছ! তোমার বুদ্ধি কাজ করছে না! মোসাডকে ফাঁকি দিয়ে ইসরায়েল থেকে পালাবার কথা কোন পাগলও ভাববে না!'

'ভাববে, পাগলটার যদি বন্ধু থাকে এখানে।'

'বন্ধু?' হকচকিয়ে গেল ব্যারনেস, তারপর কথাটার অর্থ আন্দাজ করতে পারল-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। 'তোমার জন্যে হাসি মুখে মরতে পারব, রানা-কিন্তু তাতেও যদি তোমাকে বাঁচাতে না পারি?'

'বাঁচা-মরা ভাগ্যেরও তো ব্যাপার, লিনা। কিন্তু ভেবে দেখো, এরকম সুবর্ণ সুযোগ আর পাব না। খলিফা জানে, তোমাকে আমি খুন করেছি। জানে, আমার বন্ধুর মাধ্যমে তাকে সাবধান করে দিতে চাইছি। এই মুহূর্তে সিকিউরিটির কথা ভেবে খুব একটা উদ্বেগে নেই সে। এরকম সুযোগ আর পাব?'

কথা বলতে পারল না ব্যারনেস, নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়ল।

'তুমি শুধু আমার পরিচয় জানাবে না, মোসাডকে বোঝাতে চেষ্টা করবে খলিফা লোক ভাল নয়-সে ইসরায়েলেরও মঙ্গল কামনা করে না। তার প্ল্যান আর ষড়যন্ত্র সব তুমি ব্যাখ্যা করবে...'

'ভেবেছ তাতেই তোমাকে জামাই আদর করবে মোসাড?'

হেসে ফেলল রানা। 'আদর নয়, আমি চাইছি খলিফার সাথে দেখা করতে ওরা যেন আমাকে বাধা না দেয়। ভাল মনে করলে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারো তুমি-মোসাডকে বলতে পারো, আমিই তোমাকে অনুরোধ করেছি আমার পরিচয় যেন ওদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়। অন্তত খানিকটা চিন্তায় পড়ে যাবে ওরা, তাই না? ইসরায়েলের পরম শত্রু জেরুজালেমে বসে বলছে কিনা এই দেখো আমি তোমাদের নাগালের মধ্যে এসেছি! তোমার কি মনে হয়, ওরা হতভম্ব হয়ে যাবে না?'

'তোমার জন্যে আমার এত ভয় হয়, রানা। যদি চাও আমি মারা যাই, তাহলে হও, যাও খুন হয়ে। প্রচণ্ড ভালবাসা বোধহয় অভিশপ্ত...' কথা শেষ না করে পা দুটো ভাঁজ করল ব্যারনেস, হাঁটু জোড়া তুলে আনল বুকের ওপর-ভ্রূণের ভঙ্গি।

'করবে, লিনা?'

'তুমি চাও, কন্ট্রোলকে তোমার আসল পরিচয় জানিয়ে দিই, বলি ক্যাকটাস ফ্লাওয়ারের পরিচয় ফাঁস করার কোন ইচ্ছে তোমার নেই, তুমি অজ্ঞাত কোন কারণে খলিফার সাথে দেখা করতে চাও, এবং খলিফা লোক ভাল নয়, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

মাথা ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাল ব্যারনেস। 'তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।'

'কি প্রতিজ্ঞা?'

'কন্ট্রোলের সাথে কথা বলে যদি বুঝি তোমার বিপদ কাটেনি, যদি বুঝি খলিফার সাথে দেখা করার আগেই তোমাকে ওরা বাধা দেবে ঠিক করেছে, তাহলে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে দেখা করার প্ল্যান বাদ দেবে তুমি। সোজা আমার লীয়ারের কাছে চলে যাবে, পল বার্না তোমাকে নিরাপদ কোথাও পৌঁছে দেবে।'

'তুমি আমার সাথে চালাকি করবে না, পুরোপুরি সৎ থাকবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মোসাডের প্রতিক্রিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিবেচনা করবে-আর, যদি দেখো

দেখা করার ফিফটি-ফিফটি চান্স আছে, চান্সটা আমাকে নিতে দেবে?'

মাথা ঝাঁকাল ব্যারনেস।

'আমার মাথা ছুঁয়ে কিরে খাও,' জেদ ধরল রানা।

রানার মাথায় হাত রাখল ব্যারনেস্। :বেঁচে ফিরে যাবার সম্ভাবনা আছে দেখলে তোমাকে আমি বাধা দেব না।'

রানার পেশীতে ঢিল পড়ল।

'এবার তোমার পালা...'

ব্যারনেসের মাথায় হাত রেখে রানা বলল, 'যদি দেখি খলিফার সাথে দেখা করার কোন সুযোগ পাব না, তোমার কথা মত শীয়ারের কাছে চলে যাব আমি...'

রানার বুকের নিচে ঘুরে গেল ব্যারনেস, ওর ঘাড় পেঁচিয়ে ধরল দু'হাতে। 'মেক লাভ টু মি, রানা। নাউ! কুইকলি! আই হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট অ্যাট লিস্ট।'

কাপড় পরা শুরু করে ব্যারনেস বলল, 'ফোন করা সম্ভব নয়। এই কামরায় লোক পাঠাব আমি।' ক্যানভাস বুটের ফিতে বাঁধল সে। 'শুধু বিপদের খবর হলে লোক পাঠাব। সে শুধু বলবে, ব্যারনেস আমাকে পাঠিয়েছে। সাথে সাথে তার সাথে বেরিয়ে পড়বে তুমি। সে তোমাকে শীয়ারের কাছে নিয়ে যাবে।'

সিধে হয়ে দাঁড়াল ব্যারনেস, খাকি ট্রাউজার্স পরে আয়নার সামনে চলে এল, চুলে চিরুনি চালাচ্ছে। 'সাথে কিছু আছে তো, রানা?' আয়নায় ওকে দেখতে পাচ্ছে সে।

মাথা নাড়ল রানা।

'আমি যোগাড় করে পাঠাতে পারি, কি লাগবে বলো—ছুরি, পিস্তল?'

আবার মাথা নাড়ল রানা। 'খলিফার সামনে যেতে দেয়ার আগে সার্চ করা হবে আমাকে।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' শার্টের বোতাম লাগাল ব্যারনেস, ঘুরে দাঁড়াল রানার দিকে। 'এখানে চুমো খাও,' নাকের পাশে আঙুল ছোঁয়াল সে, তারপর নাকের আরেক পাশে, সবশেষে ঠোঁটে। 'তারপর আমি চলে যাব।'

ভীষণ ক্লান্ত হলেও ব্যারনেস চলে যাবার পর সামান্য একটু ঘুমাতে পারল রানা। সারা রাতে পাঁচ-সাত বার ঘুম ভেঙে গেল, সটান বিছানার ওপর উঠে বসে নিস্তব্ধতার ভেতর কান পেতে থাকল। সূর্য ওঠার আগে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল ও, কিন্তু সেদ্ধ একটা ডিম আর কফি ছাড়া কিছু ছুঁলো না। শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

দুপুর পেরিয়ে যাচ্ছে, ব্যারনেস কোন মেসেজ পাঠায়নি। মোসাড সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিয়েছে খলিফার সাথে দেখা করতে ওকে তারা বাধা দেবে না। ব্যারনেসের মনে ক্ষীণ একটু সন্দেহ থাকলেও ওকে খবর পাঠাত সে। রুম সার্ভিসকে দিয়ে হালকা লাঞ্চ আনিয়ে খেয়ে নিল রানা। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিস্তেজ হতে দেখল কড়া রোদকে। বিকেল হয়ে গেছে।

সন্ধে হতে আধ ঘণ্টা বাকি, টেলিফোন বেজে উঠল। চমকে উঠে রিসিভার

জ্বলল রানা।
'গুড ইভনিং, মি· গগল। আপনার ড্রাইভার আপনাকে নিতে এসেছে,' রিসেপশন ডেস্ক থেকে একটা মেয়ে কথা বলছে।
'ধন্যবাদ। ওকে বলো আমি আসছি।'
শুরু হলো ব্যাপারটা। এর শেষ কোথায় রানার জানা নেই। মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে সে। জানে, এছাড়া কোন উপায় ছিল না। কাপড় পরে আগেই তৈরি হয়ে ছিল, কাবার্ডে ব্রীফকেসটা ভরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।
এখনও সঠিক বলা যাচ্ছে না কোথায় যাচ্ছে ও। হয়তো খলিফার কাছে নয়, ব্যারনেসের লীয়ারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে ওকে। হয়তো ব্যারনেস রিপোর্ট করার পর তাকে বন্দী করেছে মোসাড, রানাকে নিয়ে যাবার জন্যে ড্রাইভার পাঠিয়েছে।
ডেস্কের সুন্দরী মেয়েটা ওকে বলল, 'আপনার গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছে, স্যার। হ্যাভ এ নাইস ইভনিং।'
'আই হোপ সো,' বলল রানা। 'ধন্যবাদ।'
ছোট একটা জাপানী গাড়ি, ড্রাইভার একটা মেয়ে। রানাকে হেঁটে আসতে দেখে সবিনয়ে হাসল সে, চেহারায় বন্ধু বন্ধু ভাব। পিছনের সীটে উঠল রানা, অপেক্ষা করে আছে কখন শুনতে হবে, 'ব্যারনেস পাঠিয়েছে আমাকে।'
তার বদলে মেয়েটা 'সালোম, সালোম,' বলল ওকে, হেডলাইট জ্বেলে ছেড়ে দিল গাড়ি।

পুরানো শহর ঘিরে থাকা পাঁচিলের বাইরের দিক ঘেঁষে ছুটে চলেছে গাড়ি। দিনের আলো দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। রাস্তায় লোক চলাচল কম, যানবাহন আরও কম। এদিকের রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে কিদরন উপত্যকায়। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা। পাঁচিলের ভেতর পুরানো শহরের আকাশ ছোঁয়া অ্যাপার্টমেন্ট ভবনগুলো দেখা গেল। পবিত্র নগরীতে একটুর জন্যে খুন হয়ে যাচ্ছিল ও।
ধর্ম বিষয়ে আলোচনায় ইহুদিরা সব সময় আগ্রহী, কথাটা মনে রেখে ভাঙা ভাঙা হিব্রুতে একটা প্রশ্ন করল রানা, 'মুসলমানদের সাথে তোমাদের বিরোধটা কোথায়, ধর্ম কি বলে?'
হাসল মেয়েটা, কিন্তু না বোঝার ভান করল। ফ্রেঞ্চ ভাষায় একই প্রশ্ন করল রানা, ফলাফল শূন্য। তারমানে, ভাবল রানা, কথা বলতে নিষেধ করা আছে।
অলিভস পাহাড়ের নিচে পৌঁছুতে রাত হয়ে গেল, একটু পর আরব বসতির শেষ চিহ্নটা পেছনে ফেলে এল ওরা। রাস্তা ফাঁকা হলেও চল্লিশের ওপর স্পীড তুলল না মেয়েটা। অন্ধকার, অল্প নিচু একটা উপত্যকায় নেমে এল গাড়ি, চওড়া কংক্রিটের রাস্তার দু'পাশে পাহাড়, পাহাড়ের দু'পাশে ধু-ধু মরুভূমির আভাস।
খোলা আকাশে মেঘ নেই, মেলা বসেছে তারাদের।
শহর ছাড়ার পর রাস্তার পাশে খানিক পর পর সাইনপোস্ট দেখা গেল। পুবে

জর্দান, ডেড সী, আর জেরিকো–সেদিকেই যাচ্ছে ওরা। পঁচিশ মিনিট পর হেডলাইটের আলোয় আরেকটা সাইনপোস্ট দেখল রানা হাতের ডান দিকে–ইংরেজি, আরবী, আর হিব্রুতে লেখা। সী লেভেলের নিচে নামছে এখন ওরা, ডেড সী'র উপত্যকায়।

. মেয়েটাকে আরেকবার কথা বলাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা। নিজেকে সান্ত্বনা দিল এই বলে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানার কথা নয় তার। গাড়িটা কোন রেন্ট-এ-কার কোম্পানী থেকে ভাড়া করা, ড্যাশবোর্ডে নাম লেখা রয়েছে। তবে গন্তব্য সম্পর্কে জানে মেয়েটা। একটু পর ও নিজেও জানতে পারবে।

. সামনে একটা সতর্কীকরণ সঙ্কেত দেখা গেল, সামনে ক্রসরোড। স্পীড কমিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নেয়ার সিগনাল দিল ড্রাইভার। হেডলাইটের আলো পড়ল সাইনপোস্টে, জেরিকো রোড ধরছে ওরা, ডেড সী পিছনে থেকে যাচ্ছে। উত্তর দিকে যাচ্ছে ওরা, জর্দান উপত্যকা গ্যালিলি-র দিকে।

পাহাড়ের মাথার ওপর ষাঁড়ের শিং আকৃতি নিয়ে চাঁদ উঠল। আবার গাড়ির স্পীড কমাল ড্রাইভার, জেরিকো শহরের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। দুনিয়ার সবচেয়ে পুরানো মানববসতি। এখানে ছয় হাজার বছর ধরে বাস করছে মানুষ, তাদের পরিত্যক্ত আবর্জনা মরু সমতলকে কয়েকশো ফিট উঁচু করে তুলেছে। বিধ্বস্ত পাঁচিলগুলো আবিষ্কার করেছে আর্কিওলজিস্টরা।

মেইন রোড ছেড়ে বাঁক নিল ড্রাইভার। রাস্তার দু'পাশে বেশিরভাগ অ্যান্টিকস-এর দোকান, কিছু ক্যাফে-ও আছে, সব আরবদের। লোকালয় ছাড়িয়ে পাহাড়ী পথ ধরল ওরা, তারপর মেটো পথে নেমে এল। পাউডারের মত ধুলো ঢুকল ভেতরে, হাঁচি পেল রানার।

আধ মাইল সামনে পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে, ডান দিকেরটায় একটা সাইনবোর্ড–নিষিদ্ধ এলাকা, মিলিটারি জোন। কিন্তু কোন গার্ড নেই, সাইনবোর্ডটাকে অগ্রাহ্য করে ডান দিকের পথেই গাড়ি চালাল সে।

হঠাৎ করেই আকাশ ঢাকা বিশাল উঁচু একটা পাঁচিল দেখতে পেল রানা–কালো, চওড়া। অর্ধেক আকাশ ঢেকে সামনে ওটা খাড়া একটা পাহাড়।

আরও পাঁচশো গজ এগিয়ে গাড়ি থামাল ড্রাইভার, ক্যাবের আলো জ্বালল। ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে একমুহূর্ত দেখল মেয়েটা। একটু কি করুণা ফুটল দৃষ্টিতে?

'এখানেই,' অস্ফুটে বলল সে।

ব্লেজারের ভেতরের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল রানা।

'না,' আবার ইংরেজিতে বলল মেয়েটা। 'আপনার কোন ঋণ নেই।'

'টোডা রাবা,' ভাঙা হিব্রুতে তাকে ধন্যবাদ দিল রানা, দরজা খুলে নেমে পড়ল নিচে।

মরুর বাতাস স্থির কিন্তু হিম-শীতল, কাঁটাঝোপ থেকে বুনো ফুলের বিশ্রী গন্ধ আসছে।

'সালোম,' খোলা জানালা দিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে বিদায় জানাল মেয়েটা, দ্রুত গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরতি পথে চলে গেল। গাড়ির নাক ঘোরার সময় হেডলাইটের আলোয় সামনে পাম গাছের ঝাড় দেখতে পেল রানা।

গাড়ির টেইল লাইট অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিকে পিছন ফিরল রানা। নির্জন মরুতে একা ওকে ফেলে রেখে গেল নাকি? চাঁদ আর তারার আলোয় বেশিদূর দেখা গেল না, দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে আছে পাম ঝাড়। কোথাও থেকে কোন শব্দ না পেয়ে ধীরে পায়ে এগোল রানা, পাম ঝাড়ের ভেতর ঢুকে পোড়া পোড়া একটা গন্ধ পেল, খানিক দূরে গাছের মাথায় ক্ষীণ নীলচে ধোঁয়ার আভাস। ঝাড়ের বাইরে, ওদিকে কোথাও থেকে একটা ছাগল ব্যা করে উঠল। তারপর ককিয়ে কেঁদে উঠল একটা শিশু।

মরুর মাঝখানে এটা একটা মরুদ্যান, সম্ভবত বেদুইন যাযাবররা আস্তানা গেড়েছে। হঠাৎ করে ফাঁকা জায়গাটায় বেরিয়ে এল রানা, চারদিক থেকে পাম ঝাড় দিয়ে ঘেরা। পশু আর জানোয়ারদের শুকনো বিষ্ঠা ছড়িয়ে আছে নুড়ি পাথর আর ঝুরঝুরে বালির ওপর, দ্রুত হাঁটা অসম্ভব ব্যাপার।

ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে একটা কুয়া, চারধারে মসৃণ পাথরের উঁচু চাতাল। চাতালের ওপর কালো একটা আকৃতি দেখতে পেল রানা, প্রথমে ঠিক চিনতে পারল না।

সেটার দিকে সাবধানে এগোল রানা, অজানা ভয়ে দুরু দুরু করছে বুক। হঠাৎ নড়ে উঠল আকৃতিটা।

মানুষের একটা মূর্তি, অস্বাভাবিক লম্বা একটা আলখাল্লা পরে আছে, পাগড়িটা শুধু মাথা নয় চোখ আর ঠোঁট বাদ দিয়ে গোটা মুখ ঢেকে দিয়েছে। আলখাল্লা অস্বাভাবিক লম্বা, মনে হলো লোকটা ওর দিকে হেঁটে নয়, অন্ধকারে উড়ে আসছে।

পাঁচহাত দূরে থামল মূর্তিটা, মুখ ঢাকা পাগড়িটা উলের।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা, নিজের কানেই ভোঁতা আর কর্কশ শোনাল। সন্ন্যাসী উত্তর দিল না, চওড়া আস্তিন সহ হাতটা আলখাল্লার ভেতর থেকে বের করে নাড়ল শুধু, তারপর পিছু নেয়ার ইঙ্গিত করল। দ্রুত ঘুরল সে, হন হন করে হেঁটে ঢুকে গেল পাম ঝাড়ের ভেতর।

অনুসরণ করল রানা। একশো গজ এগিয়ে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করল, হাঁটায় লোকটার সাথে পারছে না। বারবার গাছের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে সে, খুব জোরে হেঁটেও তাকে দৃষ্টি সীমার মধ্যে ধরে রাখা যাচ্ছে না।

পাম ঝাড় থেকে বেরিয়ে এল ওরা, চাঁদের আলোয় প্রায় আধ মাইল দূরে দেখা গেল পাহাড়ের কালো গা, আকাশ থেকে খাড়া নেমে এসেছে মরুভূমিতে।

মেঠো একটা পথ ধরে এগোল ওরা। সরু, এবড়োখেবড়ো, আঁকাবাঁকা পথ–তবে নিয়মিত লোক চলাচল করে। এখানেও মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে আনতে ব্যর্থ হলো রানা। উপলব্ধি করল, লোকটাকে ধরতে হলে দৌড়াতে হবে। সন্ন্যাসী লম্বা-চওড়া, ভারী মানুষ, এ-ধরনের পথে তার এত দ্রুত হাঁটতে পারাটা রীতিমত একটা বিস্ময়।

পাহাড়ের সামনে পৌছুল ওরা, পথটা এঁকেবেঁকে ওপর দিকে উঠে গেছে। সন্ন্যাসীকে নিঃশব্দে অনুসরণ করল রানা। খুদে পাথর আর বালি মেশানো আলগা

মাটিতে বারবার পা পিছলে যাবার উপক্রম হলো। ধীরে ধীরে আরও খাড়া হচ্ছে পাহাড়ের গা। খানিক পর পায়ের নিচে নিরেট পাথর অনুভব করল রানা, মসৃণ ধাপ।

একদিকে নিচের খাদ ক্রমশ গভীর হতে থাকল, আরেক দিকে পাহাড়ের গা ওদের দিকে আরও বেশি হেলান দিচ্ছে, যেন ঠেলে কিনারার দিকে নিয়ে যেতে চাইছে ওদেরকে।

সব সময় রানার সামনে আর দূরে থাকল সন্ন্যাসী। অক্লান্ত শরীর, পায়ে দ্রুতগতি। মসৃণ ধাপে তার পা কোন শব্দ করছে না। নিঃশ্বাসের কোন আওয়াজ নেই। এই আকারের একজন মানুষ দম না হারিয়ে একনাগাড়ে পাহাড়ে উঠছে, শুধু বোধহয় অসুরের পক্ষেই সম্ভব। ঈশ্বরের নাম জপে যার দিন কাটে, এভাবে সে হাঁটতে পারে না। সন্ন্যাসী নয়, এ লোকের অন্য কোন পরিচয় আছে। অদ্ভুত একটা সতর্কতা লক্ষ করছে রানা তার মধ্যে, ভারসাম্য রক্ষায় ট্রেনিং পাওয়া যোদ্ধাকেও বুঝি হার মানাবে। খলিফা যেখানে জড়িত, সেখানে সব কিছুরই দ্বিতীয় একটা চেহারা থাকে।

যতই ওপরে উঠল ওরা, নিচের জ্যোৎস্না মাখা দৃশ্য ততই নয়নাভিরাম হয়ে উঠল–ধু-ধু মরুতে চিকচিক করছে বালি, দৈত্যাকার পাহাড়গুলোকে চোখের ভুলে সচল বলে মনে হতে লাগল, দূরে ডেড সী–তারা জ্বলা আকাশের নিচে টলটলে রূপালি পারদ।

একবারও বিশ্রাম নেয়নি ওরা। কত উঁচুতে উঠতে হবে? এক হাজার ফিট, দেড় হাজার ফিট? নিয়মিত, ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে রানা, এখনও হাঁপ ধরেনি, হালকা ঘামে বাতাস লাগায় কপালে যেন বরফ ঠেকে আছে।

স্মৃতি থেকে কি যেন একটা নাড়া দিতে চাইল ওকে। কিসের যেন একটা গন্ধ পাচ্ছে ও। সব সময় নয়, মাঝে মধ্যে। মনে হলো পরিচিত গন্ধ। তারপর অনেকক্ষণ আর পেল না–অন্যান্য জোরাল গন্ধে হারিয়ে গেল সেটা।

ধোঁয়ার গন্ধ আসছে, তার সাথে আবর্জনা আর মানুষের ঘামের গন্ধ।

অনেক পাহাড়েই সন্ন্যাসীরা বসবাস করে, কিছু কিছু ফটোও দেখা আছে রানার। চূড়ায় সার সার গুহা থাকে, গুহার পিছন দিকে থাকে সুড়ঙ্গ, ভেতরের অন্যান্য গুহায় যাওয়া যায়।

মিষ্টি গন্ধটার কথা ভোলেনি রানা।

খাদের কিনারা ঘেঁষে শেষ একশো ফিট উঠতে সত্যি ভয় পেল রানা। পা কাঁপতে শুরু করেছিল, অনেক কষ্টে থামাল ও। পাথুরে টাওয়ারের গায়ে একটা কাঠের দরজা, বারো ফিট উঁচু, লোহার আঙটা লাগানো।

ওরা পৌঁছুবার আগেই খুলে গেল সেটা। ওদের সামনে সরু একটা পাথুরে প্যাসেজ, দরজার ভেতর দেয়ালের গায়ে ছোট খোপে জ্বলছে নিঃসঙ্গ একটা লণ্ঠন।

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই অন্ধকার দু'পাশ থেকে হঠাৎ দুটো মূর্তি রানার গা ঘেঁষে এল। আত্মরক্ষার জন্যে প্রথম আঘাতটা ও-ই করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে স্থির হয়ে গেল শরীর। অস্ত্রের খোঁজে

সার্চ করা হলো ওকে।

দু'জনেই তারা সিঙ্গল-পীস কমব্যাট স্যুট পরে আছে, পায়ে ক্যানভাস প্যারাট্রুপার বুট। মোটা, কর্কশ, উলেন পাগড়ি মাথা আর মুখে পেঁচানো, শুধু চোখ আর নাক খোলা। প্রত্যেকের হাতে উজি সাবমেশিন গান, লোড আর কক করা, শোল্ডার স্ট্র্যাপের সাথে ঝুলছে।

সন্তুষ্ট হয়ে পিছিয়ে গেল তারা, প্রথম সন্ন্যাসী আবার রানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সরু প্যাসেজ খানিক পর পর বাঁক নিয়েছে, প্রতিটি বাঁক গুনছে রানা। সম্মিলিত কণ্ঠের একটা গুঞ্জন ঢুকল কানে, দূরাগত এবং অস্পষ্ট।

ধীরে ধীরে প্রার্থনার সুর পরিষ্কার হলো। গ্রীক অর্থোডকস্ চার্চের সার্ভিস-রহস্যময়, ভোঁতা আর কর্কশ লাগল কানে। এই রোমহর্ষক শব্দের সাথে ধূপের ধোঁয়া মিশে গিয়ে পরিবেশটাকে আরও গা ছমছমে করে তুলেছে। পথ দেখিয়ে রানাকে একটা বিশাল গুহার ভেতর নিয়ে এল সন্ন্যাসী। আলো এখানে খুব কম, গুহার বিশালত্ব বা লোকজনের সংখ্যা আন্দাজ করা অসম্ভব। যতদূর দেখা গেল, গ্রীক সন্ন্যাসীদের বড় বড় মাথা দেখতে পেল রানা, লম্বা কাঠের আসনে সার সার মূর্তির মত প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে আছে। প্রতিটি মুখ প্রাচীন, সাদা দাড়িতে ঢাকা। জ্যান্ত শুধু চোখগুলো, মহামূল্য পাথরের মত জ্বলছে। ধূপের ঝাঁঝাল গন্ধে শ্বাস নিতে কষ্ট হলো রানার। সন্ন্যাসীদের ভেতর দিয়ে হন হন করে এগোল ওরা, কারও মুখে প্রার্থনার একটা শব্দও জড়িয়ে গেল না বা বাদ পড়ল না। কেউ এমনকি ওদের দিকে তাকাল না বা নড়েচড়ে বসল না।

চার্চের পিছন দিকে গাঢ় অন্ধকার, সন্ন্যাসীরা আছে কিন্তু দেখা যায় না। ঘড়ঘড় শব্দ করে রানার সামনে একটা প্রাচীন দরজা খুলে গেল। আওয়াজটা লক্ষ্য করে অন্ধকারে পা বাড়াল রানা। এটা সম্ভবত একটা গোপন দরজা, শুধু সন্ন্যাসীরা জানে।

অন্ধকারে কিছুই দেখার উপায় নেই, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে হাতড়ে এগোল রানা সাবধানে। ছোট ছোট পাথুরে ধাপ ঠেকল পায়ে। সোজা নয়, এঁকেবেঁকে নেমে গেছে সিঁড়িটা। গুনল রানা, পাঁচশো ধাপ, প্রতিটি ছয় ইঞ্চি উঁচু।

অকস্মাৎ আবার মরুভূমির হিম-শীতল তারকাখচিত আকাশের নিচে বেরিয়ে এল রানা। খোলা একটা উঠান, সমতল পাথরের মেঝে। সামনে পাঁচিলের মত খাড়া পাহাড়ের গা। উঠানটাকে ঘিরে আছে প্যারাপেট-বুক-সমান উঁচু দুর্গ প্রাচীর, তাও পাথরের। দুর্গ-প্রাচীরের পর, হাজার, বারো কিংবা পনেরোশো ফিট নিচে উপত্যকা, ঝপ্ করে নেমে গেছে।

সাক্ষাতের জন্য এরচেয়ে দুর্গম আর সুরক্ষিত জায়গা হতে পারে না। খলিফা যে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্নে মাত্রা ছাড়িয়ে সতর্ক, আরেকবার উপলব্ধি করল রানা। এখানে আরও সশস্ত্র প্রহরী দেখল ও।

আবার ওরা বিনা নোটিসে রানার গা ঘেঁষে এল। দু'জন লোক দক্ষ হাতে সার্চ করল ওকে। এই ফাঁকে নিজের চারদিকে ভাল করে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল ও। পাহাড়ের গায়ে উঠানটাকে একটা কার্নিস বলা যেতে পারে, দুর্গ-প্রাচীর পাঁচ

ফিট উঁচু। উঠানের দু'দিকে পাহাড়ের গা কেটে তৈরি করা হয়েছে গুহা-মুখ, পাশাপাশি অনেকগুলো। সন্ন্যাসীরা যখন নিঃসঙ্গ হতে চায় গুহাগুলো ব্যবহার করে তখন।

উঠানে আরও লোক রয়েছে, মাথা আর মুখ উলেন কাপড় দিয়ে পেঁচানো। তাদের মধ্যে দু'জন লোক টর্চলাইটের আলো ফেলছে আকাশে–উজ্জ্বল জোড়া রশ্মি পিরামিডের আকৃতি তৈরি করেছে কালো আকাশের গায়ে।

রানা বুঝল, কোন প্লেনকে সঙ্কেত দিচ্ছে ওরা। না, প্লেন হতে পারে না–নিশ্চয়ই হেলিকপ্টার। এই ছোট উঠানে হেলিকপ্টারই শুধু নামতে পারবে।

সার্চ করা শেষ হলো, একজন লোক ইঙ্গিতে সামনে এগোতে বলল রানাকে। প্রকাণ্ডদেহী সন্ন্যাসী একটা গুহা-মুখে ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে অপেক্ষা করছে।

এগিয়ে গিয়ে মাথা নিচু করল রানা, ঢুকে পড়ল গুহাটার ভেতর। কেরোসিন ল্যাম্পের মৃদু আলোয় গুহার অন্ধকার দূর হয়নি। অমসৃণ একটা কাঠের টেবিল রয়েছে একদিকের দেয়াল ঘেঁষে, টেবিলের ওপর দেয়ালে সাদামাঠা একটা ক্রুশ। আর কোথাও কোন অলংকরণ চোখে পড়ল না। পাথর কেটে খোপ বানানো হয়েছে কয়েকটা, পোকায় কাটা বই আর বাসন-পেয়ালা রাখা হয়েছে। এই গুহাটাও সম্ভবত স্বেচ্ছা-নির্বাসনের জন্যে ব্যবহার করা হয়।

ইঙ্গিতে রানাকে ভেতরে ঢুকতে বললেও, প্রথম সন্ন্যাসী গুহামুখের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকল, হাতদুটো ঢোলা আলখাল্লার ভেতর ঢোকানো, মুখ ঘুরে আছে অন্য দিকে।

গুহা বা গুহার বাইরে উঠানে পিন-পতন স্তব্ধতা। তবে ইলেকট্রিসিটির মত জ্যান্ত আর ধনুকের ছিলার মত টান টান। কেউ নড়ছে না, সবাই অপেক্ষায়।

আবার হঠাৎ সেই গন্ধটা পেল রানা। এখানে, এই গুহার ভেতর। সারা শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল, বিস্ময়ের একটা ছোট ধাক্কার মত, গন্ধটা চিনতে পারার সাথে সাথে। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে আসছে।

বিদ্যুৎচমকের মত সন্ন্যাসীর পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেল রানার কাছে। দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে থাকল ও। দিশেহারা মনে হলো নিজেকে।

তারপর দুয়ে দুয়ে চারের মত খাপে খাপে মিলে গেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব। জানে, এখন রানা জানে!

ডাচ চুরুটের সুগন্ধ, এত পরিচিত যে ভোলার নয়। চিনতে এত দেরি হলো সেটাই আশ্চর্য। প্রকাণ্ডদেহী সন্ন্যাসীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা।

বাতাসে এখন মৃদু গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ছে, লণ্ঠনের কাঁচে যেন পোকাদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ। সামান্য একটু কাত করল মাথাটা সন্ন্যাসী, গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে চেষ্টা করছে।

বাঁচতে হলে মাথা ঠাণ্ডা রেখে অঙ্ক কষতে হবে রানাকে, হিসেব এক চুল ভুল করা চলবে না।

সন্ন্যাসী প্রতিপক্ষ, উঠানে দাঁড়ানো পাঁচজন সশস্ত্র লোক প্রতিপক্ষ। হেলিকপ্টার আসছে, ওতেও আছে একাধিক শত্রু।

সবচেয়ে বিপজ্জনক সন্ন্যাসী। এখন যখন তাকে চেনে রানা, জানে, এই ট্রেনিং পাওয়া অকুতোভয় যোদ্ধা কোন অংশে তার চেয়ে কম যায় না। দু'জন কখনও লাগেনি, কিন্তু লাগলে কে জিতবে কে হারবে বলা সত্যিই কঠিন।

তারপর রয়েছে উঠানের পাঁচজন সশস্ত্র লোক। চোখ পিট পিট করে হঠাৎ উপলব্ধি করল রানা, ওরা ওখানে বেশিক্ষণ থাকবে না। সহজ একটা হিসাব। একান্ত বিশ্বস্ত লেফটেন্যান্ট ছাড়া আর কারও সামনে নিজের চেহারা প্রকাশ করবে না খলিফা, যদি কেউ দেখে ফেলে তাকে মরতে হবে। পাঁচজনকে সরে যেতে হবে, তবে কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করবে তারা–সম্ভবত কোন গুহার ভেতর। হঠাৎ তৎপর হতে একটু সময় লাগবে ওদের।

তাহলে থাকবে শুধু সন্ন্যাসী আর খলিফা। হেলিকপ্টার চড়ে আসছে সে।

শব্দ শুনে রানার মনে হলো, এরই মধ্যে সরাসরি মাথার ওপর পৌঁছে গেছে যান্ত্রিক ফড়িং। ঘাড় বাঁকা করে ওপর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সন্ন্যাসী। এই প্রথম তাকে অসতর্ক অবস্থায় দেখল রানা।

এঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল, খাড়া ভাবে কপ্টার নামাচ্ছে পাইলট। ল্যান্ডিং লাইটের আলোয় মৃদু আলোকিত হয়ে উঠল গুহার ভেতরটা।

রোটরের বাতাস উঠানটাকে ঢেকে দিল ধুলোয়। চোখের সামনে একটা হাত তুলে গুহা-মুখের দিকে আরও একটু সরে এল সন্ন্যাসী।

দোর-গোড়ায় পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে একবার দেখল সে। মাত্র এক পলক। তারপর আবার তাকাল উঠানে।

ঠিক এই মুহূর্তটার জন্যে অপেক্ষা করছিল রানা। ফণা তোলা কেউটের মত ছুটে গেল ও। দশ ফিট পেরোতে হবে, সব শব্দ চাপা পড়বে কপ্টারের গর্জনে। লাফ দিল রানা, আর ঠিক তখনই ওর দিকে তাকাল সন্ন্যাসী।

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে সন্ন্যাসীর মাথা নিচু হলো, ডাইভ দিয়ে মাঝপথে রয়েছে রানা–বাধ্য হয়ে টার্গেট বদলাতে হলো ওকে। ভেবেছিল একটাই কোপ মারবে ঘাড়ে, যাতে সাথে সাথে মৃত্যু হয়। এখন আর তা সম্ভব নয়। সন্ন্যাসীর ডান কাঁধের ওপর আঘাত হানল ও, যেন বজ্রপাত হলো।

সন্ন্যাসীর ঘাড় আর হাতের জয়েন্টের মাঝখানে কলার বোন গুঁড়িয়ে গেল, এঞ্জিনের আওয়াজ সত্ত্বেও পরিষ্কার শব্দ পেল রানা। বাঁ হাতে শত্রুর অসাড় কনুই খপ্ করে ধরে হ্যাঁচকা টানে ওপরে তুলল, ভাঙা কলার বোনের দুই অসমান প্রান্ত কর্কশ শব্দে ঘষা খেলো পরস্পরের সাথে। কনুই ছাড়ল না রানা, শক্ত করে ধরে মোচড়াতে লাগল, ভাঙা হাড় ক্ষুরের মত মাংস কাটছে। তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সন্ন্যাসী, কাঁধের অসহ্য ব্যথা কমাবার ব্যর্থ প্রয়াসে কোমরের কাছে ভাঁজ করল শরীরটা।

যেই কোমর ভাঁজ করতে দেখল রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেয়ালের দিকে সবেগে ঠেলে দিল তাকে। পাথরের সাথে সংঘর্ষ হলো খুলির, সমতল মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল সন্ন্যাসী।

দ্রুত হাতে তাকে চিৎ করল রানা, আলখাল্লার ভেতর ডান কব্জি ঢুকিয়ে দিল। ভেতরে প্যারাট্রুপার বুট আর শার্ক কম্যান্ডের পুরোদস্তুর নীল ওভারঅল পরে আছে

লোকটা। ওয়েবিং বেল্টে চকচক করছে ব্রাউনিং হাই-পাওয়ার পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ পিস্তল। এক ঝটকায় কুইক-রিলিজ হোলস্টার থেকে বের করে নিল রানা ওটা, বাঁ হাতের ঝাপটা দিয়ে কক করল। জানে, ভেলেক্স এক্সপ্লোসিভ লোড করা আছে।

কার্ল রবসনের মাথা আর মুখ থেকে উলেন পাগড়ি খসে পড়েছে। চওড়া হাসিখুশি মুখটা এই মুহূর্তে যন্ত্রণায় নীল, ব্রিজের ঠিক নিচে ভাঙা নাকটা আরও যেন বেঁকে রয়েছে। পোড়া চকলেট রঙের চোখ জোড়া খোলা, তবে দৃষ্টি নেই। রানার প্রিয় একটা মুখ। এই লোকের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আর ভক্তি পেয়েছে ও। কিন্তু কে জানত···।

রবসনের চুলের ভেতর থেকে কপালে বেরিয়ে আসছে তাজা রক্ত, তবে এখনও জ্ঞান হারায়নি সে। তার নাকের ব্রিজে ব্রাউনিঙের মাজল ঠেকাল রানা। ভেলেক্স বুলেট তার খুলির মাঝখানটা ফুটো করে বেরিয়ে যাবে। লাফিয়ে পড়ার পর কখন যেন নকল দাড়িটা হারিয়েছে রানা, রবসনের চোখে দৃষ্টি ফিরে আসতে দেখল ও। ক্ষীণ একটু বিস্ফারিত হলো চোখ জোড়া, চিনতে পারছে।

'বস্! না!' রবসন মিনতি জানাল, কাতর চোখে প্রাণভিক্ষার আবেদন, 'আমি ক্যাকটাস্ ফ্লাওয়ার!'

ওই বস্ ডাকটাই পঙ্গু করে দিল রানাকে, শ্রদ্ধা মেশানো আন্তরিক সম্বোধন কি করে অগ্রাহ্য করে একজন মানুষ! সেই সাথে বিস্ময়ের একটা ধাক্কাও অনুভব করল রানা। ব্রাউনিঙের ট্রিগারে ঢিল হলো ওর আঙুল। ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা, তিন সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রবসনের মুখের দিকে, তারপর অকস্মাৎ তার আহত কাঁধের ওপর ঘাড় লক্ষ্য করে প্রচণ্ড এক লাথি মারল। জ্ঞান হারাল ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার। ঝট্ করে মাথা নিচু করে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল রানা।

উঠানে নেমেছে হেলিকপ্টার। কিন্তু আকাশে আরও একটা উজ্জ্বল আলো দেখল রানা। সার্চ লাইট, গভীর খাদের তলায় কি যেন খুঁজছে।

উঠানেরটা বেল জেট র‍্যাঙ্গার, ফাইভ সিটার, গায়ে শার্ক কমান্ডের নীল আর সোনালি রঙ করা, বড় বড় হরফে লেখা: শার্ক কমিউনিকেশন।

কন্ট্রোল সামনে নিয়ে এখনও নিজের সীটে বসে রয়েছে পাইলট, একজন মাত্র আরোহী কেবিন থেকে নেমে এসেছে, দীর্ঘ পদক্ষেপে গুহার দিকে এগিয়ে আসছে সে।

মাথার ওপর রোটর ব্লেড ঘুরতে থাকায় ঘাড় নিচু করে আছে সে, তবু তার শালপ্রাংশু দেহ-কাঠামো চিনতে পারল রানা। মাথাটা প্রকাণ্ড, শরীরের তুলনায় কাঁধ দুটো একটু বেশি চওড়া। খুলির দু'পাশে পাক ধরা সোনালি চুল রোটরের বাতাসে উড়ছে। তাকে আলোকিত করে আছে ল্যান্ডিং লাইটের চোখ ধাঁধানো আলো। কোন শেক্সপিরিয়ান ট্রাজেডির কেন্দ্রীয় চরিত্র বলে মনে হলো তাকে রানার।

রোটরের তলা থেকে বেরিয়ে এসে সিধে হলেন ড. এডওয়ার্ড ওয়ার্নার, আর এই প্রথম গুহামুখের সামনে রানাকে দেখতে পেলেন। দাড়িটা নেই, সাথে সাথে

রানাকে চিনতে পারলেন তিনি।

সেই মুহূর্তে খাঁচায় বন্দী সিংহের মত লাগল ড. ওয়ার্নারকে।

'খলিফা!' কর্কশ কণ্ঠে ডাকল রানা, পরমুহূর্তে ড. ওয়ার্নার চরকির মত আধ পাক ঘুরে যেতে ওর সমস্ত সন্দেহের অবসান হলো। বিশাল ধড় নিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে ছুটলেন ড. ওয়ার্নার, চোখের নিমেষে পৌঁছে গেলেন কেবিন দরজার সামনে।

ব্রাউনিং ধরা হাত তুলেই গুলি করল রানা। সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করেনি, তবে লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হলো না।

প্রথম গুলিটা পিঠে লাগল, খোলা দরজা দিয়ে কেবিনের ভেতর ছিটকে পড়লেন ড. ওয়ার্নার। ঠিক পিঠে নয়, কোমরে লেগেছে গুলিটা, বুঝতে পারল রানা-মৃত্যু হবে না। হঠাৎ পরাজয়ের গ্লানি গ্রাস করতে উদ্যত হলো ওকে। হেলিকপ্টার উঠান ছেড়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে। খাড়াভাবে উঠছে, সেই সাথে ঘুরে যাচ্ছে দ্রুত।

এক ছুটে বিশ ফিট পেরোল রানা, লাফ দিয়ে প্যারাপেটের মাথায় চড়ল। ওর মাথার ওপর দিয়ে সগর্জনে চলে যাচ্ছে জেট র‍্যাঙ্গার, পেটটা মানুষ-খেকো হাঙরের মত সাদা লাইটের, ল্যান্ডিং আলো ধাঁধিয়ে দিল ওর চোখ। দুর্গ-প্রাচীরের ওপর দিয়ে উড়ে গেল যান্ত্রিক ফড়িং।

প্রাচীরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ধরল রানা ব্রাউনিংটা। সরাসরি ওপর দিকে গুলি করছে ও। ফুয়েল ট্যাংক কোথায় জানা আছে ওর। পিস্তল থেকে এক এক করে বেরিয়ে গেল কয়েকটা বুলেট, প্রতিবার কাঁধে ঝাঁকি খেল রানা।

কপ্টারের পেট কামড়াল ভেলেক্স বুলেট, বিস্ফোরিত হয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। তবু নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে জেট র‍্যাঙ্গার। গুনছিল রানা, ব্রাউনিং খালি হয়ে এসেছে।

সাতটা, আটটা-এই সময় হঠাৎ মাথার ওপর আকাশটা আগুনে ভরাট হয়ে গেল। হুস করে প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হলো, দুর্গ প্রাচীরে কেঁপে উঠল রানার পা। শূন্যে চিৎ হলো জেট র‍্যাঙ্গার, ওটাকে মুড়ে ফেলেছে আগুন। তারপর ডিগবাজি খেতে শুরু করল, আগুনের গোলাটা সবেগে নেমে গেল গভীর খাদের দিকে।

উঠানের দিকে ঘুরছে রানা, চোখের কোণ দিয়ে দেখল কাঠের দরজা দিয়ে উঠানে বেরিয়ে আসছে লোকজন।

ওরা সবাই শার্ক কমান্ডের কমান্ডো, ট্রেনিং পাওয়া দক্ষযোদ্ধা, ওদের নিজ হাতে ট্রেনিং দিয়েছে রানা। ব্রাউনিঙে রয়েছে আর মাত্র একটা বুলেট। রানা জানে, শেষ রক্ষা হলো না। তবু উঠানে ঢোকার কাঠের দরজার দিকেই ছুটল ও, পালাবার ওটাই একমাত্র পথ।

তীব্র আলো আর যান্ত্রিক গর্জন, রানার পিছন দিক থেকে আসছে। কোন সন্দেহ নেই, সবশেষে উদয় হতে যাচ্ছে মোসাড, ভাবল রানা। দুর্গ প্রাচীর ধরে ঝড়ের বেগে ছুটছে ও। মোসাডের পরম শত্রু মাসুদ রানা, তাকে ওরা মুঠোয় ভরার এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে না।

বুলেট বৃষ্টি শুরু হলো এক সেকেন্ড পর। বাতাসে শিস কেটে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল কয়েকটা। প্যারাপেট ধরে ছুটতে ছুটতেই শেষ বুলেটটা উঠানে দাঁড়ানো লোকগুলোকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল রানা। পরমুহূর্তে ধাক্কা খেলো, ওর শার্টের আস্তিন ধরে কে যেন হ্যাঁচকা টান দিল। দুর্গ-প্রাচীরের কিনারা থেকে পড়ে গেল রানা।

পতনটা অনন্তকাল স্থায়ী হবে, উপলব্ধি করে চোখ বুজল রানা। গলার ভেতর থেকে একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসতে চাইল। এক হাজার কি দেড় হাজার ফিট নিচে খাদের তলা। ধাক্কা খাওয়ার আগেই নিজের মৃত্যু কামনা করল রানা।

প্যারাপেটের দশ ফিট নিচে সরু, বিশ ইঞ্চি চওড়া কার্নিসে একজোড়া কাঁটাঝোপ গজিয়েছে, শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে যেন রানাকে বিদ্ধ করার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। ঝোপের মধ্যে পড়ে দোল খেতে শুরু করল রানা, মট মট করে ভেঙে গেল কয়েকটা ডাল। ব্লেজার, মোজা, টাইয়ের ভেতর ঢুকে গেছে কাঁটা, মাংসে কামড় বসাচ্ছে।

উঠান থেকে তীক্ষ্ণ একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এল। 'সিজ ফায়ার! কেউ আর গুলি করবে না।'

রোটরের আওয়াজও পাচ্ছে রানা, দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটা উঠানে নেমেছে।

'তোলো ওকে,' ব্যারনেস লিনা প্যারাপেটের ওপর দাঁড়িয়ে ঝুঁকে আছে নিচের দিকে। 'সিঁড়ি নামাও!'

ক্ষত-বিক্ষত শরীর নিয়ে রশির সিঁড়ি বেয়ে প্যারাপেটে উঠল রানা, সেখান থেকে লাফ দিয়ে উঠানে নামল। শার্ক কমান্ডের কমান্ডোরা এক লাইনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে পিস্তল তাক করে আছে। রানার নাগাল থেকে দূরে সরে গেছে ব্যারনেস লিনা, তার দু'পাশে দু'জন করে চারজন মোসাড এজেন্ট, সশস্ত্র। হেলিকপ্টার থেকে আরও লোক বেরিয়ে আসছে।

'আমরা ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স মোসাড,' আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের পরিচয় দিল ব্যারনেস লিনা, রানার দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না। 'আপনি বাংলাদেশী নাগরিক মেজর মাসুদ রানা, ভুয়া পাসপোর্ট নিয়ে অবৈধভাবে ইসরায়েলে ঢুকেছেন, এবং ইসরায়েলি নাগরিকদের জান-মালের ক্ষতি সাধন করেছেন–আপনাকে গ্রেফতার করা হলো।'

হাঁপাচ্ছে রানা, চোখে কপালের ঘাম পড়ায় ভাল দেখতে পাচ্ছে না সামনেটা।

'তোলো ওকে!' নির্দেশ দিল ব্যারনেস লিনা। তার দু'পাশ থেকে একজন করে মোসাড এজেন্ট এগিয়ে এল, রানার দু'পাশে দাঁড়াল তারা। তাদের মাঝখানে থেকে হেলিকপ্টারের দিকে এগোল রানা, দেখল গুহার ভেতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার। তার মাথা আর মুখ এখনও ভিজে রয়েছে রক্তে।

কেবিনের খোলা দরজা দিয়ে প্রথমে রানা ঢুকল। পাইলটের সীটটা খালি, সেটার পিছনে বসল ও। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শার্ক কমান্ডোর লোকদের সাথে কথা বলছে ব্যারনেস লিনা। কমান্ডোরা

যে যার অস্ত্র হোলস্টারে ভরে রাখল। তাদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মোসাড এজেন্টরা।

মোসাডের এজেন্ট দু'জন দু'সেকেন্ড অপেক্ষা করল, তারপর একসাথে ঢুকল কেবিনে। দুটো মাথা দরজার ভেতর, জোড়া লেগে এক হয়ে রয়েছে। রানা শুধু দু'হাত দিয়ে ঠেকে দিল, হুমড়ি খেয়ে দু'জনেই পড়ে গেল কন্টারের মেঝেতে। একজনের পিঠে পা রেখে অপরজনের মাথা দু'হাতে ধরে মেঝেতে সজোরে ঠুকে দিল রানা, স্থির হয়ে গেল লোকটা। প্রথম লোকটার কানের পাশে প্রচণ্ড এক লাথি মারল ও, কনুইয়ের কাছে ধরে ডান হাতটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওপর দিকে তুলল, পিঠের ওপর এখনও একটা পা চেপে আছে। কাঁধের কাছে ভেঙে গেল হাতটা। কেউ কোন শব্দ করার অবকাশ পায়নি, জ্ঞান হারিয়েছে। কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিল রানা। আরেকজনের অপেক্ষায় বসে আছে।

ষোলো

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ব্যারনেস লিনা, কেবিনের দৃশ্যটা দেখে রাগে লাল হয়ে উঠল চেহারা। নিঃশব্দে পাইলটের সীটে বসল সে, পিস্তলটা কোটের পকেটে ভরল। কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল, তারপর বিস্ফোরিত হলো তার কণ্ঠস্বর, 'তুমি একটা যাচ্ছে তাই, বুঝলে! কোন কারণ নেই তবু ঝুঁকি নিতে হবে? দেখলে আমি এসে গেছি, বুঝলে অভিনয় করে তোমাকে ওদের হাত থেকে ছাড়ালাম, জানো হেলিকপ্টার আমিই চালাব, তারপরও বাহাদুরি দেখাবার কি দরকার ছিল? ওরা যদি তোমাকে…!'

কপ্টারের মেঝেতে রয়েছে রবসন, হাত দুটো মাথার পিছনে তোলা, পা দুটো মোসাড এজেন্টদের অজ্ঞান দেহের ওপর ছড়ানো। তার দিকে একটা পিস্তল তাক করে বসে আছে রানা সীটে। ব্যারনেসের দিকে তাকাল না ও, শুধু হাসল। 'দেখলাম সবটুকু কৃতিত্ব তুমি পেয়ে যাচ্ছ, একটু ঈর্ষা হলো, তাই…'

স্টার্ট নিল এঞ্জিন।

'যদি জানতাম,' তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল কার্ল রবসন, 'গগল নয়, তুমি–তাহলে কি ভুলেও এই বান্দা পেছন ফিরত তোমার দিকে? দ্বিতীয় ভুল করলাম খালি হাতে এখানে ঢুকে।'

খাড়া উঠে যাচ্ছে হেলিকপ্টার। ব্যারনেস জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় লেগেছে তোমার?'

'বলো কোথায় লাগেনি?' আবার হাসল রানা। 'সম্ভবত গোটা পঞ্চাশেক কাঁটা এখনও বিঁধে আছে শরীরে।'

'আমি কাঁটার কথা বলছি না, বলছি বুলেটের কথা!' ঝাঁঝের সাথে বলল ব্যারনেস।

'কই, লাগলে তো এতক্ষণ টের পেতাম!' কৌতুক করল রানা। 'আমরা যাচ্ছি

কোথায়?'

'জানো না, না?' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্যারনেস। 'আচ্ছা জীবনে কি কখনোই কাউকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো না? আজও তুমি ভেবেছিলে আমি বেঈমানী করতে পারি!'

'বাজে কথা বোলো না তো!' প্রতিবাদ করল রানা। 'তা যদি ভাবতাম, তোমাকে পিস্তল হাতে কেবিনে ঢুকতে দেখেও আমি কিছু বললাম না কেন?'

চুপ করে গেল ব্যারনেস। কন্টার ঘুরিয়ে নিয়ে জর্দানের দিকে চলল ওরা।

'রবসন,' তার চোখে চোখ রেখে সরাসরি প্রশ্ন করল রানা, 'সোহেলকে কিডন্যাপ করার আয়োজন কি তুমিই করেছিলে?'

মাথা নাড়ল ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার। 'উঁহুঁ, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলব না। ওয়ার্নার তার অন্য একজন এজেন্টকে দিয়ে কাজটা করায়। ব্যাপারটা যে ঘটতে যাচ্ছে তা-ই আমি জানতাম না।'

তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা, সে দৃষ্টিতে ক্ষমা নেই।

'সোহেলকে উদ্ধার করার পর আমি জানতে পারি কাজটা খলিফার। আগে জানলে বাধা দিতাম, বস্। খলিফাও সেটা জানত। সেজন্যেই দায়িত্বটা আমাকে দেয়নি সে।' দ্রুত কথা বলছে রবসন, জরুরী ভঙ্গিতে।

'ওয়ার্নার আসলে চেয়েছিল কি?' হিস হিস করে উঠল রানার গলা।

'তিনটে জিনিস। এক, তোমাকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল, সে খলিফা নয়। সেজন্যেই কৌশলে নিজেকে খুন করার প্রস্তাব পাঠায় তোমার কাছে। অবশ্যই তুমি তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারতে না। তারপর সোহেলকে উদ্ধার করার সুযোগ করে দেয়া হয় তোমাকে। খলিফা নিজে ফোন করে সাইরাস কারচিভালের নাম আর ঠিকানা জানিয়ে দেয়। তারপর তোমাকে লেলিয়ে দেয়া হয় ব্যারনেস লিনা অটারম্যানের পেছনে···,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে ব্যারনেসের দিকে একবার তাকাল রবসন। 'ওঁকে যদি তুমি খুন করতে পারতে, খলিফার মুঠোর ভেতর চলে যেতে তুমি।'

'এ-সব তুমি জানলে কখন?'

'সোহেলকে উদ্ধার করার পর। তখন ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার কাভার ফাঁস না করে কিছুই আমার করার ছিল না। আমি শুধু মোসাডের মাধ্যমে ব্যারনেস অটারম্যানকে সাবধান করে দেয়ার চেষ্টা করি।'

'কথাটা সত্যি, রানা,' শান্ত গলায় বলল ব্যারনেস।

'খলিফা তোমাকে চীফ লেফটেন্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব দিল কবে থেকে?'

'তোমার কাছ থেকে শার্ক কমান্ডের দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পরদিন। তোমাকে সে প্রথম থেকেই অবিশ্বাস আর ভয় করত, রানা। সেজন্যেই তো শার্ক কমান্ডের কমান্ডার হতে দিতে চায়নি। আর তাই, শার্ক কমান্ড থেকে তোমাকে সরাবার প্রথম সুযোগটা সাথে সাথে কাজে লাগায়। তুমি বিদায় হয়েছ দেখেও স্বস্তি পায়নি, রুঁবুইলে রোডে খুন করার চেষ্টা করল। কিন্তু তারপর, তুমি বেঁচে যাওয়ায়, তোমার গুরুত্ব নতুন করে উপলব্ধি করল সে।'

'অর্গানাইজেশনের অন্যান্য শাখার কমান্ডাররাও কি খলিফার নিজের

লোক-কোবরা কমাভার, চিতা কমাভার?'

'আমরা তিনজনই-হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল রবসন। নিস্তব্ধ হয়ে গেল কেবিন।

দু'মিনিট পর ব্যারনেস বলল, 'সামনে এয়ারফিল্ড।'

'বস,' ফিসফিস করে ডাকল কার্ল রবসন। 'এবার বোধহয় আমার পালা, তাই না?'

'তোমার পালা মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

চোখে আবেদন নিয়ে তাকিয়ে থাকল রবসন। 'বস্, তোমার আমি কোন ক্ষতি করিনি-অন্তত জ্ঞাতসারে করিনি। আমাকে ক্ষমা করা যায় না?'

'ক্ষমা?'

'জানি, তোমার জায়গায় আমি হলে, আমিও সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা বোধ করতাম না-হয়তো তোমার প্রাণভিক্ষার আবেদন কানে তুলতাম না। কিন্তু বস্, ভেবে দেখো, আমাকে মেরে কি লাভ তোমার? তুমি চলে গেলে, তোমাকে প্রাণ নিয়ে পালাতে দেয়ার অপরাধে আমাকে আর গুরুত্বপূর্ণ কোন দায়িত্ব দেয়া হবে না। হয়তো মোসাড হেডকোয়ার্টারে একটা ডেস্কে বসতে দেয়া হবে আমাকে। ইসরায়েলের বাইরে আর যেতে পারব না, তোমার ক্ষতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্তত এই কথাটা মনে রেখেও কি আমাকে ক্ষমা করা যায় না?'

'পাগল নাকি!' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'এই লিনা, গর্দভটাকে বোঝাও তো!'

'আমার কোন দায় পড়েনি!' ঝাঁঝের সাথে বলল ব্যারনেস। রানওয়েতে কপ্টার নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

'তোমার একটা ভুল ধারণা ভেঙে দিচ্ছি, রবসন,' বলল রানা, গম্ভীর। 'বি.সি.আই. অকারণ রক্তপাতে বিশ্বাস করে না।'

বোকার মত তাকিয়ে থাকল রবসন। 'তারমানে কি…?'

'তারমানে কপ্টার নিয়ে চলে যাবে তুমি, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।' রানা হাসল।

'বস! কিন্তু…'

রানওয়ে স্পর্শ করল হেলিকপ্টার। 'নামো!' তাগাদা দিল ব্যারনেস। জানালা দিয়ে দেখা গেল অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লীয়ার জেট, পাশে দাঁড়িয়ে পল বার্না হাত নাড়ছে ব্যারনেসের উদ্দেশে।

'এই কাগজটা হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ো,' হেলিকপ্টার থেকে নেমে রবসনের হাতে কাগজটা গুঁজে দিল ব্যারনেস।

'কি এটা?' জিজ্ঞেস করল রবসন।

'আমার পদত্যাগপত্র,' বলল ব্যারনেস। 'প্রসঙ্গক্রমে ওতে তোমার কথাও লেখা আছে, ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার। যতটা সম্ভব তোমার পক্ষে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেছি।'

'কিন্তু কেন? আমি আপনার…?'

'আমার নয়, রানার প্রতি তোমার আন্তরিকতা লক্ষ করেছি আমি,' বলে লীয়ারের দিকে দ্রুত এগোল বারনেস, রানার একটা হাত ধরে আছে শক্ত করে।

'তুমি জানতে রবসনকে আমি ছেড়ে দেব?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমাকে এইটুকু যদি না বুঝি, তাহলে ভালবাসতে পারলাম কিভাবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল ব্যারনেস লিনা।

লীয়ার জেট অন্ধকার আকাশের কোণে পুরোপুরি অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত হেলিকপ্টারের পাশে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল ক্যাকটাস ফ্লাওয়ার। তারপর বিড়বিড় করে বলল সে, 'অদ্ভুত একটা জোড়া–ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন।'

***

মাসুদ রানা

শ্বেত সন্ত্রাস

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সন্ত্রাসবাদীরা যোদ্ধা নয়–
যুদ্ধে পারবে না জেনেই তারা বেছে নিয়েছে
সন্ত্রাসের পথ। তাদের পেতে রাখা বোমার আঘাতে
যদি তিন বছরের নিষ্পাপ শিশু আহত
কিংবা নিহত হয়–কী আর করা,
ধরে নিতে হবে তার কপাল মন্দ।
এ নীতি মানে না রানা–
ঘৃণা করে সে সন্ত্রাসবাদকে। তাই
জাম্বো জেট জিরো-সেভেন-জিরোকে যখন
হাইজ্যাক করে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়া হলো,
চারশো একজন জিম্মিকে উদ্ধার করতে
ছুটে গেল সে কমান্ডো গ্রুপ নিয়ে।
তারপর?



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০